NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

SELF LEARNING MATERIAL

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY | 8 | UNDER GRADUATE DEGREE PROGRAMME

HBG

CC-BG-08

HONOURS IN BENGALI

বাংলা কথাসাহিত্য

8

CHOICE BASED CREDIT SYSTEM

CBCS • UG • HBG • BENGALI • CC-BG-08

মানুষের জ্ঞান ও ভাবকে বইয়ের মধ্যে সঞ্চিত করিবার যে একটা প্রচুর সুবিধা আছে, সে কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু সেই সুবিধার দ্বারা মনের স্বাভাবিক শক্তিকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলে বুদ্ধিকে বাবু করিয়া তোলা হয়।

—**রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর**

ভারতের একটা mission আছে, একটা গৌরবময় ভবিষ্যৎ আছে, সেই ভবিষ্যৎ ভারতের উত্তরাধিকারী আমরাই। নূতন ভারতের মুক্তির ইতিহাস আমরাই রচনা করছি এবং করব। এই বিশ্বাস আছে বলেই আমরা সব দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে পারি, অন্ধকারময় বর্তমানকে অগ্রাহ্য করতে পারি, বাস্তবের নিষ্ঠুর সত্যগুলি আদর্শের কঠিন আঘাতে ধূলিস্যাৎ করতে পারি।

—**সুভাষচন্দ্র বসু**

Any system of education which ignores Indian conditions, requirements, history and sociology is too unscientific to commend itself to any rational support.

—**Subhas Chandra Bose**

Price: ₹475.00
[Not for sale]

Printed at Seva Mudran, 43, Kailash Bose Street, Kolkata-700 006

উপক্রমণিকা

মহান দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বসুর নামাঙ্কিত এই মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনে আপনাকে স্বাগত। সম্প্রতি এই প্রতিষ্ঠান দেশের সর্বপ্রথম রাজ্য সরকারি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ন্যাক (NAAC) মূল্যায়নে 'এ'-গ্রেড প্রাপ্ত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন প্রকাশিত নির্দেশনামায় স্নাতক শিক্ষাক্রমকে পাঁচটি পৃথক প্রকরণে বিন্যস্ত করার কথা বলা হয়েছে। এগুলি হল—'কোর কোর্স', ডিসিপ্লিন স্পেসিফিক ইলেকটিভ', 'জেনেরিক ইলেকটিভ' এবং 'স্কিল'/'এবিলিটি এনহ্যান্সমেন্ট কোর্স'। ক্রেডিট পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে বিন্যস্ত এই পাঠক্রম শিক্ষার্থীর সামনে নির্বাচনাত্মক পাঠক্রমে পাঠ গ্রহণের সুযোগ এনে দেবে। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে যান্মাষিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা এবং ক্রেডিট ট্রান্সফারের সুযোগ। শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক এই ব্যবস্থা মূলত গ্রেড-ভিত্তিক যা অবিচ্ছিন্ন আভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সার্বিক মূল্যায়নের দিকে এগোবে এবং শিক্ষার্থীকে বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত সুবিধা দেবে। শিক্ষাক্রমের প্রসারিত পরিসরে বিবিধ বিষয় চয়নের সক্ষমতা শিক্ষার্থীকে দেশের অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আন্তঃব্যবস্থায় অর্জিত ক্রেডিট স্থানান্তরে সাহায্য করবে। শিক্ষার্থীর অভিযোজন ও পরিগ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী পাঠক্রমের বিন্যাসই এই নতুন শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য।

UGC (Open and Distance Learning Programmes and Online Learning Programmes) Regulations, 2020 অনুযায়ী সকল উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্নাতক পাঠক্রমে এই সি.বি.সি.এস. পাঠক্রম পদ্ধতি কার্যকরী করা বাধ্যতামূলক—উচ্চশিক্ষার পরিসরে এই নতুন শিক্ষাক্রম এক বৈকল্পিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে। আগামী ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষ থেকে স্নাতক স্তরে নির্বাচনভিত্তিক এই পাঠক্রম কার্যকরী করা হবে, এই মর্মে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বর্তমান পাঠক্রমগুলি উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রের নির্ণায়ক কৃত্যকের যথাবিহিত প্রস্তাবনা ও নির্দেশাবলী অনুসারে রচিত ও বিন্যস্ত হয়েছে। বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে সেইসব দিকগুলির প্রতি যা ইউ.জি.সি. কর্তৃক চিহ্নিত ও নির্দেশিত।

মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে স্ব-শিক্ষা পাঠ-উপকরণ শিক্ষার্থী সহায়ক পরিষেবার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সি.বি.সি.এস পাঠক্রমের এই পাঠ-উপকরণ মূলত বাংলা ও ইংরেজিতে লিখিত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সুবিধের কথা মাথায় রেখে আমরা ইংরেজি পাঠ-উপকরণের বাংলা অনুবাদের কাজেও এগিয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ শিক্ষকরাই মূলত পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন—যদিও পূর্বের পরম্পরা অনুযায়ী অন্যান্য বিদ্যায়তনিক উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংযুক্ত অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের সাহায্য আমরা অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ করেছি। তাঁদের এই সাহায্য পাঠ-উপকরণের মানোন্নয়নের সহায়ক হবে বলেই আমার বিশ্বাস। এই নির্ভরযোগ্য ও মূল্যবান বিদ্যায়তনিক সাহায্যের জন্য আমি তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এই পাঠ-উপকরণ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণ পদ্ধতি-প্রকরণে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। একথা বলা বাহুল্য যে, এ বিষয়ে উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনের পঠন প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত সকল শিক্ষকের সদর্থক ও গঠনমূলক মতামত আমাদের আরও সমৃদ্ধ করবে।

মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির এই বিদ্যায়তনিক উদ্যোগের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি। মুক্তশিক্ষাক্রমে উৎকর্ষের প্রশ্নে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার

উপাচার্য

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

স্নাতক পাঠক্রম : বাংলা (HBG)

বিষয় : বাংলা (HBG)

কোর কোর্স : বাংলা কথাসাহিত্য

কোর্স কোড : **CC-BG-08**

প্রথম মুদ্রণ : আগস্ট, 2022

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations of the Distance
Education Bureau of the University Grants Commission.

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

স্নাতক পাঠক্রম : বাংলা (HBG)

বিষয় : বাংলা (HBG)

কোর কোর্স : বাংলা কথাসাহিত্য

কোর্স কোড : CC-BG-08

: কোর্স রচয়িতা :

মডিউল - ১ (ক) : **ড. মহর্ষি সরকার**
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

মডিউল - ১ (খ) : **ড. চিত্রিতা ব্যানার্জি**
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, শ্রীশিক্ষায়তন কলেজ, কলকাতা

মডিউল - ২ (ক) : **ড. গোবর্ধন অধিকারী**
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চোপড়া কমলাপাল স্মৃতি মহাবিদ্যালয়, উত্তর দিনাজপুর

মডিউল - ২ (খ) : **ড. মহর্ষি সরকার**
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

মডিউল - ৩ : **ড. মুনমুন ঘোষ**
সহকারী অধ্যাপক, সিঙ্গুর সরকারি মহাবিদ্যালয়

মডিউল - ৪ : **ড. তাপসকুমার সাহা**
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সেন্টজেভিয়ার্স কলেজ, কলকাতা

ও

ড. অনিন্দিতা দত্ত
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বেথুন সরকারি মহাবিদ্যালয়, কলকাতা

: কোর্স সম্পাদক :

অধ্যাপক মননকুমার মণ্ডল
বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

স্নাতক-বাংলা বিষয় সমিতি

ড. শক্তিনাথ ঝা, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক কৃষ্ণনাথ কলেজ, মুর্শিদাবাদ
বাণীমঞ্জুরী দাস, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপিকা, বেথুন কলেজ, কলিকাতা
ড. নীহারকান্তি মণ্ডল, সহযোগী অধ্যাপক, মুরলীধর গার্লস কলেজ, কলিকাতা
ড. চিত্রিতা ব্যানার্জি, সহযোগী অধ্যাপিকা, শ্রীশিক্ষায়তন কলেজ, কলিকাতা
আব্দুল কাফি, সহকারি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
ড. অনামিকা দাস, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
ড. প্রতুলকুমার পণ্ডিত, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপক মননকুমার মণ্ডল, বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ ও অধিকর্তা, মানববিদ্যা অনুষদ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ উপকরণের সমুদায় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ব্যাতিরেকে এই পাঠ উপকরণের কোনো অংশের পুনর্মুদ্রণ বা পুনরুৎপাদন এবং কোনো রকম উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ বে-আইনি ও নিষিদ্ধ। এই বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রয়োজনীয় বিধিসম্মত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

কিশোর সেনগুপ্ত
নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

স্নাতক পাঠক্রম ঃ বাংলা (HBG)

কোর কোর্স : বাংলা কথাসাহিত্য

কোর্স কোড : **CC-BG-08**

মডিউল-১ (ক)

একক-১	❑	বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য	9
একক-২	❑	উপন্যাস : বিষয় বৈচিত্র্য ও শ্রেণিবিভাগ	15
একক-৩	❑	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : উপন্যাসের পথিকৃৎ	20
একক-৪	❑	'কপালকুণ্ডলা' : উপন্যাসের পাঠ	24

মডিউল-১ (খ)

একক-৫	❑	ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ ও 'ঘরে-বাইরে'	65
একক-৬	❑	'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসের মূলপাঠ ও কাহিনি বিশ্লেষণ	71
একক-৭	❑	'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্র বিচার	77
একক-৮	❑	'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসের বিবিধ প্রসঙ্গ ও মূল্যায়ণ	88

মডিউল-২ (ক)

একক-৯	❑	ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র	103
একক-১০	❑	উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত কাহিনি, কাহিনি-বিশ্লেষণ ও নামকরণ	109
একক-১১	❑	'দেনা-পাওনা' উপন্যাসের চরিত্র বিচার	117
একক-১২	❑	'দেনা-পাওনা' উপন্যাসের গঠনশৈলী ও অন্যান্য প্রসঙ্গ	136

মডিউল-২ (খ)

একক-১৩ ❑	লেখক পরিচিতি—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	149
একক-১৪ ❑	পদ্মানদীর মাঝি : কাহিনি-পরিচিতি	156
একক-১৫ ❑	পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসে চরিত্রায়ণ	166
একক-১৬ ❑	উপন্যাসের গঠন-কৌশল	182

মডিউল-৩

একক-১৭ ❑	কাবুলিওয়ালা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	195
একক-১৮ ❑	নিশীথে : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	208
একক-১৯ ❑	অতিথি : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	224
একক-২০ ❑	স্ত্রীর পত্র : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	234

মডিউল-৪ (ক)

একক-২১ ❑	ছোটগল্প : পয়োমুখম্—জগদীশ গুপ্ত	249
একক-২২ ❑	ছোটগল্প : প্রাগৈতিহাসিক—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	257
একক-২৩ ❑	ছোটগল্প : পুঁইমাচা—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	264
একক-২৪ ❑	ছোটগল্প : জলসাঘর — তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	270
একক-২৫ ❑	ছোটগল্প : ফসিল — সুবোধ ঘোষ	278

মডিউল-৪ (খ)

একক-২৬ ❑	দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা ছোটগল্পের প্রেক্ষাপট	287
একক-২৭ ❑	মহানগর — প্রেমেন্দ্র মিত্র	298
একক-২৮ ❑	আদাব — সমরেশ বসু	308
একক-২৯ ❑	দ্রৌপদী — মহাশ্বেতা দেবী	320

মডিউল-১ (ক)
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : 'কপালকুণ্ডলা'

একক-১ □ বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য

গঠন

১.১. উদ্দেশ্য
১.২ প্রস্তাবনা
১.৩ লেখক পরিচিতি
১.৪ লেখকের সাহিত্যকৃতি
১.৫ সারাংশ

১.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে শিক্ষার্থীরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে অবহিত হতে পারবেন।

- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে।
- বঙ্কিমচন্দ্রের সামগ্রিক রচনা সম্পর্কে।
- বাংলা সাহিত্যে তাঁর বহু বিচিত্র অবদান সম্পর্কে।

১.২ প্রস্তাবনা

বাংলা উপন্যাস জগতে প্রথম সার্থক উপন্যাস শিল্পী হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত। মেধা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে তিনি যে কেবল পেশাগত জীবনে সাফল্য লাভ করেছিলেন তা নয়, সাহিত্যরচনার ক্ষেত্রেও সেই ধারা তিনি অব্যাহত রেখেছিলেন। খ্যাতি ও জনপ্রিয়তার শীর্ষে আসীন হতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি। উপন্যাস, প্রবন্ধ এবং বিচিত্র ব্যক্তিগত রচনাধর্মী গ্রন্থ, নানাধরনের সৃষ্টি সম্ভার তাঁর বিরল প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে সর্বদাই। 'কপালকুণ্ডলা' তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস। সাহিত্যসৃষ্টিতে তাঁর নিজস্ব শৈলী সমকালীন পর্বে এতটাই জনপ্রিয় হয়েছিল যে, পরবর্তীকালে বিখ্যাত হয়ে ওঠা অনেক লেখকই তাঁদের সাহিত্যজীবনের প্রথমপর্বে বঙ্কিমচন্দ্রকে গুরুপদে বরণ করে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। আসুন, বাংলা সাহিত্যের এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনাকারের পারিবারিক জীবন, পেশাগত জীবন এবং সাহিত্যচর্চার পর্বটিকে চিনে নেবার চেষ্টা করি।

১.৩ ঔপন্যাসিকের জীবনচিত্র

বঙ্কিমচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন ১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দের ২৬ জুন চব্বিশ পরগনা জেলার নৈহাটির কাছে কাঁঠালপাড়া গ্রামে। পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের চার পুত্রের মধ্যে ইনি তৃতীয়। অন্যান্যরা হলেন শ্যামাচরণ, সঞ্জীবচন্দ্র এবং পূর্ণচন্দ্র। গ্রামেই শিক্ষার শুরু, কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা শুরু হয় ছয় বছর বয়সে পিতার কর্মস্থল মেদিনীপুরে আসার পর।

কয়েক বছর ইংরেজি স্কুলে শিক্ষালাভ করে এগারো বছর বয়সে কাঁঠালপাড়ায় ফিরে এলে তাঁর বিবাহ হয় পাঁচ বছর বয়সী এক বালিকার সঙ্গে।

ইতিহাস পাঠের প্রতি তাঁর আবাল্য ঝোঁক ছিল। ১৮৪৯ খ্রিষ্টাব্দে ১১ বছর বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র পাঁচ বছরের মোহিনীদেবীকে বিবাহ করেন। এই বছরই হুগলি কলেজে ভর্তি হন। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। হুগলি কলেজে পড়াশুনা করে ১৮৫৬ সালে বঙ্কিমচন্দ্র কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন আইন পড়বার জন্য। এরপর ১৮৫৭ ও ১৮৫৮ তে যথাক্রমে প্রবেশিকা ও বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনিই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্নাতক। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র যশোরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন। এই সময়েই তাঁর সঙ্গে দীনবন্ধু মিত্রের পরিচয় হয়, যা পরবর্তীকালে অন্তরঙ্গতা লাভ করে। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে বঙ্কিমচন্দ্রের পত্নীবিয়োগ হয়। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র মেদিনীপুরের নেগুয়ায় (বর্তমানে কাঁথি মহকুমা) বদলি হন। নেগুয়ার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল এইখানেই অবস্থানকালে বঙ্কিমের মনে কপালকুণ্ডলার বীজ উপ্ত হয়। এই বছরেই বঙ্কিমচন্দ্র হালিশহরের চৌধুরী বাড়ির কন্যা দ্বাদশবর্ষীয়া রাজলক্ষ্মী দেবীকে বিবাহ করেন। এরপর বঙ্কিমচন্দ্র খুলনায় বদলি হন। এই সময়েই তাঁর ইংরেজী উপন্যাস 'Rajmohon's wife' ও প্রথম বাংলা উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' রচনার সূত্রপাত হয়। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বারাইপুরে বদলি হন এবং পরের বছর বঙ্কিমচন্দ্র ভ্রাতৃবিরোধের মধ্যে জড়িয়ে পড়েন। পিতা যাদবচন্দ্র কাঁঠালপাড়ার ভদ্রাসন উইল করে সঞ্জীবচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্রকে ভাগ করে দেন। বঙ্কিমচন্দ্র ওই সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হন। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান পেয়ে আইন পাশ করেন। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে তাঁর মাতৃবিয়োগ হয়। ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা ভবানীপুর (কলকাতা) থেকে প্রকাশিত হয়। ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে কাঁঠালপাড়ায় বঙ্গদর্শনের ছাপাখানা ও কার্যালয় স্থানান্তরিত হয়। ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র হুগলিতে বদলি হন এবং ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে অস্থায়ীভাবে বর্ধমান ডিভিসনে কমিশনারের পি. এ. নিযুক্ত হন। ঠিক এই সময়েই বঙ্কিমচন্দ্রের পারিবারিক কলহ তাঁর হয়ে ওঠে ও তিনি বঙ্গদর্শনের প্রকাশ বন্ধ করে দেন। অবশেষে ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র কাঁঠালপাড়ার বাসা উঠিয়ে দিয়ে চুঁচুড়ায় বাড়ি ভাড়া করে সপরিবারে চলে যান এবং বঙ্গদর্শনের সমস্ত স্বত্ব সঞ্জীবচন্দ্রকে দান করেন। চুঁচুড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়িতে কলকাতা থেকে অনেক সাহিত্যিক যাতায়াত করতেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভূদেব মুখোপাধ্যায়, পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন ইত্যাদি।

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র যখন পি. এ.-রূপে হাওড়ায় বদলি হন, সেই সময়ে তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়। এই হাওড়াতেই বিচারের রায় নিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট বাক্ল্যাণ্ড সাহেবের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ হয়। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি সরকারের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারিরূপে ও ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টাররূপে কলকাতায় বদলি হন এবং শেষে তিনি উড়িষ্যার জাজপুরে বদলি হন। হাওড়া থেকে কলকাতায় বদলি হবার পর জাজপুর গমন পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের বাস ছিল কলকাতার বহুবাজার স্ট্রীটে। সেখানে প্রায় প্রতিদিনই সাহিত্যের বৈঠক বসত। এই সাহিত্যের আড্ডায় আসতেন চন্দ্রনাথ বসু, হেমচন্দ্র, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সঞ্জীবচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত। এই সময়ে পিতার বাৎসরিক উপলক্ষ্যে বঙ্কিমের সঙ্গে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিরোধ লাগে।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারী তারিখে বঙ্কিমচন্দ্র মিঃ ব্লাইদকে অ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারীর চার্জ বুঝাইয়া দেন। সেইদিন সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথ আসিয়া তাঁহাদের জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে বঙ্কিমকে লইয়া যান। সেইদিন ১১ই মাঘ ছিল।" ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে জেনারেল এসেমব্লীজ

ইনস্টিটিউশান (বর্তমানে স্কটিশ চার্চ কলেজ)-এর অধ্যক্ষ পাদ্রী হেস্টির সঙ্গে হিন্দু ধর্মের মূল তত্ত্ব নিয়ে স্টেটম্যান পত্রিকায় তাঁর বাদানুবাদ হয়। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে বঙ্কিমচন্দ্র 'প্রচার' নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই সময়েই বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তত্ত্ববোধিনী সভার বিতর্ক উপস্থিত হয়। এই বিতর্কে বঙ্কিমের পক্ষে ছিলেন চন্দ্রনাথ বসু ও তাঁর বিরোধিতা করেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের পর বঙ্কিমচন্দ্রকে বিভিন্ন জায়গায় চাক্‌রির অজুহাতে ঘোরা-ফেরা করতে হয় এবং এই সময়ে তিনি হাঁপানিতে খুব কষ্ট পান। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সভ্য হন। হাওড়ায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালীন বঙ্কিমচন্দ্র ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে মেডিকেল কলেজের সামনে প্রতাপ চ্যাটার্জী লেনে একটি বাড়ী কিনে সেখানে বাস করতে থাকেন। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চাক্‌রি করে বঙ্কিমচন্দ্র অবসর গ্রহণ করেন। তারপর জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি কলকাতাতেই ছিলেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরোধে এনট্রান্স পরীক্ষার্থীদের জন্য তিনি ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে 'Bengall Selections' প্রকাশ করেন। এই বছরই বঙ্কিমচন্দ্র 'রায়বাহাদুর' ও ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে C. I. E. উপাধি পান। এই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষা বাঙ্‌লাকে পরীক্ষার বিষয় করবার জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনের এই পর্ব সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনা উল্লেখ করা যেতে পারে : '১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই আগস্ট তারিখে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে 'সোসাইটি ফর হায়ার ট্রেনিং অব ইয়ং মেন" নামীয় সভার প্রতিষ্ঠা দিবসে বঙ্কিমচন্দ্র উপসিত হইয়া সাহিত্য শাখার স্থায়ী সভাপতি হন। এই সভার নাম পরে পরিবর্তিত হইয়া 'ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট' হয়। বঙ্কিমচন্দ্র এখানে মাঝে মাঝে উপস্থিত হইয়া সাহিত্য ও ধর্ম বিষয়ে বক্তৃতা করিতেন। তাঁহার জীবনের শেষ কীর্তি উক্ত সভার উদ্যোগে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে তৎকর্তৃক প্রদত্ত বৈদিক সাহিত্য-বিষয়ক ইংরেজীতে দু'টি বক্তৃতা; এই বক্তৃতা দু'টি ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি' ম্যাগাজিনের ঐ বৎসরের গোড়ার দুই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।"

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময়ে তাঁর বহুমূত্রে রোগ অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি পায়, তিনি শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। ৮ এপ্রিল (২৬ চৈত্র, ১৩০০) বেলা তিনটা ২৫ মিনিটের সময় তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র (শ্যামাচরণের পত্র) কৃষ্ণবাবু মুখাগ্নি করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বিধবা স্ত্রী রাজলক্ষ্মী দেবী বঙ্কিমের মৃত্যুর পরেও দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি রেখে যান স্ত্রী ও তিন কন্যাকে— শরৎকুমারী, নীলাব্জকুমারী এবং উৎপলকুমারী।

১.৪ বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য কীর্তি

কোনো এক লেখকের একটি গ্রন্থ পাঠ্য হলেও তিনি অন্যান্য যেসব বইপত্র লিখেছেন সেগুলির নামও আপনাদের জেনে রাখা দরকার। তাতে লেখক হিসাবে তাঁর সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে আমাদের একটা ধারণা জন্মাবে। পাঠ্য গ্রন্থটি পড়ার সময় লেখকের মনোভাব বুঝতে তার আপনাদের সাহায্য করবে।

'সাহিত্যসাধক চরিতমালা'য় বঙ্কিমচন্দ্র আলোচনা-প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যিক জীবনকে চার পর্বে ভাগ করেছেন

আদি পর্ব ১৮৫২ খ্রিষ্টাব্দে 'সংবাদ প্রভাকরে' রচনা প্রকাশ থেকে আরম্ভ করে ১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দে 'দুর্গেশনন্দিনী'র প্রকাশকাল পর্যন্ত তেরো বৎসর।

উদ্যোগ পর্ব ১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গদর্শনের প্রকাশ পর্যন্ত সাত বৎসর। 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬) ও 'মৃণালিনী' (১৮৬৯) এই পর্বের রচনা।

যুদ্ধ পর্ব ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে প্রচার পত্রিকায় বিদায়কাল পর্যন্ত সতেরো বছর। এই যুগে বঙ্কিমচন্দ্র মোট এগারখানি ক্ষুদ্রবৃহৎ উপন্যাস রচনা করেছিলেন। সেগুলি যথাক্রমে 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩), 'ইন্দিরা' (১৮৭৩), 'যুগলাঙ্গুরীয়' (১৮৭৪), 'চন্দ্রশেখর' (১৮৭৫), 'রজনী' (১৮৭৭), 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮), 'রাজসিংহ' (১৮৮২), 'আনন্দমঠ' (১৮৮২), 'দেবীচৌধুরানী' (১৮৮৪), 'রাধারানী' (১৮৮৬), 'সীতারাম' (১৮৮৭)। উপন্যাস ছাড়া এই পর্বে 'লোকরহস্য' (১৮৭৪), 'বিজ্ঞানরহস্য' (১৮৭৫), 'কমলাকান্তের দপ্তর' (১৮৭৫), 'বিবিধ সমালোচনা' (১৮৭৬), 'দীনবন্ধু মিত্রের জীবনী', 'সাম্য' (১৮৭৯), 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত', 'কৃষ্ণচরিত্র' (১৮৮৬), 'বিবিধ প্রবন্ধ' (প্রথম খন্ড- ১৮৮৭, দ্বিতীয় খন্ড- ১৮৯২), 'ধর্মতত্ত্ব অনুশীলন' (১৮৮৮), শ্রীমদ্ভাগবদগীতা (১৯০২) ইত্যাদি প্রবন্ধ পুস্তকাদি রচিত হয়।

শান্তি পর্ব ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দের ৮ এপ্রিল তারিখে মৃত্যু পর্যন্ত পাঁচ বৎসর। এই সমাপ্তি পর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের কোনো উল্লেখযোগ্য রচনা প্রকাশিত হয়নি।

১৮৬৫ সালে 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যে একটি নতুন যুগের সূচনা হল। রবীন্দ্রনাথের অপরূপ ভাষাতেই তার পরিচয় দেওয়া যাক—

...কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই সুপ্তি, কোথায় গেল বিজয়বসন্ত, সেই গোলেবকাওলি, সেই সব বালক-ভুলানো কথা কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত সংগীত, এত বৈচিত্র্য।

'দুর্গেশনন্দিনী'র পর 'কপালকুণ্ডলা' ও 'মৃণালিনী' প্রকাশের ফলে ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা নিঃসংশিত আসন লাভ করল। ১৮৭২ সালে বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রকাশ করলেন, বাংলার তৎকালীন তরুণ ও প্রতিভাসম্পন্ন লেখকেরা সাগ্রহে এই পত্রিকায় যোগ দিলেন।

'কত কাব্য নাটক উপন্যাস কত প্রবন্ধ কত সমালোচনা কত মাসিকপত্র কত সংবাদপত্র বঙ্গভূমিকে জাগ্রত প্রভাত কলরবে মুখরিত করিয়া তুলিল'। একদিকে উপন্যাস রচনার মধ্য দিয়ে বঙ্কিমের সৃজনধর্মী শিল্প বাঙালীকে মুগ্ধ করতে লাগল, অন্যদিকে প্রবন্ধে সমালোচনায় বৈজ্ঞানিক গবেষণায় বিজ্ঞানানুশীলনে বাঙ্লা মননসাহিত্যকেও তিনি সমৃদ্ধ করে চললেন। এই জন্য রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রকে 'সব্যসাচী' বলেছেন।

'বঙ্গদর্শন' প্রকাশ কেবল বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যিক জীবনের নয়, বাঙালীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই পত্রিকার মধ্যে দিয়েই বাঙালীর জাতীয় জীবনকে নবজাগৃতির আদর্শ ও অনুপ্রেরণায় পরিচালিত করা সম্ভব হয়েছিল। 'দেশব্যাপী একটি ভাবের আন্দোলন' উপস্থিত করা, অসংখ্য তরুণ লেখককে উপযুক্ত পথে চালিত করা, বাঙালীর সর্বত্রগামী মনীষাকে আবিষ্কার করা, এই পত্রিকার মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র যেমন বঙ্গদর্শন প্রকাশ করলেন, বঙ্গদর্শনও সেইরূপ বঙ্কিমচন্দ্রকে আবিষ্কার করল। কেবল ঔপন্যাসিক নয়, বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে যে সাহিত্যের বিচিত্র সম্ভাবনা ছিল এবং সর্বোপরি একটি সংগঠনী প্রতিভা ছিল, বঙ্গদর্শন প্রকাশিত না হলে সে তথ্য হয়ত অজ্ঞাত থাকত। পত্রিকার প্রয়োজনে বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধ সমালোচনা রঙ্গব্যঙ্গ সাহিত্যেও আত্মনিয়োগ করলেন। ফলে বাঙালি জাতির অতীত ইতিহাস, প্রাচীন সাহিত্যের সৌন্দর্য ও আদর্শ, ধর্মচেতনা, মানবতাবোধ বঙ্কিমের লেখনীস্পর্শে উজ্জীবিত হল। বিজ্ঞান দর্শন সাহিত্য সমাজতত্ত্ব ইতিহাস ধর্মনীতি প্রত্নতত্ত্ব অর্থনীতি সংগীত ভাষাতত্ত্ব বঙ্কিম-প্রতিভা যা কিছু স্পর্শ করেছে তাকেই স্বর্ণকান্তি করে তুলেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হয়ে যে সকল তরুণ লেখক বঙ্গদর্শন লেখক-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হলেন ভবিষ্যৎ বাঙ্লা সাহিত্যে তাঁরা প্রত্যেকেই খ্যাতিমান হয়েছেন। 'সাম্য', 'বঙ্গদেশের কৃষক', 'কমলাকান্তের দপ্তর', 'মুচিরাম গুড়' প্রভৃতি রচনার মধ্যে দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক যে বৈপ্লবিক আদর্শ এই

বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে সে যুগে এই প্রকার চিন্তা আমাদের কাছে অকল্পনীয়।

মানবপ্রেম ও স্বদেশপ্রেম বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য সাধনার মূলমন্ত্র। উনিশ শতকের মধ্যভাগে স্বাজাত্যবোধের স্ফুরণ ছিল আকস্মিক এবং কিছুটা বুদ্ধির স্তরে সীমাবদ্ধ। বঙ্কিমচন্দ্রই সর্বপ্রথম সেই অস্ফুট স্বদেশচেতনাকে উচ্চকণ্ঠে জনসমাজে প্রচার করলেন। ব্যক্তিগত জীবনে ইংরেজ শাসকদের রাষ্ট্রশাসনের যন্ত্রস্বরূপ থাকা সত্ত্বেও উচ্চপদস্থ শাসকের ভ্রূকুটি বঙ্কিমচন্দ্রের অপরিম্লান দেশচেতনাকে কখনই স্তিমিত করতে পারেনি। আনন্দমঠের সেই অবিস্মরণীয় 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্র সংক্ষিপ্ত বাক্যের গভীরতম প্রাণশক্তির দ্বারা নির্জিত জাতিকে অবিশ্বাস্যভাবে ঐক্যবদ্ধ করেছে। তদানীন্তন ইংরেজ শাসকদের শিক্ষানীতি কৃষিনীতি ভূমিব্যবস্থা আমলাতান্ত্রিকতা প্রজাপীড়ননীতি সরকারি কর্মচারি বঙ্কিমের কঠোর সমালোচনার বিষয়বস্তু হয়েছে।

'কমলাকান্ত', 'লোকরহস্য' এবং 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' গ্রন্থগুলিতে তাঁহার হাসি ও ব্যাঙ্গের অন্তরালে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জাতিগত অপমান, লাঞ্ছনার জ্বালা ও বেদনার অশ্রু, লুকাইয়া আছে। প্রবন্ধগুলিতে যে চরম কথাগুলি বঙ্কিমচন্দ্র বলিতে পারেন নাই বিদ্রূপের আবরণে সে সকল কথা তিনি অতি সহজেই বলিতে পরিয়াছেন। বাঙলাদেশে চিরন্তন গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে কমলাকান্তয় বঙ্কিমের এই বিদ্রোহ বাঙলা সাহিত্যে অমর হইয়া আছে। গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ লিখিতে লিখিতে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বভাবতঃ রহস্যপ্রিয় মন প্রথমটা লোকরহস্যের সহজ পথে একটা মুক্তির উপায় আবিষ্কার করিয়া কতক সস্ত্ব না লাভ করিয়াছিল 'আনন্দমঠ'-এর বন্দেমাতরম সঙ্গীতে যাহার পূর্ণ পরিণতি, 'মৃণালিনী'তে যাহার সূত্রপাত কমলাকান্তে সেই মাতৃমন্ত্রের প্রথম সার্থক প্রকাশ। বাঙালি জাতির পরাধীনতার সুগভীর ধিক্কার এখানেই বঙ্কিমচন্দ্রের মনে নিদারুণ তীব্রতায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। আধুনিক বাঙালির রাষ্ট্রীয় সাধনার ইতিহাসে প্রকৃতপক্ষে কমলাকান্ত হইতেই আমাদের যাত্রা শুরু।"

বঙ্কিমের সাহিত্য জীবনের দুটি প্রগতিশীল প্রবন্ধের কথা আলোচনা করা যেতে পারে। দুটি প্রবন্ধ হল সাম্য ও কৃষ্ণচরিত্র। 'সাম্য' গ্রন্থের 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধটি নানা কারণে আজও স্মরণীয়। 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্রের মধ্য দিয়ে অনুশীলন তত্ত্বের বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা গড়ে তুলতে চেয়েছেন। এই প্রসঙ্গে তার ধর্মতত্ত্ব গ্রন্থ শ্রীমদ্‌ভাগবত গীতার নবতর ব্যাখ্যা সবিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। এছাড়া, বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিবিধ প্রবন্ধে'র দুটি ভাগের মধ্যে তাঁর বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মানবজ্ঞানের বিচিত্র দিককে নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র যে আলোচনা করেছেন, তা শব্দে বিষয়বস্তুর গৌরবে নয়, রচনার রস সম্ভোগেও আকর্ষণীয়। বঙ্কিমচন্দ্র শিশুদের জন্য যেমন রচনাশিক্ষা এবং ইংরেজী শিক্ষার গ্রন্থ লিখেছেন, উপন্যাস সাহিত্যের জন্ম মুহূর্তেই তাকে যৌবনোচিত মহিমা দান করেছেন, তেমনই প্রবন্ধ রচনাতেও তিনি একটি বিশিষ্ট ধারার প্রবর্তন করেছেন। দীর্ঘ বিয়াল্লিশ বছর ধরে বঙ্কিমের সাহিত্য সাধনা যেমন বিচিত্র তেমনি উল্লেখ্য বাংলার সাহিত্য সাধনায় তাঁর নেতৃত্বদান।

শ্রদ্ধেয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে একটি মন্তব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন, "তিনি সর্বদা আপনাকে আড়ালে রাখিয়া নিজের সৃষ্টিকেই প্রাধান্য দিতেন। তাঁহার জীবনের আদর্শ স্থির ছিল; জীবনে যত অগ্রসর হইয়াছেন, সেই আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা তাঁহার তত বাড়িয়াছে। তিনি শয়নে স্বপনে একাগ্রচিত্ত হইয়া দেশের এবং দশের কল্যাণ কামনা করিয়া সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহাকে বুঝিতে হইলে তাঁহার নিম্নলিখিত উক্তিটি আমাদের সর্বদা মনে রাখিতে হইবে... 'সাহিত্যও ধর্ম' ছাড়া নহে। কেননা, সাহিত্য সত্যমূলক। যাহা সত্য, তাহা ধর্ম। 'যদি এমন কুসাহিত্য থাকে যে, তাহা অসত্য-মূলক ও অধর্মময়, তবে তাহার পাঠে দুরাত্মা বা বিকৃতরুচি পাঠক ভিন্ন কেহ সুখী হয় না'।"

সরকারি চাকরি ও সাহিত্য সেবায় আত্মনিয়োগ করে বঙ্কিমচন্দ্র কঠোর পরিশ্রম করতেন তার প্রমাণ মেলে তাঁর সাহিত্য জগতে বিচরণ করলে। দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে নিরলস সাহিত্য সাধনায় বঙ্গবাসীকে যেভাবে তিনি সমৃদ্ধশালী করেছেন, বাঙালি কৃতজ্ঞচিত্তে তা চিরকাল স্মরণ করবে।

১.৫ সারাংশ

আমরা এই এককে জানলাম বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাথমিক পরিচয়। ব্যক্তিগত জীবনের পাশাপাশি তাঁর কর্মজীবন সম্পর্কে। সাহিত্য রচনার হাতেখড়ি তাঁর কীভাবে হয়েছিল। উপন্যাস রচনার সাথে সাথে তিনি যে প্রবন্ধগুলি পাঠককে উপহার দিয়েছেন সেগুলির গুরুত্বও অনেক। উপন্যাস, প্রবন্ধের পাশাপাশি তিনি সম্পাদনা করেছেন 'বঙ্গদর্শন' নামের একটি পত্রিকাও। তিনি যে সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন সেকথাও অনুমান করা যায়।

একক-২ ❑ উপন্যাস : বিষয় বৈচিত্র্য ও শ্রেণিবিভাগ

গঠন

২.১ উদ্দেশ্য

২.২ প্রস্তাবনা

২.৩ উপন্যাস : আধুনিক কালের সৃষ্টি

২.৪ উপন্যাসের ভাগ : নভেল ও রোমান্স

২.৪.১ রোমান্সের শ্রেণিবিভাগ

২.৪.২ বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের শ্রেণিবিভাগ

২.৫. সারাংশ

২.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে শিক্ষার্থীরা জানতে পারবেন—

- উপন্যাসের চরিত্র, লক্ষণ এবং সাহিত্যে উপন্যাসের উদ্ভবপর্ব।
- উপন্যাসের কাহিনি এবং চরিত্রাবলী অনুযায়ী শ্রেণিভেদ অনুধাবন।
- উপন্যাসগুলির শ্রেণিভেদ অনুযায়ী বিন্যাসকরণ।
- বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালে বাংলা আখ্যানকেন্দ্রিক গদ্যসাহিত্যের ধারা কেমন ছিল।
- সমসাময়িক অন্যান্য ঔপন্যাসিকদের তুলনায় বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়।

২.২ প্রস্তাবনা

বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের জন্মপর্ব ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ। অর্থাৎ ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারার পথটি একটু করে প্রসারিত হতে থাকে। সেদিক থেকে দেখলে, সাহিত্যের এই ধারাটির বয়স আমাদের বাংলাসাহিত্যে নবীন। এরপর দেখা যায়, উদ্ভবের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, অত্যন্ত দ্রুতগতিতে এই ধারাটি তার প্রাপ্তবয়স্কতায় পৌঁছে যায়। নবজাগরণের প্রভাবে আধুনিক যুগের মানুষ আগেকার ধ্যান-ধারণা, অদৃশ্য দেবদেবীর কাল্পনিক ক্ষমতার বিশ্বাস, অদৃষ্টের অতিরঞ্জিত কীর্তনের প্রভাব ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চায়। আর তাই তারা আগ্রহী হয়ে ওঠে দৃশ্যমান, বাস্তব, মানবজীবনের ছবি দেখতে ও দেখাতে। এই প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও। এইসময় আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের প্রভাব পড়ে এদেশে। আর তারই সঙ্গে পরিচিতি লাভ করে এদেশীয় লেখকগণ। বাঙালি লেখক ও পাঠককুল এবার অনেকখানি মানবমুখী হয়ে উঠবে এরই প্রভাবে। এই রেনেসাঁর অবধারিত ফলশ্রুতিতে উপন্যাসের জন্ম হবে।

২.৩ উপন্যাস : আধুনিক কালের সৃষ্টি

'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসটি একেবারেই আধুনিক কালের সৃষ্টি। উপন্যাসে যে রকম নিটোল গল্প থাকে, আপনারা

সেই রকম গল্প নানান কাহিনি পড়ে জানতে পারেন। অনেক আগেকার দিনের লেখা কিছু কাহিনিতেও এই ধরণের গল্প, যেমন ধরুন আমাদের পঞ্চতন্ত্রের গল্প, মনসাদেবীর গল্প, মা চণ্ডীর গল্প, আরব্য রজনীর গল্প, বিক্রমাদিত্য ও বেতালের গল্প, বিভিন্ন রূপকথার গল্প, আরো কত কী। গল্প সম্পর্কে বা কাহিনি সম্পর্কে আপনারা সবাই অবগত আছেন। এখন প্রশ্ন, পুরানো সেইসব গল্পের সঙ্গে উপন্যাসের কাহিনির পার্থক্য কোথায়? এই সব গল্পের সাথে যদি উপন্যাসের কোনো পার্থক্য না থাকে তবে উপন্যাসকে আধুনিক কালের গল্পই বা বলব কী করে? বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে উপন্যাসের প্রকৃত উদ্ভব ঘটেছিল, এ কথাই-বা বলা যাবে কেমন করে? কাজেই সাহিত্য হিসাবে উপন্যাস কী, উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য আসলে কী, সেটা আমাদের বুঝতেই হবে উপন্যাসের কাহিনিকে আয়ত্ত করার ক্ষেত্রে। এই বৈশিষ্ট্য অবশ্য একটা নয়, অনেক। এক এক করে সেগুলো বুঝে নেওয়া যাক।

উপন্যাস সৃষ্টির প্রথম কারণ হল, উপন্যাস হচ্ছে মানুষের গল্প এবং মানবিক অনুভূতির গল্প। অর্থাৎ উপন্যাসের মধ্যে মানুষের একটা গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান আছে। সেই অবস্থান থেকে সরে এলে উপন্যাসের কাহিনি নির্মাণ যথার্থ হয় না। এই জন্যই আধুনিক কাল ছাড়া উপন্যাসের উদ্ভব বা নির্মাণকাজ অসম্ভব ছিল। মধ্যযুগে, অর্থাৎ চার-পাঁচশো বছর আগেকার সৃষ্ট সাহিত্যে দেবদেবীদেরই প্রাধান্য ছিল। মঙ্গলকাব্যের মধ্যে আমরা দেবদেবীর জন্মকথা, জীবনকথা পড়েছি, তাঁদের অপরিমেয় আশীর্বাদে আটপৌরে মানুষের জীবন কীভাবে ধন্য হয় তাও দেখেছি। একটু খেয়াল করলে দেখতে পাব, মঙ্গলকাব্যে বারে বারে দেবদেবীর কথাই প্রতিধ্বনিত হয়েছে। দেবতা বা দেবী সমস্ত ঘটনাকে নিজের মত করে নিয়ন্ত্রিত করে ঘুঁটি সাজিয়েছেন। অর্থাৎ সেখানে দেবতারাই সব, মানুষ নিমিত্ত মাত্র। ঘটনার সংগঠন এবং ঘটনার পরিপ্রেক্ষিত ও ঘটনার বিকাশে বিশেষ করে তাদের ইচ্ছে-অনিচ্ছের উপর ভিত্তি করে গল্প গতি পেয়েছে। মানুষের গল্পও যে মানুষকে শোনানো যায়, তার জীবনের সুখ-দুঃখের কাহিনি, চাওয়া-পাওয়ার খতিয়ান, লাভ-ক্ষতির হিসেব অর্থাৎ মানবিক অনুভূতির গল্পও যে সাধারণ মানুষকে আনন্দ দিতে পারে, এ কথা আমরা আগে বুঝতে পারিনি। তা বুঝতে শিখেছি আধুনিক কালেই। মানুষের এই প্রাধান্য স্বীকৃত না হলে মানুষের গল্প মানুষকে শোনানো যায় না। আধুনিক কালের গল্পে দেবদেবীকে ছাপিয়ে মানুষ স্বীকৃতি পেয়েছে বলেই উপন্যাসের উদ্ভব সম্ভব হয়েছে।

দ্বিতীয় কারণ হল, উপন্যাস সাধারণ মানুষের গল্প। দেব-দেবীর মাহাত্ম্য বা অসাধারণ মানুষের অলৌকিক গল্পই আগে আমাদের যে মুগ্ধ করত সে কথা অনস্বীকার্য। আধুনিক কালে মানুষের বোধের উন্মেষ ঘটেছে, বুদ্ধির উদ্ভব ঘটেছে, সাধারণ মানুষের মর্যাদা স্বীকৃত হয়েছে, তাই সেই সাধারণ মানুষের গল্পই উপন্যাসে শুনতে আমরা আগ্রহী হয়েছি ঔপন্যাসিকের কাছ থেকে। সুতরাং জনগণের বিকাশ বা নবজাগরণের বিস্তার উপন্যাসের উদ্ভবের আর একটি কারণ।

তৃতীয় কারণ হল, উপন্যাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য বাস্তবতাবোধ। আগেকার দিনে যে সব কাহিনি রচনা করা হত সেখানে বাস্তবতা বোধের কোনো ব্যাপারই ছিল না। তার কারণ আগেই বলা হয়েছে যে, দেব-দেবীর মাহাত্ম্য, অলৌকিক ক্ষমতার উপর বিশ্বাস ছিল প্রবলভাবে। তা বিশ্বাসযোগ্য, কী বিশ্বাসযোগ্য নয় এ বিষয়ে কারও কোনো চিন্তা ছিল না। থাকবার কথাও নয়। উদাহরণ হিসেবে লাউসেনের পশ্চিম দিকে সূর্য উঠানো বা ধনপতি সওদাগরের দেখা কমলে-কামিনী দৃশ্য ইত্যাদি অবাস্তব ঘটনার দৃষ্টান্ত। বরং যত অলৌকিক এবং অবিশ্বাস্য কাহিনি ছিল তার প্রতিই প্রবল লোভ ছিল মানুষের, কারণ সে তো সাধারন মানুষের গল্প নয়। সাধারণ মানুষের গল্পও যে উপন্যাসের কাহিনি হতে পারে সে বোধের বা ধারণার তখনও উন্মেষ হয়নি। দেবদেবী যত অলৌকিক ক্ষমতা দেখাবেন সমুদ্র থেকে চাঁদ সওদাগরের সাতটি মধুকর ডিঙা ডুবিয়ে দেবেন বা উদ্ধার করবেন, মানুষকে সাত ঘড়া মোহর পাইয়ে

দেবেন, মরা মানুষ বাঁচিয়ে দেবেন ইত্যাদি ততই তাঁদের প্রতি আমাদের ভক্তি বাড়বে। এই ছিল সরল পরিকল্পনা। কিংবা, বিভিন্ন রূপকথার গল্পের রাজকুমার পক্ষীরাজ ঘোড়া চড়ে যতই অজানা দেশে পাড়ি জমাবে নানা প্রকার উদ্দেশ্য নিয়ে, কালসর্পের বেশে এসে লোহার বাসরঘরে ছোবল দেবে মা মনসা ইত্যাদি যতই অলৌকিক কান্ড ঘটতে থাকবে ততোই ভালো লাগবে---আমাদের। বিনোদনের একটা উদ্দেশ্য নিয়েই পাঠক সর্বদা প্রস্তুত। রসায়নের খোঁজ করে না কেউ। আর তাই মধ্যযুগীয় মানসিকতা ছিল ঠিক এইরকম। মানুষ সঠিক ভাবে চিন্তা করে না। কাহিনি বাস্তবসম্মত না হলেও চলে। এই ধারণা আর বেশিদিন চলল না। সে সন্ধান করতে লাগল কাহিনির। তাছাড়া, সাধারণ মানুষের নিত্যনৈমিত্তিক সুখদুঃখের গল্পে এত অলৌকিক ঘটনা তো ঘটেও না। কাজেই পূর্বের কাহিনি আর তার ভালো লাগল না। উপন্যাসটিতে থাকে তার বাস্তবতার গুনে ঋদ্ধ হয়ে। এটাই হল উপন্যাসের অন্যতম গুণ।

চতুর্থ কারণটি বলা যেতে পারে এবার। উপন্যাসের এই 'গতি' পাওয়ার আরও একটা কারণ রয়েছে। আর সেটা হল মুদ্রণযন্ত্র বা ছাপাখানার উদ্ভাবন। ছাপাখানা প্রথম তৈরি হয় আধুনিক কালেই। তার আগে পর্যন্ত অর্থাৎ ছাপাখানা আসার পূর্বে কাব্যকবিতা মানুষ পড়তো না শুনতো। লিপিকর-পুথিকরদের দিয়ে আর কত বেশি সংখ্যাই বা লেখানো যায়! যে কাহিনি মানুষকে ডেকে শোনাতে হয় বা জোর করে শোনাতে হয় সেখানে লেখকের স্বাধীনতা থাকে অল্প, কাহিনিও হয় নড়বড়ে। কারণ সেই সময়কার লেখক বা রচয়িতা কেউই ধর্মভাবের উপর, অন্ধবিশ্বাস থেকে মানুষকে আটকে করতে পারে না। কিন্তু যখন সাহিত্য সহজপাঠ্য হয়ে গেল, মুদ্রণ শিল্প আসার পর, অর্থাৎ মানুষকে আর গিয়ে শোনাতে হয় না বা ডেকে শোনাতে হয় না, পাঠক নিজেই পড়ে নিতে পারে।

পঞ্চম কারণটি একটু বুঝিয়ে বলা দরকার। মানুষ তার বিপুল অভিজ্ঞতা এবং মানসিকতা নিয়ে এই পৃথিবীটাকে দেখছে। ফলে দেখতে দেখতে তার নিজের একটা দৃষ্টিভঙ্গিও তৈরি হচ্ছে। উপন্যাসের পক্ষে এই নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিটাও খুব দরকার। ঔপন্যাসিক বা গল্পকার যে দৃষ্টিভঙ্গিতে তা বর্ণনা করেন সময়ের সাথে সাথে তা পাঠকের কাছে পাল্টে যেতে পারে। আর আগে গল্প ছিল, সেই গল্প লেখক নিজের মতো করে বর্ণনা করতেন, কিন্তু বর্তমানে তা সম্ভব নয়। এর জগৎ আর জীবন সম্বন্ধে তাঁর নিজের ধারণাটা কীরকম সেটা আপনি মোটেই বুঝতে পারতেন না। তা পুরোপুরি আপনার অন্তরালে রাখতেন ঔপন্যাসিক। এই ধারাও ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়েছে। তাই পাঠক ও ঔপন্যাসিকের মধ্যে যে বিশাল একটা দূরত্ব ছিল তা আসতে আসতে কমে আসছে এবং একটি সুদৃঢ় সেতু নির্মিত হচ্ছে উপন্যাসকে ভিত্তি করে।

২.৪ নভেল ও রোমান্স

উপন্যাস আসলে মানুষেরই গল্প এবং বাস্তবতাই তার প্রধান বৈশিষ্ট্য, এ কথা আমরা আগেই বলেছি। তবু মানুষগুলি কী ধরনের, বাস্তবতার প্রকৃতিই বা কীরকম, এই দুটি ব্যাপারের ওপর ভিত্তি করে উপন্যাসের দুটি স্পষ্ট ভাগ আছে, সেটা আপনাদের একটু জেনে রাখতে হবে। উপন্যাসে যে সব মানুষের গল্প শোনানো হয়েছে সে মানুষগুলি যদি আমাদের চেনা হয়, যে সমস্যার কথা উপন্যাসে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, তা যদি আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যেই পড়ে, তবে তাকে আমরা বলি 'নভেল'। কিন্তু মানুষগুলিকে লেখক যদি সংগ্রহ করেন ইতিহাস থেকে বা একেবারেই তাঁর কল্পনা থেকে, কিংবা লেখক তাঁর নিজের মতো করে যদি তার নির্মাণ করেন তখন তাহলে মানবিক অনুভূতির গল্প হলে তাকে আমরা বলব রোমান্স। তবে ইতিহাস থেকে নেওয়া হোক, আর কল্পনা থেকেই রচনা করা হোক, বাস্তবতাবোধ সেখানে বজায় রাখতেই হবে, কারণ বিশ্বাসযোগ্য না হলে তাকে তো আপনি উপন্যাসই বলতে পারবেন না।

এবার নভেল এবং রোমান্সের পার্থক্যটা আপনাদের দুটো-একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করা যাক। তাহলে এটা আরও স্পষ্ট হবে। মনে করুন আপনার পরিচিত কোনো ভদ্রলোক দিনরাত পরিশ্রম করে বর্তমানে সামাজিকভাবে একটা সম্মানের জায়গায় দাঁড়িয়ে। সমাজের সকল জায়গায় তাঁর একটা স্থান রয়েছে। এক ছেলে আর এক মেয়েকে নিয়ে দিব্বি আছেন ভালোই। এমন সময় একদিন বাড়িতে পুলিশ এল বাড়িতে তাঁর ছেলেকে গ্রেফতার করার জন্য। জান গেল যে, ছেলেটি একটি খুনি। তারও পরে একদিন জানা গেল যে মেয়েটি পা পিছলে নষ্টমেয়ে হয়ে গেছে। আপনার পরিচিত সেই ভদ্রলোকটির কথা ভাবুন একবার। যে কিনা তাঁর সন্তানকে মানুষ করার জন্য দিনরাত এক করে পরিশ্রম করছেন আর তারাই প্রতিনিয়ত বাবার বুকে আঘাত দিচ্ছে। এই ধারণা নিয়ে আপনি একটা নভেল লিখতে গেলেন। কিংবা ধরুন, আপনার পরিচিত কোনো এক ব্যক্তির নাম রাম, তার বাবার নাম বিষ্ণু, ভাইয়ের নাম গোবিন্দ। নামগুলির সাথে ভগবানের নাম জড়িয়ে। তা, আপনি ভাবলেন যে চরিত্রও হবে ভগবানের মতই। কিন্তু দেখা গেল, এরা সকলেই কুকর্মের সাথে জড়িত। আপনি একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে নাম ভগবানের মতো হলেই ভগবান হওয়া যায় না। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আপনি একটা নভেল লিখতে পারেন। বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রেখে আপনিও একটা উপন্যাস লিখে ফেলতে পারেন। তখন এটি হয়ে যাবে 'কাব্যিক উপন্যাস'।

এবার মনে করুন আপনি ইতিহাস পড়তে পড়তে মুঘল সম্রাট বাবরের জীবনের ওই ঘটনাটার কথা জানলেন যেখানে তিনি সন্তান হুমায়ুনের আরোগ্যের জন্য নিজেকে ঈশ্বরের কাছে রোগগ্রস্ত করার প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। এখানে ইতিহাসের সাল তারিখ ভেদ করে প্রকাশিত হচ্ছেন একজন পিতা, যিনি নিজের সন্তানের রোগমুক্তির জন্য ব্যাকুল (পরবর্তীকালে কবি শঙ্খ ঘোষ 'বাবরের প্রার্থনা' নামে একটি বিখ্যাত কবিতা লিখেছেন)। এই মানবিক অনুভূতির গল্প নিয়ে যদি আপনি কোন উপন্যাস রচনা করেন, সেটাকে বলা হবে রোমান্স। আশা করি, ব্যাপারটা স্পষ্ট হল, আরো স্পষ্ট হবে আমাদের পরের আলোচনা থেকে।

২.৪.১ রোমান্সের শ্রেণিবিভাগ

রোমান্সেরও আবার দুটি বিভাগ করা হয় ঐতিহাসিক রোমান্স এবং কাব্যিক রোমান্স। রোমান্সের বিষয় যখন ইতিহাস থেকে সংগ্রহ করা হয় তখন তাকে বলা হয় ঐতিহাসিক রোমান্স এবং রোমান্সের বিষয় যখন কল্পনার সাহায্যেই উদ্ভাবন করা হয় তখন তাকে বলা হয় কাব্যিক রোমান্স। ব্যাপারটা আর একটু ভালো করে বোঝা যাক।

ঐতিহাসিক রোমান্স কাকে বলে, সেটা বোধহয় আমরা বুঝতে পেরেছি, কারণ রোমান্সের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে এই ঐতিহাসিক রোমান্সের কথাই বলা হয়েছে। এবারে কাব্যিক রোমান্সের একটা উদাহরণ দেবো এবং একে 'কাব্যিক' কেন বলা হচ্ছে সেটাও বলব।

ধরুন আপনার মাথায় হঠাৎ একটা চিন্তা এল যে, কোন একটা ছেলে যদি প্রায় জন্ম থেকেই বনে জঙ্গলে পশুদের সঙ্গে বেড়ে ওঠে এডগার রাইস বারোসের বিখ্যাত সেই টার্জানের গল্পের মতো, তারপর যৌবনকালে তাকে বন্দী করে নিয়ে আসা হল শহরে, সভ্য করার চেষ্টা করা হল, সভ্য ভাষা শেখানো হল, লেখাপড়াও কিছু শিখলো সে। এবার তার মধ্যে সেই আজন্মলালিত বন্য সংস্কার থাকবে, অথবা থাকবে না। এই বিষয়টা নিয়ে যদি আপনি একটা সার্থক উপন্যাস লিখে ফেলতে পারেন মানে বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রেখে লিখে ফেলতে পারেন, তাহলে সেটা হবে একটা কাব্যিক উপন্যাস। কেন? তার প্রধান কারণ হল, এইরকম চরিত্র আমাদের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখতে পাই না, কল্পনার সাহায্যেই আপনি মানবিক অনুভূতির এই গল্প লিখেছেন। এবার বলি, এই 'কাব্যিক' নামটার আর একটা তাৎপর্যের কথা।

ঔপন্যাসিকের উপন্যাস লেখার কৌশল আর কবির কবিতা লিখবার প্রক্রিয়াটা আলাদা, একেবারে বিপরীত বললেই কথাটা ঠিক বলা হয়। ঔপন্যাসিক কি করেন? তিনি আগে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন, সেই অভিজ্ঞতা থেকে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছন এবং তারপর উপন্যাসটা লিখতে আরম্ভ করেন। কবির পদ্ধতিটা ঠিক উল্টো, তিনি প্রথমেই একটা সিদ্ধান্ত নেন বা বলা যায় একটা ধারণা তাঁর মাথায় এসে যায়; সেটাকেই তিনি প্রকাশ করার চেষ্টা করেন নিজের শব্দবিন্যাসে বা বাক্যবিন্যাসে। কাব্যিক রোমান্সের জন্মও এই কবিতার মতই আগেই একটা ধারণা ঔপন্যাসিকের মাথায় এসে গেল। তারপর কবির প্রক্রিয়াতেই তিনি সেটাকে মানবিক আবেদনে সমৃদ্ধ করে, বাস্তবতা বজায় রেখে একটা উপন্যাসে পরিণত করেন। কাজেই, পদ্ধতির দিক থেকেও এটাকে কাব্যিক রোমান্স নামে অভিহিত করাটাই সংগত বলে আপনার মনে হয় না কি?

২.৪.২ বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের শ্রেণিবিভাগ

বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের পথিকৃৎ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা সম্পর্কে আমরা ইতিমধ্যে জেনে ফেলেছি। তিনি কী কী উপন্যাস লিখেছেন সে সম্পর্কেও আমরা জেনেছি। এখন বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিকে শ্রেণিবিভাগ করব নভেল জাতীয় উপন্যাস, ঐতিহাসিক উপন্যাস, কাব্যিক রোমান্স উপন্যাস। তিনি সর্বমোট এগারোটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস আর তিনটি খন্ড-উপন্যাস লিখেছেন। শ্রেণিবিভাগটি হবে এইরকম

ক) নভেল : 'বিষবৃক্ষ', 'রজনী', 'কৃষ্ণকান্তের উইল'। খণ্ড-উপন্যাসের মধ্যে 'ইন্দিরা' ও 'রাধারানী'।

খ) ঐতিহাসিক রোমান্স : 'দুর্গেশনন্দিনী', 'মৃণালিনী', 'চন্দ্রশেখর', 'রাজসিংহ', 'আনন্দমঠ', 'সীতারাম'। খণ্ড-উপন্যাসের মধ্যে 'যুগলাঙ্গুরীয়'।

গ) কাব্যিক রোমান্স : 'কপালকুণ্ডলা' ও 'দেবীচৌধুরানী'।

২.৫ সারাংশ

এই এককে পাঠ্যবস্তুগুলিকে সংক্ষেপে আরেকবার আলোচনা করে নেওয়া যাক। উপন্যাস হবে মানুষের গল্প এবং মানবিক অনুভূতির গল্প। গণতন্ত্রের বা জনজাগরণের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গেই দেবদেবীর কাল্পনিক মাহাত্ম্যকীর্তন ছেড়ে মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-স্বপ্ন, বিঘ্ন-বিপর্যয়ের কাহিনী অবলম্বনে উপন্যাস রচনা শুরু হয়। উপন্যাসের মধ্যে সাধারণ মানুষের উপস্থিতি। লেখক আর পাঠক, মুদ্রণযন্ত্রের কৃপায় প্রত্যক্ষ সংযোগে আসার ফলে কথকতা নির্ভর কাব্যিক মাধ্যম ছেড়ে, মানুষের কাহিনি গদ্যের শক্তমাটিতে গড়িয়ে গেল মানুষের দরজায় দরজায়। বাস্তব পৃথিবী তার রুক্ষ্ম কোমল মূর্তি নিয়ে, স্বরূপে হাজির হল বাঙালি পাঠকের সামনে। পাঠক এবার সেই রস আস্বাদনে মগ্ন হবে।

যদিও সব উপন্যাসই সাধারণভাবে মানুষের গল্প, তবু খেয়াল রাখতে হবে সে মানুষের সময়কালের এবং সমকালীন জগতের কথা। যদি সেই মানুষগুলি আমাদের সমকাল বা পরিচিত অভিজ্ঞতার জগতের বাইরের হয়, লেখক যদি তাদের নির্বাচন করেন সুদূর ঐতিহাসিক পট থেকে বা নির্মাণ করেন একেবারেই তাঁর নিজস্ব কল্পনার জগৎ থেকে, তাহলে তাদের জীবনকাহিনীর নাম হবে রোমান্স। আর যদি সেই মানুষগুলি আমাদের চেনা হয়, আমাদের আটপৌরে জনজীবনের এক একজন হয়, যে সমস্যার কথা বলা হয়েছে তা যদি আমাদের চেনা জগৎ ও অভিজ্ঞতার মধ্যেই পড়ে, তবে তাকে আমরা বলি নভেল। অর্থাৎ রোমান্স, কল্পনা আর কিছুটা ইতিহাসের মিশ্রন কিন্তু নভেল সব সময় বাস্তব জীবনমুখী, মাটির কাছাকাছি।

একক-৩ □ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : উপন্যাসের পথিকৃৎ

গঠন

৩.১ উদ্দেশ্য
৩.২ প্রস্তাবনা
৩.৩ উপন্যাসের পথিকৃৎ বঙ্কিমচন্দ্র
৩.৪ সমসাময়িক বাংলা সাহিত্য
৩.৫ বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব
৩.৬ সারাংশ

৩.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আমরা জানতে পারব—

- বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে কোনো উপন্যাস লেখার প্রয়াস হয়েছিল কিনা।
- যদি হয়ে থাকে, তবে তার একটা সম্যক পরিচয়।
- পূর্বের রচনা ও রচয়িতা থাকা সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্রকে কেন শ্রেষ্ঠ বলা হয়।

৩.২ প্রস্তাবনা

বঙ্কিমচন্দ্র যে প্রথম উপন্যাস লেখা শুরু করলেন আর প্রথম লেখাতেই তিনি সাহিত্যধারার খোলনলচে বদলে ফেললেন তা কিন্তু নয়। এমন ভাবনা করাও ঠিক না। তিনি উপন্যাস লেখার পূর্বে একটি ইংরেজি কাহিনি লিখলেন, কিন্তু পাঠককে ছুঁতে পারলেন না। ততদিনে অনেকেই উপন্যাস লেখার প্রচেষ্টা করছেন, আবার কেউ কেউ করে ফেলেছেন। এখন প্রশ্ন তাঁরা তবে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে পারলেন না কেন? আসলে বিষয়কে ও ভাষারীতিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন লেখকের নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছিল সেসময়। শেষ পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র সহ আরও কিছু শক্তিশালী ঔপন্যাসিকের হাতে উপন্যাসের সর্বাঙ্গীণ পরিণতি সাধিত হয়েছে ধীরে ধীরে।

বঙ্কিমচন্দ্রকে কেন 'উপন্যাসের পথিকৃৎ' বলা হয়, তিনি এই শিরোপার কতখানি দাবিদার তা নিয়েও এখানে আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করব।

৩.৩ উপন্যাসের পথিকৃৎ বঙ্কিমচন্দ্র

প্রথমেই বলা হয়েছে বাংলা সাহিত্যের উপন্যাসের পথিকৃৎ বঙ্কিমচন্দ্র এবং তা আপনারা সকলেই জানেন। এখন প্রশ্ন হতে পারে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রকে কেন পথিকৃতের স্বীকৃতি দেব বা কেন সার্থক উপন্যাস-শিল্পী হিসেবে সফল বলব? এই নিয়েই আমাদের আলোচ্য অংশের অবতারণা। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা প্রকাশের কয়েক বছর আগে ও পরের সাহিত্য সৃষ্টির নজির যদি আপনি দেখে থাকেন, তাহলে দেখবেন সেখানে কাহিনিকার আপনাকে গল্প শোনাতে ব্যস্ত। পাঠকের মূল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য কেবলমাত্র গল্প শোনা নয়।

সেই গল্পের সাথে একটা আত্মিক যোগাযোগ স্থাপন করাই হল উপন্যাস পাঠের মূল উদ্দেশ্য। অর্থাৎ পড়তে পড়তে পাঠক তার চেনা ছকের মানুষজনকে উপন্যাসে পাবে চরিত্র হিসেবে, এটাই তো পাঠক চায়। যে কারণে পাঠক একই ধরণের গল্প বারবার শুনতে না চেয়ে একটা সময় অন্য কিছু, নতুন ধরনের রস আস্বাদনের সাহিত্যকর্ম খোঁজে। আর সেই সময় বঙ্কিমচন্দ্র পাঠকের হাতে যা তুলে দিলেন তা কেবল গল্পের গল্প উপন্যাস নয়। পাঠক এখানে অন্যান্য চরিত্রের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে দেখার সুযোগ পাবে। বঙ্কিমচন্দ্রের আগে কয়েকজন চেষ্টা করেছেন পাঠকের মনের কাছাকাছি পৌঁছতে কিন্তু তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব বিচার-বিবেচনা করবার আগে সেইসব আখ্যানগুলির কথা সংক্ষেপে একটু আমাদের জেনে রাখতে হবে আমাদের।

৩.৪ সমসাময়িক বাংলা সাহিত্য

বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'-কে অনেকে প্রথম সার্থক উপন্যাসের শিরোপা দিতে নারাজ। পরিবর্তে তারা বলেন ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'নববাবুবিলাস' বইটি প্রথম সার্থক আখ্যান।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হয় ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দে, কিন্তু তার অনেক আগেই, ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয় 'নববাবু-বিলাস'। এর লেখক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'প্রমথনাথ শর্মা' ছদ্মনামে এই গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। সেই সময়ে বিলাস ও ব্যাভিচারের স্রোতে প্রবাহিত 'বাবু সম্প্রদায়' নামে যে একটি শ্রেণির উদ্ভব ঘটেছিল, তারই প্রথম পরিচয় পাওয়া যাবে এই গ্রন্থে। অর্থাৎ অভিজাত শ্রেণিদের মধ্যেই এক নতুন বর্গ 'বাবু বর্গ'-এর সৃষ্টি হয়েছিল বিলাসব্যসন আর ব্যাভিচারের উপর ভিত্তি করে। সমাজের উচ্চবর্গের বাবুদের আমোদ, বিনোদন ইত্যাদি সমন্বিত এই গ্রন্থে সেই সময়কার মানুষদের কথা প্রথম দেখানোর প্রচেষ্টা করা গেল বলেই এই গ্রন্থের কথা উল্লেখ করা হল, নতুবা রচনাগত দিক থেকে এটি সম্পূর্ণ পদ্যে লেখা নয় বা গদ্যে লেখাও নয়, গদ্যে পদ্যে ছড়ায় কৌতুকে পূর্ণ। তাই এটিকে এক ধরনের টুকরো লেখার সংকলন বলাই ভালো।

বাবু সম্প্রদায়কে নিয়ে প্রথম উল্লেখযোগ্য আখ্যানটি প্রকাশিত হয় ১৮৫৮ সালে। গ্রন্থটির নাম 'আলালের ঘরের দুলাল'। প্যারীচাঁদ মিত্র এটি রচনা করেন 'টেকচাঁদ ঠাকুর' ছদ্মনামে। এটিকে আগাগোড়া একটি কাহিনি বলা যায়। এ গ্রন্থের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো এটি লেখা হয়েছিল একটু ভিন্ন ভাষায়। সাধু বাংলার পরিবর্তে একেবারে মুখের ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে এই গ্রন্থে। যে কথ্য ভাষায় মানুষ কথা বলেন নিজেদের ভাব বিনিময় করে থাকেন সেই ভাষাতেই প্যারীচাঁদ মিত্র এই গ্রন্থটি রচনা করেছেন। প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁর প্রায় সব গ্রন্থেই এইরকম মৌখিক ভাষা ব্যবহার করেছেন, যেমন- 'মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়', 'অভেদী' এবং 'আধ্যাত্মিকা'।

প্যারীচাঁদের অন্যান্য রচনাকে বিশেষ গুরুত্ব না দিলেও 'আলালের ঘরের দুলাল'-কে উপন্যাস রচনার প্রচেষ্টা হিসাবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত বলে অনেকে সমালোচকের মনে হয়েছে। এর নায়ক মতিলাল শেরবোর্ণ সাহেবের স্কুলে কিছুদিন পড়াশুনা করেই নিজেকে দিগগজ পন্ডিত মনে করেছে এবং বিলাসের জোয়ারে গা ভাসিয়ে দিয়েছে। সেই সময়কার সমাজচিত্র যেমন এই গ্রন্থে ফুটে উঠেছে সাবলীল ভাবে, তেমনি চরিত্রগুলিও অত্যন্ত জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এই গ্রন্থের 'ঠক চাচা' চরিত্রটি সবচেয়ে শক্তিশালী কলমে আঁকা এক ভন্ড, প্রতারক মানুষ। উপন্যাসের প্রধান গুণ যে বাস্তবতা, সেটিও প্যারীচাঁদের এই রচনার মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়।। তা সত্ত্বেও উপন্যাসে লেখকের যে নিজস্ব জীবনদৃষ্টি ফুটে ওঠে, এখানে সেই দিকটির বিশেষ কোনো পরিচয় নেই। প্যারীচাঁদের নিজস্ব কোনো দৃষ্টিভঙ্গি এখানে পরিলক্ষিত হয়নি। সেই কারণেই বাবুদের স্খলন বা পতন কেবল বাইরের ঘটনা হয়েই থাকে, ভেতরের কোন অতৃপ্তি বা অপূর্ণতা থেকে জন্ম তা বোঝা শক্ত। পাঠকও গ্রন্থটিকে তাই

সমাদরে গ্রহণ করতে পারেনি। আমরা বড়জোর এটিকে একটি দুর্বল উপন্যাস হিসাবে আখ্যা দিতে পারি।

'বাবু সম্প্রদায়'-কে নিয়ে এই সময়ে আরও একটি গ্রন্থ লেখা হয়েছিল, প্যারীচাঁদ মিত্রের গ্রন্থ প্রকাশের কয়েক বছর পরে অবশ্য, ১৮৬২ সালে। এটির নাম 'হুতুম প্যাঁচার নক্সা'। লেখক কালীপ্রসন্ন সিংহ 'হুতুম প্যাঁচা' ছদ্মনামে এই গ্রন্থটি লিখেছেন। বাস্তবতাবোধ এবং সমাজচিত্রের হাল হকিকতের নিখুঁত পরিচয় রয়েছে এই গ্রন্থেও। তবে এখানে কোনো নিটোল কাহিনি আমরা দেখতে পাই না, পাই কিছু কিছু টুকরো সমাজচিত্র। অর্থাৎ পরিপূর্ণ একটি কাহিনির অভাব রয়েছে এখানে। কাজেই একে উপন্যাসের উপাদান বলা গেলেও উপন্যাস কোনো মতেই বলা চলে না।

এই সময় আরেকটি বই উপন্যাস হিসেবে দাবি করেছিল খুব। শ্রীমতি হ্যানা ক্যাথরিন ম্যালেন্স বা ম্যুলেন্স নামে একজন বিদেশিনীর লেখা 'করুণা ও ফুলমণির বিবরণ' নামের একটি বই। এটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে। বিদেশিনী হিসাবে বাংলা ভাষায় তাঁর দখল অবশ্য খুবই প্রশংসা করবার মতো। সাধারণ মানুষের জীবন নিয়েই তিনি এই গ্রন্থের কাহিনি রচনা করেছেন। তাতে তাদের সংসার জীবনের খুঁটিনাটি যে সব পরিচয় ফুটে উঠেছে তাও আমাদের পড়তে খারাপ লাগে না। গ্রন্থটি একেবারেই উদ্দেশ্যমূলক। খ্রিষ্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করাই ছিল এই বইটির উদ্দেশ্য। ফুলমণি খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বী বলে তার সংসারে কোনো কষ্ট নেই। অন্যদিকে করুণাও অবশ্য খ্রিষ্টধর্মেই দীক্ষিত, কিন্তু এই ধর্মের প্রতি তার কোনো আস্থা নেই। কাজেই তার জীবনে কষ্টেরও কোনো শেষ নেই। ধর্মে আস্থা আসার পরেই তার জীবন আবার সুখের হয়েছে। উপনিবেশিকতার যুগের খ্রীষ্ট ধর্মের প্রচার ও প্রসার যে ব্রিটিশদের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ছিল তার উদাহরণ হিসেবে আমরা এই বইটিকে তুলে ধরতে পারি। এই বইটির চরিত্রগুলি নির্দিষ্ট ছকে বাঁধা। ছকের বাইরে তাদের কোনো ভূমিকা নেই। এইরকম বানানো এবং কৃত্রিম কাহিনি নিয়ে উপন্যাস লেখা যায় না, কারণ মানুষের জীবন এইরকম ছকে বাঁধা হয় না। যে-জীবন নিয়ে উপন্যাস লেখা হবে তা বিশ্বাসযোগ্য হতে হবে। তাই আমরা একে উপন্যাস বলতে পারি না।

১৭৫৭ সালে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস', প্রকাশিত হয়েছিল লেখক ভূদেব মুখোপাধ্যায় নিজের নামেই। নামকরণের তিনি এটিকে উপন্যাস বলে দাবি করলেও তা আমরা মানতে পারি না। এই গ্রন্থটি আসলে দুটি ছোট কাহিনি একসঙ্গে নিয়ে রচিত, যাকে বড় জোর খণ্ডোপন্যাস বলা যেতে পারে। দুটি কাহিনির হল, 'সফল স্বপ্ন' এবং 'অঙ্গুরীয় বিনিময়'। দ্বিতীয় খণ্ডে উপন্যাসের কিছু কিছু লক্ষণ ধরা পড়েছে। পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস নয় বলেই আমরা ভূদেব মুখোপাধ্যায়কেও প্রথম ঔপন্যাসিকের মর্যাদা দিতে পারবো না।

৩.৫ ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব

বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে আলোচনা করতে গেলে বঙ্কিম-সাহিত্য সম্পর্কে একটু জেনে নেওয়া প্রয়োজন। ইংরেজি গ্রন্থ 'Rajmohan's wife' আত্মতৃপ্ত না হওয়ায় তিনি বাংলা সাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ করলেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস প্রকাশিত হল 'দুর্গেশনন্দিনী'। প্রকাশের সাথে সাথে একটা আলোড়ন সৃষ্টিতে সক্ষম হল উপন্যাসটি। উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দুতে ইতিহাসকে রেখে সমসাময়িক চরিত্রের পরিবেষ্টনে বেঁধে ফেললেন তাঁর কাহিনিকে। পাঠের শেষে পাঠক তৃপ্তি অনুভব কররার পাশাপাশি সাধারন মানুষকেও খুঁজে পেলেন যাদের বাস্তব অস্তিত্ব রয়েছে। 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসেও দেখালেন তিনি সাধারন মানুষকে। মানুষকে দেখিয়েই তিনি তাঁর দায়িত্ব শেষ করেননি। সম্পূর্ণ গল্পটাকে দেখিয়েছেন একটা বৃত্তের মাধ্যমে, যা তাঁর পূর্বের লেখা কোনো লেখকের রচনায় পাওয়া যায়নি। আসা যাক, 'রাজসিংহ' উপন্যাসের কথা। এখানে তিনি ঐতিহাসিক চরিত্র রাজসিংহের কাহিনি বর্ণনা

করলেন বাস্তবতার আলোকে। মানুষ ও মানবতার কথা নিয়ে যে উপন্যাস রচিত হয় তার যথার্থ প্রয়োগ দেখালেন এখানে।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের বিভিন্ন লক্ষণের মধ্যে কিছু কিছু যেমন সেই সময়ের মানুষের ছবি আঁকা, সাধারণ মানুষের চরিত্র ফুটিয়ে তোলা, বাস্তবতাবোধ ইত্যাদি গুণ যে সেই সময়ের বেশ কিছু লেখার মধ্যেই ছিল সে কথা অনেকেই বলেছেন। 'আলালের ঘরের দুলাল' গ্রন্থে কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য থাকায় তা যে শ্রেষ্ঠ, এ সম্বন্ধেও কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু কাহিনি গেঁথে একটা অখণ্ড জিনিস তৈরি করবার যে ক্ষমতা উপন্যাস লিখতে গেলে থাকা দরকার, তা ছিল না 'আলালের ঘরের দুলাল' গ্রন্থে। লেখকের নিজস্ব জীবন দৃষ্টি থাকার জন্য সমস্ত ঘটনাই উপন্যাসে যেভাবে জীবনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ হয়ে ওঠে, উপন্যাসের সেই মহত্ত্ব এবং গাম্ভীর্য বঙ্কিমচন্দ্র ছাড়া আর কেউই সেই মুহূর্তে সৃষ্টি করতে সমর্থ হননি। বাকিরা এই বৈশিষ্ট্য গুলি উপন্যাসের ক্ষেত্রে পূরণ করতে পারেননি। সেই কারণেই, জীবনের প্রথম তিনটি উপন্যাসে পরিচিত মানুষ ও আমাদের অভিজ্ঞতার জগৎ চিত্রিত না করার জন্য আমরা সেই গ্রন্থগুলিকে উপন্যাসের মর্যাদা দিতে পারিনা। অন্যদিকে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখার মধ্যে এই বিষয়গুলি সহজেই নজরে পড়ে।

এককথায় বিষয়গুলি বললে বলতে হয় :

মানুষ ও মানবতার কথা উপন্যাসে যথার্থভাবে দেখালেন বঙ্কিমচন্দ্র।

সময়গত ও স্থানগত ঐক্যের যথাযথ সংস্থাপন করলেন তিনি তাঁর উপন্যাসের মধ্যে।

কাহিনির বৃত্তনির্মাণে দক্ষতা দেখালেন তিনি, যা তাঁর পূর্বে অন্যকেউ দেখাতে পারেননি।

ভাষা নির্বাচনের ক্ষেত্রে তিনি মান্যভাষাকে গ্রহণ করলেন। তিনি তাঁর শব্দবন্ধের মাধ্যমে চিত্রময়তা ফুটিয়ে তুললেন। এর পাশাপাশি কাব্যিক সুষমা সৃষ্টি করলেন শব্দগুণে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা প্রথম সার্থক পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের স্রষ্টার মর্যাদা দিয়ে থাকি বঙ্কিমচন্দ্রকে। আর এই দাবির যোগ্য দাবিদার বঙ্কিমচন্দ্রই।

৩.৬ সারাংশ

বাংলা উপন্যাসের জন্মলগ্নের সঙ্গে সঙ্গেই এই ধারার রচনা জনপ্রিয়তা লাভ করে। এই ধারার দুটি দিক ছিল একদিকে ইতিহাসের বিষয়কে অবলম্বন করে রোমান্সের সৃষ্টি, অন্যদিকে জীবনমুখী বাস্তব চরিত্র ঘটনা কল্পনা করে কাহিনি সৃষ্টি। গঠনগত দিক থেকে সর্বাঙ্গীণ পরিণতি সবগুলির না থাকলেও কাহিনী পরিবেশনের বৈচিত্র্য এগুলিকে পাঠকের কাছে আকর্ষক করে তুলেছিল। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রমুখ, মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ছবি তুলে এনে, উপন্যাস উদ্ভবের বীজ প্রথম বপন করলেন। পাশাপাশি ইতিহাসের ঘটনা ও চরিত্র অবলম্বনে মানব অনুভূতির কথাকে উপন্যাসের ভাববস্তু হিসাবে হাজির করালেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়। বঙ্কিমচন্দ্র অব্যবহিত পরেই, ইতিহাস ও সমকালীন বাস্তব জগৎ উভয় ক্ষেত্র থেকে কাহিনি সংগ্রহ করে, নিজস্ব কল্পনাশক্তি ও সৃজনক্ষমতায় সেগুলিকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়ে বাংলা উপন্যাসের ভাণ্ডারটিকে নভেল, রোমান্সের সম্পদে পরিপুষ্ট করে তুললেন। ভবানীচরণ, প্যারীচাঁদ, কালীপ্রসন্ন বা ভূদেব মুখোপাধ্যায়-এর মত মানুষেরা উপন্যাস সৃষ্টির যে জমি তৈরি করে দিয়েছিলেন সেখানে সোনার ফসল উৎপাদন করতে লাগলেন বঙ্কিমচন্দ্র। একথা সবাইকে মানতে হয় এক বাক্যে।

একক-৪ ❑ 'কপালকুণ্ডলা' : উপন্যাসের পাঠ

গঠন

৪.১ উদ্দেশ্য

৪.২ প্রস্তাবনা

৪.৩ 'কপালকুণ্ডলা'-র কাহিনি সন্ধান

৪.৩.১ কাহিনির বিষয়-সংক্ষেপ

৪.৩.২ উপসংহারের অভিমুখ

৪.৩.৩ কাহিনি-বিশ্লেষণ

৪.৪ উপকাহিনির প্রয়োজনীয়তা

৪.৪.১ 'কপালকুণ্ডলা'-র উপকাহিনির প্রয়োজনীয়তা

৪.৪.২ উপকাহিনির সংখ্যা

৪.৪.৩ উপকাহিনির বিষয়বস্তু

৪.৫ 'কপালকুণ্ডলা'-র কহিনি বৃত্ত নির্মাণ

৪.৬ 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের অতিপ্রাকৃত বা অলৌকিক উপাদান

৪.৭ উপন্যাসের কাহিনি ও বাস্তবতার মেলবন্ধন

৪.৭.১ পরিচ্ছেদ শীর্ষক উদ্ধৃতির মাধ্যমে বাস্তবতার ইঙ্গিত

৪.৭.২ ইতিহাসাশ্রিত কাহিনির মধ্যে বাস্তবতার অনুসন্ধান

৪.৭.৩ স্থান—কাল ও বাস্তবতার বয়ন

৪.৮. চরিত্র নির্মাণ

৪.৮.১ নবকুমার চরিত্র

৪.৮.২ কপালকুণ্ডলা চরিত্র

৪.৮.৩ মতিবিবি চরিত্র

৪.৮.৪ অন্যান্য অপ্রধান চরিত্রসমূহ

৪.৯. 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের শ্রেণিবিচার

৪.৯.১ কাব্য হিসেবে 'কপালকুণ্ডলা'

৪.৯.২ উপন্যাস হিসেবে 'কপালকুণ্ডলা'

৪.৯.৩ রোমান্সধর্মী রচনা হিসেবে 'কপালকুণ্ডলা'

৪.৯.৪ কাব্যিক রোমান্সধর্মী রচনা হিসেবে 'কপালকুণ্ডলা'

৪.১০. সারাংশ

৪.১১ অনুশীলনী

৪.১২ গ্রন্থপঞ্জি

৪.১ উদ্দেশ্য

- 'কপালকুণ্ডলা'-র প্রেক্ষাপট বঙ্কিমচন্দ্র কোথায় থেকে সংগ্রহ করেছিলেন, কাহিনিটি কতখানি বাস্তব বা লেখকের স্বকপোল-কল্পনা কিনা সে বিষয়ে জানতে পারবেন।
- কাহিনি নির্মাণে বিভিন্ন ঘটনা বা চরিত্রাবলি অঙ্কনে কতখানি দক্ষতা দেখিয়েছেন তা জানতে পারবেন।
- কাহিনির সূচনা থেকে শুরু করে অন্তিম পরিণতি পর্যন্ত যে উপাদান বিন্যস্ত করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র এবং সেগুলি একে অপরকে কীভাবে সংযোগের মাধ্যমে আকর্ষণীয় করে তুলেছে তা জানতে পারবেন।
- কাহিনির গতিপ্রকৃতি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে প্রধান চরিত্রগুলি এবং অপ্রধান চরিত্রগুলি যে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে তা অবগত হবেন।
- রচনা শ্রেণি অনুযায়ী 'কপালকুণ্ডলা' কোন শ্রেণির রচনা তা নির্ণয় করার ক্ষেত্রে সক্ষম হবেন।

৪.২ প্রস্তাবনা

একটি রচনাকে বিশ্লেষণ করতে গেলে, সেই রচনার কাহিনি, চরিত্র এবং রচয়িতার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রকৃতির উপর আলোকপাত করা প্রয়োজন। আলোচ্য 'কপালকুণ্ডলা' রচনাটিতে যে গল্প-কাহিনি বঙ্কিমচন্দ্র পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন সেই কাহিনির বিভিন্ন চরিত্রের ক্রিয়া-কলাপ তাদের কথাবার্তা বা সংলাপ এবং ঘটনার পরম্পরা অবলম্বন করে লেখকের মনোজগতের কেন্দ্রে আলোকপাত করা সম্ভব। সেই প্রচেষ্টাই এই এককে নেওয়া হবে।

ইতিহাস, বাস্তব, লেখকের কল্পনা এবং কিছু প্রশ্নের মিলিত সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে 'কপালকুণ্ডলা'-র কাহিনি। সেই কাহিনির চরিত্ররা কখনো বাস্তব, কখনও বা ইতিহাসকে আশ্রয় করে নির্মিত হয়েছে। আবার কোনো চরিত্র লেখকের মনোজগতের প্রেরণা থেকে সৃষ্টি হয়েছে। এই চরিত্রগুলি কখনো কখনো আমাদের মানব মণ্ডলের সঙ্গে অনেকখানি মিলে যায়। আবার কখনো কখনো তা অন্য মার্গ ধরে এই উপন্যাসটির সামগ্রিক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে আমরা কাহিনি, চরিত্র এবং লেখকের দার্শনিক চিন্তাভাবনা ও মনোজগতের রূপটিকে ধরার চেষ্টা করব।

৪.৩ 'কপালকুণ্ডলা'-র কাহিনি সন্ধান

'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৮৬৬ সালে। এটি বহু পাঠকের দ্বারা পঠিত এবং বহু সমালোচকের দ্বারা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আদায় করেছে সে বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই। কেবল তাই নয় উপন্যাসটি ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয় পাঠকের হৃদয়ে যে অবস্থান করেছে সে কথা বলাই চলে। অধ্যাপক ক্লেম কর্তৃক জার্মান ভাষায় এটি অনূদিত হয় ১৮৮৬ সালে। এরপর এটি সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করেন হরিচরণ বিদ্যারত্ন ১৯৩৭ সালে। এছাড়াও বিভিন্ন সময় উপন্যাসটি হিন্দি, গুজরাটি, তামিল, তেলেগু ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে উপন্যাসটিকে নাটকের রূপ দেন প্রসিদ্ধ নট ও নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ। তার উপরে অতুলকৃষ্ণ মিত্র উপন্যাসটির আরও একবার নাট্যরূপ দেন। এই কাহিনির আকর্ষণ এবং আবেদন এতখানি ছিল যে অপর আর এক সাহিত্যিক দামোদর মুখোপাধ্যায় এই উপন্যাসের দ্বিতীয় অংশ রচনা করেছেন 'মৃন্ময়ী' নামে। অর্থাৎ এ থেকে সহজেই অনুমান করা যায় বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয় উপন্যাস 'কপালকুণ্ডলা' সেই সময়কার সাহিত্যিক ও পাঠকদের কতখানি নাড়া দিয়েছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই উপন্যাসটি সম্পর্কে অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় তাঁর অনুজ পূর্ণচন্দ্র

চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'বঙ্কিম-প্রসঙ্গ' গ্রন্থে। এখানে তিনি বলেছেন জেলাশাসক হিসেবে যখন তিনি মেদিনীপুরের নেগুঁয়াতে (বর্তমানে যা কাঁথি নামে পরিচিত) বদলি হয়ে আসেন তখন তাঁর সমুদ্রতীরবর্তী বাংলোর কাছে প্রতিদিন গভীর রাতে দেখতে পাওয়া যেত এক কাপালিককে। সেই কাপালিক থাকত সমুদ্র নিকটবর্তী গভীর জঙ্গলের মধ্যে। সেই কাপালিক যে বঙ্কিমচন্দ্রের মনে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল সে কথা অনুমান করা যায় নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রকে করা একটি প্রশ্নের সাপেক্ষে। বঙ্কিমচন্দ্র প্রশ্ন করেছিলেন, ''যদি শিশুকাল হইতে ষোল বৎসর পর্যন্ত কোনও স্ত্রীলোক সমুদ্রতীরে বনমধ্যে কাপালিক কর্তৃক প্রতিপালিত হয়, কখনও কাপালিক ভিন্ন অন্য কাহারও মুখ না দেখিতে পায় এবং সমাজের কিছু জানিতে না পায়, কেবল বনে বনে সমুদ্রতীরে বেড়ায়, পরে সেই স্ত্রীলোকটিকে কেহ বিবাহ করিয়া সমাজে লইয়া আইসে, তবে সমাজ সংসর্গে তাহার কতদূর পরিবর্তন হইতে পারে এবং তাহার উপরে কাপালিকের প্রভাব কি একেবারে অন্তর্হিত হইবে?

এ প্রশ্নের উত্তরে দীনবন্ধু মিত্র কিছু না বললেও বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র বলেছিলেন ''কিছুকাল সন্ন্যাসীর প্রভাব থাকিবে। পরে সন্তানাদি হইলে স্বামীপুত্রের প্রতি স্নেহ জন্মাইলে সমাজের লোক হইয়া পড়িবে; সন্ন্যাসীর প্রভাব তাহার মন হইতে একেবারে তিরোহিত হইবে।" এই উত্তর যে বঙ্কিমচন্দ্রের মনঃপুত হয়নি তা পূর্ণচন্দ্র 'বঙ্কিম-প্রসঙ্গ' গ্রন্থে স্বীকার করেছেন।

'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের পরিকল্পনার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের উপর প্রভাব পড়েছে মহাকবি কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম' নাটকের শকুন্তলার চরিত্রের, ভবভূতির 'মালতিমাধব'-এর কপালকুণ্ডলা চরিত্রের এবং শেক্সপিয়রের নাটক 'দ্য টেমপেস্ট'-এর চরিত্র মিরান্দার। এর পাশাপাশি 'কথাসরিৎসাগর'-এর দশম তরঙ্গে বর্ণিত 'শ্রীদত্ত ও মৃগাঙ্কবতী' উপাখ্যানের সঙ্গেও 'কপালকুণ্ডলা'-র সাদৃশ্য সূক্ষ্মভাবে লক্ষ করা যায় । আর 'মালতীমাধব' নাটকে অঘোরঘন্ট নামে এক কাপালিক চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়, যিনি চামুণ্ডা দেবীর মন্দিরের পূজারী। কপালকুণ্ডলা ছিল তাঁর শিষ্যা এবং সহযোগী। নায়ক মাধব সেই কাপালিককে বধ করে উদ্ধার করেছিলেন মালতীকে।

আবার দেখতে পাব, 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম' নাটকে রাজা দুষ্মন্ত এবং তপোবনবাসী কন্যা শকুন্তলার পূর্বপরিচয় কোনো ছিল না কিন্তু পরবর্তীকালে প্রণয়ের সম্পর্কে আসক্ত হয় তারা। অর্থাৎ তপোবনের মধ্যে দুষ্মন্ত ছিল শকুন্তলার কাছে একমাত্র আকর্ষক পুরুষ, ঠিক তেমনই কপালকুণ্ডলার কাছেও নবকুমার হয়ে উঠেছে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। শকুন্তলা তপোবনের কণ্ব মুনির আশ্রমে থাকায় যেমন কণ্ব ব্যাতীত অপর পুরুষ দর্শন করেনি, ঠিক তেমনি কপালকুণ্ডলাও কখনও সমুদ্রতট বা বালিয়াড়ি ছেড়ে সংসার জীবনে প্রবেশ করেনি, তাই তারও কাপালিক ব্যাতীত ভিন্ন পুরুষ দর্শন হয়ে ওঠেনি। অর্থাৎ দুটি ক্ষেত্রেই তাদের উত্তরণের পুরুষ হয়ে এসেছে তাদেরই যৌবনের নায়ক।

৪.৩.১ কাহিনির বিষয়-সংক্ষেপ

'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসটির আখ্যানকে চারটি খণ্ডে বিন্যস্ত করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। খণ্ডগুলিকে আবার বিভিন্ন পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়েছে। খণ্ডগুলির কোনো স্বতন্ত্র নামকরণ করেননি তিনি। পরিচ্ছেদগুলির ক্ষেত্রে শীর্ষ ক্রমাঙ্ক ব্যবহৃত হয়েছে। তার পাশাপাশি অনুচ্ছেদগুলির শিরোনাম ব্যবহৃত হয়েছে এবং বিভিন্ন সাহিত্য থেকে উদ্ধৃতি গ্রহণ করা হয়েছে প্রতিটি পরিচ্ছেদের শুরুতে। প্রথম খণ্ড রয়েছে ন'টি পরিচ্ছেদ, দ্বিতীয় খণ্ডে ছয়টি পরিচ্ছেদ, তৃতীয় খণ্ডে সাতটি পরিচ্ছেদ ও চতুর্থ খণ্ডে ন'টি পরিচ্ছেদ। প্রথম সংস্করণে মোট পরিচ্ছেদ সংখ্যা ছিল বত্রিশটি। পরবর্তীকালে তিনি চতুর্থ খণ্ড থেকে একটি পরিচ্ছেদ পরিত্যাগ করেন। বর্তমান সংস্করণে মোট একত্রিশটি পরিচ্ছেদ পাওয়া যায়।

প্রায় দু'শো পঞ্চাশ বছর আগে মাঘ মাসের এক রাত্রিশেষে একদল যাত্রী নৌকাযোগে গঙ্গাসাগর থেকে ফিরছিল। পথে কুজ্ঝটিকার কারণে নৌকার নাবিকরা দিকভ্রষ্ট হয়। শেষ পর্যন্ত নৌকাটি একটি তীরে গিয়ে থামলে যাত্রীদের রান্নার কাজের প্রয়োজনীয় কাঠ সংগ্রহের জন্য সপ্তগ্রামের তরুণ যুবা নবকুমার বনের মধ্যে প্রবেশ করে। পুনরায় জোয়ার এলে নবকুমারের প্রতীক্ষায় কালবিলম্ব না করে যাত্রীদল নিয়ে নাবিকেরা রওনা দেয়। নবকুমার যেখানে ছিল সেই জায়গাটি ছিল মনুষ্যবসতিহীন অরণ্যমাত্র। যাত্রীদল ফিরে এসে তাকে পুনরায় সাথে নিয়ে যাবে, এই প্রত্যাশায় অপেক্ষা করতে করতে একটা সময় সন্ধ্যে নামে। তখন সে বুঝতে পারে, আসলে যাত্রীদল তাকে ফেলে চলে গেছে। ক্লান্তিতে নবকুমার বালিয়াড়িতে ঘুমিয়ে পড়ে।

গভীর রাত্রে ঘুম ভাঙলে দূরে প্রজ্বলিত আলোকরাশির দিকে এগিয়ে যায়। সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখতে পায় বছর পঞ্চাশ বয়সি এক জটাধারী কাপালিক অগ্নির সম্মুখে গলিত শবের উপর ধ্যানে মগ্ন। ধ্যানভঙ্গ হলে কাপালিক নবকুমারকে একটি পর্ণকুটিরে নিয়ে যায়। ফলমূল ইত্যাদি আহারাদির ব্যবস্থা করে কাপালিক এবং নির্দেশ দেয় তার অনুমতি ব্যতীত সে স্থান যেন নবকুমার পরিত্যাগ না করে। পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙলে সেই স্থান পরিত্যাগ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করলে কাপালিকের কথা মনে পড়ে। আর কাপালিকের সেই নির্দেশ অমান্য করতে তার সাহস হয়নি। খাদ্যের সন্ধানে বেরিয়ে অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করে নবকুমার এবং পথ হারিয়ে সমুদ্রের তীরে উপনীত হয় সে। সন্ধ্যার সময় কাপালিকের পর্ণকুটির অভিমুখে গমন করতে উদ্যত হলে অস্পষ্ট সন্ধ্যার আলোকে একটি অপূর্ব রমণী মূর্তি দেখতে পায় সে। অবগত থাকা ভালো, এই রমণী হল কপালকুণ্ডলা। সে পথ দেখিয়ে নবকুমারকে কাপালিকের কুটির পর্যন্ত নিয়ে যায়।

পরের দিন সন্ধ্যায় কাপালিকের সঙ্গে নবকুমারের দেখা হলে নবকুমার বাড়ি ফেরার অনুমতি চায়। উত্তরে সন্ন্যাসী কাপালিক তাকে অনুসরণ করার আদেশ দেয়। অনুসরণ করার সময় পিছন থেকে কপালকুণ্ডলা তাকে ধরে। বলে, ফিরে যাওয়ার জন্য। নবকুমারকে সে আরও জানায় নরমাংস না হলে তান্ত্রিকের পূজো সম্পন্ন হয় না। এই কথা কাপালিক শুনতে পেলে নবকুমারকে শক্ত হাতে সমুদ্র সৈকতে টেনে নিয়ে যায় এবং দৃঢ়ভাবে হাত বেঁধে সমুদ্র সৈকতে ফেলে রাখে। আর জানায় ভৈরবীর পূজোয় বলিদানের হেতু তাকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বলিদানের জন্য খড়্গ খুঁজতে গিয়ে কাপালিক দেখেন খড়্গ যথাস্থানে নেই। খড়্গ আনার জন্য কুটিরের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলে কপালকুণ্ডলা লুকিয়ে রাখা খড়্গ দিয়ে নবকুমারের বন্ধনমুক্ত করে এবং সেখান থেকে তারা উভয়েই পলায়ন করে। এদিকে নবকুমার ও কপালকুণ্ডলাকে খুঁজতে গিয়ে একটি বালিয়াড়ির উপরে আরোহণ করেন কাপালিক। ঘটনাচক্রে বালির স্তূপ থেকে নীচে পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত হন তিনি।

ভৈরবী পূজোর স্থল থেকে নবকুমারকে সঙ্গে নিয়ে কপালকুণ্ডলা নিকটবর্তী একটি কুঠিরে উপস্থিত হয়। সেখানে দেবতার সেবক এক অধিকারী বাস করত। কপালকুণ্ডলার সেই সকল কথা শোনার পর নবকুমারকে মেদিনীপুরের পথ দেখিয়ে দেওয়ার বিষয়ে আশ্বস্ত করে অধিকারী। কপালকুণ্ডলা সমুদ্রতীরে ফিরে যেতে চাইলে অধিকারী তাকে বাধা দেয় এবং তাকে জানায় নবকুমারের সাথে বিবাহ করে সেই স্থান ছেড়ে যাওয়ার জন্য। প্রথমে অসম্মত হলেও পরে অধিকারী নির্দেশ মেনে নেয়। শৈশবে জলদস্যুদের দ্বারা অপহৃত ও গৃহহারা হয়েছিল কপালকুণ্ডলা এবং পরে কাপালিকের আশ্রয় লাভ করে। কপালকুণ্ডলা একজন ব্রাহ্মণ কন্যা। সুতরাং তাকে বিবাহ করতে পারে নবকুমার। এই প্রস্তাবে সে সম্মত হয় এবং পরের দিন অধিকারীর পৌরোহিত্যে নবকুমারের সঙ্গে কপালকুণ্ডলার বিবাহ সুসম্পন্ন হয় এবং তাদের সঙ্গে কিছু পাথেয় কপালকুণ্ডলার আঁচলে বেঁধে দিয়ে উভয়কে বিদায় জানায় অধিকারী।

দেশে ফেরার জন্য অধিকারী যে অর্থ প্রদান করেছিল সেই অর্থের বিনিময়ে কপালকুণ্ডলার জন্য একজন দাসী, একজন রক্ষক এবং শিবিকাবাহক নিযুক্ত করল নবকুমার। আর অর্থের অপ্রতুলতার কারণে নিজে পদব্রজে চলতে লাগল। একসময় সে অনেক পিছনে পড়ে যায়। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে আসে আর মাঝে মাঝে অল্প বৃষ্টি হয়। পথে মতিবিবি নামে এক মহিলার সাথে পরিচয় হয়, যার পালকি ভেঙ্গে, তাকে শিবিকার সাথে বেঁধে রেখে তার সমস্ত অলঙ্কারসামগ্রী লুট করে নিয়ে গেছে দস্যুরা।

নবকুমার ওই মহিলাকে মুক্ত করে সঙ্গে নিকটবর্তী চটিতে পৌঁছে দেয় এবং আকস্মিক প্রজ্বলিত প্রদীপের উজ্জ্বল আলোয় দেখতে পায় সাতাশ বছর বয়সী এই মহিলা অসাধারণ সুন্দরী। মতিবিবি নিজেকে পশ্চিমদেশীয় মুসলমান বলে পরিচয় দেয়। মতিবিবি কপালকুণ্ডলাকে দেখবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে নবকুমার তাতে সম্মত হয় এবং মতিবিবিকে কপালকুণ্ডলার সম্মুখে নিয়ে যায়। বহু অলঙ্কার এবং রত্নখচিত পোষাকে সুসজ্জিত হয়ে মতিবিবি কপালকুণ্ডলার সামনে গিয়ে তার রূপে মুগ্ধ হয়ে, তার সমস্ত অলঙ্কার নবকুমারের নিষেধ অগ্রাহ্য করে কপালকুণ্ডলাকে পরিয়ে দিয়ে ফিরে আসে। পরের দিন মতিবিবি বর্ধমানের দিকে এবং নবকুমার পত্নীসহ সপ্তগ্রামের অভিমুখে যাত্রা করলে পথে এক ভিক্ষুককে ভিক্ষা হিসেবে অলঙ্কার ভর্তি গয়নার বাক্স দান করে কপালকুণ্ডলা।

নবকুমার ঘরে ফিরে এলে তার মা ও ছোটবোন (দুই বোন থাকলেও ঔপন্যাসিক ছোটবোন শ্যামাসুন্দরীর কথা বলেছেন কেবল) খুশি হয়। অজ্ঞাতকুলশীল কপালকুণ্ডলাকে বধূ হিসেবে গ্রহণ করতে কোনো রূপ দ্বিধা প্রকাশ করে না কেউ। সংসার জীবনে কপালকুণ্ডলার নতুন নাম হয় মৃন্ময়ী। মৃন্ময়ীকে শ্যামাসুন্দরী সাজসজ্জা ও অলঙ্কার দিয়ে সাজিয়ে তুলতে গেলে সেদিকে কোনো আগ্রহ প্রকাশ করে না সে। শ্যামাসুন্দরীকে সে জানায় সমুদ্রতীরে বনে বনে ভ্রমণেই ছিল তার প্রকৃত সুখ।

মতিবিবি পূর্বে হিন্দু ছিল। ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর তার নতুন নাম হয় লুৎফ-উন্নিসা। দেশে-বিদেশে ভ্রমণকালে আত্মপরিচয় গোপন করার জন্য সে মতিবিবি নামটি ধারণ করে। মতিবিবির চরিত্র একই সঙ্গে মহাদোষে কলুষিত এবং মহৎ গুণে শোভিত। প্রথমদিকে তার পিতা ঢাকায় রাজ কর্মে নিযুক্ত থাকলেও কর্মদক্ষতায় তিনি আগ্রার উচ্চপদস্থ প্রধান ওমরাহে পরিণত হয়। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লুৎফ-উন্নিসার রূপ গুণ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সে সংস্কৃত, পারসিক, নৃত্য, গীত ইত্যাদিতে সমান পটীয়সী। কিন্তু তার মনোবৃত্তি ভীষণ বেগবতী। তার ইন্দ্রিয় দমনের ক্ষমতা বা ইচ্ছা কোনোটাই বিন্দুমাত্র ছিল না।

যুবরাজ সেলিম তার প্রধান গুণগ্রাহী হওয়ার কারণে লুৎফ-উন্নিসা রাজ অন্তঃপুরে স্থান পায় এবং সে স্বপ্ন দেখে রাজমহিষী হওয়ার। তার এই স্বপ্নে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখা যায় সম্রাট আকবরের কোষাধ্যক্ষ খাজা আয়াসের কন্যা মেহের-উন্নিসাকে। আকবর মেহের-উন্নিসার সঙ্গে শের আফগানের বিবাহ দিলে, যুবরাজ সেলিম একদিন শের আফগানকে হত্যা করে। তিনি যে মেহের-উন্নিসাকে বেগম বানাবেন তা বুঝতে দেরি হয়নি লুৎফ-উন্নিসার। ইতিমধ্যে আকবরের মৃত্যু হলে সেলিম সম্রাট হন 'জাহাঙ্গীর' নাম ধারণ করে। একসময় মতিবিবির ওরফে লুৎফ-উন্নিসার মনের আমূল পরিবর্তন হয়। পুনর্বার বিবাহ করার জন্য জাহাঙ্গীরের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে বিদায় গ্রহণ করে এবং সপ্তগ্রামে এসে উপস্থিত হয়।

এদিকে সপ্তগ্রামে এসে মতিবিবি, তাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করার জন্য নবকুমারকে অনুরোধ করে। নবকুমার দৃঢ়তার সঙ্গে প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয়। পরে মতিবিবি ক্রুদ্ধ হয়ে জানায়, সে তার উদ্দেশ্য যে-কোনো ভাবেই সাধন করবে। নবকুমার বুঝতে পারে তার প্রথমা স্ত্রী পদ্মাবতীই আসলে মতিবিবি। মতিবিবি নবকুমারের জীবন থেকে কপালকুণ্ডলাকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য পুরুষের ছদ্মবেশ ধরে বনের মধ্যে থাকা কাপালিকের সঙ্গে পরামর্শ শুরু করে।

শ্যামাসুন্দরীর সহযোগিতায় মৃন্ময়ী ধীরে ধীরে যোগিনী থেকে গৃহিণী হয়ে উঠেছে। নবকুমারের সাথে কপালকুণ্ডলা বিবাহ এক বছর পেরিয়ে গেছে। শ্যামাসুন্দরী তার স্বামীকে বশ করার জন্য একটি ওষধির সন্ধান পায় যা রাত্রি দ্বিপ্রহরে এলোচুলে তুলে আনতে হয় অরণ্য থেকে। শ্যামাসুন্দরীর পক্ষে সে রাত্রে বাইরে যাওয়া সম্ভব নয় বলে কপালকুণ্ডলা সেই অরণ্য লতা তুলে আনার জন্য সন্ধ্যার কিছু পর বাড়ির বাইরে যেতে গেলে সাক্ষাৎ হয় নবকুমারের সঙ্গে। কপালকুণ্ডলা জানায়, সে অবিশ্বাসিনী কিনা দেখতে চাইলে নবকুমার তার সাথে আসতে পারে।

বনের মধ্যে আলো জ্বলতে দেখে, সেই আলোর অভিমুখে যাত্রা করে কপালকুণ্ডলা। সেখানে পুরুষবেশী মতিবিবি এবং কাপালিক কাউকে চিনতে পারেনি সে। মতিবিবি কপালকুণ্ডলাকে চিনতে পেরে জানায়, সে পুরুষ নয় এবং তারা কথা বলছিল কপালকুণ্ডলার সম্পর্কে। সে ভয় পেয়ে, ফিরে দেখে, ঘরের সামনে গিয়ে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে কাপালিক। সাগর তীরবর্তী কাপালিককে চিনতে পারে সে। কপালকুণ্ডলা পুরুষবেশী যুবার (মতিবিবি) সঙ্গে দেখা করার জন্য একটি পত্র মারফত আহূত হয়। সঙ্কেত স্থান ভুলে যাওয়ায় মিলনের উদ্দেশ্যে বেরোবার পর আবার ফিরে আসে কিন্তু সেই পত্র খুঁজে পায় না আর। এদিকে সেই পত্র নবকুমার পাওয়ায় সেও পিছু নেয় কপালকুণ্ডলার।

কাপালিকের সঙ্গে নবকুমারের দেখা হলে, কাপালিক নবকুমারকে কপালকুণ্ডলার বিরুদ্ধে মন্ত্রণা দেয়। তার ক্লান্ত শরীরকে চাঙ্গা করার জন্য নিজের হাতে প্রস্তুত সুরা পান করায়। কাপালিক নবকুমারকে বোঝাতে সক্ষম হয় কপালকুণ্ডলা বধযোগ্যা। এদিকে কপালকুণ্ডলাকে মতিবিবি নিজের পরিচয় প্রকাশ করে বলে, নবকুমারকে ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য। বিনিময়ে ধন-দৌলত অট্টালিকা সমস্ত কিছু মতিবিবি দান করবে তাকে। কপালকুণ্ডলা মতিবিবির কথায় সম্মত হয় কিন্তু দান গ্রহণে অস্বীকৃত হয়। অন্যদিকে নেশাগ্রস্থ নবকুমার মতিবিবির সঙ্গে কপালকুণ্ডলাকে ঘনিষ্ঠ হয়ে কথা বলতে দেখে হত্যা করার জন্য কৃতসংকল্প হয়।

কপালকুণ্ডলা ঘরে ফিরে যেতে চাইলে কাপালিকের সম্মুখীন হয় এবং কাপালিক জানায় তাকে বলি দেওয়ার কথা। সে কাপালিকের ইচ্ছাকে চরিতার্থ করতে দেওয়াই সংগত বলে বোধ করে। উপযুক্ত স্থানে নবকুমার এবং কপালকুণ্ডলাকে বসিয়ে রেখে কাপালিক ভৈরবীর পুজা শুরু করে। পূজা শেষে কপালকুণ্ডলা স্নান করিয়ে আনার জন্য কাপালিক নির্দেশ দেয় নবকুমারকে। নবকুমার ও কপালকুণ্ডলার কথোপকথনে কপালকুণ্ডলা জানায় নবকুমার তার এই আচরণ নিয়ে কোনো প্রশ্ন করেনি তাই সে কোনো কিছু বলেনি। সে আরও জানায় তার সাথে যাকে দেখেছিল সে আসলে পদ্মাবতী। দৃঢ়তার সঙ্গে কপালকুণ্ডলা জানায়, সে আর বাড়ি ফিরে যাবে না। মা ভবানীর চরণে আত্মাহুতি দেওয়াই তার নির্মম সিদ্ধান্ত। নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে বাহুবেষ্টনীতে আবদ্ধ করতে চাইলে তাৎক্ষণিক এক বিশাল জলতরঙ্গ তীরভূমিকে আঘাত করে এবং কপালকুণ্ডলা ভেসে যায়। তাকে উদ্ধারের জন্য নবকুমারও ঝাঁপ দেয় জলে। সেই অনন্ত গঙ্গা প্রবাহের মধ্যে তরঙ্গ দোলায় আন্দোলিত হয়ে কপালকুণ্ডলা ও নবকুমার কোথায় গেল সেই প্রশ্ন রেখে কাহিনি সমাপ্ত করেছেন ঔপন্যাসিক।

৪.৩.২ উপসংহারের অভিমুখ

'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের উপসংহার নিয়ে বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় সেই উক্তির কথা, যে উক্তির মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক উপন্যাসটির সমাপ্তি টেনেছেন। বলেছেন "সেই অনন্ত গঙ্গাপ্রবাহমধ্যে বসন্তবায়ুবিক্ষিপ্ত বীচিমালায় আন্দোলিত হইতে হইতে কপালকুণ্ডলা ও নবকুমার কোথায় গেল?" এই উক্তি উপন্যাসটির বর্তমান সংস্করণে রয়েছে।

একটু আলোচনা করলে দেখা যায় অনন্ত গঙ্গাপ্রবাহবক্ষে অর্থাৎ কালসময়ের স্রোতে তরঙ্গমালায় আন্দোলিত

হতে থাকা নবকুমার ও কপালকুণ্ডলা ভবিষ্যৎকে যে একটা ধোঁয়াশার মধ্যে রাখতে চাইছেন ঔপন্যাসিক, তা স্পষ্টতই অনুমেয়। এই 'কাল' দুটি অর্থে প্রযুক্ত। প্রথমত, সময়; দ্বিতীয়ত, নিয়তি। ঔপন্যাসিক রচনার গাম্ভীর্য বজায় রাখতে সময় এবং নিয়তিকে প্রসারিত দিয়েছেন উপসংহারে। তিনি উভয়ের বর্তমান পরিস্থিতির জন্য উভয়কেই দায়ী করেছেন। নবকুমারের সন্দেহপ্রবণতা যদি তীক্ষ্ণতর না হতো অথবা সে যদি কপালকুণ্ডলার মনোজগৎকে সঠিকভাবে নিরূপণ করতে পারত তাহলে মা ভৈরবীর চরণে নিজেকে সমর্পণ করার মত পরিস্থিতি তৈরি হত না। কেননা, নবকুমারের সঙ্গে এক বছর ধরে ঘর সংসারের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করে অনেকখানি গৃহিণী করে তুলেছিল মৃন্ময়ী ওরফে কপালকুণ্ডলা। শ্যামাসুন্দরীর প্রয়োজনীয় ওষধি আনার জন্য সে রাত্রে একা বেরিয়েছিল কপালকুণ্ডলা। কাপালিকের প্ররোচনায় পুরুষবেশী পদ্মাবতীর সঙ্গে কথোপকথনকালে নবকুমার সবচেয়ে বেশি বীতশ্রদ্ধ হয় স্ত্রীর প্রতি। এমত অবস্থায় স্ত্রীকে বধ করার জন্য কৃতসংকল্প হয়, যা অন্যায় সীমা লঙ্ঘন করে। সে দিক থেকে আমরা নবকুমারকে সবচেয়ে বেশি দোষী চিহ্নিত করতে পারি। অন্যদিকে, কপালকুণ্ডলাও কিয়দাংশে দায়ী নবকুমারের ও নিজের এই পরিণতির জন্য। সে যদি নবকুমারের কাছে সকল সত্য উন্মোচন করে পতির সাহায্য চাইত, তাহলে হয়তো বিয়োগান্তক পরিস্থিতির সৃষ্টি হত না। ঔপন্যাসিক কম অপরাধীকে হত্যা করে, তুলনায় বেশি অপরাধীকে বাঁচিয়ে রাখার মত ভুল প্রথম সংস্করণে করলেও দ্বিতীয় সংস্করণে তা করেননি। দ্বিতীয় সংস্করণেও একই ভুলের পুনরাবৃত্তি হলে পাঠকের চোখে বঙ্কিমচন্দ্র একদেশদর্শীতায় দুষ্ট হতেন। প্রথম সংস্করণের শেষে উপরোক্ত উক্তিটির পরে আরও ছিল

(কাপালিক) লম্ফ দিয়া অনায়াসে দৃষ্ট পদার্থ কূলে তুলিলেন। দেখিলেন, এ নবকুমারের প্রায় অচৈতন্য দেহ। অনুভবে বুঝিলেন, কপালকুণ্ডলাও জলমগ্ন আছেন। পুনরপি অবতরণ করিয়া তাঁহার অনুসন্ধান করলেন, কিন্তু তাঁহাকে পাইলেন না।

তীরে পুণরারোহন করিয়া কাপালিক নবকুমারের চৈতন্য বিধানের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। নবকুমারের সংজ্ঞালাভ হইবামাত্র, নিঃশ্বাস সহকারে বাক্যস্ফূর্তি হইল। সে বাক্য কেবল 'মৃণ্ময়ী! মৃণ্ময়ী!'

কাপালিক জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মৃণ্ময়ী কোথায়?' নবকুমার উত্তর করিলেন, 'মৃণ্ময়ি-মৃণ্ময়ি-মৃণ্ময়ি!'

অর্থাৎ প্রথম সংস্করণে ঔপন্যাসিক মৃন্ময়ী ওরফে কপালকুণ্ডলাকে নিরুদ্দেশ করে নবকুমারকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। এই ঘটনা সহৃদয় পাঠক মেনে নেয় না। তাই ঔপন্যাসিককে দ্বিতীয় সংস্করণে কপালকুণ্ডলার পাশাপাশি নবকুমারকেও নিরুদ্দেশ যাত্রায় নিক্ষেপ করতে হয়। বলা যেতে পারে, দুজনের এই সমান পরিণতি উপন্যাসের ক্ষেত্রে যথার্থ ও বাঞ্ছনীয় হয়েছে।

৪.৩.৩ কাহিনি-বিশ্লেষণ

উপসংহারের পাশাপাশি কাহিনির বাস্তবসম্মত বিশ্লেষণ হওয়াটাও জরুরি। স্বাভাবিক ভাবনা-চিন্তার আলোকে আমরা ধরে নিতে পারি যে, রসুলপুরের নদীর বিস্তীর্ণ বালিয়াড়ি অঞ্চলজুড়ে মৃন্ময়ীকে সযত্নে লালন পালন করার একটা চিন্তা বঙ্কিমচন্দ্র করেছিলেন আপন মানসলোকে। আর সে কারণেই কোনো এক সময়ে, কোনো একদল জলদস্যুর অতর্কিত আক্রমণে পরিবার-পরিজন থেকে অপহৃতা হয় শিশু কন্যাটি। আর সেই শিশুটিকে কাপালিক উদ্ধার করে এবং আশ্রয় দান করে। মানবিক আবেদন বা নিজের প্রয়োজন যে কারণেই হোক কাপালিক প্রতিপালন করেছে মেয়েটির। এতক্ষণ পর্যন্ত ঘটনার গতি স্বাভাবিক মনে হচ্ছিল। কিন্তু এরপরে ঔপন্যাসিক জানান, উপন্যাসের নায়িকা চরিত্র কখনোই কোনো যুবা পুরুষের মুখ দেখেনি তার এই ষোলো বয়স পর্যন্ত। এটিকে বড় অসামঞ্জস্য বোধহয় ঘটনার পরম্পরার বিস্তারে। কেননা কাপালিক এবং অধিকারীর কাছে বেড়ে ওঠা কপালকুণ্ডলার বনের

মধ্যে ভ্রমণকালে কাপালিক বা অধিকারীর কোনো শিষ্যের সাথে কখনো-সখনো মুখোমুখি হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল। প্রয়োজনে তারা অধিকারীর কুটিরে এসেছে, অথচ ষোড়শবর্ষীয়া কন্যাটি একটি বারের জন্যেও কোনো শিষ্যকে দেখেনি তা বড় বেমানান। আসলে কপালকুণ্ডলাকে নির্ভেজাল রূপে গড়ে তুলতে গিয়ে কোথাও একটা সামঞ্জস্যতা খুইয়েছেন ঔপন্যাসিক। সভ্য সমাজের বা সেই সময়কার নাগরিক জীবনের নিয়ম-কানুন, রীতি-নীতি বিবাহ ইত্যাদি সম্পর্কে তার ধারণা না থাকা স্বাভাবিক। কারণ, যে পরিবেশের মধ্য দিয়ে সে বড় হয়েছে তা নাগরিক জীবনযাপনের থেকে বহু দূরবর্তী।

নিতান্তই ভাগ্যচক্রে সেইরকম একটি বেলাভূমিতে উপস্থিত না হলে কপালকুণ্ডলার সঙ্গে হয়ত নবকুমারের বিবাহ হত না। অর্থাৎ নিয়তিতাড়িত নবকুমার মানুষ, লোকালয় ও সমাজের সংস্রববিহীন একটি ষোড়শী কন্যাকে বিবাহ করতে চাইল কৃতজ্ঞতাবশত, কিছুটা পুরানো ক্ষত (পদ্মাবতী) থেকে নিষ্কৃতি পেতে আর কিছুটা অধিকারীর অনুরোধে। সপ্তগ্রামে উপস্থিত হয়ে নবকুমার অনুধাবন করল, প্রণয় কর্কশকে মধুর করে তোলে, অসৎ-কে করে তোলে সৎ, অপুণ্যকে করে তোলে পুণ্যবান আর অন্ধকারকে করে তোলে আলোকময়। যে প্রণয় নবকুমার আনতে চেয়েছিলেন দাম্পত্য সম্পর্কে, সে প্রণয় আসেনি। কেননা কপালকুণ্ডলার কোনো রূপ পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি এই প্রণয়। নবকুমারের বোন শ্যামাসুন্দরী চুল বেঁধে দিতে চাইলে, অলঙ্কারে ভূষিত করতে চাইলে কপালকুণ্ডলা বলেছে "বোধ করি, সমুদ্রতীরে সেই বনে বনে বেড়াইতে পারিলে আমার সুখ জন্মে।" অর্থাৎ সংসারের প্রতি কোনো রূপ আকর্ষণ বোধ করেনি কপালকুণ্ডলা।

এক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও দেখা যায় সংসারের প্রতি টান অনুভব করে না কপালকুণ্ডলা। আসলে কাপালিকের কাছে কাটানো জীবনের প্রথম ষোলটি বছর যেভাবে কাটিয়ে এসেছে তার একটা প্রভাব পড়েছে। সেইজন্য নবকুমারের বা সংসার কোনো কিছুই তাকে আকৃষ্ট করতে পারে না। আর একটি বিষয় খেয়াল করতে হবে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বন্ধুমহলে প্রশ্ন করেছিলেন, কাপালিকের কাছে পালিতা কন্যার উপর থেকে কাপালিকের প্রভাবসমূহ কি একেবারে বিলুপ্ত হবে? তিনি এই ইঙ্গিত কোথাও দেননি যে, নায়কের আগের পক্ষের কোনো স্ত্রী থাকবে বা নায়কের বোন শ্যামাসুন্দরী তাঁর স্বামীর কাছে বিশেষ ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত থাকবে। অর্থাৎ এই বিষয়গুলিও উপন্যাসের পরিণতি নির্মাণে বা নায়িকার পরিণতির সাথে গভীরভাবে সংযুক্ত।

৪.৪ উপকাহিনির প্রয়োজনীয়তা

যে-কোনো কাহিনি রচনার সময় রচয়িতা মূল রচনার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন কোনো ক্ষুদ্র নাতিগুরুত্বপূর্ণ কাহিনি সংস্থাপন করেন রচয়িতা সুকৌশলে এই কাহিনিগুলিকে সুচারুরূপে মূল কাহিনির সঙ্গে পরিবেশন করেন। এর ফলে মূল কাহিনির বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় না। এখন আপনি প্রশ্ন করতেই পারেন রচয়িতা কেন এমন করেন? আপনার চিন্তায় যে কারণগুলি উঠে আসতে পারে—

উপন্যাসের কলেবর বৃদ্ধি করার জন্য?

পাঠকের অনুসন্ধিৎসু মনের তলানিতে খোঁচা দিয়ে তার কৌতূহল বাড়ানোর জন্য?

রচয়িতার কল্পনার বিন্যাস থমকে গিয়ে কি উপকাহিনির উৎসমুখ খুলে দেয়?

উপন্যাসের চরিত্র ও কাহিনির প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি?

উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্রগুলির সম্যক পরিচয় দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়েই কি রচয়িতা উপকাহিনির সূত্রপাত করেন?

আপনার এই ভাবনা বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে কতখানি মেলে দেখা যাক। উপন্যাসের কলেবর বৃদ্ধি, উপকাহিনি সংযোজনের অন্যতম একটি কারণ। আকার আয়তনে একটু বৃদ্ধি না হলে বড়গল্প আর উপকাহিনিবিহীন উপন্যাসের বিশেষ কোনো পার্থক্য থাকে না। পাঠক যে-কোনো কাহিনি পাঠ-কালে বা পাঠান্তে প্রশ্ন করে 'তারপর?' এই শব্দ উচ্চারণের মধ্যে দিয়ে প্রশ্নের উত্তর খোঁজে না পাঠক, সে জানতে চায় তার নির্ভেজাল কৌতূহলের সদুত্তর। মূল কাহিনির পাশাপাশি উপকাহিনিগুলিও এই কৌতূহল সঞ্চার করে পাঠকের মানসপটে। পরের যে প্রশ্নটি আপনার মনে হয়েছে, রচয়িতার কল্পনার বিন্যাস থমকে গিয়ে উপকাহিনির উৎসমুখ খুলে দেয়? একটু বলে নেওয়া ভালো, রচয়িতার কল্পনার বিন্যাস কখনও থমকে যায় না। আসলে, পাঠকের উত্তেজনা কিঞ্চিৎ প্রশমিত করতে অর্থাৎ একটু mental refreshment পাঠককে দেওয়াই রচয়িতার উদ্দেশ্য। সেই কারণেই তিনি জ্ঞাতসারে উপকাহিনির উৎসমুখ খুলে দেন। মূল কাহিনির চরিত্র ও কাহিনিকে আরও বেশি আকর্ষণীয় করে তুলতে কাহিনিকার উপকাহিনির শরণাপন্ন হন। পাঠকের হৃদয়বৃত্তিকে নাড়া দেয় উপকাহিনি। উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্রগুলির সম্যক পরিচয় দেওয়ার একটা উদ্দেশ্য নিয়েও উপকাহিনির গতি লক্ষ করা যায়। আবার কখনো কখনো লেখকের প্রিয় অপ্রধান চরিত্রগুলির প্রভাব কাটাতে না পেরে উপকাহিনির চলমানতা বজায় রাখেন লেখক।

৪.৪.১ 'কপালকুণ্ডলা'-র উপকাহিনির প্রয়োজনীয়তা

যে-কোনো উপন্যাসেই লেখকের জীবনদর্শনের একটি আভাস পাওয়া যায়। সেকথা তাঁর উপন্যাস-চিন্তার কথা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। ঔপন্যাসিক যে বিষয়কে কেন্দ্র করে তার উপন্যাসের প্লট নির্মাণ করছেন সেটা তাঁর বক্তব্যের প্রধান বিষয় হলেও, তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়ল উপকাহিনির। অর্থাৎ, উপকাহিনি একদিকে তাঁর নিজস্ব ভাবনাচিন্তা প্রকাশ ঘটাবে, অন্যদিকে মূল কাহিনিকে আরও বেশি শক্তিশালী ও আকর্ষণীয় করে তুলবে।

মূল বক্তব্যকে সামনে রেখে উপকাহিনির মধ্যে দিয়ে যদি লেখক মূল বক্তব্যানুসারী একটি ছোট কাহিনি নির্মাণ করেন, তাহলে দেখা যায় যে তা অনেক বেশি শক্তিশালী ও আবেদনময় হয়ে ওঠে। আবার মূল কাহিনির বিপরীতমুখী এক জীবনচিত্র যদি লেখক অঙ্কন করতে পারেন তবে তার গুরুত্ব অনেক বেড়ে যায়। অর্থাৎ দুই বিপরীত মেরুর কাহিনি লেখকের বক্তব্যকে অনেক বেশি জীবন্ত ও অনেক বেশি হৃদয়স্পর্শী করে তোলে।

উপরোক্ত আলোচনাটিকে আপনাদের সামনে প্রাঞ্জল করার লক্ষ্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি বহুল পঠিত ও প্রশংসিত উপন্যাস 'পুতুল নাচের ইতিকথা' নেওয়া হল। শশী-কুসুম কাহিনিকে সামনে রেখে উপন্যাসের কাহিনি গড়াতে গিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনে হয়েছে একটি জোরদার উপকাহিনি প্রয়োজন। মার্কসবাদী চিন্তাধারায় বিশ্বাসী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ঈশ্বর বিশ্বাস করতেন না। তাই দেখব, যামিনী কবিরাজকে মেরে ফেলতে হাত কাঁপবে না মানিকের। আবার নিয়তিকে অতিক্রম করতে পারেন নি তিনি। আর শশীকেও সেই নিয়তির কাছে পরাজিত হতে দেখব। কুসুম তাকে সারাজীবনের মতো ত্যাগ করে চলে যাবে।

শান্তি হল না মানিকের। কুসুমের অপরিষ্কার, নোংরা ননদ মতির মধ্যে প্রেমের সঞ্চার করলেন। কলকাতা থেকে ইংরেজি পড়া প্রিয় বন্ধু কুমুদকে ভোঁতা করে গাওদিয়ায় নিয়ে এসে বিয়ে দিলেন মতির সাথে। এখানেই শেষ করতে পারতেন তিনি। আদিখ্যেতা দেখিয়ে কলকাতায় পাঠিয়ে তাদের প্রেম-ভালবাসা-রাগ-অনুরাগের বিণ না বাজালেও পারতেন। আসলে শশীর ব্যর্থতা ও না পাওয়ার যন্ত্রণাগুলিকে অন্য একটা ছোট কাহিনির মধ্যে তুলে ধরে মূল বিষয়টিকেই জোরদার করেছেন। 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসের পাঠক মাত্রই এসকল কাহিনি অবগত আছেন।

মতি-কুমুদ উপকাহিনির মধ্যে দিয়ে পাঠকের কৌতূহলের ধারা যখন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে, তখন মানিক সুকৌশলে মতি-কুমুদকে ট্রেনে বসিয়ে মূল কাহিনি থেকে সরিয়ে ফেললেন মূল কাহিনির গুরুত্ব বজায় রাখতে।

৪.৪.২ উপকাহিনির সংখ্যা

উপকাহিনি লেখার কারণগুলি পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে, সেইদিক থেকে উপকাহিনিগুলির অভিনিবেশ ও সংখ্যা আমরা দেখার চেষ্টা করবো। উপন্যাসের কলেবর বৃদ্ধির উদ্দেশ্য নিয়ে ঔপন্যাসিক যে উপকাহিনির সঞ্চার করেছিলেন মূল কাহিনির মধ্যে সেকথা বলা বাহুল্য। উপন্যাসে দুটি মাত্র উপকাহিনি রয়েছে :

মতিবিবি বা লুৎফ-উন্নিসার কাহিনি

শ্যামাসুন্দরীর কাহিনি

এই দুটি উপকাহিনির মধ্যে মতিবিবি বা লুৎফ-উন্নিসার কাহিনিটি প্রধান। ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র নবকুমারের প্রথমাপত্নী পদ্মাবতীকে মতিবিবি সাজিয়ে পুনরায় উপন্যাসে ফিরিয়ে নিয়ে আসায় পাঠকের কৌতূহলও যে বৃদ্ধি পেয়েছে সে কথা অনস্বীকার্য। অপর আর শ্যামাসুন্দরী উপকাহিনি উপন্যাসের মধ্যে এনে গল্পের পরিণতি দান করেছেন। এখন আমরা আলোচনা মাধ্যমে দেখব এই দুটি উপকাহিনি ফুটিয়ে তোলার পেছনে বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্য কী ছিল।

প্রথমেই জেনে রাখা ভালো 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে মতিবিবির গল্প প্রধান উপকাহিনি হলেও পরিণতি দানের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয়ে পড়ে ছিল শ্যামাসুন্দরীর গল্প। এই শ্যামাসুন্দরীর গল্প, বঙ্কিমচন্দ্র যে শেষ পর্বে শোনাবেন তার একটা ইঙ্গিত প্রথমেই দিয়ে রেখেছিলেন। লক্ষ করার বিষয়, লেখকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠেছে কপালকুণ্ডলার জীবন বিন্যাসের ক্ষেত্রে। তিনি প্রথমেই জানিয়েছিলেন সমাজ-সংসার বিচ্ছিন্ন কোনো মেয়ে বিজনভূমিতে শৈশব কাটানোর পর যৌবনকালে সংসারী হতে চাইলে সে দাম্পত্যজীবনে সুখ আনতে পারে না, বা নিজেও সুখী হতে পারে না। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে বঙ্কিমচন্দ্র নবকুমারের প্রেম উপস্থাপন করলেও তা কোনোভাবেই আকর্ষণ করতে পারেনি কপালকুণ্ডলাকে। কিংবা শ্যামাসুন্দরীর চেষ্টা করলেও সংসারের প্রতি টান অনুভব করেনি কপালকুণ্ডলা। আর সেই কথা নিজের জীবন দিয়ে প্রমাণ করল কপালকুণ্ডলা।

উপকাহিনির কাজ হল মূল কাহিনিকে আরও বেশি উদ্দীপ্ত করা, আরও বেশি উজ্জ্বল করা। আর তা করতে গিয়েই মতিবিবির গল্প সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। একদিকে মতিবিবি সংসার জীবনে বড় হয়ে উঠেছে অন্যদিকে কপালকুণ্ডলা বড় হয়ে উঠেছে এক কাপালিকের কাছে নিঃসঙ্গ অবস্থায়। কপালকুণ্ডলার এই নিঃসঙ্গতাকে, সংসার-জীবন বিমুখতাকে আরও বেশি উজ্জ্বল করে ফুটিয়ে তুলতে মতিবিবির সংসার কেন্দ্রিকতাকে আলোকিত করে তুলে ধরেছেন। যে কারণে, নবকুমারকে আপন করে পেতে চেয়েছে মতিবিবি কপালকুণ্ডলার কাছ থেকে, নানা প্রকার উপঢৌকন, রত্ন, অট্টালিকা ইত্যাদি প্রদানের মাধ্যমে। সংসার জীবন যার কাছে আকর্ষণীয় নয়, তাকে সাংসারিক বস্তু তাকে আকৃষ্ট করতে পারে না। ফলত মতিবিবির ছলচাতুরির পরিপ্রেক্ষিতে কপালকুণ্ডলা সরলতা আরও বেশি প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে।

শ্যামাসুন্দরীর গল্পে বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্টতই দেখিয়ে দিয়েছেন কুলীন ব্রাহ্মণের বহু স্ত্রীর মধ্যে সে একজন। আর তার প্রতি স্বামীর বিশেষ ভালোবাসাও নেই। যে কারণে স্বামীর হৃদয় জয় করার জন্য সে নানা প্রকার চেষ্টা করেও যখন সফল হয়নি তখন সে ব্যবস্থা করেছে গুপ্তপন্থা। এই গুপ্তপন্থা বা টোটকার মাধ্যমে সে স্বামীকে বশ করতে চায়। সেই জন্য প্রয়োজনীয় ওষধিলতা বন থেকে খুঁজে আনার দায়ভার সঁপে দিয়েছে কপালকুণ্ডলার উপর। শ্যামাসুন্দরী স্বামীর মন পাওয়ার প্রচেষ্টা, দাম্পত্য জীবনে নিজেকে সঁপে দেওয়ার যে অঙ্গীকার, স্বামীর প্রতি ও

দাম্পত্য জীবনের প্রতি যে ভালোবাসা দেখা যায় তার উল্টো ছবি ধরা পড়ে কপালকুণ্ডলা চরিত্রে। সে সংসার জীবনের প্রতি নিরাসক্ত এবং উদাসীন। এই বৈপরীত্য তুলে এনে কপালকুণ্ডলাকে মূল কাহিনিতে প্রতিষ্ঠা করাই ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের লক্ষ্য।

শ্যামাসুন্দরী ও কপালকুণ্ডলার মধ্যেই এই সংসারকেন্দ্রিক বৈপরীত্য সীমাবদ্ধ থাকেনি, তা ছড়িয়েছে মতিবিবি ও কপালকুণ্ডলার মধ্যেও। একদিকে কপালকুণ্ডলা যখন স্বামী-সঙ্গ পেয়েও তার মূল্য বুঝতে পারছে না, অপরদিকে প্রচুর বৈভবপূর্ণ জীবন, বিলাসব্যসন ও আভিজাত্যের মধ্যে থেকেও মতিবিবি তার স্বামীকে কাছে পাওয়ার জন্য লালায়িত। একটা সময় যুবরাজ সেলিমের মোহ ত্যাগ করে সে সপ্তগ্রামে ফিরে এসেছে। কপালকুণ্ডলার বিরুদ্ধে জঘন্যতম ষড়যন্ত্রে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে, কাপালিককে সাহায্য করেছে, শুধুমাত্র তার স্বামী নবকুমারকে ফিরে পাওয়ার জন্য। নবকুমারকে সে ফিরে পাবে এবং দাম্পত্য জীবন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে— তার এই প্রত্যাশাই কপালকুণ্ডলার সংসার জীবনের প্রতি নিরাসক্ত ভাবকে আরও বেশি উজ্জ্বল করে তুলেছে। মূল কাহিনির গতি প্রদানে উপকাহিনি দুটি সার্থক এবং যথার্থ।

৪.৪.৩ উপকাহিনির বিষয়বস্তু

উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডে উপকাহিনির প্রধান চরিত্র মতিবিবিকে টেনে এনেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। মতিবিবি অতীতে হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান ছিল এবং তার নাম ছিল পদ্মাবতী। তীর্থক্ষেত্র থেকে ফেরার সময় একদল বিধর্মী মুসলমানের হাতে আক্রান্ত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয় এবং পদ্মাবতীর নতুন নাম হয় লুৎফ-উন্নিসা। ধর্মান্তরিত হওয়ার পর পতিগৃহে তাকে আর মেনে নেয়নি নবকুমারের পরিবার। এদিকে মুসলমান হওয়ার পর বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রূপ, সাহিত্য, নৃত্য ও সংগীত ইত্যাদি বিষয়ে পারদর্শী হয়ে ওঠে সে। লুৎফ-উন্নিসা বাইরে বেরুবার সময় 'মতিবিবি' নামটি গ্রহণ করত। পিতার পদোন্নতিতে আগ্রা স্থানান্তরিত হলে যুবরাজ সেলিমের সঙ্গে পরিচয় হয় তার। স্থান পায় রাজ অন্তঃপুরে। লেখক জানিয়েছেন, "সেলিমের চিত্তে তাঁহার প্রভুত্ব এইরূপ প্রতিযোগীশূন্য হইয়া উঠিল যে, লুৎফ-উন্নিসা একসময় তাঁহার পাটরানী হইবেন ইহা তাঁহার স্থির প্রতিজ্ঞা হইল।" প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে এরপর উঠে আসে খাজা আয়াসের কন্যা মেহের-উন্নিসা। এর সঙ্গে শের আফগানের বিয়ে হওয়ায় সেলিম সম্রাট হন। এরপর শের আফগানকে হত্যা করে মেহের-উন্নিসাকে বিয়ে করে দিল্লি নিয়ে আসেন। মেহের-উন্নিসার নতুন নাম হয় নূরজাহান। এটি ঐতিহাসিক কাহিনি। ঔপন্যাসিক এই কাহিনিকে এতদূর সম্প্রসারিত করেননি। তিনি মূলত মতিবিবি এবং মেহের-উন্নিসার প্রতিদ্বন্দ্বিতার ছবিটিকে তুলে ধরেছেন পাঠকের সামনে। আর এই প্রতিযোগিতায় মতিবিবি বা লুৎফ-উন্নিসার পরাজয় এবং দিল্লির সম্রাজ্ঞী হওয়ার বাসনা থেকে মুক্ত হওয়ার তথ্যটুকুই তুলে ধরেছেন।

উপন্যাসের আরেকটি উপকাহিনি শ্যামাসুন্দরীর কাহিনি। শ্যামাসুন্দরী নবকুমারের ছোট বোন। তার বিয়ে হলেও তার জীবন কাটে বিধবার মতোই। লেখক বলেছেন, "দ্বিতীয়া (বোন) শ্যামাসুন্দরীর সধবা হইয়াও বিধবা; কেন না, তিনি কুলীনপত্নী। তিনি দুই একবার আমাদের দেখা দিবেন।" অর্থাৎ শ্যামাসুন্দরী চরিত্রটির বিশেষ ভূমিকা যে নেই উপন্যাসে, তা প্রথমেই জানিয়ে দিয়েছেন ঔপন্যাসিক। কিন্তু উপন্যাসের একেবারে শেষের দিকে দেখতে পাওয়া যায় শ্যামাসুন্দরীই উপন্যাস কাহিনির সূচক বিন্দু হয়ে অবস্থান করছে। একটু বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাব, শ্যামাসুন্দরীর স্বামী আর কতদিন থাকবে সে প্রশ্নের উত্তরে শ্যামাসুন্দরী কপালকুণ্ডলাকে বলেছে—

(কপালকুণ্ডলার ঠাকুরজামাই অর্থাৎ শ্যামাসুন্দরীর স্বামী) কালি বিকালে চলিয়া যাইবে। আহা! আজি রাত্রে যদি

ওষধিটি তুলিয়া রাখিতাম, তবু তারে বশ করিয়া মনুষ্যজন্ম সার্থক করিতে পারিতাম। কালি রাত্রে বাহির হইয়াছিলাম বলিয়া নাথি ঝাঁটা খাইলাম, আর আজি বাহির হইব কি প্রকারে?

ঔপন্যাসিক আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন সে রাত্রে শ্যামাসুন্দরীর পক্ষে ওষধি সংগ্রহ করতে বনে যাওয়া সম্ভব নয় এবং শ্যামাসুন্দরী এই সামান্য কাজটি করতে কপালকুণ্ডলাকে পাঠিয়ে দিলেন বনে। কপালকুণ্ডলা বনে না গেলে পুরুষবেশী মতিবিবি ও কাপালিকের কথোপকথন শুনতে পেত না, নবকুমারের সন্দেহের চোখে পড়তে হত না এবং পরে রাত্রে পুরুষবেশী মতিবিবির আহ্বানে যেতে হত না। আর এত কিছু না হলে কপালকুণ্ডলার শেষ পরিণতি এমন বিয়োগান্তকমূলক হত না। লীলা মজুমদার যে কথা ("বন থেকে জানোয়ার তুলে আনা যায়, কিন্তু জানোয়ারের মন থেকে বন তুলে ফেলা যায় না") বলেছেন, সে বিশ্বাস বহু পূর্বেই মেনে নিয়ে ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তাই তিনি কপালকুণ্ডলাকে দিয়ে সমাজজীবনে ঘরকন্না করাতে পারেননি, আর তাই তাকে উপন্যাস থেকে সরিয়ে ফেলতে শ্যামাসুন্দরীর পতিকে বশ করার উপকাহিনি আনয়ণ করেছেন শেষাংশে।

৪.৫ 'কপালকুণ্ডলা'-র কাহিনিবৃত্ত নির্মাণ

'বৃত্তনির্মাণ' বা 'বৃত্তগঠন' শব্দটি ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Plot-construction' থেকে এসেছে। উপন্যাসের ক্ষেত্রে story বা কাহিনি এবং plot বা বৃত্ত দুটি বিষয় ধারণাগতভাবে একটু বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। ঔপন্যাসিক E M Forster তাঁর 'Aspects of the Novel' নামক বইতে প্লট ও বৃত্তের মধ্যে একটি পার্থক্য দেখিয়েছেন উদাহরণ দিয়ে। বলেছেন 'রাজা মারা গেলেন, তারপর রাণি মারা গেলেন' এটা হল কাহিনি। আর, 'রাজা মারা গেলেন, তারপর দুঃখে রাণিও মারা গেলেন' এটা হল বৃত্ত। অর্থাৎ গল্পের মধ্যে থাকে কয়েকটা ঘটনা আর প্রশ্ন। তারপর কী হল বা কী হবে, একটা সমান্তরাল প্রশ্ন। আর বৃত্তের মধ্যে থাকে একটা কার্যকারণ সম্পর্ক।

কোনো একটা গল্প বা উপন্যাস লিখতে গেলে ঔপন্যাসিক আগের থেকেই গল্পটির ছক কষে নেন। কীভাবে কাহিনির বুনোট বাঁধবেন, কীভাবে কাহিনি সাজাবেন, কার্যকারণ শৃঙ্খলা কীভাবে রক্ষিত হবে ইত্যাদি সমস্ত কিছুই এক কথায় কাহিনিবৃত্ত। কেবলমাত্র একটি কাহিনির উপর ভিত্তি করে যখন উপন্যাসের বৃত্ত রচনা হয়ে থাকে তখন আমরা তাকে যদি সরলবৃত্ত বলে থাকি, তবে যখন একাধিক কাহিনি বা উপকাহিনির কথা বর্ণনা হচ্ছে যে বৃত্তে তাকে আমরা বলব জটিলবৃত্ত। আর এমন কিছু উপন্যাস আছে যাদের কোনো একটি কাহিনিকে মূল কাহিনি বলে ধরে নেওয়া যায় না, তখন সেই প্রকার উপন্যাসের বৃত্তকে আমরা বলব যৌগিকবৃত্ত। এই প্রকার উপন্যাস হল 'শ্রীকান্ত'। আমাদের আলোচ্য কাহিনির বৃত্ত সরল নয়, জটিল প্রকৃতির। কেন জটিল প্রকৃতির সেকথা এখনি বললাম। 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের ক্ষেত্রে দেখব, নবকুমার ও কপালকুণ্ডলার সরলবৃত্তকে সর্বাঙ্গীন সুন্দর করতে মতিবিবি আর শ্যামাসুন্দরীর গল্প দিয়ে ঔপন্যাসিক কীভাবে জটিলবৃত্ত রচনা করেছেন।

এবার আসা যাক 'কপালকুণ্ডলা'-র গঠন প্রসঙ্গে। উপন্যাসটিকে বঙ্কিমচন্দ্র চারটি খণ্ডে বিন্যস্ত করেছেন। আর প্রত্যেকটি খণ্ড নির্মাণ করেছেন কিছু কিছু পরিচ্ছেদের সমন্বয়ে। প্রথম খণ্ড নয়টি পরিচ্ছেদ, দ্বিতীয় খণ্ডে ছ'টি পরিচ্ছেদ, তৃতীয় খণ্ডে সাতটি পরিচ্ছেদ এবং চতুর্থ খণ্ডে নয়টি পরিচ্ছেদ লক্ষ করা যায়। প্রথম খণ্ডে রয়েছে পথভ্রষ্ট নবকুমারের সঙ্গে কাপালিকের সাক্ষাৎ তার হাতে বন্দী হওয়া, তারপর কপালকুণ্ডলার সাহায্যে বিপদ মুক্ত হওয়া এবং শেষ পর্যন্ত অধিকারী পৌরোহিত্যে নবকুমার ও কপালকুণ্ডলা বিয়ে এবং মেদিনীপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার কথা। দ্বিতীয় খণ্ড দেখতে পাই নবকুমারের নিজ গ্রাম সপ্তগ্রামে ফিরে আসার পথে প্রথমা পত্নীর সঙ্গে দেখা হওয়া আর বাড়িতে কোনোরকম প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই কপালকুণ্ডলাকে নবকুমারের স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করার

কথা। তৃতীয় খণ্ড দেখতে পাই মতিবিবির আগমন এবং প্রতিপত্তির বর্ণনা, যুবরাজ সেলিমের সঙ্গে তার স্বপ্ন এবং শেষ পর্যন্ত মোহভঙ্গ হয়ে পুনরায় সপ্তগ্রামে প্রত্যাবর্তন। চতুর্থ খণ্ড দেখতে পাওয়া যায় কপালকুণ্ডলার বিরুদ্ধে কাপালিকের সঙ্গে চুড়ান্ত ষড়যন্ত্র, কপালকুণ্ডলাকে লোভ দেখানো, নবকুমারের বিনিময়ে বহুমূল্য রত্নসামগ্রী অট্টালিকা পাইয়ে দেওয়ার কথা আর শেষ পর্যন্ত কপালকুণ্ডলা এবং নবকুমারের অতল জলে তলিয়ে যাওয়ার ঘটনা।

উপন্যাসের মধ্য দিয়ে সর্বদাই উপন্যাসিকের একটা স্বতন্ত্র পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম পরিচ্ছেদে পথভ্রষ্ট নবকুমার ও তার সঙ্গী নৌকাযাত্রী একটি বালিয়াড়িতে উপস্থিত হয়। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে রান্নার কাঠের সন্ধানে কেউ নবকুমারের সাথে যেতে না চাওয়ায় শেষ পর্যন্ত নবকুমার কাঠের খোঁজে একাই যায়। এই ঘটনায় যাতে পাঠকের মনে সমাজের প্রতি কোনো বিরূপ ভাবনার উদ্রেক না হয়, সেজন্য ঔপন্যাসিক সৎ উপদেশ দিয়ে বলেছেন—

"ইহা শুনিয়া যদি কেহ প্রতিজ্ঞা করেন, কখনও পরের উপবাস নিবারণার্থ কাষ্ঠাহরণে যাইবেন না, তবে তিনি উপহাসাস্পদ। আত্মোপকারীকে বনবাসে বিসর্জন করা যাহাদিগের প্রকৃতি, তাহারা চিরকাল আত্মোপকারীকে বনবাস দিবে কিন্তু যতবার বনবাসিত করুক না কেন, পরের কাষ্ঠাহরণ করা যাহার স্বভাব, সে পুনর্বার পরের কাষ্ঠাহরণে যাইবে। তুমি অধম তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন?"

তৃতীয় পরিচ্ছেদে অসহায় নবকুমারের কষ্টের ছবির পাশাপাশি চতুর্থ পরিচ্ছেদে কাপালিকের সন্ধান এবং সঙ্গী পেয়ে খুশির ঝলক ধরা পড়েছে তার চোখে। পঞ্চম পরিচ্ছেদে কপালকুণ্ডলার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন ঔপন্যাসিক পাঠকদের সাথে এবং নবকুমারের সাথে। এই পরিচ্ছেদে সে যেমন নবকুমারকে কাপালিকের আস্তানা পর্যন্ত পথ দেখিয়েছে তেমনি ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে বন্দী নবকুমারকে বলিদান থেকে রক্ষা করে কাপালিকের বন্ধন থেকে মুক্ত করেছে। সপ্তম পরিচ্ছেদে কাপালিক উঁচু বালিয়াড়ি থেকে পড়ে আহত হয় এবং কর্মক্ষমতা হারায়। অষ্টম পরিচ্ছেদে নবকুমারকে বিয়ের প্রস্তাব দেয় অধিকারী। নবম পরিচ্ছেদে বিবাহ সম্পন্ন হয় নবকুমার ও কপালকুণ্ডলার। তারপর তাদের মেদিনীপুরে পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার কথা বলে অধিকারী।

নবকুমারের সাথে মতিবিবির সাক্ষাৎ করানোর উদ্দেশ্য নিয়েই কপালকুণ্ডলার পালকির সঙ্গে না পাঠিয়ে পদব্রজে কিছুটা পেছনে রেখে যাত্রা করানো হয়েছে নবকুমারকে। দ্বিতীয় খণ্ডে মতিবিবিকে নবকুমারের সঙ্গে দেখা করানো ইঙ্গিত প্রথম খণ্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদে দিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র। দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে মতিবিবি দুষ্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত হয়েছে। নবকুমার তাকে পৌঁছে দিয়েছে নিকটের চটিতে। এই পরিচ্ছেদে মতিবিবি তার স্বামীকে চিনতে পেরেছে কিন্তু নবকুমার চিনতে পারেনি। তৃতীয় পরিচ্ছেদে মতিবিবি কপালকুণ্ডলাকে দেখার পর তাকে নানাবিধ দামী অলঙ্কার সামগ্রী দিয়ে নিজের ঐশ্বর্য ও বৈভবকে বোঝাতে চেয়েছে। চতুর্থ পরিচ্ছেদে কপালকুণ্ডলা যে সাংসারিক রত্ন সামগ্রীর প্রতি বিন্দুমাত্র আকৃষ্ট নয় তা বোঝাতে সমগ্র অলঙ্কার দান করেছে ভিখারিকে। পঞ্চম পরিচ্ছেদে নবকুমার বাড়ি ফিরলে নববধূসহ নবকুমারকে আপন করে নিয়েছে বাড়ির লোকজন। আর ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে দেখানো হয়েছে কপালকুণ্ডলার প্রেমে নবকুমার আত্মহারা হলেও কপালকুণ্ডলার বিশেষ কোনো পরিবর্তন নেই সেই প্রেমকে উপলক্ষ করে, অথবা নবকুমারকে কেন্দ্র করে।

অদক্ষ ঔপন্যাসিক হলে হয়তো বারবার দেখানোর চেষ্টা করতেন সংসারের প্রতি মন টিকছে না কপালকুণ্ডলার, এই নিয়ে একটা দোলাচল অবস্থা। আর সেই ঘটনার পুনঃপুনঃ বর্ণনা দিয়ে পাঠকের রসভঞ্জন করতেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তা করেননি। তৃতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে দেখিয়েছেন সম্রাট সেলিমের অত্যন্ত প্রিয় নারী হওয়া সত্ত্বেও মতিবিবিকে কেন উড়িষ্যায় যেতে হয়েছিল এবং পথে নবকুমারের সঙ্গে তার সাক্ষাতের বিষয়টিও চমৎকারভাবে দেখিয়েছেন। রাজমহিষী হওয়ার ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে লড়াই দেখানো হয়েছে এই পরিচ্ছেদে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে আগ্রার সিংহাসনে মতিবিবির অধিকার কতখানি সুরক্ষিত রয়েছে তা যাচাই করার জন্য মতিবিবিকে নিয়ে আসা হয়েছে বর্ধমানে, শের আফগানের বেগম মেহের-উন্নিসার কাছে। সম্রাট সেলিমের রাজমহিষী হওয়ার সম্ভাবনা যে প্রায় অসম্ভব, সেই কথা চতুর্থ পরিচ্ছেদে সে জানতে পেরেছে সেলিমের সঙ্গে কথোপকথনকালে। পঞ্চম পরিচ্ছেদে বাধ্য হয়েই সিদ্ধান্ত নিয়েছে আগ্রা ছেড়ে আসার। আর আশাভঙ্গ হয়ে, ক্ষমতাচ্যুত হয়ে ভাগ্যদখলের লড়াই মেতে উঠেছে প্রতিহিংসার আগুন খেলায়। তার স্বামীকে যে কপালকুণ্ডলা পতি হিসেবে পেয়েছে তা কোনোভাবেই মানতে পারে নি মতিবিবি। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে দেখানো হয়েছে মতিবিবি নানাভাবে নবকুমারকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেছে নিজের প্রতি এবং নবকুমারকে জানিয়েছে সে-ই তার পূর্ব পত্নী পদ্মাবতী। আর সপ্তম পরিচ্ছেদে সে বাধ্য হয়ে কাপালিকের সঙ্গে মিলিত হয়ে আঁতাত রচনা করেছে কপালকুণ্ডলার বিরুদ্ধে।

কপালকুণ্ডলা চতুর্থ খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে শ্যামাসুন্দরীর সঙ্গে কথোপকথনকালে স্বামীকে বশ করার ওষধি জানতে পেরে তা ননদিনীর জন্য সংগ্রহ করতে গিয়ে ব্যর্থ হয় প্রথমবার। এই জন্য দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সেই বনলতা সংগ্রহ করতে গিয়ে কাপালিককে দেখতে পায় সে এবং কাপালিকের সঙ্গে পুরুষবেশী পদ্মাবতীর কথাবার্তা শুনতে পায়। তৃতীয় পরিচ্ছেদে কপালকুণ্ডলার কাছে পত্র এসেছে জঙ্গলে যাওয়ার জন্য। চতুর্থ পরিচ্ছেদে কপালকুণ্ডলার, হারানো পত্র কুড়িয়ে পেয়েছে পঞ্চম পরিচ্ছেদে নিজের বাড়িতে কাপালিককে ডেকে আনে নবকুমার। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে কাপালিক কপালকুণ্ডলার সম্পর্কে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে এবং নিজ হাতে প্রস্তুত করা মদ্যপান করিয়ে নবকুমারের বাহ্যিক জ্ঞান শূন্য করে দেয়। সপ্তম পরিচ্ছেদে পুরুষবেশী পদ্মাবতী ও কপালকুণ্ডলার অঙ্গুরি বিনিময় দেখে তাকে দ্বিচারিণী হিসেবে ঠাহর করে নবকুমার। অষ্টম পরিচ্ছেদে নবকুমারই কাপালিক কর্তৃক নির্দিষ্ট বধ্যভূমিতে নিয়ে যায় কপালকুণ্ডলাকে এবং নবম পরিচ্ছেদে পুরুষবেশী পদ্মাবতীর পরিচয় পেয়ে নবকুমারের নেশার ঘোর কেটে যায় ও ভুল বুঝতে পারে। কপালকুণ্ডলাকে আলিঙ্গন করতে গেলে নদীর পাড় ভেঙ্গে কপালকুণ্ডলা জলে পড়ে যায়। আর তাকে উদ্ধার করতে গিয়ে নবকুমার সঙ্গে সঙ্গে জলে ঝাঁপ দেয়। কিন্তু কেউই আর উঠে আসতে পারে না।

কাহিনির সর্বত্রই বঙ্কিমচন্দ্র ঘটনাগুলিকে এমনভাবে সজ্জিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করেছেন যাতে উপন্যাসের কাহিনিবৃত্ত নির্মাণ যথার্থ বলে মনে হয়েছে এবং উপকাহিনি ও তার প্রয়োগ বঙ্কিমচন্দ্র দক্ষ হাতে যথাস্থানে করেছেন এমন দাবি আমরা করতেই পারি।

৪.৬ 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের অতিপ্রাকৃত বা অলৌকিক উপাদান

বাংলা সাহিত্য উপন্যাসের পথিকৃৎ বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় বাস্তববাদের প্রাধান্য থাকবে এটাই স্বাভাবিক, কেননা প্রথম থেকেই তাঁর উপন্যাসের প্রধান লক্ষণ বাস্তবতা। আর সেই কারণেই অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত বিষয় তাঁর লেখায় থাকবে না এমন চিন্তা ভাবনা অযৌক্তিক নয়। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য লেখা যদি আপনারা পাঠ করে থাকেন সেক্ষেত্রে দেখবেন অতিপ্রাকৃত বা অলৌকিক ঘটনা, যেমন ভাগ্য গণনা, স্বপ্নদর্শন ইত্যাদির মত বিষয়গুলি তাঁর লেখায় রয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্বাস করতেন যে, পাঠকের বিনোদন দেওয়ার জন্য বা বাইরের চাকচিক্য বৃদ্ধি করার জন্য এই সব বিষয় উপন্যাসে এসে পড়ে। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা যায় বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে কাহিনির ভবিষ্যৎ নির্ধারণের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে কিছু কিছু অলৌকিক অতিপ্রাকৃত ঘটনা।

'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে এই অলৌকিকতার ছবি দু'বার নজরে এসেছে। প্রথমটি প্রথম খণ্ডের অষ্টম ও নবম পরিচ্ছেদে আর অন্যটি চতুর্থ খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদে। এই পরিচ্ছেদের কাহিনি এর আগে আলোচিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও বর্তমান আলোচনার সুবিধার জন্য উপরোক্ত দুটি উপকাহিনি আরও একবার উল্লেখ করা যেতে পারে।

কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে কাপালিকের হাত থেকে উদ্ধার করে তাকে সঙ্গে নিয়ে অধিকারীর কুটিরে এসে পৌঁছলে আশ্রয় দেয় অধিকারী। নবকুমারকে বিবাহ করে দেশান্তরী হয়ে যেতে কপালকুণ্ডলাকে পরামর্শ দিয়েছে অধিকারী। বিবাহ যে অন্যায় হবে না বা অসংগত হবে না তা বোঝাতে তিনি 'মানবাকারপরিমিতা করাল কালীমূর্ত্তির' কাছে পাঠিয়েছেন অধিকারীকে। অধিকারী 'পুষ্পপাত্র হইতে একটি অচ্ছিন্ন বিল্বপত্র লইয়া মন্ত্রপূত করিলেন, এবং তাহা প্রতিমার পাদোপরি সংস্থাপিত করিয়া তৎপ্রতি চাহিয়া রহিলেন।' আর সেই বিল্বপত্রটি মাটিতে পড়ে যায়নি বলেই তিনি সংকল্প করেছেন দেবী কালিকার সম্মতি আছে এই বিবাহে। নবম পরিচ্ছেদে দেখতে পাওয়া যায় নবকুমার যখন মেদিনীপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দেবে তার পূর্বে কপালকুণ্ডলা 'কালীপ্রণামার্থে গেলেন। ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া, পুষ্পপাত্র হইতে একটি অভিন্ন বিল্বপত্র প্রতিমার পাদোপরি স্থাপিত করিয়া তৎপ্রতি নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন। পত্রটি পড়িয়া গেল।' এই বিল্বপত্র পড়ে যাওয়া অশুভ বা অমঙ্গলের সূচনাবাহী। আর এই ঘটনা গভীরভাবে রেখাপাত করেছে কপালকুণ্ডলার মনে। কারণ সংস্কার, বিশ্বাস এবং ভক্তি তার অনেক বেশি মা কালীর উপর।

চতুর্থ খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছদে আর একটি অলৌকিক অতিপ্রাকৃত ঘটনার কথা রয়েছে। রাতে স্বপ্নে কপালকুণ্ডলা দেখল, নদীমধ্যে ঝড়ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ পরিবেশে 'একজন জটাজুটধারী প্রকাণ্ড পুরুষ আসিয়া কপালকুণ্ডলার নৌকা বাম হস্তে তুলিয়া সমুদ্রমধ্যে প্রেরণ করিতে উদ্যত হইল। এমত সময়ে সেই ভীমকান্তশ্রীময় ব্রাহ্মণবেশধারী আসিয়া তরী ধরিল।' কপালকুণ্ডলাকে রক্ষা করবে নাকি ডুবিয়ে দেবে জানতে চাইলে কপালকুণ্ডলা বলে "নিমগ্ন কর।" ব্রাহ্মণবেশী নৌকা ছেড়ে দিলে, নৌকাও পাতালে প্রবেশ করে। কপালকুণ্ডলার এই স্বপ্নের মধ্য দিয়ে একটা মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা লক্ষ করা যায়। কপালকুণ্ডলার সাংসারিক জীবন বা দাম্পত্য জীবন বিনষ্ট করার জন্য যে কাপালিক এসেছে সে কথা কপালকুণ্ডলা অবগত। ব্রাহ্মণবেশধারী যে-কোনো পুরুষ নয়, সে কথা শুনেছে কপালকুণ্ডলা। কাপালিকের সঙ্গে তাকে পরামর্শ করার সময় সে দেখেছে। তার সর্বনাশের জন্যই যে এসকল আলোচনা চলছে উভয়ের মধ্যে, সে কথা অনুমান করা তার পক্ষে অসম্ভব কিছু নয়। আর সেই কারণেই তার অবচেতন মনের চিন্তার বহিঃপ্রকাশ এই স্বপ্নটি।

৪.৭ উপন্যাসের কাহিনি ও বাস্তবতার মেলবন্ধন

কাহিনি সর্বদাই কাহিনি। তার মধ্যে লেখক বাস্তবতা মিশিয়ে দেন। এই উপন্যাসের শুরুতেই আমরা দেখতে পাই একদল নৌকার নাবিক যাত্রীদলসহ নদীতে দিকভ্রষ্ট হয়েছে। এটি বাস্তবসম্মত। তারপর যাত্রীদল নবকুমারকে রান্নার কাঠ আনতে বনে পাঠালেন। নবকুমারের দেরি দেখে বাকিরা নৌকাযাত্রা করে পলায়ন করল ক্লান্ত-শ্রান্ত নবকুমারকে ফেলে। একসময় সে সাক্ষাত পেল কাপালিকের। কাপালিক তাকে যত্নআত্তি করে রেখেছে আর ফন্দি এঁটেছে ভৈরবী পূজায় বলি দেবে। কিন্তু কপালকুণ্ডলার উপস্থিতি কাপালিকের কাজে বিঘ্ন ঘটায়। একাকী বনের মধ্যে পথভ্রষ্ট নবকুমারকে এক সুন্দরী যুবতী কাছে এসে বলেছে, "পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ?" নবকুমার একদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করে চলেছে তাকে। এই সিনেমাটিক সিক্যুয়েন্স বাস্তব জীবনে হয়তো কখনও কারোরই হয়নি। বিষয়টি যতখানি কল্পনা হোক না কেন, এই বিষয়টি নিয়ে লেখক যখন উপন্যাস রচনা করার প্রয়াস দেখিয়েছেন, তখন দেখতে হবে এই বিষয়টিকে বাস্তবমুখী করে তোলার জন্য বা পাঠকের কাছে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য কী কী চেষ্টা করেছেন তিনি। এখন আমরা সেই চেষ্টার ক্ষেত্রগুলি সন্ধান করব।

৪.৭.১ পরিচ্ছেদ শীর্ষক উদ্ধৃতির মাধ্যমে বাস্তবতার ইঙ্গিত

'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসটিতে চারটি খণ্ডে মোট একত্রিশটি পরিচ্ছেদ রয়েছে। প্রতিটি পরিচ্ছেদের শুরুতেই বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজি, সংস্কৃত, বাংলা ভাষার বিখ্যাত উক্তিসমূহ সংগ্রহ করে সংস্থাপন করেছেন। প্রতিটি পরিচ্ছেদের ঘটনার সঙ্গে ভাবগত মিল রয়েছে এমন উক্তি বা পংক্তি বিভিন্ন সাহিত্য থেকে খুঁজে খুঁজে তা পরিচ্ছেদ শুরুর আগে উল্লেখ করেছেন। এর দ্বারা শুধু যে তাঁর পাণ্ডিত্য ও রসবোধের প্রকাশ ঘটেছে তা নয়, উপন্যাস উপভোগ্য হওয়ার পাশাপাশি যে সমস্ত কাব্য, নাটক আমাদের হৃদয় অবস্থান করছে তাদের সঙ্গে ভাবগত মিলের মাধ্যমে উপন্যাসটি আরও বেশি গ্রহণযোগ্য হয়েছে এবং বৃদ্ধি পেয়েছে উপন্যাসটির বিশ্বাসযোগ্যতাও।

প্রথম খণ্ড :

- প্রথম পরিচ্ছেদ

'Floating straight obedient to the stream.'

শেক্সপিয়ারের 'কমেডি অব এররস' নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে Aegeon নামে syracuse-এর নাবিক ডিউককে তাঁর দুঃখের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে একথা বলেছিলেন। স্ত্রী-পুত্রসহ জাহাজে করে যাওয়ার সময় প্রবল ঝঞ্ঝাকবলিত হন। তিনি জাহাজের এক মাস্তুলের সঙ্গে নিজেকে বেঁধে রেখেছিলেন। স্রোতের মুখে তিনি অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। গঙ্গাসাগর থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় ঘন কুয়াশায় চারিদিক ঢেকে যাওয়ায় নবকুমারদের নৌকা দিক নির্ণয়ে ব্যর্থ হয়ে স্রোতের টানে ভেসে চলেছিল। 'কপালকুণ্ডলা'-র প্রথম খন্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনার সঙ্গে 'কমেডি অফ এররস'-এর উদ্ধৃত উক্তির ভাবসাদৃশ্যের কারণে উক্তিটি ব্যবহৃত।

- দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

'Ingratitudeæ Thou marble-hearted fiend!'

শেক্সপিয়রের 'King Lear' নাটকের প্রথম অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে King Lear তার জ্যেষ্ঠ জামাতা Albany-কে একথা বলেছিলেন। উক্তিটির অর্থ অকৃতজ্ঞ ব্যক্তির হৃদয় পাষাণের মতো। Lear-এর তিন কন্যা গনোরিল, রেগান এবং কর্ডেলিয়া। এই তিনজনের মধ্যে রাজত্ব ভাগ করে দেওয়ার আগে রাজা জানতে চেয়েছিলেন যে, তারা তাঁকে কতটা ভালোবাসে। গনোরিল ও রেগান জানিয়েছিল পিতৃপ্রেম এতই ব্যাপক যে তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু কর্ডেলিয়া বলেছিল যে পিতার প্রতি কন্যার যতটা কর্তব্য সে পিতাকে ততটাই ভালোবাসে। এই উত্তর শুনে Lear ক্ষুব্ধ হয়ে Cordelia-কে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেছিলেন। পরে তিনি বুঝতে পারেন যে, তিনি ভুল করেছেন। Albany ছিল Goneril-এর স্বামী। Goneril-এর কাছে থাকার সময় রাজা Albany-র দ্বারা অপমানিত হন। তখন তিনি জামাইকে উদ্দেশ্য করে একথা বলেছেন। নৌকারোহীদের জন্য নবকুমার কাষ্ঠসংগ্রহ করতে গিয়েছিলেন, অথচ সহযাত্রীরা তাঁকেই ফেলে রেখে চলে যান। তাই hou marble hearted friend" বাক্যটি এঁদের সম্পর্কেও প্রযোজ্য।

- তৃতীয় পরিচ্ছেদ

'Like a veil–
Which if withdrawn– would but disclose the frown
Of one who hates us– so the night was shown
And grimly darkled o"er their faces pale
And hopeless eyes.

লর্ড বায়রনের 'ডন জুয়ান' থেকে উক্তিটি উদ্ধৃত। ডন জুয়ান তাঁর সঙ্গিনীকে নিয়ে জাহাজে করে সমুদ্রের উপর দিয়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময় অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। এই অবস্থায় চতুর্দিক ভয়াল রূপ ধারণ করে। ডন জুয়ানের সঙ্গী থাকলেও 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের এই পরিচ্ছেদে নির্জন দ্বীপে ঘন অন্ধকারের মধ্যে নবকুমার কিন্তু একা।

- চতুর্থ পরিচ্ছেদ

'সবিস্ময়ে দেখিলা অদূরে
ভীষণ দর্শন মূর্তি।'

'মেঘনাদবধ কাব্যে'-র পঞ্চম সর্গ থেকে উদ্ধৃত। মেঘনাদকে বধ করার পূর্বে লক্ষণ চণ্ডীপূজা করার জন্য লঙ্কার উত্তর দ্বারের গভীর বনে স্বর্ণদেউলে উপনীত হয়েছিলেন। স্বয়ং মহাদেব সেই মন্দিরের দ্বার রক্ষা করে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁকে দেখে লক্ষণ বিস্ময়বোধ করেছিলেন। নির্জন সৈকতেভূমিতে ভীষণদর্শন কাপালিককে দেখে নবকুমারও লক্ষণের মতই বিস্মিত হয়েছিলেন।

- পঞ্চম পরিচ্ছেদ

'যোগপ্রভাবো ন চ লক্ষ্যতে তে।
বিভর্ষি চাকারমনির্বৃতানাং মৃণালিনী হৈমমিবোপরাগম।'

মহাকবি কালিদাস প্রণীত 'রঘুবংশম'-এর ষোড়শ সর্গের সপ্তম শ্লোক। রামচন্দ্রের স্বর্গারোহণের পর কুশ রাজা হন। রামচন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে অযোধ্যার সৌভাগ্য অস্তমিত হয়েছিল। অযোধ্যার রাজলক্ষ্মী তাই বিষণ্নমূর্তি ধারণ করেছিলেন। একদিন মধ্যরাত্রে কুশ তাঁর বদ্ধঘরে, স্তিমিত আলোকে অযোধ্যার বিষাদিনী রাজলক্ষ্মীকে দেখেছিলেন। অর্গলবদ্ধ গৃহে কীভাবে এই রমণী প্রবেশ করেছেন তা ভেবে বিস্মিত কুশ দেবীকে বলেছিলেন 'আপনার মধ্যে কোনো যোগপ্রভাব গোচর হচ্ছে না। কারণ আপনার আকৃতিতে রয়েছে দুঃখীজনের লক্ষণ। হিমের কারণে মৃণালিনীকে যেমন বিষন্ন ও ম্লান দেখায়, আপনাকেও সেইরকমই দেখাচ্ছে।' কপালকুণ্ডলাকে দেখে নবকুমারের মনে যে বিস্ময় হয়েছে তার সঙ্গে ভাবসাযুজ্য থাকার কারণেই এই উদ্ধৃতি।

- ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

'কথং নিগড়সংযতাসি। দ্রুতমনয়ামি ভবতীমিতঃ'

শ্রীহর্ষের 'রত্নাবলী' নাটকের চতুর্থ অঙ্কে রাজা উদয়ন একথা বলেছেন। রাজার প্রেমিকা সাগরিকা এক ব্যক্তির মায়াবলে বন্দিনী হয়েছিলেন। তখন সেখানে আগুন লাগে। তবে আগুনটি প্রকৃত নয়, তা ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। সাগরিকাকে এ অবস্থায় শৃঙ্খলিত দেখে রাজা বলেছিলেন'একি, তুমি নিগড়ে আবদ্ধ? আমি দ্রুত তোমাকে মুক্ত করছি।' কাপালিক নবকুমারকে বধ করার অভিপ্রায়ে লতাগুল্ম দিয়ে শক্ত করে বেঁধে রেখেছিলেন। কপালকুণ্ডলা খড়্গ দিয়ে সেই বন্ধন কেটে নবকুমারকে মুক্ত করেছিলেন। সেখানে উদয়ন উদ্ধার করে সাগরিকাকে আর এখানে কপালকুণ্ডলা উদ্ধার করেছে নবকুমারকে।

- সপ্তম পরিচ্ছেদ

'And the great lord of Luna
Fell at that deadly stroke;
As falls on Mount Alvernus
A thunder-smitten oak.'

মেকলে প্রণীত 'Lays of Ancient Rome' কাব্যগ্রন্থের Horatus থেকে উদ্ধৃত। কাপালিক নবকুমারকে অনুসন্ধান করতে গিয়ে বালিয়াড়ি শিখর থেকে নীচে পড়ে গিয়ে আহত হয়েছিলেন। এরই প্রাসঙ্গিকতায় উদ্ধৃত

উক্তিটি ব্যবহার করেছেন। লুনার শাসকদের সঙ্গে রোমানদের যুদ্ধের সময় রোমান সম্রাটের তীব্র আঘাতে লুনাশ্বর ভূতলে পতিত হয়েছিলেন। এই পতনের প্রসঙ্গকে কবি একটি উদাহরণের সাহায্যে তুলে ধরেছেন। বজ্রের আঘাতে একটি ওকগাছ যেমন সমূলে ভূতলে পতিত হয়। লুনার অধিপতিও সেভাবে ভূতলে পতিত হয়েছিল। এই পরিচ্ছেদে দেখতে পাওয়া গেছে বালিয়াড়ির উপর থেকে একইরকমভাবে কাপালিকের পতন ঘটেছে।

- অষ্টম পরিচ্ছেদ

'And that very night---
(Sall Romeo bear thee to Mantua.') (Romeo and Juliet)

শেক্সপিয়ার প্রণীত 'Romeo And Juliet' নাটকের চতুর্থ খণ্ডের প্রথম দৃশ্য থেকে অংশটি উদ্ধৃত। জুলিয়েট রোমিওকে ভালোবাসত। কিন্তু তাদের দুই পরিবারের মধ্যে ছিল বিরোধ। একটি সাধারণ অপরাধের জন্য রোমিওকে যখন Mantua-তে নির্বাসিত করা হয় তখন জুলিয়েটের ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্যারিস নামে এক যুবকের সঙ্গে তার বিবাহ স্থির হয়। এ থেকে নিস্তার লাভের জন্য জুলিয়েট Fair Lawrence নামে একজন পাদরীর শরণাপন্ন হয়েছিলেন। এই পাদরী রোমিও-জুলিয়েটের মিলনের বিষয়ে সহযোগিতা করেছিলেন। যদিও সেই প্রয়াস শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছিল। নবকুমার-কপালকুণ্ডলার বিবাহে অধিকারীর মধ্যস্থতার প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র রোমিও-জুলিয়েটের কাহিনিকে স্মরণ করেছেন। উদ্ধৃত অংশটির অর্থ ওই রাত্রেই রোমিও জুলিয়েটকে Mantua-তে নিয়ে যাবে। নবকুমারও পরদিন কপালকুণ্ডলাকে নিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করবে।

- নবম পরিচ্ছেদ

'কণ্ব। অলং রুদিতেন : স্থিরা ভব, ইতঃ পন্থানমালোকয়।' (শকুন্তলা)

মহাকবি কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম' নাটকের চতুর্থ খণ্ডের থেকে উদ্ধৃত অংশ গৃহীত হয়েছে। এটি কণ্বের উক্তি। পরিচিত পরিবেশ, স্নেহের বাঁধন ছিন্ন করে শকুন্তলা পতিগৃহে যাচ্ছিলেন। তাই তাঁর অশ্রু সজল হয়েছিল। এ অবস্থায় পথ চলায় বিপদের আশঙ্কা ছিল। তাই মহর্ষি কণ্ব শকুন্তলাকে বলেছিলেন 'ক্রন্দন করে কোন লাভ নেই, স্থির হও, এদিকে পথ দেখে চল।' এই পরিচ্ছেদেও দেখা যায় "কপালকুণ্ডলাও কাঁদিতে কাঁদিতে চলিল।'

দ্বিতীয় খণ্ড :

- প্রথম পরিচ্ছেদ

Therenow lean on me--
Place your foot here' (Manfred)

লর্ড বায়রনের 'Manfred' নাটক থেকে অংশটি গৃহীত হয়েছে। Hunter Chamois নামে এক ব্যক্তি ওই উক্তি করেছিল। পর্বতপ্রান্ত থেকে পতনোন্মুখ Manfred-কে বাঁচাবার জন্য শিকারী Chamois বলেছিলেন 'আপনি আমার দেহের উপর ভর করুন, এখানে পা রাখুন আর আপনার হাতটা আমার হাতে স্থাপন করুন; কোমরবন্ধটি শক্ত করে ধরুন, এগিয়ে আসুন শীঘ্রই। আমরা দাঁড়াবার মত একটা ভালো জায়গা পাব।' সংকটাপন্ন মতিবিবিকে নবকুমার তাঁর কাঁধে ভর দিয়ে চটিতে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিল। এই ভাবগত ঐক্যের পরিপ্রেক্ষিতে এই উক্তি।

- দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কৈষা ঘেষিৎ প্রকৃতিচপলা' (উদ্ধবদূত)

'উদ্ধবদূত' গ্রন্থের পঞ্চমশ্লোকে কোনো এক গোপিনীর ভাষ্যে কবি এই প্রশ্ন করেছিলেন 'কে এই স্বভাবচপল

রমণী?' মতিবিবির সঙ্গে নবকুমারের পরিচয়ের সময় মতিবিবি যে আচরণ করেছেন তাতে তাঁর স্বভাবচপলতাই প্রকাশ পেয়েছে। এদিক থেকে উদ্ধৃতিটি প্রাসঙ্গিক হয়েছে।

- তৃতীয় পরিচ্ছেদ

'—ধর দেবি মোহন মুরতি
দেহ আজ্ঞা, সাজাই ও বরবপু আনি
নানা আভরণ!' (মেঘনাদ বধ)

'মেঘনাদবধ' কাব্যের দ্বিতীয় সর্গ থেকে অংশটি উদ্ধৃত। কপালকুণ্ডলার সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বে মতিবিবি বহু অলঙ্কারে সুসজ্জিত হয়েছিলেন। মেঘনাদবধকাব্যের দ্বিতীয় সর্গে দেখা যা ধ্যানমগ্ন শিবের কাছ থেকে ইন্দ্রজিৎ নিধনের উপায় জানার জন্য পার্বতী স্বামীর সঙ্গে মিলিত হতে গিয়েছিলেন। এসময় রতিদেবী তাকে বলেছিলেন 'দেবী আমাকে অনুমতি দিন, আমি আপনার সুন্দর দেহকে নানা আভরণে সুসজ্জিত করি।' এই পরিচ্ছেদে দেখতে পাব, মতিবিবিও কপালকুণ্ডলাকে নিজের অলঙ্কার দিয়ে সাজিয়ে তুলবে।

- চতুর্থ পরিচ্ছেদ

'—খুলিনু সত্বরে,
কঙ্কণ, বলয়, হার, সীঁথি, কণ্ঠমালা,
কুণ্ডল, নূপুর, কাঞ্চি।' (মেঘনাদ বধ)

'মেঘনাদবধ' কাব্যের চতুর্থ সর্গে সীতা সরমাকে একথা বলেছিলেন। পঞ্চবটী বনের স্মৃতিবর্ণনা প্রসঙ্গে উদ্ধৃত অভিমত প্রকাশ করেছেন। যোগীবেশধারী রাবণ যখন সীতাকে হরণ করে তখন সীতা নিরূপায় হয়ে নিজের অলঙ্কারসমূহকে পথে পথে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। এই অলঙ্কারের সহায়তায় তিনি রামচন্দ্রের কাছে পথের ইঙ্গিত দিতে চেয়েছেন। এছাড়াও আরও একটি ভাবনা কাজ করছিল তাঁর মধ্যে—যেখানে পতি নারীর সবচেয়ে বড় অলঙ্কার সেখানে জাগতিক বস্তু সকল তুচ্ছ। কপালকুণ্ডলার কাছে পতি পরম ধন না হলেও জাগতিক বস্তু সকলের প্রতি যে তার কোনো লোভ নেই, সেটা দেখানও একটা উদ্দেশ্য ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের। তাই চতুর্থ পরিচ্ছেদে দেখা যায় শিবিকায় অবস্থানকারী কপালকুণ্ডলা অঙ্গের অলঙ্কারগুলি ভিক্ষুককে খুলে দিয়েছিল।

- পঞ্চম পরিচ্ছেদ

'শব্দাখ্যেয়ং যদপি কিল তে যঃ সখীনাং পুরস্তাৎ।
কর্ণে লোলঃ কথয়িতুমভূদাননস্পর্শলোভাৎ।।' (মেঘদূত)

মহাকবি কালিদাস 'মেঘদূত' কাব্যের ১০৫ সংখ্যক শ্লোকে যক্ষ এই উক্তি করেছেন। যে কথা সখীদের সামনে সোচ্চারে বলা যায়, লোভাতুর ব্যক্তি পরশের লালসায় সে কথাকেও কানে কানে বলতে চায়। আলোচ্য পরিচ্ছেদে মূল প্রসঙ্গ কপালকুণ্ডলার প্রতি নবকুমারের লালসা সে বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রেখেই আলোচ্য শ্লোকটিতে সংকলিত করা হয়েছে।

- ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

'কিমিত্যপাস্যাভরণানি যৌবনে
ধৃতং ত্বয়া বার্ধকশোভিত বল্কলম
বদ প্রদোষে স্ফুটচন্দ্রতারকা
বিভাবরী যদ্যরুণায় কল্পতে।।' (কুমারসম্ভব)

'কুমারসম্ভব'-এর পঞ্চম স্বর্গের ৪৪ সংখ্যক শ্লোক। ব্রহ্মচারীবেশী মহাদেব তপশ্চারিণী পার্বতীকে একথা বলেছিলেন। মহাদেব পার্বতীকে বলেছিলেন, 'যৌবনে সকল আবরণ পরিত্যাগ করে বার্ধক্যের বল্কল ধারণ করেছ কেন? সন্ধ্যায় চন্দ্রনক্ষত্রখচিত রাত্রের সামনে যদি অরুণ আলো প্রকাশ পায় তাহলে কেমন লাগবে।' পার্বতী যেমন যৌবনে তপশ্চর্যার কারণে যোগিনীবেশ ধারণ করেছেন, কপালকুণ্ডলাও তেমনি গৃহবধূরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েও যোগিনীর মতই আচরণ করে চলেছেন, যা স্বাভাবিক নয়।

তৃতীয় খণ্ড :

- প্রথম পরিচ্ছেদ

'কষ্টোহয়ং খলু ভৃত্যভাবং।' (রত্নাবলী)

শ্রীহর্ষ রচিত 'রত্নাবলী' নাটকের প্রথম অঙ্কে বৎস দেশের রাজা উদয়নের মন্ত্রী সৌগন্ধনারায়ণ এই উক্তি করেছেন। সৌগন্ধনারায়ণ মন্ত্রী হলেও রাজার ইচ্ছানুসারে চলতে হয়। এজন্য অনেকসময় নিজের ইচ্ছা-বিরুদ্ধ কাজও করতে হয়। এই পরিস্থিতিতে তিনি বলেছিলেন, ভৃত্যভাব তাঁর কাছে বড়ই বেদনাদায়ক। লুৎফ-উন্নিসা সেলিমের উপর প্রবল প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হলেও বুঝেছিলেন যে মেহের-উন্নিসাই সেলিমের হৃদয়েশ্বরী। তাকে মেহের-উন্নিসার অধীনেই থাকতে হবে। লুৎফ-উন্নিসার কাছেও এই ভৃত্যভাব বড় বেদনাদায়ক।

- দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

'যে মাটিতে পড়ে লোকে উঠে তাই ধরে।
বারেক নিরাশ হয়ে কে কোথায় মরে।।
তুফানে পতিত কিন্তু ছাড়িব না হাল
আজিকে বিফলা হলো, হতে পারে কাল।।' (নবীন তপস্বিনী)

দীনবন্ধু মিত্র রচিত 'নবীন তপস্বিনী' নাটক থেকে উদ্ধৃত অংশটি গ্রহণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে রাজমন্ত্রী জলন্ধর একথা বলেছেন। বক্তা বোঝাতে চেয়েছেন যে, কোনো কাজে মানুষের নিরাশ হওয়া অনুচিত। মানুষ যে মাটিতে পড়ে সে মাটিকে আশ্রয় করেই উঠে দাঁড়ায়। তুফান দেখে কেউ নৌকার হাল ছাড়ে না। কাজেই আজকে বিফল হলে কী হবে, ভবিষ্যতে সফল হওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যায়। লুৎফ-উন্নিসার পাটরানী হওয়ার স্বপ্ন বিফল হয়েছে। সেলিমকে সিংহাসনচ্যুত করার ষড়যন্ত্র বিফল হয়েছে। তবুও তিনি আশা ছাড়েননি। 'নবীন তপস্বিনী'-র জলন্ধর মালতীকে পাওয়ার জন্য নূতন আশায় বুক বেঁধেছিল। লুৎফ-উন্নিসাও সেলিমকে পাওয়ার জন্য নূতন করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন।

- তৃতীয় পরিচ্ছেদ

'শ্যামাদন্যো নহি নহি প্রাণনাথ মমাস্তি।' (উদ্ধবদূত)

শ্রীরাধিকার উক্তি। 'উদ্ভবদূত' থেকে অংশটি গৃহীত। শ্রীমতি রাধিকা কৃষ্ণপ্রেরিত দূত উদ্ধবকে বলেছিলেন যে, তিনি শ্যাম ছাড়া অন্য কাউকে প্রাণপ্রিয়রূপে জানেন না। আলোচ্য পরিচ্ছেদে সেলিমের প্রতি মেহের-উন্নিসার প্রণয়াকর্ষনের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। শের আফগানের স্ত্রী হলেও সেলিমই ছিলেন মেহের-উন্নিসার কাম্য ব্যক্তি।

- চতুর্থ পরিচ্ছেদ

'পত্নীভাবে আর তুমি ভেবো না আমারে।' (বীরাঙ্গনা কাব্য)

মধুসূদন দত্ত প্রণীত 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের 'শান্তনুর প্রতি জাহ্নবীর পত্র' (নবম সর্গ) অংশ থেকে উদ্ধৃত হয়েছে।

বশিষ্ঠর অভিশাপে শাপভ্রষ্ট অষ্টবসুর অনুরোধে তাঁদের গর্ভে ধারণের অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়ে জাহ্নবী দেবী মর্তে আগমন করেন এবং রাজা শান্তনুর পত্নিতে পরিণত হন। বিবাহের সময় শর্ত ছিল, জাহ্নবীর কোনো কাজে রাজা প্রতিবাদ করলে তিনি পত্নীর সম্পর্ক ত্যাগ করে চলে যাবেন। বিবাহের পরে শান্তনুর সাতটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। জাহ্নবী তাদের সকলকে জলে ভাসিয়ে দেন। অষ্টম পুত্র ভীষ্মকে জলে ভাসাতে গেলে শান্তনু প্রতিবাদ করেন। এর ফলে শর্ত ভঙ্গ হয়। তখন জাহ্নবী তাঁকে ছেড়ে চলে যান এবং যাওয়ার পূর্বে বলেছিলেন 'পত্নীভাবে আর তুমি ভেবো না আমারে।' মতিবিবিও এককালে যুবরাজ সেলিমের অনুরাগ-ধন্য হয়ে রাজ-অন্তঃপুরে অবস্থান করেছিল। মেহের-উন্নিসার আগমন-সম্ভাবনায় সে সেলিমকে ত্যাগ করার সংকল্প গ্রহণ করেছে।

- পঞ্চম পরিচ্ছেদ

'জনম অবধি হম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুননু শ্রুতিপথে পরশ না গেল।।
কত মধুযামিনী রভসে গোঁয়ায়নু না বুঝনু কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়া জুড়ান না গেল।।
যত যত রসিক জন রসে অনুগমন অনুভব কাহু না পেখ।
বিদ্যাপতি কহে প্রাণ জুড়াইতে লাখে না মিলিল এক।।' (বিদ্যপতি)

বিদ্যাপতি (মতান্তরে কবিবল্লভ) রচিত একটি বৈষ্ণব পদ। কৃষ্ণের প্রতি তাঁর প্রণয়াকর্ষণের কথা বলতে গিয়ে শ্রীমতী রাধিকা এই কথা বলেছিলেন। তিনি আজন্ম কৃষ্ণের রূপ দেখেছেন। তাঁর মধুর কথা শুনেছেন। তবুও তাঁর প্রেমতৃষ্ণা নিবৃত্ত হয়নি। কৃষ্ণের সঙ্গে অসংখ্য মধুযামিনী অতিবাহিত করেও তিনি হৃদয়কে তৃপ্ত করতে পারেননি। এই অংশে রাধার প্রেমের একাগ্রতা অভিব্যক্ত হয়েছে। এই প্রসঙ্গটি মতিবিবির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। নবকুমারের সঙ্গে সাক্ষাতের পর মতিবিবির হৃদয়ে তীব্র প্রেমানুভূতির সৃষ্টি হয়েছে। এই আকর্ষণ বর্ণনা করতে গিয়ে লেখক শ্রীমতী রাধিকার কৃষ্ণানুরাগের প্রসঙ্গটি স্মরণ করেছেন।

- ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

'কায় মনঃ প্রাণ আমি সঁপিব তোমারে
ভুঞ্জ আসি রাজভোগ দাসীর আলয়ে।।' (বীরঙ্গনা কাব্য)

বীরাঙ্গনা কাব্যের 'লক্ষণের প্রতি শূর্পণখা' (পঞ্চম সর্গ) থেকে গৃহীত। লক্ষণের প্রতি প্রণয় নিবেদন করতে গিয়ে শূর্পণখা একথা বলেছেন। বনবাসের সময় লক্ষণ কঠোর এবং কষ্টকর জীবনযাপন করেছিলেন। লক্ষণের এই কষ্ট দেখে শূর্পণখা তাঁকে নিজ আলয়ে এনে রাজভোগের মধ্যে রেখে দাসী হিসেবে সেবা করতে চেয়েছে। উদ্ধৃত অংশে শূর্পণখার এই মানসিকতাই ব্যক্ত হয়েছে। নবকুমারের প্রতি মতিবিবির মানসিকতাটিও ছিল অনুরূপ। তিনি নবকুমারকে প্রভূত ধনরত্ন দিতে চেয়েছে আর দাসী হিসেবে তার সেবা শুশ্রূষা করতে চেয়েছে।

- সপ্তম পরিচ্ছেদ

'–I am settled, and bend up
Each corporal agent to this terrible feat.' (Macbeth)

'Macbeth' নাটকের প্রথম অঙ্কের সপ্তম দৃশ্য থেকে উদ্ধৃত অংশটি গৃহীত হয়েছে। ম্যাকবেথ ছিলেন স্কটল্যান্ডের রাজা ডানকানের সেনাপতি। কিন্তু তিনি নিজেই রাজা হবার স্বপ্ন দেখেছিলেন। একদিন রাজা ম্যাকবেথের আতিথ্য গ্রহণ করেন। নিদ্রিত রাজাকে হত্যা করার জন্য লেডি ম্যাকবেথকে প্ররোচিত করেন। একসময় লেডি

ম্যাকবেথ দ্বিধা কাটিয়ে উঠে দৃঢ়চিত্তে রাজাকে হত্যা করতে প্রবৃত্ত হন। আলোচ্য উদ্ধৃতি সেই প্রসঙ্গকে নির্দেশ করেছে। বিবরণটি মতিবিবি সম্পর্কেও প্রযোজ্য। মতিবিবিও তাঁর প্রাথমিক সংশয় কাটিয়ে শেষপর্যন্ত কপালকুণ্ডলার সঙ্গে নবকুমারের বিচ্ছেদসাধনে দৃঢ়সংকল্প হয়েছিল।

চতুর্থ খণ্ড :

- প্রথম পরিচ্ছেদ

'রাধিকার বেড়ী ভাঙ্গ, এ মম মিনতি।' (ব্রজাঙ্গনা কাব্য)

উদ্ধৃত অংশটি মধুসূদন দত্ত প্রণীত 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'-র 'সারিকা' শীর্ষক কবিতার অংশ। সারিকা পিঞ্জরে আবদ্ধ তাই চঞ্চল। সারিকা অনুরোধ করেছে তাকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য, যাতে সে বনমধ্যে শুক পাখির সঙ্গে মিলিত হতে পারে। রাধা সখীকে অনুরোধ করেছেন তাকে যেন ছেড়ে দেওয়া হয়। রাধিকাও তেমনি বজ্রপুরীতে সমাজশৃঙ্খলে আবদ্ধ অথচ প্রেমদাহ নির্বাপিত করার জন্য তিনি ব্যাকুল। তাই অনুরোধ তার এই বেড়ি ভেঙে দিয়ে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের পথ যেন সুগম করা হয়। কপালকুণ্ডলা অরণ্যে প্রতিপালিত। সমাজের বন্ধনে সেও অস্থির। রাধিকার বেড়ি ভাঙার আকুলতা কপালকুণ্ডলার সম্পর্কেও প্রযোজ্য।

- দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

'–Tender is the night–
And haply the Queen moon is on her throne,
Clustered around by all her starry fays;
But here there is no Light.' (Keats)

John Keats-এর 'Ode to a Nightingale' থেকে উদ্ধৃত অংশটি গৃহীত হয়েছে। রোমান্টিক কবি বাস্তবের যন্ত্রণাময় পরিস্থিতি থেকে মুক্তি লাভে আগ্রহী। তাই কবি উপনীত হয়েছেন Nightingale-এর কুঞ্জে। সেখানে যৌবন অকালে ঝরে যায় না, প্রেম সেখানে চিরস্থায়ী। কবি কল্পনার চোখে দেখেছেন, আকাশে পূর্ণ জ্যোস্নালোকে এই মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। চন্দ্রমার রানী তাঁর সখীপরীদের সঙ্গে আকাশ পরিক্রমা করছেন; কিন্তু কুঞ্জবন অন্ধকার, সেখানে আলো নেই, চন্দ্রকিরণও প্রবেশ করতে পারছে না। কপালকুণ্ডলা যখন ওষধির সন্ধানে প্রবেশ করেছে তখন আকাশে চাঁদের আলো অথচ বনমধ্যে অন্ধকার। এই পরিবেশের কথা স্মরণ রেখেই বঙ্কিমচন্দ্র Keats-এর কবিতাটি উদ্ধৃত করেছেন।

- তৃতীয় পরিচ্ছেদ

'I had a dream– which was not all a dream.' (Byron)

Byron রচিত 'Darkness' নামক কবিতার অংশ। স্বপ্নের মধ্যে নিজের চরিত্র ও মানসিকতা দর্শন করে বিস্মিত কবি বলেছেন যে স্বপ্ন সর্বদা অলীক নয়, তার মধ্যে আত্মপ্রক্ষেপ ঘটে থাকে। কাপালিক এবং মতিবিবির কথোপকথন শোনার পর কপালকুণ্ডলা জীবনের স্বপ্ন দেখেছিল। এই স্বপ্ন কপালকুণ্ডলার ভবিতব্যকে নির্দেশ করেছে। এদিক থেকে বায়রনের 'Darkness' কবিতার স্বপ্নসম্পর্কিত অভিমতটির সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

- চতুর্থ পরিচ্ছেদ

'–I will have grounds
More relative than this.' (Hamlet)

শেক্সপিয়ার প্রণীত 'Hamlet' নাটকের অংশ। দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে হ্যামলেট একথা বলেছেন। হ্যামলেটের

পিতা হ্যামলেটের পিতৃব্য কর্তৃক নিহত হয়েছিলেন। এ সম্পর্কে হ্যামলেটের মনে কিছুটা সংশয় ছিল। সেই সংশয় নিবারণের জন্য কিছু প্রমাণ সংগ্রহ করা ছিল আবশ্যিক। উদ্ধৃত উক্তিতে সেই দিকটি নির্দেশিত রয়েছে। ছদ্মবেশী পদ্মাবতীর সঙ্গে সাক্ষাতের অভিপ্রায়ে যাত্রার সময় কপালকুণ্ডলার মনের মধ্যেও ছিল দ্বিধা ও সংশয়। ব্রাহ্মণবেশী পদ্মাবতীকে কপালকুণ্ডলা কাপালিকের সহযোগী বলেই মনে করেছিল। অথচ স্বপ্নে দেখেছে ব্রাহ্মণবেশী মতিবিবি তাকে বাঁচাতে আগ্রহী এ অবস্থায় কপালকুণ্ডলার মনেও দ্বিধা এবং সংশয় কার্যকর হয়েছিল।

- পঞ্চম পরিচ্ছেদ

'Stand you awhile apart,
Confine yourself but in a patient list.' (Othello)

শেক্সপিয়ারের 'Othello' নাটকের একটি অংশ। বক্তা ইয়াগো, ক্যাসিও এবং সুন্দরী দেসডিমোনা সম্পর্কে মিথ্যা প্রণয়কাহিনি বর্ণনা করে ওথেলোর মনে সন্দেহ জাগ্রত করে। শুধু তাই নয়, ইয়াগো সুকৌশলে ক্যাসিওর সঙ্গে দেসডিমোনার মিলনের সুযোগ তৈরি করে দেয় এবং দূর থেকে ওথেলোকে সে দৃশ্য দেখিয়ে নিজের অভিমতের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রমাণ করতে চেয়েছিল। এই পরিচ্ছেদেও একই ঘটনা দেখা যায়। ব্রাহ্মণ যুবকের ছদ্মবেশধারী মতিবিবির সঙ্গে কপালকুণ্ডলার সাক্ষাতের ঘটনাকে দূর থেকে দেখিয়ে কাপালিক নবকুমারের মনে কপালকুণ্ডলা সম্পর্কে সন্দেহ জাগিয়ে তুলেছিল।

- ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

'তদগচ্ছ সিদ্ধ্যৈ কুরু দেবকার্য্যম' (কুমারসম্ভব)

'কুমারসম্ভব' কাব্যের দ্বিতীয় সর্গের ১৮ সংখ্যক শ্লোক। উদ্ধৃত অংশটির বক্তা দেবরাজ ইন্দ্র। মহাদেবের ধ্যানভঙ্গের জন্য যখন কামদেব যাত্রা করেছিলেন তখন দেবরাজ ইন্দ্র বলেছিলেন 'তাহলে তুমি সিদ্ধিলাভের জন্য অগ্রসর হও, দেবকার্য সাধন কর'। কাপালিকের নির্দেশে কপালকুণ্ডলাকে বধ করে নবকুমারও একই ভাবে দেবতার ইচ্ছাপূরণ করবে এটাই কাপালিকের বিশ্বাস। আলোচ্য পরিচ্ছেদে এই প্রসঙ্গই বর্ণিত হয়েছে।

- সপ্তম পরিচ্ছেদ

'Be at peace— it is your sister that addresses you. Requite
Lucretia's love.' (Lucretia)

লর্ড লিটন প্রণীত 'Lucretia or the Children of Night' উপন্যাসের অংশ। লুক্রেশিয়ার বোন সুসান মেইনওয়ার্নিং নামে এক যুবকের উদ্দেশ্যে একথা বলেছিল, লুক্রেশিয়া মেইনওয়ার্নিংকে ভালোবাসত। মেইনওয়ার্নিং আকৃষ্ট হয়েছিল সুসানের প্রতি একথা বুঝতে পেরে সুসান মেইনওয়ার্নিংকে বলেছিল সে যেন লুক্রেশিয়াকেই ভালোবাসে। উক্তিটি এইরূপ

"Be at peace— it is your sister that addresses you. Requite Lucretiaós love it is deep and strong— give her as she gives to you a whole heart— and in your happiness, I your sister- sister to both I shall be blest."

মতিবিবিও অনুরূপভাবে কপালকুণ্ডলাকে অনুরোধ করেছিল, কপালকুণ্ডলা যেন তাঁর সুখের জন্য নবকুমারের জীবন থেকে সরে যায়।

- অষ্টম পরিচ্ছেদ

'No spectre greets me—no vain shadow this.' (Wordsworth)

ওয়ার্ডওয়ার্থ প্রণীত 'Laodamia' কবিতার অংশ, Laodamia-র স্বামী ট্রয়যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন। তখন

শোকাচ্ছন্ন Laodamia একথা বলেছিলেন "No spectre greets me— no vain shadow this– come blooming Hero– place thee by my side." স্বামীর মৃত্যুতে Laodamia-র শোকে দেবতারাও ব্যথিত হয়েছিল। দেবতা Jove– Laodamia-র স্বামীকে সশরীরে পত্নীর কাছে উপস্থিত হওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু শোকাহত পত্নী তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে এই উক্তি করেছেন। যার অর্থ তার শরীর অলীক ছায়া শরীর নয়, তা মানবীদেহ, তা কোন অশরীরী বাণী নয়। কপালকুণ্ডলা উর্ধ্ব আকাশে নবনীরদবিম্বিত মূর্তি দেখেছিলেন। তিনি এই মূর্তিতে অলৌকিক বা মায়ামূর্তি বলে মনে করেননি।

- নবম পরিচ্ছেদ

'বপুষা করণোজঝিতেন সা নিপতন্তী পতিমপ্যপাতয়ৎ।
ননু তৈলনিকেষবিন্দুনা সহ দীপ্তার্চরুপৈতি মেদিনীম।' (রঘুবংশ)

রঘুবংশ কাব্যের অষ্টম সর্গের ৩৮ সংখ্যক শ্লোক। রাজা অজের পত্নীর দেহ থেকে চেতনা লুপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মহারাজ অজ ভূতলে পতিত হয়েছিলেন। কবির মতে এটাই হওয়ার কথা। কারণ প্রজ্জ্বলিত দীপশিখা থেকে কিছু পরিমাণ তেল ক্ষরিত হলে জ্বলন্ত শিখার কিছু অংশ ভূতলে পড়ে। কপালকুণ্ডলা গঙ্গাতীরের ভূমি থেকে নদীগর্ভে পতিত হয়েছিল। নবকুমারও কপালকুণ্ডলার সঙ্গে ঝাঁপ দিয়েছিল। পত্নীর প্রাণহীনদেহের সঙ্গে অজের ভূমিতে পতিত হওয়া এবং কপালকুণ্ডলার সঙ্গে নবকুমারের জলে ঝাঁপ দেওয়ার ঘটনায় সাদৃশ্য দেখানো হয়েছে।

৪.৭.২ ইতিহাসাশ্রিত কাহিনির মধ্যে বাস্তবতার অনুসন্ধান

একটি কাল্পনিক কাহিনির সম্পূর্ণ অবয়ব দিতে গিয়ে উপকাহিনি হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্র আশ্রয় করলেন এক ইতিহাসের কাহিনির উপর। কেন নির্ভর করলেন সে বিষয়ে অনুমান করা যেতে পারে। কোনো কোনো সমালোচক বলেন, 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের ঐতিহাসিক পরিবেশ ও ঐতিহাসিক চরিত্র সমন্বয়ের ক্ষেত্রে যে সাফল্য পেয়েছিলেন সেই মোহই তাঁকে দ্বিতীয় উপন্যাস 'কপালকুণ্ডলা' লেখার ক্ষেত্রে প্ররণা জুগিয়েছে।

উপরোক্ত কারণই সর্বৈব সত্য নয়। কেবল সুনামের মোহে বা সাফল্যের মোহে উপন্যাস লেখার পাত্র নন তিনি। আসলে, বাস্তবতা রক্ষার তাগিদে তিনি একাজ করেছেন। আপনারা ভালোভাবে উপন্যাসটি পাঠ করলে দেখতে পাবেন, যে কাহিনির অভিনিবেশ ঘটিয়েছেন তিনি এই উপন্যাসে তা এত বিচিত্র রকমের যে, কোনো পাঠকের একক অভিজ্ঞতায় তা নিরুপণ করা দুঃসাধ্য। এ বিষয়ে অসুবিধা হলে আপনার শিক্ষাসহায়কের কাছে পরামর্শ নেবেন।

উপন্যাসের এই কাহিনিকে পুরোপুরি বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য যে বেস বা ভূমির দরকার ছিল তা তিনি পেয়েছেন এখান থেকেই। অর্থাৎ ইতিহাস হল সেই বিশ্বাসের ভূমি। রসুলপুরের নদী, তার বালিয়াড়িতে কাপালিকের বসবাস, কাপালিকের কাছে আজন্ম পালিত কপালকুণ্ডলাকে মানুষ করার যে কথা ঔপন্যাসিক বলেছেন তা অলীক কল্পনা হতে পারে, পাঠক হিসেবে এই দাবি আপনি করতে পারেন। কিন্তু যুবরাজ সেলিমের 'সম্রাট জাহাঙ্গীর' নাম নিয়ে সিংহাসন লাভ মিথ্যে নয়। মানসিংহের ভগিনী যে তাঁর প্রধানা মহিষী ছিলেন তা অলীক নয়। এমনকি জাহাঙ্গীর যে শের আফগানের পত্নী মেহের-উন্নিসার প্রতি প্রবলভাবে প্রণয়াসক্ত ছিলেন ইতিহাস সেই সাক্ষ্য দেয় নির্ভুলভাবে। জাহাঙ্গীর অন্যায়ভাবে শের আফগানকে হত্যা করে মেহের-উন্নিসাকে লাভ করেছিলেন নিজের অভিলাষ চরিতার্থ করার জন্য, এই কাহিনিও ইতিহাস প্রসিদ্ধ। তাই এমন একটি সবল ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর নিজের উপন্যাসকে খাড়া করবার যে সুযোগ পেয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, তাকে কাজে লাগিয়েছেন নবকুমারের প্রথমা পত্নী লুৎফ-উন্নিসাকে সম্রাটের বিশেষ কাছের মানুষ হিসেবে প্রতিপন্ন করিয়ে। ইতিহাসের এই কাহিনি বিশ্বাসযোগ্য

হবে বলেই লুৎফ-উন্নিসার কাহিনিটিও হবে বিশ্বাসযোগ্য। আর এই লুৎফ-উন্নিসা সূত্র ধরে নবকুমার ও কপালকুণ্ডলার মূল কাহিনি পাঠকের কাছে মর্যাদা পাবে এবং বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করবে, এমনই বিশ্বাস ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের।

৪.৭.৩ স্থান–কাল ও বাস্তবতার বয়ন

'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাস জুড়ে বঙ্কিমচন্দ্র যে গল্পটি আমাদের শোনাতে বসেছেন তা যে কোনো গল্প কাহিনি নয়, তা যে একটি সত্য ঘটনা সে কথা নিশ্চিত করার জন্য তিনি উপন্যাসের শুরুতেই বলেছেন

প্রায় দুইশত পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে একদিন মাঘ মাসের রাত্রিশেষে একখানি যাত্রীর নৌকা গঙ্গাসাগর হইতে প্রত্যাগমন করিতেছিল। পর্তুগিস ও অন্যান্য নাবিকদস্যুদিগের ভয়ে যাত্রীর নৌকা দলবদ্ধ হইয়া যাতায়াত করাই তৎকালের প্রথা ছিল; কিন্তু এই নৌকারোহীরা সঙ্গিহীন।

'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের প্রকাশকাল ১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দ। সেই সময়ের হিসেবে 'দুইশত পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে' অর্থাৎ ১৬১৬ খ্রিষ্টাব্দের ঘটনা যে এই উপন্যাসে বলা হচ্ছে তা পাঠককে স্পষ্ট করে জানিয়ে দেওয়া হল। পাঠক এই উপন্যাস যে বছরেই পড়ুন না কেন ঘটনার সময়কাল কিন্তু ১৬১৬ খ্রিষ্টাব্দ। পাঠককে তার মন বেঁধে ফেলতে হবে এই সময় কালের পরিপ্রেক্ষিতে।

এই সময়কালকে মান্যতা দিতে গিয়ে তিনি সেই সময়কার পর্তুগিজ ও অন্যান্য নাবিকদস্যুদের কথা উল্লেখ করলেন। অর্থাৎ এই সময়ে পর্তুগিজ ও অন্যান্য নাবিকদস্যুদের যে উপদ্রব ছিল সে কথা সকলেই অবগত আছেন। লক্ষ করার বিষয়, তখনও পর্যন্ত কিন্তু ইংরেজরা ভারতবর্ষে আসেনি। বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসের বাস্তবতা দানের ক্ষেত্রে সপ্তদশ শতকের সময়কে বেষ্টন করে আছেন।

একদিকে তিনি যখন ইতিহাসের সময়কালকে বেঁধে ফেলতে চেয়েছেন তখন তার প্রয়োজন হয়েছিল ঐতিহাসিক বাস্তবতার। আর তা করতে গিয়ে তিনি সম্রাট আকবরের মৃত্যু এবং যুবরাজ সেলিমের সিংহাসন লাভের সময়কালকে টার্গেট করেছেন। অনুসন্ধিৎসু পাঠক একটু খেয়াল করলে দেখতে পাবেন জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল ১৬০৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৬২৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। আর বঙ্কিমচন্দ্র আগেই উল্লেখ করেছেন সালটা ছিল আনুমানিক ১৬১৬ খ্রিষ্টাব্দ। অর্থাৎ তাঁর কাহিনি যে কেবল গল্প নয়, সময়ের নিক্তিতে তা সত্য এবং বাস্তব তা নির্বিবাদে প্রতিষ্ঠা করাই লক্ষ্য।

দ্বিতীয় খণ্ডের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে সপ্তগ্রামের অতীত এবং বর্তমান দশার সবিশেষ বর্ণনা দিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র। অতীত থেকে ক্রমাবনতির পথ ধরে বর্তমান অবস্থায় দাঁড়িয়েছে সপ্তগ্রাম। তিনি বলেছেন— ''সপ্তগ্রামের এক নির্জন ঔপনগরিক ভাগে নবকুমারের বাস। এক্ষণে সপ্তগ্রামের ভগ্নদশায় তথায় প্রায় মনুষ্যসমাগম ছিল না; রাজপথ সকল লতাগুল্মাদিতে পরিপূরিত হইয়াছিল। নবকুমারের বাটীর পশ্চাদ্ভাগেই এক বিস্তৃত নিবিড় বন। বাটীর সম্মুখে প্রায় ক্রোশার্ধ দূরে একটি ক্ষুদ্র খাল বহিত; সেই খাল একটা ক্ষুদ্র প্রান্তর বেষ্টন করিয়া গৃহের পশ্চাদ্ভাগস্থ বনমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল।" অর্থাৎ উপন্যাসের বাস্তবতা রক্ষার জন্য নবকুমারের বাড়ির পাশে একটি অরণ্য থাকতে হবে যেখানে কাপালিক লুকিয়ে থাকতে পারবে এবং ওষধির সন্ধানে কপালকুণ্ডলা সেই বনে যেতে পারবে। সেই কারণে সমৃদ্ধশালী নগর সপ্তগ্রামকে বর্তমান ভগ্নদশায় নিয়ে এসে বঙ্কিমচন্দ্র বাস্তবতার পরিচয় দিয়েছেন।

৪.৮ কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের চরিত্র

ঔপন্যাসিক যে কাহিনি আমাদের শুনিয়েছেন সেই কাহিনির চরিত্রগুলিকে তিনি কতখানি শিল্পসম্মতভাবে হবে গড়ে তুলেছেন তা আমাদের জানতে হবে। সেই বিষয়ে দু-চার কথা আলোচনা করা যাক।

ঔপন্যাসিক ঘটনা বর্ণনা করার সময় তিনি নিজের মতো করেই তা বর্ণনা করতে পারেন। কিন্তু চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁকে মনে রাখতে হয় চরিত্রগুলো যেন রক্তমাংসের মানুষের মতো হয়ে ওঠে। আর যখন এই কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন হবে তখনই পাঠক সেই কাহিনি পড়ার আগ্রহ প্রকাশ করবেন। পাঠক সেই গল্পের যখন চরিত্রগুলোর সঙ্গে একাত্ম হতে পারবেন বা চরিত্ররা যখন পাঠকের আপনজন হয়ে উঠবে তখনই গল্পের প্রাণ সঞ্চার হবে। সুতরাং গল্পের চরিত্রগুলিকে রক্তমাংসের মানুষের মতো মানুষ করে গড়তে হবে, এটিও একটি উপন্যাসের শর্ত। এই কাজের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র কতখানি সার্থক তা আমাদের বিচার করতে হবে।

শুধুমাত্র গল্পের বা কাহিনির প্রধান চরিত্রকে নিয়ে বিচার করে কাহিনির কাঠামো স্থাপনা করা শক্ত। অসম্ভব বললেও ভুল হয় না খুব একটা। এইজন্য প্রধান চরিত্রের পাশাপাশি অপ্রধান চরিত্রগুলিরও একটি বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে, যেমন মূল কাহিনির পাশাপাশি উপকাহিনির গুরুত্ব থাকে ঠিক তেমনই। তাই প্রধান চরিত্র এবং অপ্রধান চরিত্রগুলি আমরা একে একে আলোচনা করব।

৪.৮.১ নবকুমার চরিত্র

'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের প্রধান পুরুষ চরিত্র নবকুমার। পাশাপাশি তিনি এই উপন্যাসের নায়ক। নবকুমার ছাড়া এই উপন্যাসে সেই রকম উল্লেখযোগ্য কোনো পুরুষ চরিত্র পাওয়া যায় না। কাপালিক চরিত্র পাওয়া গেলেও বিস্তৃত নয়। আর নবকুমারের দাম্পত্য জীবন সৃষ্টির ব্যাপারে অধিকারীর অবদান রয়েছে অনেকটা।

উপন্যাসের নায়ক হতে গেলে যে যে গুণাবলী প্রয়োজন নবকুমার সেই সমস্ত গুণাবলীর অধিকারী। বিবেচনা ও বুদ্ধি প্রয়োগের ক্ষেত্রে সে যে অভিজ্ঞ, সে কথা উপন্যাসের শুরুতেই আমরা দেখতে পাই। ঘোর কুয়াশায় পথভ্রষ্ট মাঝিকে উপযুক্ত বুদ্ধি প্রদানে এবং বৃদ্ধের সাথে কথোপকথনে নবকুমার চরিত্রের অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। নবকুমার অন্যান্য তীর্থযাত্রীদের মত পুণ্য অর্জন করতে গঙ্গাসাগরে আসেনি। সে এসেছে সৌন্দর্য উপভোগ করতে। সেই কথা বৃদ্ধকে বলেছে এভাবে— "যদি শাস্ত্র বুঝিয়া থাকি, তবে তীর্থদর্শনে যেরূপ পরকালের কর্ম হয়, বাটী বসিয়াও সেরূপ হইতে পারে।"— অর্থাৎ পুণ্য অর্জনের জন্য আলাদা করে তীর্থক্ষেত্রে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না। পুণ্য অর্জনের মানসিকতাই পুণ্য অর্জনের পথকে সুগম করে।

শাস্ত্র বা জ্ঞানের দিকে থেকে নবকুমার যে অন্য চরিত্রদের থেকে বা যাত্রীদের থেকে উচ্চবর্গের তা শুধু নয়, রস আস্বাদনের ক্ষেত্রেও সে নৌকার অন্য সকল যাত্রীদের পিছনে ফেলেছে। দূরে থেকে আবছা তটভূমি দেখে 'রঘুবংশম' কাব্যের ত্রয়োদশ সর্গের অন্তর্গত পঞ্চদশ শ্লোক আবৃত্তি করেছে নবকুমার —

"দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী
তমালতালীবনরাজিনীলা।
আভাতি বেলা লমণাম্বুরাশে
ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা।।"

এর পরে দেখা যায় নবকুমার পরোপকারী এবং সাহসীও বটে। রান্নার কাঠ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বালিয়াড়ির বনের মধ্যে প্রবেশ করতে অন্যান্য যাত্রীরা পিছপা হলেও নবকুমার এগিয়ে এসেছে সাহসিকতার সঙ্গে। সকলের রান্নার কাঠ সংগ্রহ করতে যাওয়ার মধ্যে তার পরোপকারী মনোভাবের পরিচয় মেলে।

নৌকার সহযাত্রীরা তাকে ফেলে পলায়ন করলে নবকুমার সাহসিকতার সঙ্গে বালিয়াড়িতে একাকী অবস্থান

করেছে। শেষপর্যন্ত কাপালিকের সাক্ষাৎ পায় সে। কাপালিকের হাত থেকে কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে উদ্ধার করে অধিকারীর কাছে নিয়ে এলে, অধিকারী তাকে কপালকুণ্ডলাকে বিয়ে করার জন্য প্রস্তাব দেয়। সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে না দিয়ে বরং নবকুমার বলেছে 'আমার প্রাণরক্ষায়ত্রীর জন্য কোন কার্য্য আমার অসাধ্য নহে', 'ইহার জন্য সংসার ত্যাগ করিতে হয়, তাহাও করিব'।

নবকুমার জিতেন্দ্রিয় এবং নির্লোভ প্রকৃতির মানুষ। মতিবিবির যখন নবকুমারকে সমস্ত কিছু প্রদানের মাধ্যমে তাকে দাসী করার আবেদন করেছিল, তা নির্দ্বিধায় প্রত্যাখ্যান করেছে নবকুমার। যে মতিবিবির কৃপালাভে ধন্য হয়েছে দিল্লি-আগ্রার আমির-ওমরাহ স্বয়ং যুবরাজ সেলিম, সেই মতিবিবির প্রস্তাব নাকচ করে নবকুমার বলেছে "আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, ইহজন্মে দরিদ্র ব্রাহ্মণই থাকিব। তোমার দত্ত ধন সম্পদ লইয়া যবনীজার হইতে পারিব না।"

নবকুমার তখনও পর্যন্ত জানতেন না এই মতিবিবিই আসলে তার প্রথম স্ত্রী পদ্মাবতী। উপন্যাসের শুরুর দিকে নবকুমার যেভাবে কর্মে তৎপর ও ব্যক্তিত্ববান হয়েছিলেন, সপ্তগ্রামে ফিরে আসার পর একটু একটু করে সেই অবস্থান থেকে সরে এসেছেন। নবকুমারের মানসিকতা গ্রামের ফেরার পর কেমন ছিল সে কথা বলতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন 'অনাদরের ভয়ে তিনি কপালকুণ্ডলাকে লাভ করিয়াও কিছুমাত্র আহ্লাদ বা প্রণয়লক্ষণ প্রকাশ করেন নাই; অথচ তাঁহার হৃদয়াকাশ কপালকুণ্ডলার মূর্তিতে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছিল।' দ্বিতীয় খণ্ডের পঞ্চম পরিচ্ছেদে কপালকুণ্ডলার প্রতি নবকুমারের আকর্ষণের তীব্রতা লেখক বর্ণনা করেছেন। অন্যদিকে নবকুমারের প্রতি কপালকুণ্ডলার অনাসক্ত মনোভাব নবকুমারকে ভীষণভাবে আহত করেছিল। আর এই প্রতিহত প্রেম থেকেই তার উন্মাদ অবস্থার সৃষ্টি। তীব্র মানসিক যন্ত্রণার কারণেই নবকুমারের বিচারবুদ্ধি লোপ পেয়েছিল।

নবকুমারের আগেই একটি বিয়ে হয়েছিল, সেজন্য কখনোই চিন্তিত হতে দেখা যায়নি নবকুমারকে। বরং কপালকুণ্ডলাকে নিয়ে আসার সময় তাকে সমাজচ্যুত হতে হয় এই ভাবনাই নবকুমারকে সারারাত ভাবিয়ে তুলেছিল। পাশাপাশি পরোপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বিরুদ্ধতা করা তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নয়। সেই কারণে কপালকুণ্ডলাকে জীবনের সঙ্গিনী রূপে গ্রহণ করেছে নবকুমার। আর সেই সঙ্গিনীর কাছে নিরাসক্ত আচরণ নবকুমারকে ভিন্ন পথে চালিত করেছে।

বিবাহের পর নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে খুশি করার অফুরান চেষ্টা চালিয়ে গেছে নবকুমার। কিন্তু কপালকুণ্ডলার মনে তার বিন্দুমাত্র প্রভাব পড়েনি। অবসাদগ্রস্ত হয়েছে নবকুমার। আর সে কারণেই কপালকুণ্ডলাকে ব্রাহ্মণবেশী পুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে দেখে সন্দেহের উদ্রেক হয় তার মনে। আর সেই সন্দেহকে কপালকুণ্ডলার 'দ্বিচারিতা' বলে প্রতিপন্ন করেছে কাপালিক। সে নবকুমারকে জানিয়েছে কপালকুণ্ডলা বিশ্বাসঘাতিনী, সে মধ্যরাত্রে পরপুরুষের সঙ্গে মিলনের অভিসারে বেরিয়েছে। আর নবকুমার কাপালিকের এই প্ররোচনায় পা দিয়ে কপালকুণ্ডলাকে বধ করার জন্য আগ্রাসী হয়ে ওঠে।

নবকুমারের জীবনে যে conflict কাজ করেছিল তার ছবি ধরা পড়েছে যখন সে কপালকুণ্ডলার উদ্দেশ্যে বলেছে— "তুমি ত কখনও আপনার হৃৎপিণ্ড আপনি ছেদ করিয়া শ্মশানে ফেলিতে আস নাই।" অর্থাৎ নায়কের ট্র্যাজেডি doing এবং suffering-এর মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। doing-এর প্রভাব অনেক কম আছে, তুলনায় suffering-এর প্রভাব বেশি। আর এই suffering-এর মূলেও আছে নিয়তির লাঞ্ছনা। নিয়তি বা অদৃষ্টের ব্যাপারে বঙ্কিমচন্দ্রের অবচেতনে শেক্সপীরীয় প্রভাব ধারা অন্বিত হয়েছে। পরিবেশ ও পরিস্থিতিই প্রকৃতপক্ষে ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করেছে নবকুমারের। তাই প্রত্যেকটি কথা ও কার্য অনিবার্য বেগে ট্র্যাজেডির দিকে টেনে নিয়ে গেছে নবকুমারকে। বঙ্কিমচন্দ্র যদি নবকুমারকে আরও কিছু সক্রিয় চরিত্র রূপে রূপায়ন করতেন, তার অন্তর্দ্বন্দ্ব

যদি আরও বিস্তৃত আকারে প্রকাশ করতেন তাহলে নবকুমার চরিত্রটি পূর্ণতা পেত কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র আসলে নবকুমার চরিত্রের সৃষ্টি করেছেন কপালকুণ্ডলা চরিত্রটিকে পরিপূর্ণতা দানের জন্যই। তাই শেষ পর্যন্ত নবকুমার এই উপন্যাসে character of Destiny তে পরিণত হয়ে থেকে গেছে।

৪.৮.২ কপালকুণ্ডলা চরিত্র

'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে নারীচরিত্র তিনটি থাকলেও নায়িকা হিসেবে আমরা কপালকুণ্ডলাকেই দেখতে পাই। কপালকুণ্ডলাকে কেন নায়িকা হিসেবে বিবেচনা করব সে সম্পর্কে আলোচনা করা যাক।

কপালকুণ্ডলা আসলে বঙ্কিমচন্দ্রের মানস-সৃষ্টি। একদিকে রহস্যের দ্বারা আবৃত, অন্যদিকে তার মধ্যে সজীবতা ফোটাবার গুরুদায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র। কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের সর্বাধিক সক্রিয় চরিত্র। আখ্যানের সূচনা এবং সমাপ্তিসহ সমগ্র উপন্যাসে তার অবস্থান রয়েছে। ঘটনাধারা, কাহিনির বিকাশ এবং ব্যাপ্তিতে তার ভূমিকা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ।

ক্লান্ত অবসন্ন শরীরে নবকুমার প্রথম দৃষ্টিতেই কপালকুণ্ডলার রূপে মুগ্ধ। নবকুমার 'ফিরিবামাত্র দেখিলেন, অপূর্ব মূর্তি! সেই গম্ভীরনাদী বারিধিতীরে সৈকতভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া অপূর্ব রমণীমূর্তি! কেশভার, — অবেণীসম্বদ্ধ, সংসর্পিত, রাশীকৃত, আগুল্ফলম্বিত কেশভার; তদগ্রে দেহরত্ন; যেন চিত্রপটের উপর চিত্র দেখা যাইতেছে।...বিশাল লোচনে কটাক্ষ অতি স্থির, অতি স্নিগ্ধ, অতি গম্ভীর, অথচ জ্যোতির্ময়; ...কেশরাশিতে স্কন্ধদেশ ও বাহুযুগল আচ্ছন্ন করিয়াছিল। স্কন্ধদেশ একেবারে অদৃশ্য; বাহুযুগলের বিমলশ্রী কিছু কিছু দেখা যাইতেছিল।'

কপালকুণ্ডলার সঙ্গে নবকুমারের প্রথম সাক্ষাৎ এমন মনোমুগ্ধকর হলেও প্রথম থেকেই কপালকুণ্ডলাকে রহস্যে আবৃত করে রেখেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। যে কারণে কপালকুণ্ডলা কেন নবকুমারকে পথ দেখিয়ে কাপালিকের কাছে নিয়ে যাচ্ছে, কেনই বা নবকুমারকে কাপালিকের কাছে থেকে উদ্ধার করে অধিকারীর কাছে নিয়ে গেছে ইত্যাদি সমস্ত প্রশ্নের উত্তর অগোচরে রেখেছেন তিনি। কাপালিকের হাত থেকে উদ্ধার করার সময় যখন কপালকুণ্ডলা, কাপালিকের সঙ্গ ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করে এবং বলে উঠে "এখনও পলাও। নরমাংস নহিলে তান্ত্রিকের পূজা হয় না, তুমি কি জান না?" নবকুমারের মনে ভয়ের উদ্রেক হয়েছে তখন। কপালকুণ্ডলার হাত ধরে শেষ পর্যন্ত সে পালিয়ে গেছে অধিকারীর সমীপে। বঙ্কিমচন্দ্র কপালকুণ্ডলা চরিত্রকে দিয়ে নবকুমারকে বাঁচিয়ে রেখেছেন কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের পরিণতি নির্মাণ করার জন্য। কপালকুণ্ডলাকে দিয়ে কাপালিকের খড়্গ সরিয়ে ফেলেছেন আর শেষ পর্যন্ত নায়িকার দ্বারা নায়ক উদ্ধার পেয়েছে।

কপালকুণ্ডলা যে পরিবেশে মানুষ হয়েছে বা বড় হয়েছে সেখানে জাগতিক বস্তুসমূহের কোনো প্রকার গুরুত্ব নেই। সেই কারণে মতিবিবির দেওয়া অলঙ্কারসামগ্রী অনিচ্ছাসত্ত্বেও গ্রহণ করে নিজের কাছে রেখে দেওয়ার মনোভাব প্রকাশ করেনি। উল্টে পালকিতে যাত্রা করার সময় সেইসব অলঙ্কার বাক্সসহ দান করে দিয়েছে কপালকুণ্ডলা। ভিক্ষুক যখন অবাক হয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে যায় তখন কপালকুণ্ডলা ভাবে, 'ভিক্ষুক দৌড়িল কেন?'

কপালকুণ্ডলা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথমে জানিয়েছেন সে কখনো পুরুষসঙ্গ লাভ করেনি (এটি কতখানি যুক্তিযুক্ত বা কতখানি বাস্তবসম্মত সে আলোচনা অন্যত্র) তার যৌবনকাল পর্যন্ত বয়সে। সুতরাং পুরুষসঙ্গ কেমন, তা তার অজানা। কপালকুণ্ডলা পুরুষসঙ্গ থেকে বিরত থাকায় স্বাভাবিকভাবে তার কাছে বিবাহ অভিজ্ঞতা থাকবে না। এটাই কাম্য। আর এমনটাই ঘটেছে উপন্যাসে।

বিবাহ পরবর্তীকালে সে যখন পতিগৃহ সপ্তগ্রামে এসে উপস্থিত হয়েছে, সপ্তগ্রামের সেই সংসার তাকে কোনোভাবেই আকৃষ্ট করতে পারেনি। এমনকি নবকুমারের সঙ্গে প্রণয় সম্পর্কও স্থাপিত হয়নি তার। নবকুমারের কনিষ্ঠা ভগিনী শ্যামাসুন্দরী কপালকুণ্ডলাকে সংসার কর্মে মনোযোগী করে তোলার জন্য কেশবিন্যাস, প্রসাধন ও অঙ্গরাগ ইত্যাদি ব্যবহারের কৌশল শিখিয়ে দিতে চাইলেও কপালকুণ্ডলা নিরাসক্ত থেকেছে সেই সব বিষয়ের প্রতি। সপ্তগ্রামের সংসারে এসে শ্যামাসুন্দরীর অবস্থা দেখেও কপালকুণ্ডলার দাম্পত্য প্রণয় আসেনি। নবকুমারের প্রণয় কত প্রবল তা জানতে পারেনি। বরং সে বলেছে, 'বোধ করি সমুদ্রতীরে সেই বনে বনে বেড়াইতে পারিলে আমার সুখ জন্মে।'/নিরাভরণ থাকাই তার কাছে অনেক বেশি মূল্যবান বলে প্রতীয়মান হয়েছে। কপালকুণ্ডলার চরিত্রটিকে এতখানি কাঠিন্য দান না করলে পরিণতি গঠনে বা কাহিনির বৃত্ত নির্মাণে খামতি থেকে যেত হয়তো।

পরবর্তীকালে কপালকুণ্ডলার সঙ্গে যখন পাঠকের সাক্ষাৎ হয় তখন প্রায় এক বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। কপালকুণ্ডলা এক বছরের পুরনো গৃহিণী নবকুমারের। তার সাজসজ্জায় কিঞ্চিৎ পারিপাট্য এলেও মানসিকতার বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়নি। সে শ্যামাসুন্দরীর কাছে অনুযোগ করে বলেছে সে যদি জানত স্ত্রীলোকের বিবাহ মানে দাসীত্ব করা, তবে কোনোদিনই সে বিবাহ করত না।

বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য উপন্যাসের নায়িকার মত কপালকুণ্ডলা অসাধারণ রূপ-লাবণ্যে অধিকারী। এই রূপ ছাপিয়ে তার গুনের কথা প্রকাশ করেছেন ঔপন্যাসিক। কপালকুণ্ডলা পরোপকারী। সেই কারণে শ্যামাসুন্দরীর প্রয়োজনীয় বনলতা আনতে, রাত্রে বনের মধ্যে যেতে তার মধ্যে দ্বিধাবোধ আসেনি। সংসার ভালো লাগে না তার, রাত্রে অরণ্যে ঘুরে বেড়াতে আনন্দ পায় সে, গৃহস্থের স্ত্রী-কন্যাদের মতো আচরণ তাই তার মনে আসেনি। তাই সহজভাবেই সে ওষধির সন্ধানে গভীর রাতে বনের মধ্যে প্রবেশ করতে পেরেছিল। এই সাহস সে সঞ্চয় করেছে কাপালিকের কাছে লালিত পালিত হওয়ার দরুণ। অরণ্যের মধ্যে একাকী ঘুরে বেড়ানো, অরন্যের স্বাদ গ্রহণ ইত্যাদির এক অমোঘ আকর্ষণে সে এলোচুলে বনলতা তুলতে বনের মধ্যে যেতে কোনো সংকোচ বোধ করেনি। বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ যে পরামর্শ দিয়েছিলেন সে পরামর্শ বঙ্কিমচন্দ্রের আদৌ মনঃপুত হয়নি। আর সে কথারই সাক্ষ্য দেয় উপন্যাসের শেষ পরিণতি। এক ঝলকে দেখে নেওয়া যাক কপালকুণ্ডলা চরিত্রে কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে কিনা।

'কুচরিত্রা', 'অবিশ্বাসিনী'ইত্যাদি শব্দগুলি বেশ কয়েকবার কপালকুণ্ডলার মুখে বসিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র। কপালকুণ্ডলা বলেছে, 'আমি রাত্রে ঘরের বাহির হইলেই কুচরিত্রা হইব?' অথবা 'আইস, আমি অবিশ্বাসিনী কি না স্বচক্ষে দেখিয়া যাও।' এখন প্রশ্ন করা যেতেই পারে দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে যে বোঝেনা কিছু, সংসারের নিয়ম-শৃঙ্খলা, রীতি-নীতি ইত্যাদি যার কাছে এখনও স্পষ্ট নয় সে এইসব কথা জানল কী করে? এর অর্থ তার কাছে কীভাবে বোধগম্য হয়ে উঠেছে?

বাড়িতে কোনো গৃহপালিত পশু এক বছরেরও বেশি সময় ধরে থাকলে, তারও বাড়ির প্রতি মায়া জন্মে যায়, একথা পাঠক এক বাক্যে স্বীকার করবেন। অথচ কপালকুণ্ডলা নবকুমারের সঙ্গে সংসার করছে এক বছরেরও বেশি সময় ধরে। সেক্ষেত্রে নবকুমারের সঙ্গে কপালকুণ্ডলার একটি ভালোবাসার সম্পর্ক স্বাভাবিকভাবেই গড়ে ওঠার কথা, কিন্তু তা হয়নি। সংসারের প্রতি একটা অনুভূতি বা টান জন্মানোর কথা কপালকুণ্ডলা চরিত্রে। সেই অনুভূতির ছিটেফোঁটাও লক্ষ করা যায় না, যেখানে কপালকুণ্ডলাকে একজন কোমল স্বভাবের, সরল হৃদয়ের চরিত্র হিসেবে অঙ্কন করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। এত কিছুর পরেও কপালকুণ্ডলার মন টিকলো না সংসারে। গভীর নিরীক্ষণ করলে দেখা যায়, একথা বিশ্বাস করা খুবই শক্ত।

প্রথমেই বঙ্কিমচন্দ্রের জানিয়ে দিয়েছেন ষোড়শবর্ষীয়া কপালকুণ্ডলা কাপালিকের কাছে লালিতা-পালিতা হয়েছে অরণ্যের কোলে। সেই কপালকুণ্ডলার মানবিক বৃত্তিগুলিকে জাগ্রত করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র অথচ জৈবপ্রবৃত্তিগুলির ওপর তখনও তিনি পর্দা টেনে রেখেছেন। তা কী করে সম্ভব? নবকুমারের ভালোবাসার অর্থ সে বুঝতে পারবে না, আর পাঁচজন সাধারণ দম্পতির মতো তারা জীবন কাটাবে না, সমস্ত জৈবিক প্রবৃত্তিগুলিকে ঠেলে সরিয়ে রাখবে দূরে, তা কী করে হয়? অনুসন্ধিৎসু পাঠকের মনে প্রশ্ন আসে তাহলে কপালকুণ্ডলার সন্তানসম্ভাবনা কি অনিবার্য ছিল না? আর সঞ্জীবচন্দ্র কথা ধরে বলা যেতে পারে ("...সন্তানাদি হইলে স্বামী-পুত্রের প্রতি স্নেহ জন্মাইলে সমাজের লোক হইয়া পড়িবে, সন্ন্যাসীর প্রভাব তাঁহার মন হইতে একেবারে তিরোহিত হইবে") কপালকুণ্ডলার কি পরিবর্তন হতে পারত? তাহলে কি কপালকুণ্ডলা তার নিজের অবস্থায় থাকতে পারত? যেখানে এক বছরেরও বেশি সময় অতিক্রান্ত করেছে তাদের দাম্পত্য জীবন।

এই ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলির উত্তর বঙ্কিমচন্দ্র দেননি। তার পরিবর্তে তিনি রেখে গেছেন নবকুমারের সঙ্গে বিয়ের পর বালিয়াড়ি ত্যাগের পূর্বে মা কালীর পা থেকে বেলপাতা বিল্বপত্র পতন হওয়ার কথা। অশিক্ষিত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন কাপালিকের কাছে লালিতা-পালিতা মেয়ের মনের মধ্যে কুসংস্কার প্রবলভাবে থাকবে তা বিশ্বাসযোগ্য হলেও দীর্ঘদিন ধরে তা একইভাবে সক্রিয় থেকে যাবে আর নারীর সহজাত প্রবৃত্তি-কপাট বন্ধ রাখবে এটা বড় অস্বাভাবিক মনে হয় পাঠকের কাছে। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র সকল প্রশ্নের উত্তর না দেওয়ার প্রতিজ্ঞা নিয়েই বোধহয় কপালকুণ্ডলাকে কাপালিকের কাছে মানুষ করে তুলেছেন। তবে, কপালকুণ্ডলা চরিত্রটিকে আরও বেশি করে বাস্তবমুখী গঠন করলে তা অনেক বেশি হৃদয়গ্রাহী উঠত পাঠকের কাছে সে কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। এ বিষয়ে অবশ্য ভিন্নমত পোষণ করাও যেতে পারে।

৪.৮.৩ মতিবিবি চরিত্র

'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক চরিত্র মতিবিবি। তিনি উপন্যাসের নায়িকা না হয়েও বহু ক্ষেত্রে তার ঔজ্জ্বল্য কপালকুণ্ডলা চরিত্রকেও ম্লান করেছে। কপালকুণ্ডলা-নবকুমারের জীবন অবলম্বনে যে মূল কাহিনিবৃত্ত রচনা করা হয়েছে, তার গুরুত্বপূর্ণ বিন্দুতে রয়েছে মতিবিবি। কাপালিকের সান্নিধ্যে প্রতিপালিত, সমাজ-সংসার সম্পর্কে অনভিজ্ঞা কপালকুণ্ডলাকে সাংসারিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে যে জীবন-জিজ্ঞাসার উত্তর বঙ্কিমচন্দ্র অনুসন্ধান করেছিলেন তা তুলনামূলক বৈপরীত্যের মাধ্যমে স্পষ্টতর করে তোলার জন্যই মতিবিবির সৃষ্টি।

উপন্যাসে তার তিনটি নাম আমরা পাই (১) পদ্মাবতী (২) লুৎফউন্নিসা (৩) মতিবিবি। বাল্যকালে তার নাম ছিল পদ্মাবতী। সে ব্রাহ্মণকন্যা, তার পিতার নাম ছিল রামগোবিন্দ ঘোষাল। সপ্তগ্রামনিবাসী নবকুমারের সঙ্গে তার বিবাহ সম্পন্ন হয়। পদ্মাবতীর যখন তের বৎসর, তখন রামগোবিন্দ ঘোষাল উড়িষ্যা থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে পাঠানদের হাতে সে বন্দী হয়। প্রাণরক্ষার জন্য সে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। ধর্মচ্যুত হওয়ার কারণে নবকুমারের পিতা পদ্মাবতীকে গৃহ থেকে বিতাড়িত করেন। ধর্মান্তরিত রামগোবিন্দ ঘোষাল রাজকার্যে পারদর্শিতা দেখিয়ে উচ্চপদে আসীন হয়ে আগ্রা চলে যায়। পদ্মাবতীও পিতার সঙ্গে আগ্রায় গমন করে। নানাবিদ্যা ও রূপ গৌরবের অধিকারিণী পদ্মাবতী মুঘল রাজপুরীর অন্তঃপুরিকাদের মধ্যে স্থান পায় এবং লুৎফউন্নিসা নামে পরিচিত হয়। সে যখন কোনো কর্ম উপলক্ষে বাইরে বের হত, তখন মতিবিবি নামটি ব্যবহার করত। উপন্যাসে আবির্ভাবের সময়ে মতিবিবি সপ্তবিংশতিবর্ষীয়া নারী। নবপরিনীতা বধূ কপালকুণ্ডলাকে নিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তনের সময় অদৃষ্টের পরিহাসে পথমধ্যে মতিবিবির সঙ্গে নবকুমারের সাক্ষাৎ ঘটে। নবকুমার তাকে চিনতে না পারলেও সে প্রাক্তন স্বামীকে

চিনতে ভুল করেনি। অতঃপর সে দিল্লির বৃহৎ কর্মকাণ্ড ছেড়ে নবকুমারের জীবনে ফিরে এসে নবকুমারের ভবিষ্যৎ দিনগুলিকে কঠিন করে তুলেছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র মতিবিবির রূপ বর্ণনায় বিশেষ যত্নবান হয়েছেন। পান্থনিবাসে প্রথম দর্শনেই নবকুমার মুগ্ধ দৃষ্টিতে অনুভব করেছিলেন ''ইনি অসামান্য সুন্দরী। রূপরাশিতরঙ্গে তাঁহার যৌবন শোভা শ্রাবণের নদীর ন্যায় উছলিয়া পড়িতেছিল।' মতিবিবির সঙ্গে কথা বলার সময় নবকুমার তার মুগ্ধতাকে প্রকাশ করে বলেছিল 'আমি স্ত্রীলোক দেখিয়াছি; কিন্তু এরূপ সুন্দরী দেখি নাই।' তার যৌবনশ্রী ভাদ্র মাসের ভরা নদীর মতো চঞ্চল। মতিবিবির দেহের বর্ণ তপ্তকাঞ্চনের ন্যায়। তাঁর চক্ষুদুটি সুবঙ্কিম পল্লবরেখাবিশিষ্ট এবং অতিশয় উজ্জ্বল। শরীর মধ্যমাকৃতির চেয়ে কিছুটা দীর্ঘ। মুখকান্তি মধ্যে দুইটি অনির্বচনীয় শোভা প্রথম সর্বত্রগামিনী বুদ্ধির প্রভাব, দ্বিতীয় আত্মগরিমা। বাস্তবিক সে 'রমণীকুলরাজ্ঞী'। তিনি ছিলেন আপন রূপ-যৌবন সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতনা, পরিহাস রসিকা, উপস্থিত বুদ্ধির অধিকারিণী এবং অসাধারণ বাকপটু। শুধু বাকপটু নয়, বাকবৈদগ্ধেরও অধিকারী।

তৃতীয় খন্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে মতিবিবির পূর্ব-ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। মতিবিবির চরিত্র যেমন মহাদোষে কলুষিত, তেমনি মহৎ গুণে শোভিত। মতিবিবির পিতা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর সে লুৎফউন্নিসা নামে পরিচিতা হয়। বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সে ফারসী, সংস্কৃত, নৃত্য-গীত, রসবাদ প্রভৃতিতে পারদর্শী হয়ে উঠল এবং রাজধানীর গুণবতীদের মধ্যে অগ্রগণ্যা বিবেচিত হতে থাকে। তবে সে বিদ্যা সম্পর্কে যেমন শিক্ষা লাভ করেছিল, ধর্ম সম্পর্কে সে তেমন জ্ঞানার্জন করে উঠতে পারেনি। নিজের মন মত কাজ করতে সে পছন্দ করত। যেহেতু তার পূর্বস্বামী বর্তমান, তাই ওমরাহেরা তাকে বিবাহ করতে সম্মত ছিল না। তার ভাবনা ছিল 'কুসুমে কুসুমে বিহারিনীর পক্ষচ্ছেদ কেন করাইবে?' এই আচরণের ফলে তার পিতা লোকনিন্দায় বিরক্ত হয়ে তাকে গৃহ থেকে বিতাড়িত করে। লুৎফউন্নিসা ছিল লোক চরিত্র সম্বন্ধে অসাধারণ অভিজ্ঞ। লুৎফউন্নিসার অন্যতম কৃপাপ্রার্থী ছিলেন যুবরাজ সেলিম। মানসিংহের ভগিনী ছিলেন সেলিমের প্রধানা মহিষী। তিনিই লুৎফউন্নিসাকে প্রধান সহচরী হিসাবে প্রাসাদে স্থান দিয়েছিলেন 'লুৎফউন্নিসা প্রকাশ্যে বেগমের সখী, পরোক্ষ যুবরাজের অনুগ্রহভাগিনী।' অত্যন্ত চতুরা ও দুঃসাহসিক লুৎফউন্নিসা অল্পদিনের মধ্যেই রাজকুমারের হৃদয়ে অধিকার স্থাপন করে নেয়। সেলিমের চিত্তে তাঁর স্থান এত প্রতিযোগীশূন্য হয়ে ওঠে যে লুৎফউন্নিসা উপযুক্ত সময়ে সাম্রাজ্ঞী হবে, এমন স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। শুধু লুৎফউন্নিসা নয়, 'রাজপুরবাসী সকলেরই উহা সম্ভববোধ হইল।' কিন্তু সেই সময় খাজা আয়াসের কন্যা মেহের-উন্নিসা বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এই মেহের-উন্নিসার সঙ্গে শের আফগান নামে একজন ওমরাহের ইতিপূর্বেই বিবাহ স্থির হয়েছিল। মেহের-উন্নিসার প্রতি অনুরাগের জন্য বাদশাহ আকবর সেলিমকে তিরস্কার করেছিলেন। কিন্তু লুৎফউন্নিসা বুঝেছিলেন আকবরের মৃত্যু হলেই সেলিম শের আফগানকে হত্যা করে মেহেরউন্নিসাকে বিবাহ করবেন। আর তখন থেকেই লুৎফউন্নিসা সাম্রাজ্ঞী হওয়ার আশা ত্যাগ করেছিল। অতঃপর লুৎফউন্নিসা এক গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। সেলিম নয়, সেলিম পুত্র খসরুকে সিংহাসনে বসানোর লক্ষ্যে সেনাপতি মানসিংহ ও খসরুর শ্বশুর কোষাধ্যক্ষ খাঁ আজমের সঙ্গে হাত মেলায়। এই চক্রান্ত যদি ব্যর্থ হয়, তার জন্য নিরাপদ আশ্রয়ের প্রয়োজন ছিল। সেই কারণেই আগ্রা থেকে তার ভ্রাতা উড়িষ্যার মনসবদারের কাছে মতিবিবির ছদ্মবেশে তার গমন এবং প্রত্যাবর্তনের পথে নবকুমারের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটে। তাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়। জীবনের এক চরম সন্ধিলগ্নে মতিবিবির সঙ্গে নবকুমারের সাক্ষাৎ ঘটে। মেহেরউন্নিসা যে সাম্রাজ্ঞী হবেন তা লুৎফউন্নিসা বুঝতে পেরেছিল। আগ্রার আমীর ওমরাহের মধ্যে জীবনের বৃহৎ ঘটনায় যুক্ত থেকে মতিবিবি প্রকৃত সুখের সন্ধান পায়নি। তাই সপ্তগ্রামে নবকুমারকে নিয়ে সুখের নীড় স্থাপনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে।

ঔপন্যাসিক মতিবিবির চরিত্র সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন, 'পাষাণমধ্যে অগ্নি প্রবেশ করিয়াছিল, পাষাণ দ্রব

হইয়াছিল।' বস্তুত, নবকুমার যদি পদ্মাবতীকে পুনরায় গ্রহণ করত তবে কপালকুণ্ডলার কোনোরকম ক্ষতি সাধন বোধ হয় সে করতে চাইত না। কিন্তু যেহেতু নবকুমার থাকে প্রত্যাখ্যান করেছে তাই তার মধ্যে থাকা ক্রোধ দলিতফণা ফণিনীর ন্যায় বেরিয়ে এসেছে। তার এই আচরণের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে কাপালিকের সঙ্গে কপালকুণ্ডলার বিরুদ্ধে পরামর্শকালে। বঙ্কিমচন্দ্র না চাইলেও মতিবিবির চরিত্রটি যে কপালকুণ্ডলা চরিত্র অপেক্ষা অনেক বেশি মানবিক ও অনেক বেশি স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে সে কথা পাঠক অনায়াসে স্বীকার করবেন।

৪.৮.৪ অন্যান্য অপ্রধান চরিত্রসমূহ

কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের কাপালিক, শ্যামাসুন্দরী, মতিবিবির সহচরী পেষমন, বৃদ্ধ চরিত্র ইত্যাদি চরিত্রগুলি উপন্যাসের অপ্রধান চরিত্র। এরা অতি অল্প সময়ের জন্য উপন্যাসে অবস্থান করেছে। উপন্যাসের ঘটনাবলীতে সক্রিয় অংশগ্রহণ নেই। গল্পের পূর্ণাঙ্গ রূপ দানের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র এদের মাঝেমধ্যেই ব্যবহার করেছেন উপন্যাসে। এদের অবস্থান সংক্ষিপ্ত হলেও পাঠকের মনে রেখাপাত করতে সক্ষম চরিত্রগুলো। যার মধ্যে অন্যতম কাপালিক চরিত্র বৃদ্ধ চরিত্র। এই চরিত্রগুলি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আকারে আমরা একটু জেনে নেব।

কাপালিক 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য অপ্রধান চরিত্র কাপালিক। চরিত্রের ব্যক্তিনাম সম্পর্কে ঔপন্যাসিক কোনো আলোকপাত করেননি। তাই নামহীন এই সাধক সমগ্র উপন্যাস জুড়ে কাপালিক নামে পরিচিত। সঙ্গীহীন একাকী নবকুমার গভীর রাত্রে আলোক শিখা দেখতে পায়। সেই শিখার কাছে গেলে দেখতে পায় বছর পঞ্চাশ বয়সের ভীষণ-দর্শন দেখতে এক কাপালিক মাথা কাটা গলিত শবের উপর বসে ধ্যান মগ্ন। আশেপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল অস্থিখণ্ড।

দৈহিক এবং মানসিক ভাবে কাপালিক ছিল বলিষ্ঠ প্রকৃতির মানুষ। ঘৃণাভাব তার মধ্যে ছিল না। তাই সে গলিত দুর্গন্ধযুক্ত মরদেহের উপর বসে নির্বিবাদে ধ্যান করছিল। কাপালিক যে যথেষ্ট বলশালী তার একটা ইঙ্গিত আকারে-প্রকারে দিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র। প্রথম খণ্ডের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে যখন কাপালিক নবকুমারের হাত ধরে টানতে টানতে বধ্যভূমির দিকে নিয়ে যাচ্ছিল তখন নবকুমার এর মনে হয়েছে 'এই বয়সেও কাপালিক মত্ত হস্তীর বল ধারণ করে।' এমত দৈহিক ও মানসিক ক্ষমতা সম্পন্ন কাপালিককে বঙ্কিমচন্দ্র ঠিক তারপরের পরিচ্ছেদে অর্থাৎ সপ্তম পরিচ্ছেদে পর্বত শিখরস্থিত স্তুপ থেকে ফেলে দুটি হাতের ক্ষমতা লোপ পাইয়ে দিয়েছেন। উপন্যাসের স্বার্থে অবশ্য প্রয়োজন ছিল তা। কেননা পুরোপুরি সবল থাকলে কাপালিক নবকুমার ও কপালকুণ্ডলাকে আরও দ্রুত খুঁজে বের করে ফেলতে পারত। আর উপন্যাসের বৃত্ত নষ্ট হয়ে যেত।

কপালকুণ্ডলার প্রতিপালক হল কাপালিক। জলদস্যুরা যখন শিশু কপালকুণ্ডলাকে সমুদ্রতীরে ত্যাগ করেছিল কাপালিক তাকে কুড়িয়ে এনে 'আপন যোগসিদ্ধিমানসে' প্রতিপালন করেছিল। কপালকুণ্ডলার সঙ্গে কাপালিকের বয়সের ব্যবধান ছিল পিতা-কন্যার মতোই। কিন্তু এই বালিকার প্রতি কাপালিকের বাৎসল্য রস সৃষ্টি হয়েছিল কিনা সে বিষয়ে কোনো তথ্য দেননি বঙ্কিমচন্দ্র। অপরদিকে কাপালিকের আরাধ্যা দেবী ভবানী তাকে স্বপ্নে বলেছে ''তুই এ পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয় লালসায় বদ্ধ হইয়া এই কুমারীর শোণিতে এতদিন আমার পূজা করিস নাই''। ভবানী নির্দেশিত 'ইন্দ্রিয় লালসা' কোন দিকে ইঙ্গিত করে তা পাঠকের বুঝতে অসুবিধা হয় না। আসলে কাপালিক কপালকুণ্ডলাকে হয়তো বা ভোগ্যবস্তুতে পরিণত করতে চেয়েছিল।

কাপালিককে দুটি রূপে উপন্যাসে দেখা গিয়েছে। প্রথম দেখা গিয়েছে বামাচারী তান্ত্রিক হিসাবে। ভবানীর পূজায় নবকুমারকে নরবলি দেওয়ার চেষ্টা করতে। আর দ্বিতীয়বারে তার লক্ষ্য ছিল কপালকুণ্ডলা। এই দুইয়ের

মধ্যে মানসিকতার প্রভেদ ছিল। নবকুমারের আবির্ভাবকে তিনি প্রথমে মা ভবানীর ইচ্ছা বলে মনে করেছেন এবং নিঃসংকোচে নবকুমারের বলি দিতে চেয়েছেন। অন্যদিকে কপালকুণ্ডলাকে বলি দিতে চাওয়ার সময় ছিল তার প্রতিহিংসা এবং ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ।

সামগ্রিকভাবে কাপালিক চরিত্র সৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পীসত্তার সার্থক প্রকাশ ঘটে নি। এই চরিত্রটিকে ঔপন্যাসিক বাহ্যিক প্রয়োজন সিদ্ধির উদ্দেশ্য নিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তাই কাপালিক আগাগোড়া থেকেই নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। মহাশক্তিকে আরাধনার দ্বারা তুষ্ট করে সে নিজেও মহাশক্তিমান হতে চেয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার এই প্রয়াস সাফল্য লাভ করেনি। তাই বলা যেতে পারে কাপালিক চরিত্র একটি বিকৃত মস্তিষ্কের নরপিশাচে পরিণত হয়েছে।

শ্যামাসুন্দরী : 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের একটি অপ্রধান নারী চরিত্র শ্যামাসুন্দরী। উপন্যাসের আখ্যানবৃত্তে শ্যামাসুন্দরী সামান্য প্রয়োজনীয় ভুমিকা রয়েছে। কপালকুণ্ডলা চরিত্রের মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র যে তত্ত্বানুসন্ধান করতে চেয়েছেন তাকে ফুটিয়ে তোলার জন্য শ্যামাসুন্দরী চরিত্রটির অবতারণা করা হয়েছে।

কপালকুন্ডলার গার্হস্থ্য জীবনে যে পরিবর্তন এসেছে তার জন্য বহুলাংশে কৃতিত্বের ভাগীদার শ্যামাসুন্দরী। লেখক প্রথমেই জানিয়ে দিয়েছেন শ্যামাসুন্দরী সধবা হলেও বিধবা, কেননা সে কুলীন পত্নী। অর্থাৎ সেই সময় কুলীন সন্তানদের যে বহুপত্নীপ্রথা প্রথা প্রচলন ছিল তার ইঙ্গিত দিয়েছেন। শ্যামাসুন্দরী যে তার স্বামীর বহুপত্নীর একজন তাও পরিষ্কার করে উল্লিখিত হয়েছে। শ্যামাসুন্দরী বাপের বাড়িতেই থাকত আর মাঝেমধ্যে তার স্বামী এসে দেখা দিয়ে যেত।

শ্যামাসুন্দরী, কপালকুণ্ডলাকে গৃহস্থ নারীর মতো সাজিয়ে যোগিনী স্বভাব থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিল। সেই কারণেই সে বলেছে 'পুরুষের বাতাসে যোগিনীও গৃহিণী' হয়ে যায়। শ্যামাসুন্দরীর পতিকে নিজের কাছে আটকে রাখার জন্য বশীভূত করতে আগ্রহী। শ্যামাসুন্দরী স্বামীর ভালোবাসার কাঙাল। অথচ পরিস্থিতির শিকার হয়ে স্বামী সুখ থেকে বঞ্চিতা সে। একদিকে কপালকুণ্ডলা স্বামীকে কাছে পেয়েও স্বামীর প্রণয় বুঝতে পারেনি, এরই বিপরীতে স্বামীকে কাছে না পেয়ে স্বামী বিরহে কাতর শ্যামাসুন্দরীর ছবি ঔপন্যাসিক বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই ফুটিয়ে তুলেছেন। কপালকুণ্ডলার বিপরীতে একটি বিপরীতধর্মী চরিত্র সৃষ্টি করার লক্ষ্য যাতে কপালকুণ্ডলাকে আরও উজ্জ্বল করে দেখানো যায়। অর্থাৎ শ্যামাসুন্দরীর সাপেক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র কপালকুণ্ডলাকে দেখতে চেয়েছেন এবং দেখাতে চেয়েছেন পাঠকদের।

স্বামীকে বশীভুত করার জন্য শ্যামাসুন্দরীর হয়ে বনলতা তুলতে গিয়ে কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে যবনিকার সূত্রপাত অঙ্কন করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। ব্রাহ্মণবেশী মতিবিবি এবং কাপালিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে কপালকুণ্ডলা অন্তিম পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়। তাই বলা চলে, অপ্রধান চরিত্র হলেও কপালকুণ্ডলার পরিণতিতে শ্যামাসুন্দরীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

অধিকারী : উপন্যাসের অপ্রধান চরিত্রদের মধ্যে আরেকটি চরিত্র অধিকারী। কপালকুণ্ডলা ও নবকুমারের মধ্যে সাক্ষাৎ হলেও বিবাহ বন্ধন সম্পন্ন হয়েছে অধিকারী জন্যই। নবকুমার ও কপালকুণ্ডলার বিবাহে সম্মতিসূচক মা কালীর পাদপদ্মে প্রদেয় বিল্বপত্রের ওপর নির্ভর করে অধিকারী তার দৈব-বিশ্বাসের পরিচয় দিয়েছে।

বৃদ্ধ চরিত্র : নবকুমারের সাথে অন্যান্য চরিত্রের পার্থক্য বোঝাতে ঔপন্যাসিক প্রথমেই অবতারণা করলেন একটি অপ্রধান চরিত্র বৃদ্ধ চরিত্রের। এই বৃদ্ধ গঙ্গাসাগর থেকে ফিরে আসা নৌকার তীর্থযাত্রীদের একজন, যে

কেবলমাত্র পুণ্য সঞ্চয় করার উদ্দেশ্য নিয়ে গঙ্গাসাগরে গিয়েছিল। নবকুমারের সাথে কথোপকথন কালে একথা জানিয়েছে সে। অবস্থাসম্পন্ন সেই বৃদ্ধ পুণ্যসঞ্চয় করে ফেরার পথে চিন্তিত হয়ে পড়েছে তার বিশ-বাইশ বিঘা ধানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে। দুষ্কৃতীরা যদি সেই ধান কেটে ফেলে তবে বিপুল ক্ষতির সম্ভাবনা। অর্থাৎ পুণ্যসঞ্চয় করতে এসেও বৃদ্ধ যে বৈষয়িক চিন্তাভাবনার বৃত্ত থেকে দূরে সরতে পারেনি তা পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়। অন্যদিকে নবকুমার কেবল সমুদ্র দেখার সাধ নিয়ে গঙ্গাসাগরে এসেছে।

৪.৯ 'কপালকুন্ডলা'-র শ্রেণিবিচার

একটি উপন্যাসকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্লেষণ না করে তার শ্রেণি বিচার করা কঠিন কাজ। 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের মোটামুটি সমস্ত বিষয় আমরা অবগত হয়েছি। যিনি প্রথম এই উপন্যাস পড়বেন, কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের নামকরণ নিয়ে তার মনে একটা খটকা লাগবে। যখন উপন্যাস পড়তে গিয়ে জানতে পারবেন ভবভূতির 'মালতীমাধব' কাহিনির প্রধান নারী চরিত্রের নামও কপালকুণ্ডলা তখন বিষয়ে কৌতূহল আরও বাড়বে।

পূর্বেই বলেছি, তবুও আর একবার জানিয়ে রাখি অনেক সমালোচক মনে করেন বঙ্কিমচন্দ্র ভবভূতির নাটক 'মালতীমাধব' থেকে এই নামকরণটি গ্রহণ করেছেন। কেননা অঘোরঘণ্ট নামে এক কাপালিকের শিষ্যার নামও কপালকুণ্ডলা। শুধু পার্থক্য এই যে মালতিমাধবের কপালকুণ্ডলা কাপালিকের নরবলির জন্য প্রভূত সাহায্য করেছে আর বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা তার বিপরীতে গিয়ে কাপালিকের মুখ থেকে নবকুমারকে প্রাণ দান করেছে। একজন নেগেটিভ চরিত্র হিসেবে কপালকুণ্ডলার ছবি এঁকেছেন, আরেকজন পজেটিভ করে এঁকেছেন চরিত্রটিকে।

কপালকুণ্ডলা গ্রন্থটি আসলে একটি পরীক্ষা মূলক গ্রন্থ। আসলে বঙ্কিমচন্দ্রের মনের গভীরে যে চিন্তা ক্রিয়াশীল ছিল সেই চিন্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এই গ্রন্থে। যে মেয়ে আজন্ম লোকালয় থেকে দূরে থেকেছে, যৌবনে তাকে বিবাহ দিলে সে দাম্পত্য জীবন মেনে নিতে পারবে কিনা, এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে খুঁজতেই বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের সৃষ্টি। নির্জন বালিয়াড়িতে কপালকুণ্ডলার বেড়ে ওঠা, তাকে লালন পালন করেছে কাপালিক। কখনো-সখনো অধিকারীর কাছে যেত কপালকুণ্ডলা। এজন্য তার অধিকার রয়েছে কপালকুণ্ডলা উপরে ইত্যাদি সবকিছুই আমরা একে একে আলোচনার মাধ্যমে দেখেছি। এখন আলোচনা করব কপালকুণ্ডলা উপন্যাসটি কোন শ্রেণির রচনা।

৪.৯.১ কাব্য হিসেবে 'কপালকুণ্ডলা'

শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হওয়ার পাশাপাশি সমালোচিতও হয়ে থাকে নানাভাবে। কোনো কোনো সমালোচক 'কপালকুণ্ডলা'-কে একটি 'গদ্য কাব্য' বলে রায় দিয়েছেন। একথা ঠিক যে, কবিতার রচনার মধ্য দিয়েই বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য জগতে পদার্পণ করেছেন। তাই বলে এটাও কখনো পুরোপুরি সম্ভব নয় যে একজন মানুষ কবিতা লিখে সাহিত্য সমাজে পদার্পণ করলেন বলে তাঁর সমস্ত রচনাই কবিতার আভায় মণ্ডিত হবে, তা তো হতে পারে না। উপন্যাসের মধ্যে কবিত্ব গুণ থাকবে এটাও একটা উপন্যাসের গুণ।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা'-কে অনেকে 'কাব্যধর্মী উপন্যাস' বলে অভিহিত করেন। তার কারণ হলো কাব্যে অলৌকিক মায়ার জগত থাকে। অতীন্দ্রিয় জগতের বস্তু, সৌন্দর্য, প্রেম, রহস্যময়তা, অলৌকিকতাই কাব্যের বিষয়বস্তু। 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের কাব্যধর্মীতা পাঠকের মনকে অতি সহজেই বিশেষভাবে আবিষ্ট করে তোলে।

যখন দিনের শেষে সূর্য দিগন্ত রেখার উপর পতিত হয়ে অপূর্ব শোভা বিতরণ করতে থাকে ঠিক তেমনি কাব্য ধর্ম এই উপন্যাসটিতে প্রাণ দান করেছে।

প্রকৃতি-প্রীতি ও সৌন্দর্য-প্রীতি কাব্যধর্মীতার একটি বিশেষ লক্ষণ। নবকুমারের চরিত্রে কবিস্বভাব লুকিয়ে ছিল। তাই তার অন্তরে নিহিত ছিল এক অসাধারণ প্রকৃতি-প্রীতি। সীমাহীন সমুদ্রের জলরাশি দেখে তার কবি হৃদয় তাড়িত হয়ে উঠেছে, আর উচ্চারণ করেছে ''দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী...''

নবকুমারের সৌন্দর্যবোধ আরও দেখা গেছে কাপালিকের কুটিরে প্রথম রাত্রি কাটানোর পর, দ্বিতীয় দিন অপরাহ্নে যখন সমুদ্রের তীরে উপস্থিত হয়ে সেই সমুদ্র-সুষমা আহরণ করেছে সে বালিয়াড়িতে বসে। কপালকুণ্ডলার সঙ্গে যখন তার প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছে তার বর্ণনা দিতে গিয়ে নবকুমারের মনের কাব্যিক লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। তার মনে হয় সে মূর্তিটির মধ্যে যে একটি মোহিনীশক্তি ছিল যা বর্ণনা করতে পারা যায় না 'অর্ধচন্দ্রনিঃসৃত কৌমুদীবরর্ণ, ঘনকৃষ্ণ চিকুরজাল...'ইত্যাদি।

এছাড়াও উপন্যাসে বেশ কিছু উক্তি রয়েছে যা কাব্যসুষমা বহন করে। যেমন —

'পাষাণমধ্যে অগ্নি প্রবেশ করিয়াছিল। পাষাণ দ্রব হইতেছিল।'

'ইন্দ্রিয়সুখান্বেষণে আগুনের মধ্যে বেড়াইয়াছি, কখনও আগুন স্পর্শ করি নাই। এখন একবার দেখি, যদি পাষাণ মধ্যে খুঁজিয়া একটা রক্তশিরাবিশিষ্ট অন্তঃকরণ পাই।'

'পুরুষের বাতাসে যোগিনীও গৃহিণী'

'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাস থেকে কাব্যিক লক্ষণযুক্ত চরণের উদাহরণ দিলে শেষ হবে না হয়তো, কারণ কাব্যের আখ্যান থেকে এরূপ নানাবিধ উক্তির সন্ধান মেলে। তা সত্ত্বেও বলতে হবে এটি বঙ্কিমচন্দ্রের 'গদ্য কাব্য' নয় কারণ কাব্যের আখ্যান এবং চরিত্র সৃষ্টির কোনো দায় থাকে না কাব্যের। শুধু আখ্যানের অবলম্বন হিসেবে চরিত্র আসেনি তাদের জীবন্ত করার চেষ্টা তিনি করেছেন। সুতরাং কাব্যরস, এর কাব্যিক উপভোগ্যতা বাড়াতে পারে কিন্তু 'কপালকুণ্ডলা'-কে 'গদ্য কাব্য' বলা চলে না।

৪.৯.২ উপন্যাস হিসেবে 'কপালকুণ্ডলা'

উপন্যাসের যে লক্ষণগুলি দ্বিতীয় এককে আপনারা পাঠ করেছেন সেগুলি একবার মনে করুন। এর মধ্যে দুটি শর্ত, গণতন্ত্রের বা জনজাগরনের প্রতিষ্ঠা ও ছাপাখানা আবিষ্কার বাদ দিলে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি ফুটে ওঠে।

ক. প্রথমেই বলা হয়েছিল যে উপন্যাস হবে মানুষের গল্প, মানবতার গল্প, তার সুখ দুঃখের গল্প। 'কপালকুণ্ডলা' গ্রন্থে একটা অলৌকিকতার পরিমণ্ডল আছে কিন্তু এ গল্পে মানুষ ও মানবতার প্রভাব সবচেয়ে বেশি স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। নবকুমার সৌন্দর্যের পুজারী এবং প্রকৃতি প্রেমিক, যে নানা রকম ভাগ্য বিপর্যয়ের মাঝে নিজের প্রথম স্ত্রীকে হারিয়ে কপালকুণ্ডলাকে দ্বিতীয়বার পেয়েছে। নবকুমার তাকে প্রণয় নিবেদন করেছে, ভালোবাসার সংসার গড়ে তুলতে চেয়েছে। কিন্তু সেই নারী কপালকুণ্ডলা ভিন্ন পরিবেশে লালিতা-পালিতা হওয়ার জন্য তার কাছে প্রণয়, দাম্পত্য জীবন গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে। প্রেম সম্পর্কে কপালকুণ্ডলার ঔদাসীন্য কাটেনি। নবকুমারের উদাসীনতার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে সে। কপালকুণ্ডলার মনে প্রেম জাগিয়ে তুলতে না পেরে একটা সময় কপালকুণ্ডলাকে হত্যা পর্যন্ত করতে চেয়েছে নবকুমার। অন্যদিকে প্রবল জীবন তৃষ্ণার প্রতীক হিসেবে দেখানো হয়েছে পদ্মাবতী বা মতিবিবিকে, যে প্রেম পাওয়ার জন্য যে কোনো কাজ করতে পিছপা নয়।

খ. বাস্তবতা হলো উপন্যাসের প্রাণ। এ কথা বারবার বলা হয়েছে। উপন্যাস সৃষ্টির আগে রূপকথা, দেব-দেবীদের মাহাত্ম্য, মঙ্গলগান ইত্যাদি প্রচলিত থাকলেও সেগুলি কখনোই উপন্যাস হয়ে ওঠেনি। তার কারণ সেখানে বাস্তবতার অভাব রয়েছে, বিশ্বাসযোগ্যতার অভাব রয়েছে। সেই কারণেই উপন্যাসের বৃত্ত এমনভাবে নির্মাণ করতে হয় যাতে সমগ্র গল্পটা একটা কার্যকারণ সূত্রে বেঁধে রাখতে পারা যায়। আর এই কার্যকারণ সূত্রে বেঁধে ফেলার কাজ করে বাস্তবতা। পুরো কাহিনিটাই বঙ্কিমচন্দ্র আগের থেকে চিন্তা করে তাকে বাস্তবায়িত করতে চেষ্টা করেছেন। সে দিক থেকে এটিকে উপন্যাস বলে স্বীকার করতেই হয়।

গ. উপন্যাসের মধ্যে জগৎ এবং জীবন সম্পর্কে ঔপন্যাসিকের একটা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থাকা প্রয়োজন। সেটি কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই। সেইজন্য অন্যদেরকে মতামত মেনে নিতে আপত্তি আছে। চরিত্রের যেমনভাবে স্বাভাবিক আচরণ করা উচিত, উপন্যাসে তেমনি দেখিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র। দাম্পত্য জীবনের মূলে রয়েছে প্রেম, জৈবিক চাহিদা নয়। সেই প্রেম ষোলো বছর বয়স পর্যন্ত যার মনে জেগে ওঠার অবকাশ পায় নি বা অবকাশ হয়নি, পরেও তা পরিণত হতে পারে না বা জাগাতে পারে না— এই ধরনের একটি জীবনবোধ এখানে প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং 'কপালকুণ্ডলা'-কে উপন্যাস না বলার কোন কারণ নেই।

৪.৯.৩ রোমান্সধর্মী রচনা হিসেবে 'কপালকুণ্ডলা'

'কপালকুণ্ডলা'-কে রোমান্সধর্মী উপন্যাস বলা যায় কিনা সেই বিষয়ে আলোচনা করার আগে আমাদের স্মরণ করা উচিত রোমান্সধর্মী উপন্যাস বলতে কী বোঝায়? এই মডিউলের একেবারে প্রথম দিকে সে বিষয়ে বিস্তৃত আকারে আলোচনা হয়েছে। 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের চরিত্ররা আমাদের বিশেষ পরিচিত নয়। অর্থাৎ আমাদের পরিচিত অভিজ্ঞতার জগত থেকে পাত্র-পাত্রী ও ঘটনা যখন আহরণ করা হয় তখন তাকে আমরা বলি 'নভেল' যার পাত্র-পাত্রী আমাদের অপরিচিত, ঘটনা ধারার ঠিক অভিজ্ঞতার মধ্যে পড়ে না, অথচ মানবিক সুখ দুঃখের কাহিনি এখানে এমন ভাবে উপস্থাপিত করা হয় যাতে পাঠকের কৌতূহলী ও উৎসাহিত হওয়ার কারণ থাকে এই ধরনের উপন্যাসকে আমরা বলে থাকি 'রোমান্স'। 'কপালকুণ্ডলা'-য় যেহেতু দ্বিতীয় ব্যাপারটি ঘটেছে তাই আমরা 'কপালকুণ্ডলা'-কে রোমান্স উপন্যাস বলতে পারি।

একটু বিস্তৃত আকারে যদি বলা যায় তাহলে দেখব, আমাদের আটপৌরে জনজীবনের সঙ্গে উপন্যাসের চরিত্রগুলির একটা দূরত্ব বজায় রয়েছে অর্থাৎ আমাদের বিশেষ পরিচিত নয়। এমনকি, যে ঘটনার মধ্য দিয়ে উপন্যাস এগিয়ে চলেছে সেই ঘটনা আমাদের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত নয়। নায়ক-নায়িকার কাহিনি এমনভাবে সংস্থাপন করেছেন ঔপন্যাসিক যাতে পাঠক এর দ্বারা উৎসাহিত এবং কৌতূহলী হয়। অর্থাৎ রোমান্সধর্মী উপন্যাসের প্রায় বৈশিষ্ট্যগুলি কপালকুণ্ডলার সঙ্গে একাত্ম। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের এই গ্রন্থটিকে আমরা রোমান্স জাতীয় রচনা উপন্যাস বলতে পারি। আর যেহেতু এখানে পাত্র-পাত্রী কিছু ইতিহাস থেকে নেওয়া হয়েছে তাই আমরা এটিকে 'ঐতিহাসিক রোমান্স' বলতে পারি তবে বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক রোমান্স কিন্তু 'কপালকুণ্ডলা' নয়।

৪.৯.৪ কাব্যিক-রোমান্সধর্মী রচনা হিসেবে 'কপালকুণ্ডলা'

'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে যে রোমান্সধর্মী তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কাব্যিক রোমান্স বলতে গেলে যা বোঝায় তা আমাদের একটু জেনে নেওয়া প্রয়োজন। যে রোমান্সের বিষয়বস্তু লেখকের কল্পনাতে প্রথম দেখা দেয়, তারপর বাস্তব পরিবেশ, বিশ্বাসযোগ্য পাত্র-পাত্রী, বুদ্ধির দ্বারা সাহিত্যের রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন, তাই

হল 'কাব্যিক রোমান্স'।

আকবরের মৃত্যু, যুবরাজ সেলিমের রাজ সিংহাসন লাভ, দিল্লির আমির-ওমরাহদের অবস্থান ইত্যাদি নানা ঐতিহাসিক বিষয় লেখক উপন্যাসের মধ্যে এনেছেন মতিবিবি চরিত্রের মধ্য দিয়ে। মতিবিবি লেখকের কল্পনা। সেই কল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে গিয়ে তিনি এই ঐতিহাসিক কাহিনিগুলির শরণাপন্ন হয়েছেন। এতে যে মতিবিবির কাহিনী বাস্তবতা পেয়েছে, সেই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আর মূল পরিকল্পনায় যে কাব্যিক রোমান্স সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

নবকুমারের দৈব দুর্বিপাক, সেখান থেকে কপালকুণ্ডলা তাকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছে, উভয়ের মধ্যে বিবাহ হয়েছে, কিন্তু দাম্পত্য জীবনে কপালকুণ্ডলা মানিয়ে উঠতে পারেনি ইত্যাদি সমস্ত ঘটনাই কাব্যিক রোমান্সের ফসল।

তবে এটা স্বীকার করতে হবে যে, প্রক্রিয়ার সাথে মিল থাকলেই তাকে যথাযথ রোমান্স আখ্যা দিতে পারি না, কাহিনিকে বাস্তব করে তুলবার জন্য যথেষ্ট সর্তকতা এবং নিষ্ঠা থাকা প্রয়োজন। তবেই কাব্যিক রোমান্স সৃষ্টি করা সম্ভব। বঙ্কিমচন্দ্র 'কপালকুণ্ডলা'-র মধ্যে কাব্যিক রোমান্স সৃষ্টি করতে পারলেও 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসটি একটি যথার্থ উপন্যাস হিসেবে মান্যতা পায়, সমস্ত কিছু ছাপিয়ে।

৪.১০ সারাংশ

'কপালকুণ্ডলা' প্রণেতা বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা উপন্যাসের পথিকৃৎ। তাঁর সমকালে অন্যান্য লেখকদের মধ্যে সর্বপ্রথম তিনিই উপন্যাসে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' ১৮৬৬ সালে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে একে একে তিনি বিখ্যাত সব উপন্যাস পাঠকদের উপহার দেন। 'কপালকুণ্ডলা'-র মূল কাহিনিতে নবকুমার ও কপালকুণ্ডলার কাহিনির পাশাপাশি মতিবিবির গল্প ও শ্যামাসুন্দরীর গল্প উপকাহিনি হিসেবে সংযোজিত হয়েছে।

উপন্যাসের মধ্যে বিভিন্ন চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়ে তিনি পাঠকের কৌতুহলকে বাড়িয়ে তুলেছেন। মতিবিবির মতো অতি বাস্তব চরিত্রচিত্রণের ক্ষেত্রে তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। পাশাপাশি কাহিনি বিন্যাসের সময় বাস্তবতার প্রসঙ্গটিও সযত্নে লক্ষ্য রেখেছেন। কাপালিক চরিত্র নির্মাণের সময় তাকে কেবল সাধক হিসেবেই অঙ্কন করেননি, বরং বিকৃত মানসিকতার একটি ক্ষমতালোভী মানুষ হিসেবে অঙ্কন করেছেন। কপালকুণ্ডলা ও নবকুমারের প্রেম ও প্রণয় যে কারণে পরিণতি পায়নি তারও ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ভাষা, বর্ণনারীতির ক্ষেত্রে যথেষ্ট স্বাক্ষরতার পরিচয় স্থাপনা করেছেন। সামগ্রিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা চলে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই নিজের মাইলস্টোন হয়ে আছেন।

উপন্যাসের কাহিনিকে পাঠকের কাছে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে ঔপন্যাসিক নানা ঐতিহাসিক সত্য ঘটনার উল্লেখ করেছেন। কল্পিত কাহিনির সঙ্গে ইতিহাসের সত্যতা জুড়ে দিয়ে কাহিনির বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করেছেন। চরিত্রচিত্রণের ক্ষেত্রে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। কব্যিক ভাষারীতি, ব্যঞ্জনাময় উক্তি এবং প্রগাঢ় অনুভূতির বাহ্যিক রূপ পাঠকজগতের কাছে তুলে ধরেছেন।

৪.১১ অনুশীলনী

সামগ্রিক আলোচনা নির্ভর বিস্তৃত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী

১) 'কপালকুণ্ডলা'কে উপন্যাস না বলে অনেকে কাব্য বলতে চেয়েছেন। এ বিষয়ে আপনার মতামত জানান।

২) এক সমালোচকের মতে 'কপালকুণ্ডলা ঠিক উপন্যাস নয়; ইহার কতকটা কাব্য, কতকটা নাট্য।' আপনি এই মত সমর্থন করেন কি? সেই বিষয়ে আলোকপাত করুন।

৩) 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের শ্রেণিবিচার করুন।

৪) উপন্যাসে উপকাহিনীর প্রয়োজন হয় কেন? 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের উপকাহিনীর বিষয়ে আলোচনা করুন।

৫) 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে অলৌকিক, অতিপ্রাকৃত বা সংস্কারের কোনো পরিচয় আছে বলে মনে করেন কি? উপন্যাসের মতো আধুনিক সাহিত্যে এর কি কোনো দরকার ছিল?

৬) কপালকুণ্ডলাকে প্রায় সর্বদাই অন্ধকারে দেখানো হয়েছে, দিনের উজ্জ্বল আলোয় তাকে আমরা বিশেষ দেখতে পাই না। এমন মন্তব্যের বিশেষ তাৎপর্য আছে বলে আপনার মনে হয়?

৭) 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাস রচনার উৎস কি? এ বিষয়ে যা জানা যায় তার পরিচয় দিন।

৮) কপালকুণ্ডলার চরিত্র সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যা ভেবেছেন এবং পরিণতি যেরকম দেখিয়েছেন, তা কি আপনার স্বাভাবিক বলে মনে হয়েছে? যদি না হয়ে থাকে তবে এর স্বাভাবিক পরিণতি কী হতে পারত বলে আপনি মনে করেন?

৯) গ্রন্থের নাম যখন 'কপালকুণ্ডলা' তখন কপালকুণ্ডলাকেই বোধহয় নায়িকা করতে চেয়েছেন, কিন্তু অনেকেই মনে করেন মতিবিবিই অনেক বেশি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এ বিষয়ে আপনার অভিমত লিখুন?

১০) 'কপালকুণ্ডলা'-র কয়েকটি অপ্রধান চরিত্রের পরিচয় দিন। এই চরিত্রগুলি সৃষ্টি করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র যে সতর্ক ছিলেন, তার কী প্রমাণ পাওয়া যায়?

১১) 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে ইতিহাস থাকলেও একে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' বলা সংগত নয় কেন, বুঝিয়ে দিন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১) বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির নাম প্রকাশকালসহ উল্লেখ করুন।

২) উপন্যাসের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি কী সংক্ষেপে লিখুন।

৩) প্রথম সার্থ ঔপন্যাসিক হিসেবে কোন বৈশিষ্ট্যগুলি বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় দেখতে পাওয়া যায়?

৪) 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে শ্যামাসুন্দরীর উপকাহিনিটির গুরুত্ব কী?

৫) কাপালিক চরিত্রটি সম্বন্ধে সংক্ষেপে লিখুন।

৬) 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসটিকে কী কাব্য-রোমান্স বলা যায়?

৭) সুমতি-কুমতি প্রসঙ্গটি উপন্যাসে কেন ব্যবহৃত হয়েছে।

৪.১২ গ্রন্থপঞ্জি

১) শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*

২) সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় : *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*

৩) প্রফুল্লকুমার দাশগুপ্ত : *উপন্যাস-সাহিত্যে বঙ্কিম*

৪) মোহিতলাল মজুমদার : *বঙ্কিম-বরণ*

৫) সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত : *বঙ্কিমচন্দ্র*

৬) অরবিন্দ পোদ্দার : *বঙ্কিম মানস*

৭) মোহিতলাল মজুমদার : *বঙ্কিম বাংলার নবযুগ*

৮) প্রমথনাথ বিশী : *বঙ্কিম সরণী*

মডিউল-১ (খ)
ঘরে বাইরে : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

একক-৫ ❑ ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ ও 'ঘরে-বাইরে'

গঠন

৫.১. উদ্দেশ্য
৫.২ প্রস্তাবনা
৫.৩ ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)
৫.৪ উপন্যাস ও প্রকাশকাল
৫.৫ রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস ভাবনার ক্রমবিবর্তন ও 'ঘরে বাইরে'
৫.৬ গ্রন্থপঞ্জি

৫.১ উদ্দেশ্য

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১ -১৯৪১)-এর লেখা 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসটি বই আকারে ১৯১৬ তে প্রকাশিত হলেও প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত 'সবুজপত্র' পত্রিকায় ১৩২২ সালের বৈশাখ থেকে ফাল্গুন সংখ্যায় প্রথম ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪ -১৯১৮) সমকালে লিখিত এবং প্রকাশিত উপন্যাসটিতে রয়েছে পরিবর্তিত সময়ের বুনটে নারী পুরুষের সম্পর্কের অন্তর্বয়ন। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে বদলে যাওয়া সময়– রাজনীতি-সমকাল মানুষের জীবন ও সম্পর্ককে প্রভাবিত করেছে, বদলে দিয়েছে সমাজ নির্ধারিত দাম্পত্য সম্পর্কের চিরচেনা নিয়ম বন্ধনের অনুশাসন। সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে থাকা মানুষগুলির স্বতন্ত্র ব্যক্তি রূপে নিজস্ব অবস্থান খুঁজে নেওয়া বা খুঁজতে বাধ্য হওয়ার যে পরিবর্তিত অবস্থান, তারই ছাপ উপন্যাসে। সংস্কার অভ্যাসে তৈরি ঘর এবং বদলে যাওয়া বাইরের বড় পৃথিবীর নতুন সম্বন্ধ মানুষকে, বলা যায় বাধ্য করছে নিজেকে নিয়ে ভাবতে, নিজের পারিবারিক সামাজিক অবস্থানকে নতুন করে জেনে বুঝে নিতে — না নিয়ে তার আর কোন উপায়থাকে নি সেই নতুন আর্থ সামাজিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাভুমিতে। আধুনিককালে জাত উপন্যাসের এটাই প্রধান শর্ত। রবীন্দ্রনাথও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন তাঁর ভাবনা চিন্তায়, তারই প্রকাশ উপন্যাসে। এই এককটিতে ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ ও 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাস রচনার প্রেক্ষাপট আলোচিত হয়েছে। শিক্ষার্থী এই গুরুত্বপূর্ণ রবীন্দ্র-উপন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতটি রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলির পারম্পর্যে বুঝে নিতে পারবেন।

৫.২ প্রস্তাবনা

রবীন্দ্রনাথের ভাবনার মূল ক্ষেত্র ব্যক্তি সম্পর্ক, তার নানা ধরন, বিচিত্রধারা। অনেক আগে ভারতী পত্রিকায় লেখা 'করুণা' থেকে শুরু উপন্যাস লেখা, তারপর রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন 'বউঠাকুরানীর হাট' ও 'রাজর্ষি'— এরপর দীর্ঘ সময় আর উপন্যাস লিখছেন না। অথচ লেখা হচ্ছে একের পর এক ছোটগল্প, চলছে উপন্যাসের সঠিক ধরনের খোঁজ। ছোটগল্পগুলোতে আসছে মানুষের জীবন-সম্পর্কের নানা দিক। বিশ শতকের শুরুতে 'নবপর্যায় বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের নতুন উপন্যাস 'চোখের বালি', বাংলা উপন্যাসে এক স্বতন্ত্র ধারার সূচনা

করে। পরপর তিনটি উপন্যাস প্রকাশের পর আবার কয়েক বছরের বিরতি, তারপর 'সবুজপত্র' পত্রিকায় বিষয় ও প্রয়োগ রীতিতে উপন্যাসের নতুন পরীক্ষা 'চতুরঙ্গ' এবং 'ঘরে-বাইরে'। 'ঘরে-বাইরে' প্রথম চলিত ভাষায় তিনটি প্রধান চরিত্রের আত্মকথন রীতিতে লেখা উপন্যাস, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের ধারায় একেবারেই স্বতন্ত্র। নতুন আঙ্গিক ও ভাষারীতিতে সমকালের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে পরিবর্তিত জীবন ভাবনাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে উপন্যাসের মূল সংকট বিন্দু। প্রথাগত সামাজিক দাম্পত্যে ব্যক্তির ভূমিকা এবং অবস্থা খুঁজে দেখতে চেয়েছেন তিনি। স্বদেশী আন্দোলনের আবেগ ব্যক্তি সম্পর্ককে কীভাবে প্রভাবিত করেছে, তৈরি হয়েছে ঘর এবং বাইরের বড় পৃথিবীর নতুন সম্পর্ক। পরিবর্তিত সময়কালে স্বদেশ চেতনা এবং ব্যক্তির আত্মপরিচয়-সন্ধান উপন্যাসিকের ভাবনার বিষয়। বিভিন্ন প্রসঙ্গের বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে উপন্যাসটির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের খোঁজ এই এককটিতে করা হবে।

৫.৩ ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)

যথার্থ আধুনিক বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্পের সূচনা করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কিন্তু নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্পের আধুনিক ইতিহাস গড়ে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। উনিশ শতকে বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালে তিনি লিখেছেন মূলত দুটি উপন্যাস।

'বউঠাকুরানীর হাট' এবং 'রাজর্ষি', তারও বেশ কয়েক বছর আগে ভারতী পত্রিকার পাতায় প্রথম উপন্যাস রচনার প্রচেষ্টা 'করুণা'। তারপর বউঠাকুরাণীর হাট ও রাজর্ষি মূলত ইতিহাস আশ্রিত কাহিনি উপন্যাসের সঠিক পথের খোঁজে দীর্ঘ অনেকটা সময় কেটে যাচ্ছে, সেসময় লেখা হচ্ছে কবিতা, নাটক, ছোটগল্প, প্রবন্ধ, গান। বিশ শতকের একেবারে শুরুতে বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন পত্রিকা নবপর্যায়ের প্রকাশ, সম্পাদনার দায়িত্ব নিতে হল রবীন্দ্রনাথকে। নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শন'-এর প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হল নতুন ধারাবাহিক উপন্যাস 'চোখের বালি'র প্রথম পর্ব। 'বিনোদিনী' নামে একটি বড় গল্পের খসড়া তৈরি হয়েছিল কিছুদিন আগে — সেই লেখাটিই বিস্তৃত আকারে নতুন নামে, নারী পুরুষের সম্পর্কের বিচিত্র জটিল রসায়নে হয়ে উঠল নতুন উপন্যাস 'চোখের বালি'। বিষয় ভাবনা এবং বক্তব্যে বাংলা উপন্যাস এবং রবীন্দ্র উপন্যাসে এক নতুন ধারার সূচনা হল, 'নবপর্যায়ের বঙ্গদর্শন' পত্রিকার পাতায়। বাংলা কথাসাহিত্যে এক স্বতন্ত্র ধারার সূচনা, লেখা হল বেশ কয়েকটা উপন্যাস এবং অজস্র ছোটগল্প — বিষয় এবং প্রয়োগের নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে।

৫.৪ উপন্যাস ও প্রকাশকাল

'করুণা' — 'ভারতী' পত্রিকার প্রথম বছরে ১২৮৪-র আশ্বিন থেকে ১২৮৫-র ভাদ্র সংখ্যায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়।

'বউঠাকুরাণীর হাট' —'ভারতী' পত্রিকার ১২৮৮-র কার্তিক থেকে আশ্বিন ১২৮৫-র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। (অক্টোবর-নভেম্বর ১৮৮১ — সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৮৮২)

'রাজর্ষি' — ১২৯৩ (১৮৮৬) বই আকারে

'চোখের বালি' — নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮ থেকে কার্তিক ১৩০৯ প্রথম ধারাবাহিক প্রকাশ। চৈত্র ১৩০৯ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হচ্ছে।

'নৌকাডুবি' — নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় ১৩১০-র বৈশাখ থেকে ১৩১২-র আষাঢ় সংখ্যায় ধারাবাহিক

প্রকাশ। বই আকারে প্রকাশ ১৩১৩-য়।

'গোরা' — প্রবাসী' পত্রিকার ভাদ্র ১৩১৪ থেকে ফাল্গুন ১৩১৬-য় প্রকাশ। গ্রন্থাকারে ১৩১৬।

'চতুরঙ্গ' — সবুজপত্র পত্রিকায়, ১৩২১ অগ্রহায়ণ - ফাল্গুন ১৩২১ সংখ্যায় চারটি স্বতন্ত্র অংশে প্রকাশিত হয়। ১৯১৬-তে প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশ।

'ঘরে বাইরে' — সবুজপত্র ১৩২২-র বৈশাখ থেকে ফাল্গুন সংখ্যায়

'যোগাযোগ' — বিচিত্রা পত্রিকার ১৩৩৪-এর আশ্বিন থেকে ১৩৩৫-এর চৈত্র সংখ্যায় ধারাবাহিক প্রকাশ। গ্রন্থাকারে প্রকাশ আষাঢ় ১৩৩৬-এ।

'শেষের কবিতা' — ১৩৩৫- এর 'প্রবাসী' পত্রিকার ভাদ্র থেকে চৈত্র সংখ্যায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে প্রকাশ ভাদ্র ১৩৩৬-এ।

'দুই বোন' — বিচিত্রা পত্রিকায় ১৩৩৯-এর অগ্রহায়ণ থেকে ফাল্গুন সংখ্যায় প্রথম ধারাবাহিক প্রকাশ। ফাল্গুন ১৩৩৯-এ স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়।

'মালঞ্চ' —বিচিত্রা পত্রিকায় ১৩৪০-এর আশ্বিন , কার্তিক এবং অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। চৈত্র ১৩৪০-এ প্রথম বই আকারে প্রকাশিত হয়।

'চার অধ্যায়' —পৌষ ১৩৪১-এ স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

৫.৫ রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস ভাবনার ক্রমবিবর্তন ও 'ঘরে বাইরে'

বিশ শতকের শুরু, ১৯০১-এ বঙ্গদর্শন পত্রিকার নবপর্যায়ের প্রকাশ, সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ। প্রথম সংখ্যা থেকে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হতে থাকে নতুন উপন্যাস, 'চোখের বালি'। উনিশ শতকের শেষের দিকে খসড়া খাতায় 'বিনোদিনী' নামে যে বড় গল্পটা লেখা হয়েছিল, সেটাই পরিণত হয় এক নতুন উপন্যাসে। 'চোখের বালি' রবীন্দ্র উপন্যাস, তথা বাংলা উপন্যাসে একটা মাইলস্টোন। বিশ শতকের শুরুতে,চোখের বালি থেকে রবীন্দ্রনাথের লেখা উপন্যাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা। উপন্যাসের যে স্বতন্ত্র ধরনটির খোঁজ চলছিল তাঁর ভাবনায়, তারই এক প্রয়োগ — চরিত্রের 'আঁতের কথা' বের করে দেখানো, বর্ণনাধর্মী লেখা নয়। ব্যক্তি চরিত্রের পারস্পরিক ঘাত প্রতিঘাত এবং তার গ্রন্থিমোচনের মধ্যে দিয়েই গড়ে উঠেছে কাহিনি সূত্র। উপন্যাসে বদলে গেল নায়ক চরিত্রের সংজ্ঞা, চোখের বালি উপন্যাসে নায়ক বা মূল চরিত্র বিনোদিনী, মূল চালিকা শক্তি। 'নৌকাডুবি' উপন্যাসে চেনা সম্পর্কের নানা জটিলতার ছবি, প্রচলিত সমাজ পরিবেশ যাকে আশ্রয় দিতে পারছে না — তৈরি হচ্ছে সংকট। নারী পুরুষের স্বাধীন সম্পর্ক ব্যক্তি সম্পর্কের ধারণা সমাজে ছিল না, তাই এর সঙ্গে পরিচিত ছিল না সমাজ-পরিবার। ১৯০৭-এ লিখতে শুরু করা 'গোরা' উপন্যাসে 'দেশ' এবং তার সঙ্গে ব্যক্তির সম্বন্ধ, সমাজ-সংস্কার-অভ্যাসের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির অবস্থান এবং ভূমিকা নিয়ে ভাবছেন রবীন্দ্রনাথ। সমাজ না ব্যক্তি, সামাজিক সংস্কার না সম্পর্ক — ঈশ্বরভাবনা-ঈশ্বরভক্তি-ধর্মভাবনা, ধর্মের প্রকৃত রূপ, নানা আচার সংস্কারের সত্যতা, সমস্ত কিছুর মধ্যে মেয়েদের অবস্থান ও ভূমিকা — নানা প্রশ্ন উঠে আসছে 'গোরা' উপন্যাসে। উপন্যাসটি লেখা হচ্ছে উনিশ শতকের শেষার্ধের প্রেক্ষিতে। গোরার মা আনন্দময়ীকে সদ্য প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা পড়ে শোনাচ্ছে বিনয়। বিশ শতকের শুরুতে গড়ে ওঠা নতুন রাজনৈতিক চেতনা, সময়-রাজনীতির সঙ্গে নতুন পরিচয় মানুষের পৃথিবীটাকে অনেক বড় করে দিচ্ছে — তৈরি করছে অনেক প্রশ্ন। বদলে যাওয়া পৃথিবীতে ব্যক্তিজীবন সম্পর্কের নতুন ভূমিকা ও

অবস্থান নিয়ে ভাবতে লাগলেন রবীন্দ্রনাথ আর সেই সূত্রে খুঁজে পেলেন বিশ শতকের উপন্যাসে নিজস্ব ধরন।

পরিবর্তিত দেশকালে ব্যক্তি সম্পর্কের নানা মাত্রা নিয়ে ভাবনা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়ে গেল রবীন্দ্রনাথের লেখায়। 'নৌকাডুবি' উপন্যাসের হেমনলিনী মেয়ে বলেই কি সমাজ পরিবারের চাপিয়ে দেওয়া সব সিদ্ধান্ত তাকে মেনে নিতে হবে ! সুচরিতা ও ললিতা,'গোরা' উপন্যাসের দুই প্রধান চরিত্র, খুঁজে নিতে চেয়েছে ব্যক্তির নিজস্ব ক্ষেত্র। হিন্দু সমাজের বিনয়ের, ব্রাহ্মসমাজের ললিতাকে বিয়ে করতে গেলে কেন ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হতে হবে, সম্পর্কের সত্য অনুভবের কি মূল্য নেই? এ প্রশ্ন ললিতার। তাদের আগের প্রজন্মের আনন্দময়ীর কাছে বিয়ে শুধুমাত্র কয়েকটি মন্ত্রের উচ্চারণ নয়, দুটি মানুষের মনের মিলন, সেটাই প্রকৃত সত্য। গোরা প্রকাশের পর আবার কয়েক বছরের ব্যবধান, ১৯১৪-য় প্রকাশিত 'সবুজপত্র' পত্রিকার পাতায় প্রথমে চার সংখ্যায় চারটি বড় গল্প, পড়ে একত্রে 'চতুরঙ্গ' উপন্যাস এবং ১৩২২-এর বৈশাখ থেকে ধারাবাহিক রূপে 'ঘরে-বাইরে'। তিনটি চরিত্রের আত্মকথনে বাংলা উপন্যাসে এক নতুন ধরণের প্রয়োগ। মেয়েদের খাঁচার জীবনে সন্তুষ্ট বিমলা, জমিদার পরিবারের 'ছোটরানী' পরিচয় এবং স্বামী-দাম্পত্য সম্পর্কের প্রতি একনিষ্ঠতায় গর্বিত ছিল সে। স্বদেশী উন্মাদনার জোয়ারে এসে উপস্থিত হওয়া সন্দীপকে কেন্দ্র করে পারিবারিক নিরাপত্তার আশ্রয় ভেঙে, জগৎ জীবনের সঙ্গে নতুন পরিচয়ে চিনে নিতে হচ্ছে নিজেকে। এর আগে স্বামী নিখিলেশ বাইরের বড় পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয় করাতে চাইলে সে রাজি হয়নি কিন্তু রাজনীতির ঝোড়ো হাওয়া, সন্দীপের প্রতি মুগ্ধতা জীবনের সমস্ত প্রচলিত ধারণা বদলে দিয়ে, নিয়ে এল উন্মুক্ত পৃথিবীর মাঝখানে। নতুন করে চিনল নিজেকে, স্বামী নিখিলেশকে, মিথ্যে 'জন্মতিথি'র পালনে আবার নতুন ভাবে শুরু করতে চাইল জীবনটাকে। 'বউঠাকুরানীর হাট' (১২৮৯) এবং 'রাজর্ষি' (১২৯৩) লেখার পর বেশ কয়েক বছর কোনও উপন্যাস লিখছেন না রবীন্দ্রনাথ। জমিদারি দেখাশোনার দায়িত্ব পেয়ে চিনলেন পূর্ব বাংলা, সেখানকার মানুষজন ও তাদের দৈনন্দিন জীবনযাপন। লেখা হতে লাগল একের পর এক ছোটগল্প — হিতবাদী-সাধনা-ভারতী পত্রিকার তাগিদও ছিল লেখার জন্য। অসাধারণ কিছু বিষয়, অনেক চরিত্র তার বিচিত্র ধরন, মানুষের সম্পর্কের বিভিন্ন দিক হয়ে উঠল লেখার বিষয় আর বোধহয় খোঁজ চলতে লাগল উপন্যাসের একটি স্বতন্ত্র ধরনের।

ছোটগল্পের ছোট পরিসরে জীবনকে দেখতে দেখতেই বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনের নবপর্যায়ে (বৈশাখ, ১৩০৮) নতুন সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের লেখা নতুন উপন্যাস 'চোখের বালি'। তারপর ১৩১০-এর বৈশাখ থেকে ১৩১২-র আষাঢ় সংখ্যা পর্যন্ত প্রকাশিত হতে লাগল আর একটি উপন্যাস 'নৌকাডুবি' এবং ১৩১৪-এর ভাদ্র থেকে তিন বছর ধরে প্রবাসী পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে লেখা হয়েছিল দীর্ঘ উপন্যাস 'গোরা'। বিশ শতকের শুরুতে সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের মনোবিকলন তত্ত্ব মানবমনের গভীর গোপন অন্ধকার স্তরগুলিকে অনাবৃত করে দিল। নারী পুরুষের পারস্পরিকতার সূত্রগুলি খুঁজে নিতে চেয়েছিলেন ফ্রয়েড আর আস্থা রেখেছিলেন সাহিত্যিকের ওপর, তিনি এই তত্ত্বকে প্রয়োগ করবেন জীবনের ক্ষেত্রে। অনেক পরে লেখা 'চোখের বালি'র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ মনের অভ্যন্তরে 'আগুনের জ্বলুনি হাতুড়ির পিটুনি' অর্থাৎ নানা ঘাত-প্রতিঘাতের কথা বলেছেন এবং এই 'আঁতের কথা' বের করে দেখানোই আধুনিক উপন্যাসের লক্ষণ বলে উল্লেখ করেছেন। তার অনেক আগেই সবুজপত্রে উপন্যাস লিখতে গিয়ে আত্মকথন রীতি গ্রহণ করলেন, চরিত্রকে খুলে মেলে ধরার প্রয়োজনে। 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে সামাজিক দাম্পত্যের চেনা কাঠামো সম্পূর্ণ হচ্ছে, ব্যক্তি সম্পর্কের অনুভবে। ঘর আর বাইরের নতুন সম্বন্ধ পুরনো অভ্যাস-সংস্কার গুলি বদলে দিচ্ছে। তিনটি চরিত্রের আত্মকথন রীতিতে প্রথম চলিত ভাষায় লেখা উপন্যাস 'ঘরে

বাইরে'। এর আগে লেখা চতুরঙ্গের দামিনীকে স্বামী মৃত্যুর সময় সমস্ত সম্পত্তি সহ গুরুদেবের আশ্রমে দান করে যায়। প্রচলিত পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোয় দশ-পঁচিশের গুটি হতে চায়নি দামিনী, সমাজ চিহ্নিত বৈধব্যকে অস্বীকার করে সে বাঁচতে চেয়েছিল। স্বামীর অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছিল সমস্ত জীবন দিয়ে। 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসের শেষে বিমলা সন্দীপকে বলেছে তার একলা থাকার প্রয়োজন রয়েছে — সে নিজের সঙ্গে কথা বলতে চাইছে, নিজেকে বুঝতে চাইছে, সেই সতীত্বের গর্ব করা, সুলক্ষণের জোরে রাজবাড়িতে ছোটরানী হয়ে আসা, শ্যামলা মেয়েটি। মিস গিল্‌বির কাছে লেখাপড়া শেখা বিমলার একালের সঙ্গে একালের ভাষাতেই পরিচয় কিন্তু সে প্রথাগত দাম্পত্যে বিশ্বাসী ছিল। স্বামী নিখিলেশের ভাবনার জগতটা ছুঁতে না পেরে মনে হত তার একটু মন্দ হবার মত তেজ থাকা উচিত বিমলার ভালবাসা পুজো করতে চাইত, 'ভোরের বেলা উঠে অতি সাবধানে যখন স্বামীর পায়ের ধুলো নিতুম তখন মনে হত, আমার সিঁথির সিঁদুরটি যেন শুকতারার মতো জ্বলে উঠল'। বিমলা ভাবত, 'সে আমার পুণ্য নয় — সে আমার নারীর হৃদয়, তার ভালোবাসা আপনিই পূজা করতে চায়', ঈর্ষাও করত নিখিলেশ-মেজরানীর সখ্যতায়। বিমলার গড়ে তোলা জগতটাকে ভেঙে দিচ্ছে স্বদেশী উন্মাদনার জোয়ারে আসা সন্দীপ। খাঁচায় তৃপ্ত থাকা বিমলার খাঁচা ভেঙে গেল, সন্দীপের মিথ্যে স্বদেশী ভাবনায় মোহগ্রস্ত বিমলা, দেশের নামে মোহর চুরি করে ঘর হারাল, নিজের কাছে অপরাধী হল। অহং বিসর্জন দিয়ে 'অমনি' পাওয়া 'ফাঁকি দিয়ে' পাওয়া স্বপ্নে না মেলা রাজপুত্র স্বামীর মধ্যেকার মানুষটাকে চিনতে শিখল, নিজেকেও চিনল। বিমলা বলেছে,'দীর্ঘকাল ধরে প্রতিদিন সৌভাগ্যের ঋণ শোধ করতে হয়, তবেই স্বত্ব ধ্রুব হয়ে ওঠে। ভগবান আমাদের দিতেই পারেন, কিন্তু নিতে হয় নিজের গুণে'।

প্রচলিত সামাজিক সংস্কারে, স্ত্রীর কাছে স্বামী ব্যক্তি নয় সংস্কার দাম্পত্য প্রেম স্বাভাবিক হৃদয়বৃত্তি নয়, সামাজিক হৃদয়বৃত্তি। ১৩৩৫-এর প্রবাসী ভাদ্র-চৈত্র সংখ্যায় লেখা 'শেষের কবিতা' উপন্যাসে অমিত বলেছে, মেয়ে বিয়ে করত পুরাকালে লক্ষণ মিলিয়ে,'আমি চাই পাত্রী আপন পরিচয়ে যার পরিচয়'। 'বিচিত্রা' পত্রিকায় প্রায় একই সময়ে (আশ্বিন ১৩৩৪ — চৈত্র ১৩৩৫) লেখা হচ্ছে আর একটি উপন্যাস,'যোগাযোগ'—ছোট থেকে যে সংস্কারের উত্তরাধিকার নিয়ে বড় হয়েছিল উপন্যাসের মূল চরিত্র কুমুদিনী, বাস্তব জীবনটা তার সঙ্গে মিলল না। স্বামী-দাম্পত্য-জীবন সবই ঈশ্বরের নির্বন্ধ বলেই বিশ্বাস করত সে। 'মা কি ছেলে বেছে নেয়? ছেলেকে মেনে নেয়। কুপুত্রও হয়, সুপুত্র হয়। স্বামী তেমনি'। কুমু নির্দ্ধিধায় স্বামী মধুসূদনকে গ্রহণ করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেছিল। তার বিশ্বাসে বিয়ে ঈশ্বরের নির্বন্ধ, স্বামী কেবলমাত্র একজন ব্যক্তি নয় 'স্বামী', তাকে গ্রহণ করতে হয়, নির্বাচন করে বেছে নেওয়া যায় না। মেয়েদের বিয়ের ক্ষেত্রে 'নিজের পছন্দ বলে যে একটা উপসর্গ আছে এ চিন্তা কখনো কুমুদিনীর মাথায় আসেনি'। কুমুদিনী এবং মধুসূদনের বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে তার দাদা বিপ্রদাসের দ্বিধাতে কুমু আশ্চর্য হয়েছে কিন্তু বিবাহিত জীবনে অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও মধুসূদনকে গ্রহণ করতে পারেনি। মধুসূদনের মানসিক স্থূলতা ভয়ংকর আত্মগর্ব এবং কুমুদিনীর দাদা বিপ্রদাস ও তার পরিবারের প্রতি অসম্মানবোধ কুমুদিনীর নিজস্বতা ও ব্যক্তিত্বে আঘাত করেছিল। সংস্কার-বিশ্বাসের প্রতি আনুগত্য আর থাকেনি। 'শ্রদ্ধাহীন আত্মসমর্পণের গ্লানি'র অনুভব সামাজিক দাম্পত্যে অন্য মাত্রা এনেছে। কুমুদিনী বলেছে,'জানি, স্বামীকে এই যে শ্রদ্ধার সঙ্গে আত্মসমর্পণ করতে পারছি নে এ আমার মহাপাপ। কিন্তু সে পাপেও আমার তেমন ভয় হচ্ছে না যেমন হচ্ছে শ্রদ্ধাহীন আত্মসমর্পণের গ্লানির কথা মনে করে'। এর কয়েক বছর পর হিবার্ট বক্তৃতামালা (১৯৩০) 'Religion of Man' এবং এই ভাবনারই বাংলা রূপান্তর 'মানুষের ধর্ম' (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দেওয়া 'কমলা বক্তৃতা', ১৯৩৩)-এ রবীন্দ্রনাথ বলছেন,'মানুষকে বিলুপ্ত করে যদি মানুষের মুক্তি, তবে মানুষ হলুম কেন'। ১৯৩৩-এই লেখা (কার্তিক,

১৩৪০) 'চোরাই ধন' গল্পে কথক বলছে, 'দাম্পত্যের স্বত্ব সাব্যস্ত করতে হয় প্রতিদিনই নতুন করে, অধিকাংশ পুরুষ ভুলে যায় এই কথাটা'। বলেছেন,'প্রত্যেক মানুষেরই আছে একজন আমি, সেই অপরিমেয় রহস্যের অসীম মূল্য যোগায় ভালবাসায়। অহংকারের মেকি পয়সা তুচ্ছ হয়ে যায় এর কাছে। সুনেত্রা আপন মনপ্রাণ দিয়ে এই পরম মূল্য দিয়ে এসেছে আমাকে, আজ একুশ বছর ধরে'। তার আর সুনেত্রার একুশ বছরের দাম্পত্যের কথায় বলেছেন, 'ওর নিখিল জগতের মর্মস্থান অধিকার করে আছি আমি, সেজন্যে আমাকে আর কিছু হতে হয়নি সাধারণ জগতের যে কেউ হওয়া ছাড়া। সাধারণকেই অসাধারণ করে আবিষ্কার করে ভালোবাসা। শাস্ত্রে বলে আপনাকে জানো। আনন্দে আপনাকেই জানি আর-একজন যখন প্রেমে জেনেছে আমার আপনাকে'। ঠিকুজি কুষ্ঠির শাস্ত্রসম্মত সামাজিক মিল এখানে হয়নি বরং হৃদয়ের সত্য অনুভবেই কেটেছে একুশ বছরের দাম্পত্য।

সামাজিক অনুশাসনের সীমা পার করে, রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় ক্রমশ ব্যক্তি গুরুত্ব পাচ্ছে। ১৯১১-য় লেখা 'অচলায়তন'-এ আচার্য পঞ্চককে বলেছিলেন,'মানুষের মন মন্ত্রের চেয়ে সত্য, হাজার বছরের অতি প্রাচীন আচারের চেয়ে সত্য'। পুরনো ক্লিশে অচল অনড়তায় ঘা দিলেন, অচলায়তনের উত্তর দিকের দেওয়ালটা ভেঙে দিলেন দাদাঠাকুর। তার আগেই ১৯১০-এ প্রকাশিত গোরা উপন্যাসে আনন্দময়ী বলছেন,'মানুষের সঙ্গে মানুষের মনের মিল নিয়েই বিয়ে — সে সময়ে কোন মন্তরটা পড়া হল তা নিয়ে কী আসে যায় বাবা'। তাঁর বিশ্বাসে,'মানুষ বস্তুতই যে কত সত্য — আর মানুষ যা নিয়ে দলাদলি করে মরে তা যে কত মিথ্যে সে কথা।

৫.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১। রবীন্দ্র উপন্যাস : ইতিহাসের প্রেক্ষিতে — ভূদেব চৌধুরি
২। রবীন্দ্রনাথ : সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত
৩। রবীন্দ্র-উপন্যাসের নির্মাণ শিল্প — গোপিকানাথ রায়চৌধুরী
৪। রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য — বুদ্ধদেব বসু

একক-৬ ❑ 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসের মূলপাঠ ও কাহিনি বিশ্লেষণ

গঠন

৬.১. উপন্যাস পাঠ

৬.২ উপন্যাসের কাহিনি বিশ্লেষণ

৬.১ উপন্যাস পাঠ

আঠারোটি পরিচ্ছেদে লেখা সম্পূর্ণ উপন্যাসটি। প্রতিটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম এক একটি চরিত্রের আত্মকথা রূপে। প্রথম পরিচ্ছেদ 'বিমলার আত্মকথা'য়,—

'মা গো আজ মনে পড়ছে তোমার সেই সিঁথির সিঁদুর, চওড়া সেই লালপেড়ে শাড়ি, সেই তোমার দুটি চোখ - শান্ত, স্নিগ্ধ, গভীর। সে যে দেখেছি আমার চিত্তাকাশে ভোরবেলাকার অরুণরাগরেখার মতো। আমার জীবনের দিন যে সেই সোনার পাথেয় নিয়ে যাত্রা করে বেরিয়েছিল। তার পরে? পথে কালো মেঘ কি ডাকাতের মতো ছুটে এল? সেই আমার আলোর সম্বল কি এক কণাও রাখল না? কিন্তু জীবনের ব্রাহ্মমুহূর্তে সেই উষা-সতীর দান, দুর্যোগে সে ঢাকা পড়ে, তবু সে কি নষ্ট হবার?'

ঘরে বাইরে উপন্যাসের মূল নারী চরিত্র 'বিমলা'। বিয়ে হয়েছে এক বনেদী জমিদার বাড়ি, তথা রাজবাড়িতে। সুন্দরী না হলে সে পরিবারে প্রবেশের ছাড়পত্র পাওয়া যায় না। বিমলা সুন্দরী নয়, সংস্কার মতে সে সুলক্ষ্মণা। নিখিলেশের ঠাকুমা, একমাত্র জীবিত বংশধরের জন্য বাড়ির দস্তুর মতো সুন্দরী নাতবৌ আনেন নি। তাঁর সংস্কার অনুযায়ী লক্ষ্মণযুক্ত একটি কন্যা নির্বাচন করেছিলেন। বিশ শতকের নিখিলেশ ছিল সেকালের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত, পরিবারের তুলনায় স্বতন্ত্র আদর্শে বড় হয়ে ওঠা। তার বড় দুই ভাইয়ের মতো বনেদিয়ানার পুরনো অভ্যাসে নিজের এবং পারিবারিক সম্পদের অপচয়ে সে আগ্রহী ছিল না। অনভ্যাসে অনেকেরই মনে হত তার চরিত্রে পুরুষের সজোর সবল তথাকথিত 'পৌরুষের' অভাব আছে।

বিয়ের পর স্ত্রী বিমলারও কখনও কখনও সেকথা মনে হয়েছে। তার রাজপুত্রের ভাবনার সঙ্গে স্বামী নিখিলেশকে সে মিলিয়ে নিতে পারেনি। বড় বেশি সাধারণ মনে হয়েছিল তবে নিজের রূপের অভাব কিছুটা মিটেছিল। মায়ের 'সতীত্বের' অর্থাৎ দাম্পত্য ও স্বামীর প্রতি একনিষ্ঠতার সংস্কার ও উত্তরাধিকার নিয়েই বিমলা শুরু করেছিল তার বিবাহিত জীবন। দাম্পত্য সম্পর্কে স্বামী-ভক্তি পুজো জীবনের স্বাভাবিক অঙ্গ বলেই সে মনে করত। যদিও নিখিলেশ অত্যন্ত সংকুচিত হত, সে লেখাপড়া শিখেছিল, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত তার মন। স্ত্রীকে লেখাপড়া আদবকায়দা শেখানোর জন্য সে মিস গিল্‌বিকে নিযুক্ত করেছিল। নিখিলেশের মাস্টারমশাই চন্দ্রনাথ বাবু তার মনের গড়নটা তৈরি করে দিয়েছিলেন। সেটা তাদের পরিবারের সংস্কারের সঙ্গে না মিললেও, ঠাকুমা তার কোন কাজে বাধা দিতেন না। বড় দুই নাতিকে তিনি অকালে হারিয়েছিলেন, বুঝতে পারতেন যে নিখিলেশ তার স্ত্রীকে খুব ভালবাসে, সম্পর্ককে মূল্য দেয়। ভাইদের মতো সুন্দরী স্ত্রীদের অবহেলা করে বাইরের অন্য নারীর প্রতি আগ্রহ তার ছিল না। সে তার সমস্ত ভাবনা দিয়ে বিমলাকেই গড়ে নিতে চেয়েছিল, উপযুক্ত জীবনসঙ্গী রূপে। বিমলার দিদি শাশুড়ি ভাবতেন সে নিখিলেশের মন ঘরে বেঁধে রাখতে পেরেছে তার ভালবাসায়, তাই খুব স্নেহ করতেন নাতবৌ কে। বিমলাকে নিয়ে নিখিলেশের নানা খেয়াল, ইউরোপীয় দোকান থেকে কিনে আনা হাল ফ্যাশানের

জামাকাপড়, তার সব সময় পছন্দ না হলেও কখনো আপত্তি করতেন না। বিমলার কথায় জানা যায়, পরের দিকে তার মানসিকতায় বদল এসেছিল, নাতবউ ইংরেজি গল্পের বই থেকে গল্প না শোনালে তিনি সন্তুষ্ট হতেন না।

বিমলার সংস্কারবাহিত মন স্বামীকে পুজো করতে চাইলেও নিখিলেশ চেয়েছিল বাইরের বড় পৃথিবীর মাঝখানে পরস্পরকে চিনে বুঝে নিতে। ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ দাম্পত্যে দুটি মানুষের পরস্পরকে চেনাজানা সম্পূর্ণ হয় না। নিখিলেশ বিমলাকে নিয়ে কলকাতায় যেতে চেয়েছিল। তার সবসময় মনে হত, আমাদের সমাজে মেয়েরা স্বামী নির্বাচনের সুযোগ পায় না। স্বামী নামক ব্যক্তিটিকে দিয়ে তার চোখ কান মুড়ে দেওয়া হয়, স্বয়ংবরা হবার সুযোগ তাদের থাকে না। নিখিলেশ স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে সামাজিক সংস্কারের বাইরে মুক্তি দিতে চেয়েছিল কিন্তু বিমলা বিশ্বাস করতো মেয়েরা খাঁচার পাখি আর সেই খাঁচার জীবনটাকেই তার স্বাভাবিক বলে মনে হত। সে ভাবত সেই খাঁচাতেই তার এত কিছু রয়েছে যে সারা পৃথিবীতেও তা থাকে না। জমিদার বাড়ি ছেড়ে কলকাতা যাবার সাধ তার ছিল না কিন্তু নিখিলেশ মিউনিসিপ্যালিটির বরাদ্দ জলের মতো মাপ করা দাম্পত্য প্রেমে বিশ্বাসী ছিল না। তার মনে হত বাইরের ঝড় ঝাপটার মধ্যে পরস্পরকে জেনে বুঝে নিতে পারলে সে সম্পর্কের বুনিয়াদ অনেক দৃঢ় হবে। বিমলা প্রথম দিকে ভাবত সে স্বামীর সঙ্গে চলে গেলে তার দিদি শাশুড়ি আঘাত পাবেন। তাঁর মৃত্যুর পর যখন আর কোনও বাধা থাকল না, তার মনে হলো বড় দুই জা, যারা সর্বদা বিমলার স্বামী সৌভাগ্যে ঈর্ষা করে তাদের হাতে রাজপাট ছেড়ে দিয়ে সে কিছুতেই কলকাতা যাবে না। সেখানে তাদের কে চেনে, গ্রামে তাদের কত মান-প্রতিষ্ঠা। তখন অত্যন্ত সাধারণ পরিবারের বিমলা সেই জমিদার পরিবারের ছোট রানীমা হয়ে উঠেছে। দুই বড়-জা সম্পর্কে তার অনেক অভিযোগ ছিল কিন্তু সে সম্পর্কে কোন কথা স্বামী নিখিলেশকে বলতে গেলে, তার প্রতিক্রিয়ায় সে নিজেই যেন নিজের কাছে ছোট হয়ে যেত। তখন মনে হত আর একটু মন্দ হবার মতো তেজ নিখিলেশের থাকা উচিৎ ছিল। নিখিলেশ ভাবত চরিত্রের 'জোর' ব্যক্তি স্বভাবের অন্তর্গত দৃঢ়তা কিন্তু আর পাঁচটা মানুষের মতো বিমলাও বাইরের জবরদস্তিকেই 'জোর' বা পুরুষের স্বভাবের অঙ্গ বলে মনে করত।

'ঘরে বাইরে' লেখা হচ্ছে ১৯১৫-য় কিন্তু উপন্যাসের প্রেক্ষাপট তার থেকে বেশ কিছু বছর আগের। ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ এবং তার পরবর্তী বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনের প্রেক্ষিতে গড়ে উঠেছে এই উপন্যাস। সেই সময়ের স্বদেশী উন্মাদনা দেশের অনেক মানুষকেই প্রভাবিত করেছিল, দেশকে ঘিরে তৈরি হয়েছিল একটা আবেগ। অধিকাংশ মানুষ সেই আবেগেই দেশকে বুঝে নিতে চাইছিল — শুরু হয়েছিল বিদেশি জিনিস বয়কট। বিলিতি কাপড় ব্যবহার না করার ঘোষণা, পুড়িয়ে ফেলা, ব্রিটিশদের তৈরি স্কুল-কলেজ ছেড়ে ছাত্রদের বেরিয়ে আসার আহ্বান জানানো।

উন্মাদনার শিকার হচ্ছিল সাধারণ দরিদ্র খেটে খাওয়া মানুষ। স্বদেশী আন্দোলনের প্রেক্ষিতে উপন্যাসের তিনটি মূল চরিত্র বিমলা, নিখিলেশ এবং সন্দীপ। নিখিলেশ বিমলার দাম্পত্য সম্পর্কে সন্দীপের প্রবেশ। স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রেই, বদলে যাচ্ছিল সম্পর্কের প্রচলিত চেনা গঠন। শুরু হয়েছে সম্পর্কের টানাপোড়েন, নানা ঘাত-প্রতিঘাত ও পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্যে দিয়ে নিজের মুখোমুখি দাঁড়ানো, নিজেকে নতুন করে খুঁজে পাওয়া। সন্দীপের মাধ্যমেই বাইরের পৃথিবী নিখিলেশ বিমলার সম্পর্কের অন্তঃপুরে প্রবেশ করলো। শুরু হল সম্পর্কের সংকট, নিখিলেশ ও বিমলার নয় বছরের দাম্পত্যের অভ্যস্ত ছন্দে এলো পরিবর্তন।

নিখিলেশ সহজে নিজেকে প্রকাশ করতে পারত না, গভীর অনুভবী এবং সংবেদনশীল মানুষ। নয় বছরের দাম্পত্যেও তাকে সব সময় বুঝতে পারত না বিমলা। অত্যন্ত কৌশলী সন্দীপের মিথ্যে স্তুতি, আবেগময় বক্তৃতায় সহজেই প্রভাবিত হল বিমলা। একসময় সন্দীপকে সে পছন্দ করত না, মনে হত নানা কৌশলে নিখিলেশের কাছে

টাকা আদায় করে, সুযোগ নেয়, প্রতারিত করে। স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ারে সন্দীপের আসা এবং তার দেশ নিয়ে আবেগে মুগ্ধ বিমলা অন্তঃপুরের চৌকাঠ পেরিয়ে পৌঁছে গেল বনেদী জমিদারবাড়ির বৈঠকখানা ঘরে। নিখিলেশের অনেক অনুরোধেও গত নয় বছরে সে রাজি হয়নি রাজবাড়ির অন্তঃপুরের বাইরে বেরোতে। স্বদেশী আবেগ, সন্দীপের অগ্নিবর্ষী বক্তৃতা, বীরপূজার মোহ বিমলাকে এমনভাবে আকৃষ্ট করলো, সে নিজেকে আর আটকাতে পারলো না। দেশের নেতাকে বরণের তাগিদে সে সহজেই সন্দীপের মিথ্যে কৌশলে, আবেগের অতি প্রকাশকে সত্যি বলে গ্রহণ করল।

দাম্পত্য জীবনে নিখিলেশের অকৃপণ ভালবাসা পেয়েছিল বিমলা, কিন্তু স্বভাব সংযত নিখিলেশের আবেগের প্রকাশ ছিল না বলে বিমলা তাকে বুঝতে পারত না। মতের অমিল হলে নিখিলেশ নিজের মতো করে স্ত্রীকে বোঝানোর চেষ্টা করত, না পারলে নিজেই চুপ করে যেত। কিন্তু বিমলা ভুল বুঝত, মনে হত সে বারবারই বুঝি ছোট হয়ে যাচ্ছে নিখিলেশের কাছে। সন্দীপ প্রথম থেকেই সুকৌশলে বিমলাকে প্রাধান্য দিতে থাকে, তাদের স্বদেশী কর্মকাণ্ডের প্রেরণা রূপে স্তুতি করত তাকে — বিমলাও আবেগপ্রবণ হয়ে ভুল বোঝে; ভাবে তার মধ্যে যে এত ক্ষমতা তা' সে আগে বোঝেনি, এভাবে কেউ বলেও নি। সে নিজেই জানে না তার সহজতার কী অসামান্য ক্ষমতা। সন্দীপের ছদ্ম আবেগে ভুল বুঝে সে ভাবল, তার এই বিশেষ ক্ষমতা এতদিনে শুধু সন্দীপের চোখেই ধরা পড়েছে। স্বদেশী সভার পরদিন রংপুর যাওয়া স্থগিত রেখে বিমলার নিমন্ত্রণ গ্রহণ এবং ক্রমশ আলাপ পরিচয়ের অগ্রগতিতে সন্দীপের সেখানে থেকে যাওয়া। সন্দীপের উপস্থিতি ঘরে বাইরে সমস্যা বাড়িয়ে তুললে মাস্টারমশাইয়ের কথায় নিখিলেশ রংপুর যাবার প্রসঙ্গে জানতে চাইলে, সন্দীপ জানায় নানা জায়গা ঘুরে কাজ করে শক্তির অপচয় না করে এক জায়গায় স্থায়ী হয়ে কাজ করতে চায়। বিমলার মত চাইলে সে প্রকারান্তরে সমর্থনই করে সন্দীপকে কারণ সন্দীপের চলে যাওয়া সেও মেনে নিতে পারে না। বিমলা বুঝতে পারে সন্দীপের প্রতি দুর্বার আকর্ষণ তার ব্যক্তিগত জীবন-ভাবনা, নিখিলেশের সঙ্গে সম্পর্ক সমস্ত কিছুকেই প্রভাবিত করছে। বদলে দিচ্ছে তাদের পারস্পরিক নির্ভরতা ও বিশ্বাসের জগত তবুও সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।

তাদের নয় বছরের দাম্পত্যে সে নিখিলেশের নিজস্ব জগতটা স্পর্শ করতে পারত না, বড় বেশি 'বড়' মনে হত তাকে আর নিজেকে নিজের কাছে বড় 'ছোট'। বিমলা ভাবত অন্য কোন কিছুতে নিখিলেশকে হারাতে না পারলেও, তার 'সতীত্ব' বা স্বামীর প্রতি একনিষ্ঠতায় নিখিলেশকে হার স্বীকার করতেই হবে। বিমলা স্বীকার না করলেও, মেজরানী-নিখিলেশ, প্রায় সমবয়স্ক দেবর বৌদিদির সখ্যতা তাকে ঈর্ষান্বিত করে তুলতো। সে জানত নিখিলেশ তাকে ভালবাসে, নিজের এরকম ভাবনায় লজ্জিত হত নিজের কাছেই তবু সংযত করতে পারত না নিজেকে। বিমলার মনোভাব বুঝতে পেরে মেজরানী নানারকম রসিকতাও করত তবে মেজরানীর সংসারের একমাত্র বন্ধন বোধহয় ছিল নিখিলেশ, স্নেহ মমতা ভালবাসায় ভরা এক পারস্পরিক নির্ভরতা ছিল তাদের। উপন্যাসে সন্দীপ আসার পর বিমলা যখন ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে, নিখিলেশ কষ্ট পাচ্ছে তবু সে জোর করে কিছু পাওয়ায় বিশ্বাসী ছিল না, তাই অপেক্ষা করছিল। যন্ত্রণাময় অপেক্ষার সেই একা সময়ে নিখিলেশকে মানসিক আশ্রয় দিয়েছিলেন চন্দ্রনাথ বাবু আর 'মেজরানীদিদি'— সে বিমলাকেও নানাভাবে সচেতন করার চেষ্টা করত, ব্যাঘাত ঘটাতে চাইত বৈঠকখানার নিভৃত আলাপচারিতায়।

বিমলা বুঝতে পারলেও প্রতিবাদ করার পরিস্থিতি ছিল না। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইলেও সন্দীপের প্রতি আকর্ষণ তাকে এতটা বদলে দিয়েছিল যে সন্দীপ ছাড়া সমস্ত জগতটাই অর্থহীন বলে মনে হত। নিখিলেশের মনে হল 'স্ত্রী' শব্দটি এত বড় নয় যে তার মধ্যে একটা গোটা মানুষকে ভরে ফেলা যায়। ছোট জায়গা থেকে বড় জায়গা, ঘর থেকে বাইরে যাবার রাস্তাটা ঝোড়ো, নিখিলেশ সেটা বিশ্বাস করত। সে ভেবেছিল, বিমলার যদি মনে হয় সে

আর নিখিলেশের সঙ্গে পথ চলতে পারছে না তাহলে স্বামীত্বের অধিকারবোধে সে কখনও বিমলাকে বেঁধে রাখতে চাইবে না। বিমলার মধ্যে যে স্বাভাবিক প্রাণময়তা আছে তার সঙ্গে যেন সন্দীপেরই বেশি মিল।

'ঘর'টা যে তাদের আর আগের মতো নেই এটা বিমলা নিখিলেশ দুজনেই অনুভব করছিল, তাদের মধ্যে দূরত্বও বাড়ছিল ক্রমশ। বিমলার মনে হচ্ছিল এই দূরত্বও সে চায়নি কিন্তু গয়নার বাক্সের আড়ালে রাখা সন্দীপের ছবিটি যে কুলুঙ্গিতে রাখা নিখিলেশের ফটোর মতো পুজো করার নয়, সম্পর্কটা যে আলাদা এটা সে অনুভব করতে পারছিল। তারই সঙ্গে সন্দীপের মিথ্যে চেহারাটাও স্পষ্ট হচ্ছিল। নিখিলেশকেও নতুন ভাবে চিনতে পারছিল বিমলা সে যে অন্য ধরণের মানুষ সেটাও বুঝতে পারছিল। কিন্তু সন্দীপের প্রতি মোহ-আকর্ষণ অস্বীকার করতে পারছিল না। সন্দীপের চাহিদায় বিমলা যখন বাধ্য হল নিজের ঘরে, স্বামীর সিন্দুক থেকে টাকা চুরি করতে, নিজের পরিবর্তনে নিজেই নিজেকে ভয় পেতে শুরু করল। অমূল্য, সেই কিশোরটি বিমলাকে সাহায্য করেছিল নিজেকে খুঁজে পেতে। যখন বিমলা একেবারে একা-নিঃসঙ্গ, নিখিলেশের সঙ্গে সম্পর্কের দূরত্বও আর সে অতিক্রম করতে পারছে না, নিখিলেশ তাকে সম্পর্ক থেকে মুক্তি দিয়েছে — সেই নিঃসঙ্গতার মুহূর্তে বিমলার একমাত্র আশ্রয় ছিল অমূল্যর নির্ভরতা। 'দিদি' বলে দেওয়া সম্মান। এর আগে যখন সে বিশেষ সাজ করে সন্দীপকে দেওয়া কথা অনুযায়ী হাট থেকে বিলিতি কাপড় সরানোর অনুরোধ করতে নিখিলেশকে ঘরে ডেকে পাঠিয়েছিল, সেই মুহূর্তে নিখিলেশেরও যেন মোহমুক্তি ঘটল। সে অনুভব করল নিজেকে

আকৃষ্ট করার জন্য বিশেষ সাজ করেছে বিমলা, সেদিন বিমলা আর বিমলার সাজ তার কাছে আলাদা হয়ে গেল। এক বিযুক্তিবোধ নিখিলেশকে সাহায্য করলো সম্পর্ক থেকে সরে আসার সিদ্ধান্ত নিতে।

স্বামী নিখিলেশের সামাজিক পরিচয় বা 'স্বামীত্বের' আড়ালে যে ব্যক্তিমানুষটি রয়েছে, যাকে বিমলা আলাদা করে খোঁজার চেষ্টাও করেনি, তাকে আজ সে চিনতে পারল। চরম একাকীত্বের মুহূর্তে সহমর্মিতার হাতটি বাড়িয়ে দিল সন্দীপের, সম্পর্ক থেকে মুক্তি দিলেও প্রিয় মানুষটি যখন মানসিক ভাবে নিরাশ্রয়, তাকে আশ্রয় দিল নিখিলেশ। উপন্যাসের মধ্য অংশে বিমলা যখন নিখিলেশের ছদ্মরূপে মোহমুগ্ধ, চন্দ্রনাথবাবু নিখিলেশকে বলেছিলেন, বিমলাকে একটু বড় জায়গা থেকে পৃথিবীটা দেখাতে। বুঝতে পারছিলেন সন্দীপকে কেন্দ্র করে স্বদেশী উন্মাদনার এক ভ্রান্ত ধারণা তৈরি হয়েছে বিমলার মধ্যে। সুযোগসন্ধানী সন্দীপ অত্যন্ত কৌশলে নিখিলেশ ও বিমলার সম্পর্কে প্রবেশ করছে, আর সন্দীপ থেকে যাবার কারণে নিখিলেশের এলাকার পরিবেশ-পরিস্থিতিও বদলে যাচ্ছে। স্বদেশী চেতনার বিস্তারের নামে সাম্প্রদায়িক বিভেদ গড়ে উঠছে নিখিলেশের জমিদারিতে যা আগে হয়নি কখনও। উপন্যাসের শেষে সেই ঝোড়ো পথটা পার হয়ে যখন নিখিলেশ ও বিমলা নতুনভাবে একসঙ্গে পথ চলার কথা ভাবছে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু করে দিয়ে সেখান থেকে বলা যায় পালিয়ে যাচ্ছে সন্দীপ। পরিস্থিতি তখন নিয়ন্ত্রণের বাইরে। নিজেকে বাঁচাতে পালিয়ে যাবার সুপরামর্শ দিচ্ছে নিখিলেশকেও। নিখিলেশ তো সন্দীপ নয়, সে ছুটে যাচ্ছে প্রজাদের মধ্যে। একেবারে শেষে বিমলা অপেক্ষা করছে নিখিলেশের জন্য, আহত নিখিলেশকে নিয়ে সবাই ফিরে আসছে — ডাক্তার বলছে কী হবে বোঝা যাচ্ছে না, আর জানা গেল অমূল্যর বুকে গুলি লেগেছে, তার মৃত্যু হয়েছে। জানলায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষারত বিমলা কথাগুলো শুনছে।

৬.২ উপন্যাসের কাহিনি বিশ্লেষণ

ঘরে বাইরে প্রথম চলিত ভাষায় লেখা উপন্যাস। আর রীতিটাও আলাদা। প্রতিটি পরিচ্ছেদ উপন্যাসের তিনটি মূল চরিত্রের আত্মকথনের ধরনে লেখা,'বিমলার আত্মকথা','নিখিলেশের আত্মকথা' বা 'সন্দীপের আত্মকথা'।

প্রথম পরিচ্ছেদ 'বিমলার আত্মকথা' — আঠারোটি পরিচ্ছেদের সাতটি বিমলার, সাতটি নিখিলেশের আর চারটি সন্দীপের কথা। চোখের বালি উপন্যাসটি বিশ শতকের একেবারে শুরুতে লেখা হলেও অনেক পরে লেখা (২৫ বৈশাখ ১৩৪৭) এই উপন্যাসের 'সূচনা' অংশে রবীন্দ্রনাথ উপন্যাস সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলেছেন,'তাই গল্পের আবদার যখন এড়াতে পারলুম না তখন নামতে হল মনের সংসারের সেই কারখানা-ঘরে যেখানে আগুনের জ্বলুনি হাতুড়ির পিটুনি থেকে দৃঢ় ধাতুর মূর্তি জেগে উঠতে থাকে। মানব-বিধাতার এই নির্মম সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার বিবরণ তার পূর্বে গল্প অবলম্বন করে বাংলা ভাষায় আর প্রকাশ পায়নি। তারপর ওই পর্দার বাইরের সদর রাস্তাতেই ক্রমে ক্রমে দেখা দিয়েছে গোরা, ঘরে বাইরে, চতুরঙ্গ'। লেখাটি শেষ হচ্ছে,'সাহিত্যের নবপর্যায়ের পদ্ধতি হচ্ছে ঘটনা পরম্পরার বিবরণ দেওয়া নয়, বিশ্লেষণ করে তাদের আঁতের কথা বের করে দেখানো। সেই পদ্ধতিই দেখা দিল চোখের বালিতে'। লেখকের কথায় 'চোখের বালি' থেকে বাংলা উপন্যাসের এক স্বতন্ত্র পথ চলার শুরু আর সেই ধারাতেই আসছে পরবর্তী উপন্যাস গুলি। আধুনিক উপন্যাসের লক্ষণ সেখানে চরিত্রের 'আঁতের কথা', অর্থাৎ অন্তর্জগতের কথা, তাদের কথাতেই উঠে আসা। সেখানে আগের ধারার উপন্যাসের,'ঘটনাপরম্পরার বিবরণ দেওয়া নয়', ঔপন্যাসিকের সর্বজ্ঞতার ভূমিকা সেখানে বদলে যাচ্ছে। ঘরে বাইরে উপন্যাসে সেই কারণেই সম্ভবত এই নতুন রীতি। চরিত্রের আত্মকথন রীতি, সেখানে প্রত্যেকে তাদের নিজেদের অন্তর্জগতের কথা, অন্যদের সঙ্গে তাদের দ্বন্দ্ব-সংঘাত অনুভব জটিলতার কথা প্রকাশ করেছে।

'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে আত্মকথনরত চরিত্রগুলির পারস্পরিক সম্পর্কে সময় রাজনীতির জটিলতা। 'ঘর' এবং 'বাইরে'র নতুন সম্বন্ধে সমকালীন পরিস্থিতির প্রবেশ। স্বদেশী আন্দোলনের আবেগ, রাজনৈতিক টানাপোড়েন

ব্যক্তি-সম্পর্ক বদলে দিয়েছে, তৈরি করেছে বিচিত্র জটিলতা। যার সঙ্গে পরিচিত ছিল না অভ্যস্ত সামাজিক সংস্কার ও অনুশাসনে গড়ে ওঠা দাম্পত্য। রাজনীতির সূত্রেই এসেছে সন্দীপ, স্বদেশী পরিচয় তাকে অনায়াসেই অন্তঃপুরে প্রবেশের ছাড়পত্র দিয়েছে। অর্থাৎ অন্তঃপুরই চৌকাঠ পেরিয়ে বৈঠকখানায় পৌঁছে দিয়েছে ছোট রানী বিমলাকে। রাজনীতিক প্রেক্ষিতের বিচ্ছুরণ সন্দীপ চরিত্রটিকে অনেক বেশি আকর্ষণীয় করে তুলেছে বিমলার কাছে। মোহভঙ্গের মুহূর্তেও সন্দীপের আগুন ঝরানো আইডিয়া সর্বস্ব রাজনৈতিক ভাবনা দোলাচল করে তুলেছে বিমলাকে। রাজনীতি ছাড়া মানুষ সন্দীপ, ব্যক্তি সন্দীপের সত্যি কতটা মূল্য আছে বিমলার কাছে! সন্দীপের যে জোর, তীব্রতা, গতি বিমলাকে আকর্ষণ করেছিল তাও তো স্বদেশী ভাবনা কেন্দ্রিক। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে বাইরের সময়-রাজনীতি চারিয়ে গেছে উপন্যাসের অন্দরে, ব্যক্তি সম্পর্কের নিভৃতিতে, উপন্যাসের অন্তর্বস্তুতে। চরিত্রগুলি নিজের মুখোমুখি হতে, পারস্পরিক সম্পর্ক ও জীবনের অন্য সত্যকে গ্রহণ করতে, স্বরূপ বুঝতে বা চিনতে বাধ্য হচ্ছে। ভাঙাগড়ার মধ্যে দিয়ে নিখিলেশ বিমলার দাম্পত্য প্রথাবদ্ধতার বাইরে অন্য বাস্তব সংকটের সম্মুখীন হচ্ছে, যার সঙ্গে সেই সম্পর্কের পরিচয় ছিল না। প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী সেই অতি সুরক্ষিত দাম্পত্য হঠাৎ এক ঝঞ্ঝার সামনে। আঠারোটি পরিচ্ছেদে তিনটি চরিত্রের আত্মকথার সূত্রে রয়েছে বিমলা, নিখিলেশ ও সন্দীপের আত্ম-আবিষ্কার। বিমলার একাকীত্বের অনুভব, শূন্যতার বোধ, নিখিলেশের সম্পর্ক থেকে মুক্তি পেতে চাওয়া এবং সন্দীপের অন্তর্দন্দু অস্বীকার করতে না পারা। সম্পর্কের টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়ে প্রত্যেকটি চরিত্র নিজেকে বুঝতে চাইছে, খুঁজছে মনের সমস্ত অন্ধকার আনাচ-কানাচ।

'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসটি উৎসর্গ করা হয়েছে,'শ্রীমান প্রমথনাথ চৌধুরী'কে। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায় প্রকাশিত সবুজপত্র পত্রিকা এবং রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যিক সংযোগ রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যভাবনার ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলায় একটি স্বতন্ত্র সাহিত্যিক পত্রিকার তাগিদ বোধ করেছিলেন তাঁরা, ১৯১৪-য় প্রকাশিত হল 'সবুজপত্র'। সবুজপত্রের পাতায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ হতে লাগল

'ঘরে-বাইরে', অন্যদিকে একের পর এক ছোটগল্প এবং 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থে পরবর্তীকালে সংকলিত হওয়া কবিতাগুলো। 'ঘরে-বাইরে'র ধারাবাহিক প্রকাশের আগে সবুজপত্র পত্রিকার চারটি সংখ্যায় প্রকাশিত চারটি বড় গল্প মিলে তৈরি হয়েছিল উপন্যাস 'চতুরঙ্গ'। চতুরঙ্গের দামিনী রবীন্দ্র ভাবনায় একেবারে স্বতন্ত্র — সে যথার্থই দামিনী, বিদ্যুৎ। দামিনী বাঁচতে চায়, তীব্র অনুভবে জীবনকে ভালবাসে। সমাজ তাকে সে অধিকার দেয়নি, দামিনী বিধবা কিন্তু স্বামীর সমস্ত সম্পত্তি সহ স্ত্রীকে গুরুদেবের আশ্রমে দান করে যাবার অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছে জীবন জুড়ে। সমাজ-সংস্কার-প্রচলিত অভ্যাস অস্বীকার করে একজন সম্পূর্ণ নারী হিসেবে বাঁচার স্বপ্ন দেখেছে, ভালবেসেছে। এখানে ঔপন্যাসিকের প্রকাশের ধরনও আলাদা। ঔপন্যাসিক ন্যারেটার নন। চারটি প্রধান চরিত্রের একজন কথক, সেই প্রত্যেকের সম্পর্কে বলছে — উপন্যাসে এক একটি চরিত্রের নামে একটি করে অধ্যায়। পরবর্তী 'ঘরে বাইরে'তে প্রকাশ কিছুটা স্বতন্ত্র, তিনটি প্রধান চরিত্রের আত্মকথনে, নিজের কথা এবং অন্যের কথা নিজের উচ্চারণে বলার মধ্যে দিয়ে তৈরি হয়েছে এক একটি পরিচ্ছেদ।

উপন্যাসের প্রধান নারী চরিত্র বিমলা, খুব সাধারণ ঘরের মেয়ে বিয়ে হয়েছে জমিদার পরিবারে। জমিদার বাড়ি তথা রাজবাড়ির রাজপুত্রের সঙ্গে মেলাতে পারেনি স্বামী নিখিলেশ কে, স্বপ্নে ঘা লেগেছে। তবু স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের সংস্কার বাহিত ধারণায় সে জানে স্বামীকে গ্রহণ করতে হয়, ভক্তি করতে হয়। বাবা-মা'র সম্পর্ক সে দেখেছে। বড় হয়েছে মায়ের বাবার প্রতি শ্রদ্ধা-ভালবাসা এবং সম্পর্কের ঐকান্তিক একনিষ্ঠতার পরিবেশে। তিলে তিলে তাকে গ্রহণ করেছে অন্তরে। বিয়ের পর রাজপুত্রের ধারণার সঙ্গে স্বামী নিখিলেশকে মেলাতে না পারলেও, স্বামীর দাম্পত্য সম্পর্কে নতুন ভাবনা, স্বতন্ত্র জীবনদৃষ্টি যুক্ত হয়েছে বিমলার সংস্কারবাহিত ধারণার সঙ্গে।

প্রচলিত দাম্পত্যের অভ্যাস বা সংস্কার নিয়ে রবীন্দ্রনাথের নানা ভাবনা রয়েছে। আমাদের সমাজে দাম্পত্য একটি সামাজিক অভ্যাস, সেই অভ্যাসে স্বামী-স্ত্রী অর্থাৎ নারী পুরুষের অবস্থান ঠিক কিরকম ? শুধু সামাজিক সত্তা বা পরিচয়টাই কি যথেষ্ট না তাদের মধ্যেকার ব্যক্তিমানুষ গুলির সঙ্গে ঐ সামাজিক স্বামী বা স্ত্রীর পরিচয় প্রয়োজন! 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে নিখিলেশের কথায়, নিজেদের সম্পর্কের বিশ্লেষণে এই প্রসঙ্গগুলি এসেছে। নিখিলেশ 'স্বামী' বা 'স্ত্রী'র সামাজিক অবস্থান নিয়ে তার ভাবনার কথা প্রকাশ করেছে বিমলার সঙ্গে কথার সূত্রে এবং নিজের আত্মকথনে মুখোমুখি নিজের সঙ্গে নিজের কথা বলায়। নিখিলেশ বিমলার সম্পর্ক নিয়ে সন্দীপের একটি কথা উল্লেখ করার,— 'যারা ন বছর দিনরাত্তির একসঙ্গে কাটিয়েছে তারা পরস্পরকে কত অল্প চেনে! কেবল ঘরকন্নার কথাটুকুতেই চেনে', তার বাইরে মানুষটার সঙ্গে কোনো পরিচয় নেই। নিখিলেশ তাই চেয়েছিল বাইরের বড় পৃথিবীতে পরস্পরকে বুঝে নিতে।

একক-৭ ❑ 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্র বিচার

গঠন

৭.১. উদ্দেশ্য
৭.২ বিমলা চরিত্র
৭.৩ নিখিলেশ চরিত্র
৭.৪ সন্দীপ চরিত্র
৭.৫ অপ্রধান চরিত্র
৭.৬ গ্রন্থপঞ্জি

৭.১ উদ্দেশ্য

এই এককটিতে 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। আত্মকথনের ভঙ্গিতে প্রত্যেকটি চরিত্র কথা বলে গেছে এবং সেগুলিই এক-একটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত হয়েছে। একটি চরিত্রের সঙ্গে অপরটির কথোপকথনের বিষয়টিও কোনো-না-কোনো চরিত্রের আত্মকথনে প্রকাশিত হয়েছে।

৭.২ বিমলা চরিত্র

'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসের মূল নারী চরিত্র বিমলা তথাকথিত সুন্দরী নয়, তার গায়ের রঙ ছিল 'শামলা'। বিমলা বলেছে,'আমাদের দেশে তাকেই বলে সুন্দর যার বর্ণ গৌর। কিন্তু যে আকাশ আলো দেয় সে যে নীল। আমার মায়ের বর্ণ ছিল শামলা, তাঁর দীপ্তি ছিল পুণ্যের। তাঁর রূপ রূপের গর্বকে লজ্জা দিত। আমি মায়ের মতো দেখতে এই কথা সকলে বলে'। শ্বশুরবাড়ির দৈবজ্ঞের কথা মতো 'সুলক্ষণা' বলেই রাজার ঘরে বিয়ে হল তার কিন্তু রাজপুত্রের ভাবনা স্বামী নিখিলেশের সঙ্গে মিলল না। নিজের রূপের অভাব হয়ত কিছুটা কমল কিন্তু দীর্ঘশ্বাসও পড়ল। মায়ের বাবার প্রতি যত্ন সেই ছোটবেলাতেও অনুভব করত বিমলা,—

'মা যখন বাবার জন্যে বিশেষ করে ফলের খোসা ছাড়িয়ে সাদা পাথরের রেকাবিতে জলখাবার গুছিয়ে দিতেন, বাবার জন্যে পানগুলি বিশেষ করে কেওড়া জলের-ছিটে দেওয়া কাপড়ের টুকরোয় আলাদা জড়িয়ে রাখতেন, তিনি খেতে বসলে তালপাতার পাখা নিয়ে আস্তে আস্তে মাছি তাড়িয়ে দিতেন, তাঁর সেই লক্ষ্মীর হাতের আদর, তাঁর সেই হৃদয়ের সুধা রসের ধারা কোন অপরূপ রূপের গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়ত সে যে আমার সেই ছেলেবেলাতেও মনের মধ্যে বুঝতুম'।

সংস্কারের সেই উত্তরাধিকারে তার ভালবাসাও পুজো করতে চাইত; মায়ের শ্রদ্ধা-ভালবাসা-একনিষ্ঠতা অন্তরে গ্রহণ করেই সে বড় হয়েছে।

বাড়ির অন্য দুই বধূর মতো বিমলার রূপ ছিলনা কিন্তু অভিমান ছিল সতীত্বের, ভাবত এখানে তার স্বামীকেও হার মানতে হবে। সবাই বলত সে মায়ের মতো দেখতে, ঈশ্বরের কাছে তাই প্রার্থনা করত,— 'মায়ের মতো যেন সতীর যশ পাই, দেবতার কাছে একমনে এই বর চাইতুম'। আধুনিক ভাবনার নিখিলেশ স্ত্রীকে ঘরের ছোট গণ্ডি পার করে বাইরের বড় পৃথিবীর সঙ্গে পরিচিত করাতে চেয়েছে, সে বিশ্বাস করত, 'স্ত্রী-পুরুষের পরস্পারের প্রতি

সমান অধিকার, সুতরাং তাদের সমান প্রেমের সম্বন্ধ' কিন্তু বিমলার সংস্কার যে মেয়েরা খাঁচার পাখি আর সেই খাঁচাতে তার এত ঐশ্বর্য যে বিশ্বেও নেই। নিখিলেশ জোর করেনি তার মনে হত স্ত্রী বলে যে বিমলা কেবলই কথা শুনে চলবে, সেটা তার 'নিজেরই সইবে না'। নিখিলেশ 'ঘর-গড়া বিমল'কে 'ছোট জায়গা' 'ছোটো কর্তব্যের' বাঁধা নিয়ম থেকে সরিয়ে আনতে চেয়েছিল। বড় জায়গা থেকে বিমলা জীবনকে বড় করে দেখুক,স্বয়ম্বরা হতে না পারা মেয়েরা চোখ মেলে জীবনটাকে দেখে বুঝে নিক, চিনতে শিখুক স্বামী-দাম্পত্যের প্রকৃত স্বরূপ, এটাই ভেবেছিল নিখিলেশ। স্বদেশী প্রচারে আসা সন্দীপের বক্তৃতা কূল ছাপিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে গেল সব কিছু। অন্তঃপুরের গণ্ডি পার হয়ে বিমলা পৌঁছে গেল রাজবাড়ির বৈঠকখানায়। সন্দীপের প্রতি বীরপূজার আগ্রহে রাজবাড়ির ছোটরানীমা, 'বন্ধুর ঘরের গৃহিনী' হয়ে উঠতে চাইল 'বাংলাদেশের সমস্ত নারীর একমাত্র প্রতিনিধি' আর সন্দীপ 'বাংলাদেশের বীর'। সন্দীপের দ্বিধাহীন প্রকাশ, মিথ্যে স্তুতি আকৃষ্ট করলো বিমলাকে। দেশ ভাবনায় নিখিলেশ সন্দীপের মতপার্থক্যে বিমলার সমর্থন সন্দীপের দিকেই। নিখিলেশ বুঝতে পারছে বিমলা বদলে যাচ্ছে, কিন্তু 'জবর্দস্তিকে' সে দুর্বলতা বলেই জেনে এসেছে আর এটাও সে বোঝে যে ঘর থেকে বাইরে আসার রাস্তাটা 'ঝোড়ো', সহজ মসৃণ পথ নয়। 'ঘরের চতুঃসীমায় যে ব্যবস্থাটুকুর মধ্যে বিমলের জীবন বাসা বেঁধে বসে ছিল ঘরের বাইরে এসে হঠাৎ সে ব্যবস্থায় কুলোচ্ছে না'।

নিখিলেশ অর্জনে বিশ্বাসী, সন্দীপ কেড়ে নেওয়ায়। নিখিলেশ বিমলাকে ঘর থেকে বাইরে আসতে বলেছিল একসময়। পুরনো সংস্কার-মনুস্মৃতিশাস্ত্র পেরিয়ে বড় পৃথিবীতে বিমলা সম্পূর্ণ হয়ে উঠুক কিন্তু বিমলার অন্তঃপুরের চৌকাঠ পেরনো এক মিথ্যে স্বদেশী উন্মাদনা ও সন্দীপের কৌশলী প্রতারণায় ব্যাহত হল। কষ্ট পেলেও বিমলাকে বাধা দেয়নি নিখিলেশ। কিন্তু তার মেজবৌদিদির মনে হয়েছে এতদিন তাদের বাড়িতে পুরুষরা মেয়েদের কাঁদিয়েছে। সময় বদলেছে, এরপর মেয়েরাই পুরুষকে কাঁদাবে। বিমলা ভেবেছে ঘরের জীবনে সে ছিল গ্রামের ছোট নদী, সন্দীপের সংস্পর্শে সমুদ্রে যেন বান ডেকে এল। স্বামীকে সে পেয়েছিল সংস্কার রূপে আর তার নিজের ছিল মায়ের জীবন থেকে পাওয়া সংস্কার বাহিত 'সতীত্ব'-এর গর্ব। তার সংস্কার শিখিয়েছিল সতীত্ব — পাতিব্রত্য — একনিষ্ঠতা, এই নিয়েই নারী। নিখিলেশ রাজবাড়ির নিষেধের বেড়ি সরিয়ে মিস গিল্‌বিকে নিযুক্ত করেছিল স্ত্রীর 'সঙ্গিনী আর শিক্ষক' হিসেবে, আধুনিকতার পাঠ নিয়েছিল বিমলা তার কাছে। সতীত্বের অহংকারে গর্বিত বিমলা স্বামী-সংস্কার ভুলে সন্দীপের প্রতি নারীত্বের আকর্ষণ বোধ করল। এক পুরুষের প্রতি এক নারীর আকর্ষণ, যা সামাজিক আনুগত্যে পাওয়া নয়। সন্দীপের 'দুর্দান্ত ইচ্ছার প্রলয়মূর্তি' যেন এক অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ, অস্বীকার করতে পারে না বিমলা,'মনে হল, কার জন্য যেন আমার মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত অপেক্ষা করে আছে — যেন সমস্ত গায়ের রক্ত বাইরের দিকে কান পেতে রয়েছে!' মানসিক দ্বন্দ্ব সংঘাতে কিছুটা বিপর্যস্ত বিমলা, দ্বিধাগ্রস্ত মনের প্রকাশ তার তৃতীয় আত্মকথায় বলেছে—

'আমার মনের ভাব ছিল অদ্ভুত-রকম। এক দিকে ইচ্ছেটাতর্কে আমার স্বামীর জিত হয়, সন্দীপের অহংকার একটু কমে। অথচ সন্দীপের অসংকোচ অহংকারটাই আমাকে টানে।' চতুর্থ আত্মকথায় বিমলার স্বীকারোক্তি, 'সমস্ত দেশের উপর এই যে একটা প্রবল আবেগ হঠাৎ ভেঙে পড়ল ঠিক এই জিনিসটাই আমার জীবনের মধ্যে আর এক সুর নিয়ে ঢুকেছিল'।

সন্দীপের প্রচণ্ড আবেগ, মিথ্যে স্তুতি, দেশকে নিয়ে লোভ করা, লুঠ করা, কেড়ে নেবার জীবনদর্শন সে ছাত্রদের শেখাচ্ছে দেশনেতা রূপে, আর সেই মিথ্যে স্বদেশী উন্মাদনার সঙ্গী করেছে বিমলাকে। নিখিলেশের বিশ্বাস, আবেগ উন্মাদনা নয় দেশকে বাঁচাতে গেলে প্রথমে দাসত্বের বীজ উৎপাটন করতে হবে, তবেই তো

স্বদেশী ভাবনার প্রচার, স্বাধীনতার পথে এগিয়ে যাওয়া যাবে! বিমলা সন্দীপের মতো দেশকে নিয়ে লোভ করাতেই বিশ্বাসী ছিল। দরিদ্র মানুষের কথা না ভেবে সন্দীপ নিখিলেশের জমিদারী এলাকায় হাট থেকে বিলিতি কাপড় বিক্রি বন্ধের জন্য নিখিলেশকে জোর করলে নিখিলেশ বাধা দেয়, সে রাজি হয় না। সন্দীপকে কথা দিয়ে বিমলা দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে নিখিলেশের কাছে প্রস্তাব করল হাটে বিদেশি কাপড় বিক্রি বন্ধ করতে। বিমলা ভেবেছিল নিখিলেশ তাকে ফিরিয়ে দিতে পারবে না কিন্তু নিখিলেশের শূন্য দৃষ্টির আঘাত তাকে নাড়িয়ে দিল। শুধু অনুরোধ প্রত্যাখ্যান নয়,'কোথাও তাকে ছুঁতেও' পারলো না সে, সে যেন 'মিথ্যে',' মনে হল, আমি মিথ্যে। যেন আমি স্বপ্ন — স্বপ্নটা যেই ভেঙে গেল অমনি কেবল অন্ধকার রাত্রি'।

বিমলার স্বীকারোক্তি,'এতকাল রূপের জন্যে আমার রূপসী জা'দের ঈর্ষা করে এসেছি। মনে জানতুম, বিধাতা আমাকে শক্তি দেন নি, আমার স্বামীর ভালোবাসাই আমার একমাত্র শক্তি। আজ যে শক্তির মদ পেয়ালা ভরে খেয়েছি, নেশা জমে উঠেছে। এমন সময় হঠাৎ পেয়ালাটা ভেঙে মাটির উপর পড়ে গেল। এখন বাঁচি কী করে!' সম্পর্কটা সত্য ছিল, এই সম্পর্ক ঘিরেই নিখিলেশ বিমলার বাঁচা। নিখিলেশের একটা বড় পৃথিবী ছিল। সে বিমলাকেও তার অংশীদার করতে চাইতো কিন্তু বিমলার আগ্রহ ছিল না। ছোটরানীমা তার রাজপাট নিয়েই সন্তুষ্ট ছিল, মনে হতো কী হবে বাইরের জীবনে, সেখানে তো সে কেউ একজন — জমিদার বাড়ি ঘিরেই ছিল তার অস্তিত্ব। সন্দীপকে দেখার পর, তার ছদ্ম অগ্নিশিখারূপী ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে নিজেই হয়ত বা নিজেরই অজান্তে কখন সেই সীমাটা পার হয়ে এল আর সন্দীপের কথায় নিখিলেশের ঐতিহ্যবাহী জমিদারবাড়ির বৈঠকখানাটি 'ঘর' এবং 'বাইরে' মিলে এক উভচর জাতীয় হয়ে উঠল কিন্তু সেখানে 'বাইরে'র অংশটুকু বড় সংকীর্ণ ছিল। সন্দীপের কৌশলী মোহগ্রস্ত স্বদেশী ভাবনায় এক মিথ্যে স্বদেশের স্বপ্ন দেখতে লাগল বিমলা। মাস্টারমশাই চন্দ্রনাথবাবু চেয়েছিলেন বিমলা বড় জায়গা থেকে জীবনটাকে দেখুক, 'বিমলাকে তুমি কলকাতায় নিয়ে যাও। এখান থেকে তিনি বাইরেটাকে সংকীর্ণ করে দেখছেন, সব মানুষের সব জিনিসের ঠিক পরিমাণ বুঝতে পারছেন না। ওঁকে তুমি একবার পৃথিবীটা দেখিয়ে দাও — মানুষকে, মানুষের কর্মক্ষেত্রকে, উনি একবার বড়ো জায়গা থেকে দেখে নিন'।

নিখিলেশের দেওয়া 'ছুটি', সম্পর্কের মুক্তি, বিমলার প্রতি অনুভূতিহীন তার চোখের শূন্যদৃষ্টি যেন বিমলার অস্তিত্বকেই মিথ্যে করে দিল। 'ঘর' তারা গড়েছিল তাদের সম্পর্কের-ভালবাসার, বাইরের বড় পৃথিবীর সঙ্গে নতুন সম্পর্ক গড়তে গিয়ে সেই ঘরটাই ভেঙে গেল। তখন বুঝতে পারল যে তাদের একটা সত্যিকারের ঘর ছিল। সম্পর্ক থেকে ছুটি পাবার পর শোবার ঘরে এসে বিমলার মনে হল সেখানে শুধু কয়েকটা আসবাব রয়েছে, 'এর উপরে সর্বব্যাপী হৃদয়টি নেই', কোনো 'আদর নেই, আসবাব'। সন্দীপের কথায় বিমলা বাধ্য হল তাদের শোবার ঘরে রাখা স্বামীর সিন্দুক থেকে টাকা নিতে— 'সেই রাত্রে নিজের ঘরে যখন চোর হয়ে ঢুকতে হল তখন থেকে এ ঘর আমার আর আপন রইল না। এ ঘরে আমার কত বড় অধিকার — চুরি করে সব খোওয়ালুম'। তার মনে হল, 'আজ ঘরকে লুটেছি, দেশকেই লুটেছি — এই পাপে একই সঙ্গে ঘর আমার ঘর রইল না, দেশও হয়ে গেল পর'। টাকা চুরি যেন আকাশের এক একটা তারা চুরি, জগতের সমস্ত আলোর উৎসকে কেড়ে নিয়ে আকাশকে অন্ধ করে দেওয়া। বিমলার মনে হয়, 'আজ আমি এই-যে চুরি করে আনলুম, এও তো টাকা চুরি নয়, এ যে আকাশের চিরকালের আলো চুরিরই মতো; এ চুরি সমস্ত জগতের কাছ থেকে চুরি; বিশ্বাস চুরি, ধর্ম চুরি'।

ঘর সম্পর্ক ভালোবাসা সমস্ত কিছু হারিয়ে একেবারে নিঃস্ব বিমলা, নিজের প্রতি নিজের শ্রদ্ধা বাঁচিয়ে রাখার কোন সম্বলই তার আর অবশিষ্ট নেই। চূড়ান্ত অপরাধবোধে যখন নিজের কাছ থেকেই নিজে পালিয়ে বেড়াচ্ছে বিমলা, অমূল্যর 'রানীদিদি' ডাক ভরসা-বিশ্বাস-শ্রদ্ধা, সেই অসহায় মুহূর্তে তাকে আশ্রয় দিচ্ছে। নিজের মুখোমুখি

দাঁড়ানো বিমলা মোহমুক্ত হতে চাইছে, সন্দীপের সঙ্গে কথা বলতে পারছে সমানে সমানে। পঞ্চম আত্মকথায় বিমলার স্বীকারোক্তি—

'যে মুহূর্তে আমি আমার স্বামীর টাকা চুরি করে সন্দীপের হাতে দিয়েছি সেই মুহূর্ত থেকেই আমাদের সম্বন্ধের ভিতরকার সুরটুকু চলে গেছে। কেবল যে আমারই সমস্ত মূল্য ঘুচিয়ে দিয়ে আমি কানাকড়ার মতো সস্তা হয়ে গেছি তা নয়, আমার 'পরে সন্দীপেরও শক্তি ভালো করে খেলবার আর জায়গা পাচ্ছে না। মুঠোর মধ্যে যা এসে পড়ে তার উপর আর তীর মারা চলে না। সেইজন্যে সন্দীপের আজ আর সেই বীরের মূর্তি নেই'।

নিজের সমস্ত অহংকার ভাসিয়ে দিয়ে সেই দিন সেই মুহূর্তটিকে নিজের জন্মতিথি করে তোলার প্রার্থনা জানাচ্ছে; ঈশ্বরের কাছে,'সব ধুয়ে মুছে আর-একবার গোড়া থেকে পরীক্ষা করো প্রভু!' সন্দীপকে দেখে মোহমুগ্ধ হচ্ছে না বরং বিতৃষ্ণা জাগছে, সকালের আলোয় সে মুখে আর কোনো 'প্রতিভার জাদু' বিমলা খুঁজে পেল না। মুগ্ধতা সরে গিয়ে বিমলার কথার সুর বদলে যেতেই সন্দীপও গর্জে উঠলো। 'মন্ত্রব্যবসায়ী' মন্ত্রের জোর হারিয়ে কর্কশ ভাবে নিজের প্রকৃত দুর্বলতাই প্রকাশ করতে লাগল। বিমলার মনে হল,'আমি মুক্তি পেয়েছি, বাঁচা গেছে, বাঁচা গেছে'। উপন্যাসের শেষে বিমলা তার অহংকার ভাসিয়েছে, নিজেকে নতুন করে তুলতে চেয়েছে, চিনেছে স্বামী নিখিলেশের আড়ালে খুঁজে না পাওয়া এক সহমর্মী মানুষকে — তার নিঃস্ব হয়ে যাওয়া মুহূর্তে যে পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। কলকাতা যাবার সময় আর রাজপাট ছেড়ে যাওয়া কথা মনে হচ্ছে না, অধিকার হারানোর কথাও নয়, শুধু 'মনে হল, কোনো জিনিসই নেবার দরকার নেই, কেবল বেরিয়ে চলে যাওয়াটাই দরকার'।

৭.৩ নিখিলেশ চরিত্র

প্রথম আত্মকথায় নিখিলেশ বলেছে—

'একদিন বিমলকে বলেছিলুম, তোমাকে বাইরে আসতে হবে। বিমল ছিল আমার ঘরের মধ্যে — সে ছিল ঘর গড়া বিমল, ছোটো জায়গা এবং ছোটো কর্তব্যের কতকগুলো বাঁধা নিয়মে তৈরি। তার কাছ থেকে যে ভালোবাসাটুকু নিয়মিত পাচ্ছিলুম সে কি হৃদয়ের গভীর উৎসের সামগ্রী, না, সে সামাজিক ম্যুনিসিপালিটির বাষ্পের চাপে চালিত দৈনিক কলের জলের বাঁধা বরাদ্দের মতো?'

ওই জমিদার পরিবারে নিখিলেশ একেবারেই একজন স্বতন্ত্র ধরণের মানুষ। তার মাধ্যমেই সংস্কারে আবদ্ধ জমিদার পরিবারে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. পাশ করা নতুন প্রজন্মের যাত্রা শুরু — জীবন সম্পর্কে ভাবনা চিন্তাও ছিল অন্য ধরনের। জমিদার পরিবারের প্রথা ভেঙে স্ত্রী বিমলাকে ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে চেয়েছিল সে। মিস গিল্‌বিকে তাঁর সঙ্গী হিসেবে নিযুক্ত করেছিল। স্ত্রীর দাম্পত্য নিয়ে তার নিজস্ব কিছু ভাবনা ছিল। ঘরের চার দেওয়ালের বাইরে সম্পর্কটাকে সে বুঝে নিতে চেয়েছে, 'আমি লোভী নই, আমি প্রেমিক। সেইজন্যেই আমি তালা-দেওয়া লোহার সিন্দুকের জিনিস চাইনি — আমি তাকেই চেয়েছিলুম আপনি ধরা না দিলে যাকে কোনোমতেই ধরা যায় না। স্মৃতি-সংহিতার পুঁথির কাগজের কাটা ফুলে আমি ঘর সাজাতে চাইনি; বিশ্বের মধ্যে জ্ঞানে শক্তিতে প্রেমে পূর্ণবিকশিত বিমলকে দেখবার বড়ো ইচ্ছা ছিল'। বিশ শতকের শুরুতে, সেই স্বদেশী উন্মাদনার কালে 'দেশ' নিয়ে নিখিলেশেরও আবেগ ছিল কিন্তু তা দেশ গড়ে তোলায়। দেশকে কেন্দ্র করে কোনো ধ্বংসাত্মক আবেগকে প্রশ্রয় দিতে সে প্রস্তুত ছিল না। সে ছিল শান্ত সংযত, খানিকটা প্রকাশ বিমুখ — নিজের অনুভব সহজে প্রকাশ করতে পারত না। জমিদার পরিবারের বিলাস ও অতিচারের যে উত্তরাধিকার নিয়ে সে জন্মেছিল, তার সমস্ত কিছু থেকে সে অনেক দূরে ছিল। স্ত্রী বিমলাকে সে ভালবেসেছিল,

তার আর দুই দাদার মতো শৃঙ্খলাহীন জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয় নি। দেশ এবং দেশের মানুষকে পরম শ্রদ্ধায় সে গ্রহণ করেছিল, 'তেমনি আমার পণ এই যে কোনো একটা উত্তেজনার কড়া মদ খেয়ে উন্মত্তের মতো দেশের কাজে লাগব না'।

নিখিলেশের মনটাকে গড়ে দিয়েছিলেন তার মাস্টারমশাই চন্দ্রনাথবাবু। নিখিলেশ গভীরভাবে তা বিশ্বাস করত। চন্দ্রনাথবাবুর আদর্শ ছাড়া আর কোনকিছুই তাকে জমিদার পরিবারের বিলাস ও অবক্ষয়িত জীবনযাপন থেকে তাকে রক্ষা করতে পারত না। নিখিলেশ তার আত্মকথায় বলছে— 'আমি যে বাড়িতে জন্মেছি এখানে কোনো উপদেশ আমাকে রক্ষা করতে পারত না। কিন্তু ঐ মানুষটি তাঁর শান্তি, তাঁর সত্য, তাঁর পবিত্র মূর্তিখানি নিয়ে আমার জীবনের মাঝখানটিতে তাঁর জীবনের প্রতিষ্ঠা করেছেন; তাই আমি কল্যাণকে এমন সত্য করে, এমন প্রত্যক্ষ করে পেয়েছি'। স্বদেশ সম্পর্কে প্রচলিত ভাবনার বাইরে ছিল নিখিলেশ। তার লড়াই দাসত্বের বীজ উৎপাটনে, তার 'লড়াই দুর্বলতার ঐ নিদারুণতার সঙ্গে'। দেশের সম্পর্কে, টাকার সম্পর্কে সন্দীপের মধ্যে যে একটা লোভ আছে, নিখিল সেটা বুঝতে পারত। সে জানত 'বিমল মনে মনে পূজা করছে' সন্দীপকে, তার সম্পর্কে কোন কথা বলতে নিখিলেশের তাই সংকোচ হত। কিন্তু সে বুঝতে পারত দেশকে রক্ষা করতে হবে, 'ভারতবর্ষ কেবল ভদ্রলোকেরই ভারতবর্ষ নয়'। সে উপলব্ধি করত, দেশের অধিকাংশ দরিদ্র শিক্ষাহীন মানুষের অবস্থার পরিবর্তন না হলে দেশকে বাঁচানো যাবে না। 'আমি স্পষ্টই জানি, আমার নীচের লোক যত নাবছে ভারতবর্ষই নাবছে, তারা যত মরছে, ভারতবর্ষই মরছে'। সাত-আট বছর আগে লেখা 'গোরা' উপন্যাসে গোরাও সমাজের একেবারে পেছনে থাকা, পিছিয়ে পড়া মানুষের মধ্যেই দেশকে খুঁজতে চেয়েছিল। চন্দ্রনাথবাবুর জীবনের 'বাতায়ন' থেকে এভাবেই জীবনকে প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছিল নিখিলেশও। স্বদেশীর নামে সন্দীপের দলের ছেলেরা যখন নিখিলেশের ওপর জোর করে শুকশায়রের হাট থেকে বিলিতি জিনিস সরিয়ে দেবার জন্য আর নিখিলেশকে অসম্মান করে বলে 'দেশের জন্যে' এই লোকসানটুকু সে করতে পারবে না! সে সময় চন্দ্রনাথবাবুর কথাগুলো খেয়াল করার —

'দেশ বলতে মাটি তো নয়, এই-সমস্ত মানুষই তো। তা, তোমরা কোনোদিন একবার চোখের কোণে এদের দিকে তাকিয়ে দেখেছ ? আর, আজ হঠাৎ মাঝখানে পড়ে এরা কী নুন খাবে আর কী কাপড় পরবে তাই নিয়ে অত্যাচার করতে এসেছ ! এরা সইবে কেন, আর এদের সইতে দেব কেন?'

তাঁর মনে হয়েছিল এদের স্বদেশী ব্রত মূলত মানুষকে 'বিব্রত করবারই ব্রত'। দেশকে এরা চেনে না, দেশের মানুষকেও নয়। দেশের নামে স্বদেশীয়ানা দেখিয়ে তারা দেশের মানুষের ওপর জোর জবর্দস্তি করছিল। নিখিলেশ তাদের উন্মাদনায় যোগ না দিলে তাকেও হুমকি চিঠি দিয়েছিল। সাধারণ দেশবাসীর সমস্যা এরা বুঝতে চায়নি, স্বদেশী ব্রত জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছিল, বাধ্য করা হচ্ছিল তাদের। স্বদেশী ভাবনা প্রচারের নামে দেশের সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচার করছিল তারা — এখানেই নিখিলেশের সঙ্গে বিরোধ, সে ভাবত এদের অন্যায় জোরের কাছে দেশের একটা মানুষও যদি হার মেনে নেয়, তাহলে সে পরাজয়, সেই হার সমগ্র দেশের। তাই সন্দীপের দলের ছেলেদের সে বলেছিল—

'আমাদের দেশ দেবতাকে থেকে পেয়াদাকে পর্যন্ত ভয় করে করে আধমরা হয়ে রয়েছে; আজ তোমরা মুক্তির নাম করে সেই জুজুর ভয়কে ফের আর-এক নামে যদি দেশে চালাতে চাও,অত্যাচারের দ্বারা কাপুরুষতাটার উপরে যদি তোমাদের দেশের জয়ধ্বজা রোপণ করতে চাও, তা হলে দেশকে যারা ভালবাসে তারা সেই ভয়ের শাসনের কাছে একচুল মাথা নিচু করবে না'।

জীবনভাবনায় নিখিলেশ ছিল স্বতন্ত্র। সামাজিক সংস্কার, দাম্পত্য, ব্যক্তিসম্পর্ক সম্বন্ধে তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। ব্যক্তিকে সে সম্মান করেছে, মূল্য দিয়েছে। সে বুঝতে পারছে সন্দীপ বিমলাকে ভুল বোঝাচ্ছে কিন্তু সে জোর করে নিজের থেকে বিমলাকে কিছু বোঝাতে চায়নি। সে অপেক্ষা করেছে, সময় দিয়েছে বিমলাকে নিজের ভুল সম্পর্কে সচেতন হওয়ার জন্য। নিখিলেশের মনে হয়েছে, সন্দীপ সম্পর্কে বিমলাকে কিছু বলতে গেলে যদি বিমলা বা সন্দীপের মনে হয় সে ঈর্ষা করছে সন্দীপকে। তবুও সম্পর্ক হারানোর যন্ত্রণা সে অস্বীকার করতে পারে নি। বিমলা দূরে সরে গেছে, এক শূন্যতার বোধ তৈরি হয়েছে। নিখিলেশ বলেছে, 'আমি কাঁদছি আমার আপন কান্না, সমাজের কান্না নয়। বিমল যদি বলে সে আমার স্ত্রী নয়, তা হলে আমার সামাজিক স্ত্রী যেখানে থাকে থাক, আমি বিদায় নিলুম'। নিখিলেশ বিমলার কাছে স্ত্রীর সামাজিক আনুগত্য চায় না, ব্যক্তি বিমলার সত্য অনুভব, ভালবাসাই তার কাম্য। নিখিলেশের নিজস্ব জীবন বিশ্বাসে সে জানে, বিশ্বাস করে সামাজিক ভাবে বিমলা তার স্ত্রী এটাই তার একমাত্র পরিচয় ও অস্তিত্ব কখনও হতে পারে না। তার এই ভাবনা সে সময়ের তুলনায় পুরুষতান্ত্রিক রক্ষণশীল সমাজ কাঠামোয় একেবারেই আলাদা। কিন্তু ব্যক্তি নিখিলেশ, তার সচেতন মন এভাবেই দেখতে চায় জীবনকে, সত্য করে তুলতে চায় নিজের জীবনে, 'আমার স্ত্রী, অতএব ও আমারই ! ও যদি বলতে চায়, না, আমি আমিই, তখনই আমি বলব —

সে কেমন করে হবে, তুমি যে আমার স্ত্রী ! স্ত্রী ? ওটা কি যুক্তি ? ওটা কি একটা সত্য ? ঐ কথাটার মধ্যে একটা আস্ত মানুষকে আগাগোড়া পুরে ফেলে কি তালা বন্ধ করে রাখা যায় ?'

স্বতন্ত্র জীবন যাপন, নিজের মতো করে ভাবতে চাওয়া নিখিলেশ — প্রচলিত সামাজিক-সংস্কার-অভ্যাস, যা তার শিক্ষা আদর্শবোধ সত্য বলে বিশ্বাস করতে দেয় না, তার সবকিছুই সে নিজের মতো করে গড়ে নিতে চায়। বিমলার বদলে যাওয়ায় তাকে অভিযোগ না করে সে নিজেকে বিশ্লেষণ করতে চায়। বুঝতে পারে, বিমলা যেরকম সেভাবেই তাকে জীবনে গ্রহণ না করে, নিজের 'দামি আইডিয়াল দিয়ে' সাজিয়ে নিতে চেয়েছিল। নিজের মতো করে বিমলার এক 'মানসী' মূর্তি সে গড়ে নিয়েছিল যা বাস্তব বিমলা নয়, যেভাবে নিখিলেশ তাকে দেখতে চেয়েছিল। এটা যে তার গুণ নয়,'মহদ্‌দোষ' সে বুঝতে পেরেছে — বিমলার সঙ্গে দূরত্ব-নিঃসঙ্গতা তাকে নিজের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। নিখিলেশ উপলব্ধি করেছে,'আমি লোভী — আমি আমার সেই মানসী তিলোত্তমাকে মনে মনে ভোগ করতে চেয়েছিলুম, বাইরে বিমল তার উপলক্ষ হয়ে পরেছিল। বিমল যা সে তাইই — তাঁকে যে আমার খাতিরে তিলোত্তমা হতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। বিশ্বকর্মা আমারই ফর্মাশ খাটছেন নাকি?' নিঃসঙ্গতার মুহূর্তে নিখিলেশের মনে হয়েছে নিজেকে আর বিমলাকে দুটি পৃথক মানুষ রূপেই তাকে বিচার করতে হবে। কোনো সামাজিক পরিচয়ে নয়,স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসেবে এবং মূল্য দিতে হবে তাদের নিজস্ব চাওয়া পাওয়া আকাঙ্ক্ষার।

নিখিলেশের নতুন উপলব্ধি তাকে সাহায্য করল সম্পর্কের বন্ধন থেকে বিমলাকে মুক্তি দিতে। ব্যক্তি বিমলার দ্বিধা, সন্দীপের প্রতি আকর্ষণকে সম্মান জানিয়ে নিখিলেশ তাকে মুক্তি দিচ্ছে সম্পর্ক থেকে— 'চেনাশোনা হোল — বাহিরকেও বুঝলুম, অন্তরকেও বুঝলুম। সমস্ত লাভ লোকসান মিটিয়ে যা বাকি রইল তাই আমি'। নিঃসঙ্গতার মুহূর্তে নিখিলেশকে আশ্রয় দিচ্ছে মেজবৌরানির স্নেহ সখ্যতা আর চন্দ্রনাথ বাবুর মানসিক নির্ভরতা। স্নেহ শাসনে তাকে ঘুমোতে পাঠিয়েছে মেজবৌদিদি — 'ঠাকুরপো তুমি করছ কী ! লক্ষ্মী ভাই, শুতে যাও। তুমি নিজেকে এমন করে দুঃখ দিয়ো না। তোমার চেহারা যা হয়ে গেছে সে আমি আর চোখে দেখতে পারি নে'। নিখিলেশও অস্বীকার করতে পারে না এই মমতা ভরা আদেশ। নিজের কান্না, একাকীত্ব দিয়ে যেন সে বিমলাকে বন্দি করে না রাখে সম্পর্কে, এটাই সে নিজেকে বলে। কোনো মানুষ কোনো বিশেষ সম্পর্ক কখনও একটা গোটা জীবনের থেকে বড়

হয়ে উঠতে পারে না। বিমলাকে, তার প্রতি ভালবাসেকে সে এত বড় করে দেখেছিল যে মনে হয়েছিল বিমলাকে তার সাধনার মধ্যে না পেয়ে যেন তার সাধনাই ব্যর্থ হয়ে গেল, 'জীবন যে কত বড়ো, জীবন যে কত মহৎ, সে কথা স্পষ্ট করে মনে রাখতে পারি নি'। সমস্ত মানসিক বিপর্যয়ের মধ্যে তাকে রক্ষা করেছেন মাস্টারমশাই। তাঁকে ছাড়া নিখিলেশের পক্ষে সহজ হত না নিজেকে সামলে নেওয়া। 'তবু এর ভিতরে আমাকে রক্ষা করেছেন আমার মাস্টার-মশায় — তিনিই আমাকে যতোটা পেরেছেন বড়োর দিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, নইলে আজকের দিনে আমি সর্বনাশের মধ্যে তলিয়ে যেতুম'। জীবনের কোনো লোকসান, কোনো ভুলের থেকে জীবন যে অনেক ব্যাপ্ত এটা চিনতে শিখিয়েছিলেন চন্দ্রনাথবাবু। তাই হয়ত বিমলার নিঃসঙ্গ অনুতাপের মুহূর্তে সহমর্মিতার হাতটা বাড়িয়ে দিতে পেরেছিল নিখিলেশ। সাম্প্রদায়িক বিবাদ বাধিয়ে নিজে পালিয়ে গিয়ে নিখিলেশকেও পালিয়ে যাবার পরামর্শ দেয় সন্দীপ কিন্তু মানুষের বিপদের মধ্যে গিয়ে তাদের বাঁচাতে পারলেও নিজে ভীষণভাবে আহত হয়ে ফিরে আসে নিখিলেশ, ডাক্তার বলতে পারে না বাঁচবে কি বাঁচবে না! বিমলা অপেক্ষা করে আবার নতুন করে তারা শুরু করবে বলে।

৭.৪ সন্দীপ চরিত্র

'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে সন্দীপ চরিত্রটি স্বতন্ত্র। সন্দীপের আত্মকথার চারটি অংশ উপন্যাসে রয়েছে অর্থাৎ চারটি পরিচ্ছেদ। প্রথম আত্মকথার শুরুতেই সন্দীপের নিজের বলা কিছু কথা চরিত্রটিকে পাঠকের কাছে পৌঁছে দেয়— 'যেটুকু আমার ভাগে এসে পড়েছে সেইটুকুই আমার, এ কথা অক্ষমেরা বলে আর দুর্বলেরা শোনে। যা আমি কেড়ে নিতে পারি সেইটেই যথার্থ আমার, এই হল সমস্ত জগতের শিক্ষা'। নিখিলেশ জোর জবর্দস্তিকে দুর্বলতা বলে মনে করে আর সন্দীপ জোর করে কেড়ে নেওয়ায় বিশ্বাসী, জীবনের সবকিছু সে এভাবেই পেতে চায়। দেশ সম্পর্কেও তার ভাবনা একইরকম— 'দেশে আপনি জন্মেছি বলেই দেশ আমার নয় — দেশকে যেদিন লুট করে নিয়ে জোর করে আমার করতে পারব সেইদিনই দেশ আমার হবে'। তার ভাবনায় 'লাভ' আর 'লোভ' একই সঙ্গে যুক্ত, সে মনে করে মানুষের 'লাভ করবার স্বাভাবিক অধিকার আছে'। তাই পাবার জন্য সে লোভ করবে এটা তার কাছে জীবনের স্বাভাবিকতারই অঙ্গ। দেশ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে চন্দ্রনাথবাবু বলেন, 'দেখুন, আমরা কোনোদিনই চাষ করি নি, আজ এখনই হাতে হাতে ফসল পাব এমন আশা যদি করি তবে— ; সন্দীপ উত্তরে বলে তারা ফসল চায় না বরং কাঁটাগাছের আবাদ করতে চায়। নিজেদের কথা ধীরেসুস্থে পরে ভাববে, পরের পায়ে কাঁটা ফোটাতে আগে কাঁটাগাছের চাষেই তাদের বিশ্বাস, স্কুলের নীতি বচনে নয়।

লজ্জা সে করে না কোন কিছুতেই। বাঁশির মিষ্টি ফাঁকা বুলি বা 'আকাশকুসুম'-এ সে বিশ্বাসী নয়। সন্দীপের মতে—

'লজ্জা ? না,আমি লজ্জা করি নে। যা দরকার আমি তা চেয়ে নি, না চেয়েও নিই। লজ্জা করে যারা নেবার যোগ্য জিনিস নিলে না তারা সেই না-নেবার দুঃখটাকে চাপা দেবার জন্যেই লজ্জাটাকে বড় নাম দেয়। এই-যে পৃথিবীতে আমরা এসেছি এ হচ্ছে রিয়ালিটির পৃথিবী। কতকগুলো বড়ো কথায় নিজেকে ফাঁকি দিয়ে খালি-পেটে খালি-হাতে যে মানুষ এই বস্তুর হাট থেকে চলে গেল সে কেন এই শক্ত মাটির পৃথিবীতে জন্মেছিল'

— এটাই সন্দীপের জীবনদৃষ্টি। সে ভাবে মানুষ যা পেতে চায়, যা তার আছে, তাকে রক্ষা করার জন্য সে দেয়াল গাঁথে। সন্দীপ মনে করে লোভ আছে বলেই সে দেয়াল গাঁথে আর তার নিজের লোভ আছে বলে সে 'সিঁদ' কাটে,— 'তুমি কল কর, আমি কৌশল করব। এইগুলোই হচ্ছে প্রকৃতির বাস্তব কথা। এই কথাগুলোর

উপরেই পৃথিবীর রাজ্য-সাম্রাজ্য, পৃথিবীর বড় বড় কাণ্ডকারখানা চলছে'। এটাই সন্দীপের জীবন দর্শন।

নিখিলেশ এবং বিমলার সম্পর্কের মধ্যে সে খুব সচেতন ভাবেই প্রবেশ করেছে। নিখিলেশ তার বন্ধু, তাকে সে চেনে, তার আদর্শ জীবনভাবনার খোঁজ সে রাখে। অর্থবান জমিদার পরিবারের সন্তান, প্রাচুর্যে বড় হওয়া নিখিলেশের কাছ থেকে নানা কৌশলে সে টাকাপয়সা সুযোগ সুবিধা আদায় করে — বিমলার আত্মকথায় এর উল্লেখ আছে। নিখিলেশ জেনে বুঝে তাকে এই সুযোগ দেয় বলে একসময় বিমলা খুব বিরক্ত হত। সে বলত যে সন্দীপ একেবারেই ভালো মানুষ নয় কিন্তু নিখিলেশ তার স্বভাব অনুযায়ী কোন উত্তর করত না। বুদ্ধিমান সন্দীপের বুঝতে আসুবিধে হয়নি যে বিমলার পক্ষে নিখিলেশের মানসিকতা তার আদর্শবোধ জীবন ভাবনাকে বোঝা খুব সহজ নয়। তাই সহজেই সে স্বদেশ ভাবনাকে কেন্দ্র করে, বিমলাকে মিথ্যে স্তুতির মাধ্যমে কৌশলে প্রতারিত করে এবং ক্রমশ নিখিলেশ ও বিমলার সম্পর্কে দূরত্ব তৈরি হতে থাকে। সুবক্তা সন্দীপ তার মিথ্যে ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে বিমলাকে প্রভাবিত করেছিল এবং এক্ষেত্রে বিমলাই যে প্রথম নয়, সেকথাও তার আত্মকথায় রয়েছে। নিজের সম্পর্কে সে বলেছে যে নিখিলেশের মতো মিথ্যে কল্পনায় গড়া পৃথিবীতে সে বাস করে না, তাদের দাঁত নখ আছে, তারা 'পৃথিবীর মাংসাশী জীব','দৌড়তে' পারে 'ধরতে' পারে 'ছিঁড়তে' পারে। পৃথিবীর খাদ্যের ভাণ্ডারে প্রয়োজনে তার চুরি করবে, না হয় 'ডাকাতি' করবে, নইলে প্রাণ বাঁচবে কি করে ! সে জানে এটা তার ধারণা মাত্র নয় এটা বাস্তব, জীবনে পরীক্ষিত ও প্রমাণিত। সে জানে 'মেয়েদের হৃদয় জয় করতে' তার দেরি হয় না— 'ওরা যে বাস্তব পৃথিবীর জীব, পুরুষদের মতো ওরা ফাঁকা আইডিয়ার বেলুনে চড়ে মেঘের মধ্যে ঘুরে বেড়ায় না'। সন্দীপের বিশ্বাসে 'যে শক্তিতে এই মেয়েদের পাওয়া যায় সেটাই হচ্ছে বীরের শক্তি — অর্থাৎ বাস্তব জগৎকে পাবার শক্তি'। সে ভাবে এভাবেই বিমলাকেও সে জয় করে নেবে। বিমলাকে সে বলে 'মক্ষীরানী', তাদের স্বদেশী মধুচক্রের মূল কেন্দ্রবিন্দু, তাদের সকলের প্রেরণা — মিথ্যে এই স্তুতিতে মুগ্ধ হয় বিমলা, ভাবে সত্যিই তার বিশেষ ক্ষমতা আছে, তা এতোটাই সহজাত যে আলাদা করে বোঝা যায়নি এতদিন, সন্দীপের চোখেই প্রথম তা ধরা পরেছে। সন্দীপ নিখিলেশ বিমলার দ্বন্দ্ব নিখিলেশের অন্তর্দহন, দাম্পত্য সম্পর্কে স্পষ্ট হয়ে ওঠা দূরত্ব সবই সে বুঝতে পারছে, মনে মনে পরিহাস করছে নিখিলেশের ভদ্রতাকে।

সন্দীপেরও আত্মবিশ্লেষণ রয়েছে। মাঝে মাঝে তারও মনে হয় সে কী শুধুই কথা দিয়ে গড়া মানুষ। বিমলাকে নানা কৌশলে আকৃষ্ট করতে চাইলেও সে যে সেখানে দর্শক মাত্র নয়, এটা সে অনুভব করছে, 'এ কথা জাঁক করে বলতে পারব না, আমি কেবলমাত্র দর্শক, উপরের তলায় রয়াল সীটে বসে মাঝে মাঝে কেবল হাততালি দিচ্ছি। বুকের ভিতরে টান পড়ছে, থেকে থেকে শিরাগুলো ব্যথিয়ে উঠছে'। তার আর বিমলার কথার মাঝখানে বৈঠকখানা ঘরে চন্দ্রনাথ বাবু এসে উপস্থিত হলে শুধু বিমলা নয় সন্দীপও 'থমকে' যায়— 'আমাদের সকলেরই ধাতের মধ্যে এক জায়গায় একটা ছাত্র বাসা করে আছে বোধ করি। আমি যে এ-হেন দুর্বৃত্ত আমিও কেমন থমকে গেলুম'। নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করাই সন্দীপের উদ্দেশ্য কিন্তু তার মধ্যেও একটা পরিবর্তন আসছে, সেটা সে নিজেও নিজের কাছে অস্বীকার করতে পারছে না। নিজের মুখোমুখি দাঁড়াতে হচ্ছে বারবার, প্রশ্ন করতে হচ্ছে নিজেকে, যে কেন সে বিমলার সঙ্গে নিজের জীবনটাকে জড়িয়ে ফেলছে। 'আমার ধারণা ছিল, আমি ঝড়ের মতো ছুটে চলতে পারি। ফুল ছিঁড়ে আমি মাটিতে ফেলে দিই, তাতে আমার চলার ব্যাঘাত করে না। কিন্তু এবার যে আমি ফুলের চার দিকে ফিরে ফিরে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি ভ্রমরেরই মতো, ঝড়ের মতো নয়'। নিজের আইডিয়া দিয়ে নিজের যে এক অন্য ছবি সে গড়ে তুলেছে, বাইরের সকলের কাছেই নয় নিজের কাছেও। তার রঙ যে কাঁচা তা বোঝা যাচ্ছে, বেরিয়ে আসে তাই ভেতরের 'সেই সামান্য মানুষটা'। তার প্রতিজ্ঞা ছিল নিজের বা অন্য কারুর গড়ে দেওয়া কোন মায়া-মোহ তার জীবনে কখনও কোন গুরুত্ব পাবে না—

'জীবনটাকে আগাগোড়া একেবারে নিরেট বাস্তব করে তুলব। কিন্তু তার পর থেকে আজ পর্যন্ত সমস্ত জীবনকাহিনীটাকে কী দেখছি ? কোথায় সেই ঠাস বুনোনি ? এ যে জালের মতো। সূত্র বরাবর চলেছে ; কিন্তু সূত্র যতখানি ফাঁক তার চেয়ে বেশি বৈ কম নয়। এই ফাঁকটার সঙ্গে লড়াই করে করে একে সম্পূর্ণ হার মানানো গেল না। কিছুদিন বেশ একটু নিশ্চিন্ত হয়ে জোরের সঙ্গেই চলেছিলুম ; আজ দেখি আবার একটা মস্ত ফাঁক'।

নিরেট বাস্তবের মধ্যেও সন্দীপের সঙ্কোচ, এই 'ফাঁক'টুকুই চরিত্রটাকে গড়ে দিয়েছে। কোনও ব্যক্তিচরিত্রই শুধু সাদা কালো, ইতিবাচক বা নেতিবাচক কখনও হয় না, প্রত্যেকেই ইতি-নেতির সংমিশ্রণে সাদাকালোর বাস্তবে ধুসর। সন্দীপের চরিত্রেও রয়েছে আত্ম-অনুসন্ধান,সে বলছে 'আমরা পুরুষ, আমরা রাজা, আমরা খাজনা নেব। আমরা পৃথিবীতে এসে অবধি পৃথিবীকে লুঠ করছি'। বিমলার কাছে টাকার দাবি করছে, মনে হচ্ছে তার ধনী হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু বিমলার কষ্টও ওর 'বুকে লাগছে'। বিমলার শেষ 'আত্মকথা'য় সন্দীপের কয়েকটি কথা, বলা যায় তার উপলব্ধি স্বীকারোক্তিও, চরিত্রটিকে সম্পূর্ণতা দিচ্ছে। চলে যাবার আগে বিমলার গয়নার বাক্স এবং 'ছ'হাজার টাকার গিনি' ফিরিয়ে দিয়ে সে বলে,'মক্ষীরানী, এতদিন পর সন্দীপের নির্মল জীবনে একটা কিন্তু এসে ঢুকেছে'। আর 'সেই আমার সর্বনাশিনী কিন্তুর হাতে দিয়ে গেলুম আমার পূজা। আমি প্রাণপণ চেষ্টা করে দেখলুম, পৃথিবীতে কেবলমাত্র তারই ধন আমি নিতে পারব না —তোমার কাছে আমি নিঃস্ব হয়ে তবে বিদায় পাব দেবী ! এই নাও'। বোধ করি এই সন্দীপকে সে নিজেও চিনত না।

'উপন্যাসের সমাজতত্ত্ব' গ্রন্থে পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন, 'ঘরে বাইরে' যেহেতু তিনজন পরস্পর সম্পর্কিত ব্যক্তির আত্মআবিষ্কারের উপন্যাস সেহেতু সন্দীপকে ভিলেন ভাবলে ভুল হবে। সন্দীপ নিজেকেই প্রশ্ন করে, ''আমি নিজের লেখা আত্মকাহিনী যখন পড়ে দেখি তখন ভাবি, এই কি সন্দীপ? আমি কি কোথা দিয়ে তৈরি ? আমি কি রক্তমাংসের মলাটে মোড়া একখানা বই?" আরও বলছে, ''আমার বোধ হচ্ছে যেন সজীব গ্রহের মতো আমি আমার সেই আইডিয়ার মণ্ডলটাকেই আঁকছি। কিন্তু আমি যা চাই, যা ভাবি, যা সিদ্ধান্ত করছি, আমি যে আগাগোড়া কেবল তাইই তা তো নয়। আমি যা ভালবাসিনে, যা ইচ্ছা করিনে, আমি যে তাও'— সন্দীপের অন্তর্দ্বন্দ্ব, নিজেকে খুঁজে পাওয়া। আলোচক পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, 'সন্দীপ আধুনিক চরিত্রঃ আত্মসচেতন। নিজেকে সে একদিকে নিখিলেশ, অন্যদিকে বিমলার সম্পর্কের টানে তন্নতন্ন করে বিশ্লেষণ করে। সত্যের সম্মুখীন সেও হতে চায়। তবে তার সত্য নিখিলেশের বিপরীত'।

৭.৫ অপ্রধান চরিত্র

চন্দ্রনাথবাবু

নিখিলেশ তার আত্মকথায় বলেছে, চন্দ্রনাথবাবুর সান্নিধ্য সাহচর্য শিক্ষা নিখিলেশের জীবনকে গড়ে দিয়েছে। নিজস্ব ভাবনা ও আদর্শের এক দৃঢ় ভিত্তিভূমিতেই ছিল তার নিজস্ব জীবন যাপন। দেশ ও বিদেশের মানুষ সম্পর্কে নিখিলেশের ভাবনা গড়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের দেশভাবনাকে ঘিরে আর তার পূর্ব সূচনা চন্দ্রনাথবাবুর মধ্যে। নিখিলেশের কথায়— 'আমার মাস্টারমশায় চন্দ্রনাথবাবুকে আজ আমার জীবনের প্রায় ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত দেখলুম; তিনি না ভয় করেন নিন্দাকে, না ক্ষতিকে, না মৃত্যুকে। কোথাও কোন অমঙ্গলের ছায়া তাঁকে বিচলিত করত না। স্থির অচঞ্চল মানুষটি নিখিলেশকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন, তার একাকীত্বের মুহূর্তে মাস্টারমশাই ছিলেন সবচেয়ে বড় আশ্রয়। জীবনের 'বড়ো'র দিকটায় তিনি সবসময় এগিয়ে দিয়েছেন নিখিলেশকে। তাঁর নিজস্ব সত্যবোধ উপলব্ধি স্বতন্ত্র জীবন-সত্যের খোঁজ দিয়েছিল। কোনো স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা নিখিলেশ তাঁর জন্য করতে পারেনি,

গ্রহণ করেন নি। চন্দ্রনাথ বাবু মনে করতেন, ছাত্র নিখিলেশকে যা তিনি দিয়েছেন, তার দাম পেয়েছেন — তার বেশি যা দিয়েছেন,সে দাম নিলে যে নিজের 'ভগবানকে হাটে বিক্রি করা হবে'। কাজের মধ্যে একটু অবসর পেলেই নিখিলেশকে সাহচর্য দিতেন চন্দ্রনাথবাবু। 'মাস্টার-মশায় যখন একটু ফাঁক পান আমার কাছে এসে বসেন। তাঁর একটা শক্তি আছে, তিনি মনটাকে এমন একটা শিখরের উপর দাঁড় করিয়ে দিতে পারেন যেখান থেকে নিজের জীবনের পরিধিটাকে এক মুহূর্তেই বড়ো করে দেখতে পাই। বরাবর যেটাকে সীমা বলে মনে করে এসেছি তখন দেখি সেটা সীমা নয়'। এভাবেই জমিদার বাড়ির অতি প্রাচুর্য ও অনিয়মিত জীবন যাপনের অভ্যাস থেকে নিখিলেশের মন ও স্বভাবকে রক্ষা করেছেন, পথ দেখিয়েছেন তিনি। জীবনটাকে বড় করে দেখতে শিখিয়েছিলেন তিনি সন্দীপকে নিয়ে নিখিলেশ এবং বিমলার সম্পর্কের সংকট মুহূর্তে নিখিলেশকে বলেছিলেন, বিমলাকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে একটু বড় জায়গা থেকে জীবনটাকে দেখিয়ে দিতে। চন্দ্রনাথবাবু বুঝতে পারছিলেন হঠাৎ ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে সন্দীপের উদ্দেশ্যমূলক সংকীর্ণ ক্ষেত্র থেকে স্বদেশ এবং জীবনের এক ভিন্ন অসত্য রূপকে সত্য বলে মনে করছে বিমলা,'ওঁকে তুমি একবার পৃথিবীটা দেখিয়ে দাও — মানুষকে , মানুষের কর্মক্ষেত্রকে উনি একবার বড়ো জায়গা থেকে দেখে নিন'। নিখিলেশের নিজের দেশকে চেনা, তার স্বরূপ বোঝার ভিত্তিটাও গড়ে দিয়েছিলেন মাস্টারমশাই — চরম রাজনৈতিক সংকটের মুহূর্তে, নিখিলেশের ব্যক্তি জীবনের সংকটে, যার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল সমকালের রাজনীতি-সন্দীপ, চন্দ্রনাথবাবু নিখিলেশকে বলছেন, 'দেখো নিখিল, মানুষের ইতিহাস পৃথিবীর সমস্ত দেশকে সমস্ত জাতকে নিয়ে তৈরি হয়ে উঠেছে। এইজন্য পলিটিক্সেও ধর্মকে বিকিয়ে দেশকে বাড়িয়ে তোলা চলবে না'। রবীন্দ্রনাথ ধর্মের বাঁধনে মানুষকে ঐক্যসূত্রে বাঁধার নীতিকে সমর্থন করেন নি, ইংরেজদের ভেদনীতির বিরুদ্ধে 'ধর্ম তথা সম্প্রদায় নিরপেক্ষ রাষ্ট্রতন্ত্রই ভারতীয়দের কাম্য হওয়া উচিৎ বলেই মনে করতেন'।

মেজরানী

পারিবারিক কারণে ছোটখাটো মতভেদ কখনো হলেও মেজোরানী দিদির সম্পর্ক নিখিলেশের জীবনে একটা বড় আশ্রয় ছিল। চন্দ্রনাথবাবু যেমন তার মনের দৃষ্টি, তার ভাবনার জগতকে ব্যাপ্তি দিয়েছে তেমনই মেজোরানীর স্নেহ ভালবাসা সাহচর্য নিখিলেশের সমস্ত সংকটের মুহূর্তে এক স্নিগ্ধ সখ্যতার সাহচর্য দিয়েছে। ন' বছর বয়সে বিয়ে হয়ে এসেছিল সে। খুব অল্প বয়সেই তার স্বামীর মৃত্যু হয়। তারপর এই পরিবার থেকে আর কখনও কোথাও সে যায়নি আর সম্পর্কের আশ্রয় ছিল নিখিলেশ। প্রায় একই সঙ্গে ছোট থেকে বড় হয়ে উঠেছিল তারা। বিমলার সঙ্গে নিখিলেশের বিয়ের পর একটা দূরত্ব তৈরি হলেও, এই সখ্যতা বিমলার সঙ্গে গড়ে ওঠেনি। নিখিলেশের কথায়,'বিমল একরকম করে বুঝেছিল, আমার উপর মেজরানীর দাবি কেবলমাত্র সামজিকতার দাবি নয়, তার চেয়ে অনেক বেশি গভীর; সেইজন্যই আমাদের আশৈশবের সম্পর্কটির 'পরে তার এতটা ঈর্ষা'। নিখিলেশ বলেছে যে তার 'উৎপাতের শাসনকে অমান্য করার' সাধ্য তার ছিল না, 'সংসারে এ যে বড় দুর্লভ'। সন্দীপের প্রতি আকর্ষণে যখন ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছিল বিমলা, নিখিলেশের সেই সংকটের মুহূর্তে তাকে মানসিক আশ্রয় দিয়েছে মেজরানী। বিমলাকে বারবার সতর্ক করেছে, তার আর সন্দীপের সম্পর্কের মধ্যে বাধা সৃষ্টির চেষ্টা করেছে — নিখিলেশের মানসিক যন্ত্রণায় সেও খুব কষ্ট পেত। নিখিলেশকে নিয়ে বিমলার প্রতি ঈর্ষা তারও ছিল, নিখিলেশকে ভালবাসলেও সামাজিক দাবির অধিকার তার ছিল না, এ কথা নিখিলেশ বুঝত—

'আমি বুঝেছি টাকাকড়ি ঘর-দুয়ারের ভাগ নিয়ে, ছোটো-খাটো সামান্য সাংসারিক খুঁটিনাটি নিয়ে বিমলের সঙ্গে, আমার সঙ্গে তাঁর যে বারবার ঝগড়া হওয়ে গেছে তার কারণ বৈষয়িকতা নয়, তার কারণ তাঁর জীবনের এই একটি মাত্র সম্বন্ধে তাঁর দাবি তিনি প্রবল করতে পারেন নি — বিমল কোথা থেকে হঠাৎ মাঝখানে এসে

একে ম্লান করে দিয়েছে — এইখানে তিনি নড়তে চড়তে ঘা পেয়েছেন, অথচ তাঁর নালিশ করবার জোর ছিল না'।

উপন্যাসের শেষে নিখিলেশ বিমলা কলকাতা যাবার সিদ্ধান্ত নিলে সেও তার জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়েছে। তার অনুভব নিখিলেশকেও তার অতীতে ফিরিয়ে দেয়, ফিরে যেতে চায় তাদের দুজনের সখ্যতার সেই পুরনো দিনগুলোতে। নিখিলেশ বুঝতে পারে এ সম্পর্ক জীবনের পরম সম্পদ, অস্বীকারের নয়, সযত্নে রক্ষা করার।

অমূল্য

কিশোর অমূল্য সন্দীপের স্বদেশী দলের ছেলে, সন্দীপের সঙ্গেই সে বিমলার কাছে আসে। সন্দীপের নিজের কথাতেও সে ছিল তারই ছায়া কিন্তু কিশোর অমূল্যই মোহগ্রস্ত বিমলাকে সাহায্য করে সন্দীপের প্রকৃত স্বরূপ বুঝে নিতে। তার মুখে সন্দীপের কথার প্রতিধ্বনি না শুনলে বোধহয় সেগুলো কত অন্তঃসারশূন্য এবং ভয়ংকর বিমলা বুঝতে পারত না। বিমলার কথায়—

'সন্দীপের মুখের কথা যখন এই বালকের মুখে শুনি তখন ভয়ে আমার বুক কাঁপতে থাকে। যারা সাপুড়ে তারা বাঁশি বাজিয়ে সাপ নিইয়ে খেলুক, মরতে যদি হয় তারা জেনেশুনে মরুক। কিন্তু , আহা, এরা যে কাঁচা। সমস্ত বিশ্বের আশীর্বাদ এদের যে নিয়ত রক্ষা করতে চায়। এরা সাপকে সাপ না জেনে হাসতে হাসতে তার সঙ্গে খেলা করতে যখন হাত বাড়ায় তখনই স্পষ্ট বুঝতে পারি, এই সাপটা কী ভয়ংকর অভিশাপ'।

সন্দীপের স্বদেশী আদর্শের মিথ্যে মুখোশের আড়ালে তার লোভ, চরিত্রের দুর্বল, স্বার্থান্বেষী চেহারাটা স্পষ্ট হয়েছিল বিমলার কাছে। বিমলার কাছে অমূল্য তার 'বালক-দেবতা', নিজের ঘরে স্বামীর সিন্দুক থেকে টাকা চুরি করে যখন সন্দীপের হাতে তুলে দিল তখন নিঃস্ব বিমলা। সে ঘর হারিয়েছে, সম্পর্ক থেকে নিখিলেশ তাকে মুক্তি দিয়েছে, সন্দীপকে ঘিরে স্বদেশী উন্মাদনার মিথ্যে আবরণটাও খসে গিয়েছে। সেই আশ্রয়হীন একাকীত্বের মুহূর্তে অমূল্যর বিশ্বাস, দিদিরানীর সম্মান বিমলাকে রক্ষা করেছে। বিমলার কথায়, তখন তার নিজের মনের ভিতর থেকে সে আর নিজেকে আশ্রয় দিতে পারছিল না, নিজের 'পরে নিজের শ্রদ্ধাকে বাঁচিয়ে রাখবার সম্বল আমার যে কিছুই নেই'। অমূল্যর শ্রদ্ধা-ভালবাসা বিমলাকে আশ্রয় দিয়েছে, নিজের ওপর নিজের শ্রদ্ধা-আস্থা-বিশ্বাস ফিরে পেতে সাহায্য করেছে। উপন্যাসের শেষে সন্দীপ নিজেকে বাঁচিয়ে সেখান থেকে চলে যায়। কিন্তু দাঙ্গার হাত থেকে মানুষকে বাঁচাতে, তাদের পাশে থাকার সময় অমূল্যর বুকে গুলি লাগে, সেখানেই তার মৃত্যু হয়।

৭.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১। রবীন্দ্র-উপন্যাসের নরনারী—গোপীমোহন সিংহ রায়
২। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস : চেতনালোক ও শিল্পরূপ — সৈয়দ আক্রম হোসেন

একক-৮ ❑ 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসের বিবিধ প্রসঙ্গ ও মূল্যায়ণ

গঠন

৮.১ রবীন্দ্রনাথের দাম্পত্য ভাবনা
৮.২ রবীন্দ্রনাথের দেশ ভাবনা
৮.৩ উপন্যাসের নামকরণ
৮.৪ উপন্যাসের আঙ্গিক ও ভাষারীতি
৮.৫ উপন্যাসের পরিণতি প্রসঙ্গে
৮.৬ উপন্যাসের শ্রেণিবিচার
৮.৭ অনুশীলনী
৮.৮ গ্রন্থপঞ্জি

৮.১ রবীন্দ্রনাথের দাম্পত্য ভাবনা

নিখিলেশ বিমলাকে বলেছে, 'তোমরা স্বয়ংবরা হতে পারনি বলেই রোজ মানুষকে বাদ দিয়ে দেবতার গলায় মালা দিচ্ছ'। নিখিলেশ বিমলার ছবির সামনে রোজ সকালে স্নানের পর ফুল দিত কিন্তু নিখিলেশ তা' মানতে পারত না। শিক্ষিত আধুনিক মনের নিখিলেশ সেটা মেনে নিতে পারত না। মনে হত, এদেশে মেয়েরা স্বামীকে নির্বাচন করতে পারে না বলেই যাকে পায়, তাকে পুজো করে দেবতা করে তুলে নিজেকে ভোলায়। বিমলা নিজে বলে, 'প্রেমের থালায় ভক্তির পূজা আরতির আলোর মতো — পূজা যে করে এবং যাকে পূজা করা হয় দুইয়ের উপরেই সে আলো সমান হয়ে পড়ে'। বিমলার উপলব্ধি, 'আমি যে অমনি পেয়েছি'। অর্থাৎ এই সম্পর্ক নিজের অর্জিত নয়, সামাজিক নিয়মে পাওয়া। ছোটবেলায় বাবা-মা'র সম্পর্কে মা'র পুজো ও ভক্তির সংস্কারে বিমলার নারী মন গড়ে উঠেছিল। সন্দীপের প্রতি আকর্ষণ সেই সংস্কারের জগতটা ভেঙে দিল, সে দিশেহারা হল নতুন বিমলাকে চিনে। তারপর অনেক ভাঙাগড়া চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে স্বামী লিখিলেশের মধ্যেকার সহমর্মী মানুষটাকে খুঁজে পেল সে। সামাজিক সংস্কারের সূত্রেই গড়ে উঠেছিল নিখিলেশ বিমলার দাম্পত্য জীবন। নিখিলেশ তাই চেয়েছিল বড় পৃথিবীর মাঝে তাদের দেনা-পাওনা হোক। সেখানে অন্য অনেক কিছুর মধ্যে তারা পরস্পরকে চিনে নিক। তার মনে হত সমাজের গড়ে দেওয়া সেই ঘরে, 'এখানে আমাকে দিয়ে তোমার চোখ-কান-মুখ সমস্ত মুড়ে রাখা হয়েছে --- তুমি যে কাকে চাও তাও জান না, কাকে পেয়েছ তাও জান না'। নিখিলেশ বিশ্বাস করত, বদলে যাওয়া সময়কালে চেনা সম্পর্কের ধরন গুলোও বদলে গেছে। বড় পৃথিবীর মাঝে সামাজিকতার গণ্ডি ছাড়িয়ে সম্পর্কে পরস্পরের অবস্থানটা বুঝে নেওয়া প্রয়োজন, তাই বিমলাকে বলত, 'এই ঘর-গড়া ফাঁকির মধ্যে কেবল ঘরকন্নাটুকু করে যাওয়ার জন্যে তুমি হওনি, আমিও হইনি। সত্যের মধ্যে আমাদের পরিচয় যদি পাকা হয় তবেই আমাদের ভালোবাসা সার্থক হবে'। এখানে বোঝা যায় নিখিলেশের কাছে সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে ব্যক্তি-সম্পর্ক গুরুত্ব পাচ্ছে। ঘরে বাইরে লেখার দশ বছর পর লেখা হচ্ছে,'ভারতবর্ষীয় বিবাহ'(১৩৩২)। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের 'বিবাহ' বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কথা এক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

'অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষের প্রেম বলে যে একটি স্বাভাবিক হৃদয়বৃত্তি আছে তাকে অতিক্রম করে দাম্পত্যপ্রেম নামক একটি সামাজিক হৃদয়বৃত্তিকে সাধনার দ্বারা গড়ে তোলবার বিশেষ চেষ্টা আমাদের দেশে আছে'।

সামাজিক দাম্পত্যে মেয়েদের ভূমিকা ও অবস্থান বিষয়ে বলেছেন, 'স্বামী বলে একটি ভাবকে শিশুকাল হতেই বালিকারা ভক্তি করতে শেখে। নানা কথাকাহিনী ব্রত পূজার ভিতর দিয়ে এই ভক্তিকে মেয়েদের রক্তের সঙ্গে একেবারে মিশিয়ে দেওয়া হয়। তারপর স্বামীকে যখন পায় তখন তাকে তারা ব্যক্তি বলে নয়, স্বামী বলে দেখে। সেই স্বামী অনেকখানি তার নিজের মনের জিনিস, বাইরের জিনিস নয়। বিচার বুদ্ধি পরিণত হবার পূর্ব হতেই অনির্দিষ্ট ব্যক্তির উপরে এই স্বামী-ভাব আরোপ করে দিনে দিনে এই পতিগত সংস্কার তাদের দেহমনকে অধিকার করে তোলে। নানা প্রকার সেবা ও ব্যবহারের দ্বারা এই সংস্কার প্রবল হোতে থাকে' ('সমাজ' প্রবন্ধ সংকলন)। বিমলাও স্বামীকে পুজো করতে চাইত, তার ছিল সংস্কারবাহিত 'সতীত্বের গর্ব' — স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, প্রচলিত দাম্পত্য ভাবনায় সে জেনেছিল, সতীত্ব পাতিব্রত্য একনিষ্ঠতা, এই ধারণাগুলিই নিয়ন্ত্রণ করে একটি মেয়ের জীবন। ভারতীয় বিবাহের আলোচনায়, রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন— 'ভারতীয় বিবাহের বিচার করতে হলে একথা জানা চাই যে এ বিবাহে স্ত্রী-পুরুষের অধিকারের সাম্য নেই'। স্ত্রীর কাছে স্বামী ব্যক্তি নয়,'আইডিয়া'। আধুনিক নতুন ভাবনার মানুষ নিখিলেশ স্ত্রীর ভক্তি পুজো গ্রহণে কুণ্ঠিত হত। সে বিশ্বাস করতো দাম্পত্যে নারী পুরুষের সমান অধিকারে কিন্তু প্রচলিত সামাজিক অনুশাসন সেকথা বলেনা। প্রথম আত্মকথায় বিমলা বলেছে, 'আমার স্বামী বরারবর বলে এসেছেন, স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের প্রতি সমান অধিকার, সুতরাং তাদের সমান প্রেমের সম্পর্ক'। বিমলা এ নিয়ে তার সঙ্গে তর্ক করত না কিন্তু ব্যক্তিসাম্যর কথাও ভাবতে পারত না,'ভক্তিতে মানুষকে সমান হবার বাধা দেয় না', এটাই বিশ্বাস করত। স্বামীভক্তি, স্বামীকে পুজো করার সংস্কারে অভ্যস্ত বিমলার জীবন বদলে গেল সন্দীপের আগমনে। বিমলা বলেছে, স্বদেশী যুগটা যেন বাঁধ ভাঙা বন্যার মত সমস্ত ভয়-ভাবনা ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। নিরাপদ নিশ্চিন্ত পৃথিবীর 'বেড়া ভাঙেনি বটে' কিন্তু দূর দিগন্তের এক ডাকে মন উতলা হয়ে গিয়েছিল। সেই স্বদেশীর ঢেউয়ে সন্দীপ এসে পৌঁছয় বিমলা নিখিলেশের জীবনে। একসময় নিখিলেশ তাকে কলকাতায় নিয়ে যেতে চেয়েছিল, অন্তঃপুরের চার দেয়ালের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে পৃথিবীটাকে চিনে নিতে বলেছিল। বিমলা রাজি হয়নি বলে নিখিলেশ জোর করেনি, সেটা ছিল তার স্বভাব বিরুদ্ধ। বিমলা বলেছে— 'তাঁর জোর আছে বলেই জোর করেন নি। তিনি আমাকে বরাবর বলে এসেছেন, স্ত্রী বলেই যে তুমি আমাকে কেবলই মেনে চলবে, তোমার উপর আমার এ দৌরাত্ম্য আমার নিজেরই সইবে না। আমি অপেক্ষা করে থাকব, আমার সঙ্গে যদি তোমার মেলে তো ভালো, যদি না মেলে তো উপায় কী !'

বিশ শতকের প্রথমার্ধের সে সময়টাই ছিল সব কিছু বদলে যাবার, বলা ভালো পুরনো ব্যবস্থার ভেঙে পড়ার। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলছেন, 'নূতন শিক্ষা, নূতন মত, নূতন অভ্যাস, বাঁধ ভাঙা বন্যার মতো ভারতের উপর আছড়ে পড়েছে। যেসব বিশ্বাস ছিল তার সমাজের স্তম্ভ, সেসব বিশ্বাসে প্রতিদিনই ছোট-বড় ছিদ্র দেখা দিচ্ছে' ('ভারতবর্ষীয় বিবাহ')। এই প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে বলছেন,

'এতদিন ভারতীয় সমাজের-যে আধারের উপরে তার বিবাহপ্রথা প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেই আধারের বিকৃতি হওয়াতে বিবাহের মূলগত ভাবসকল ও তার ব্যবহার সকল কিছুর সঙ্গে ঠিকমতো খাপ খাচ্ছে না। সত্যযুগের জন্যে একদল আক্ষেপ করছে, সে আক্ষেপের ডাকে সত্যযুগ সাড়া দিচ্ছে না। এখন সময় এসেছে নূতন করে বিচার করবার, বিজ্ঞানকে সহায় করবার, বিশ্বলোকের সঙ্গে চিন্তার ও অভিজ্ঞতার মিল করে ভাববার'।

'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে প্রচলিত দাম্পত্যের ধারণাকে প্রশ্ন করেছেন, তাঁর মতে সামাজিক দাম্পত্য সার্থক

হয়ে উঠতে পারে সেই সামাজিক সম্পর্কে থাকা দুটি মানুষের পারস্পরিক সহমর্মিতায়। স্বামী স্ত্রীর সামাজিক পরিচয়ে শুধু নয়, তার মধ্যে থাকা দুটি মানুষের অনুভবে ও ভালবাসায়। স্বামী বা স্ত্রী শুধুমাত্র একটি শব্দ ধারণা বা আইডিয়া মাত্র নয়, ওই বিশেষ সামাজিক পরিচয়ের মধ্যে থাকে দুটি মানুষ। তারা যদি পরস্পরকে গ্রহণ করে তবেই সম্পর্কের সার্থকতা, শুধুমাত্র সামাজিক পরিচয়ে তা সত্য হয়ে উঠতে পারে না। ঘরে বাইরের শেষে বিমলা সমাজ সূত্রে পাওয়া স্বামী, ঘর, অনুভব করতে না পারা ভালোবাসা-নির্ভরতা অনেক মূল্যে নতুন করে অর্জন করেছে। আর নিখিলেশ বুঝতে পেরেছে, 'আমার মধ্যে একটা অত্যাচার ছিল। বিমলের সঙ্গে আমার সম্বন্ধটিকে একটা সুকঠিন ভালোর ছাঁচে নিখুঁত করে ঢালাই করব, আমার ইচ্ছার ভিতরে এই একটা জবরদস্তি আছে। কিন্তু মানুষের জীবনটা তো ছাঁচে ঢালবার নয়'।

জীবনের অনেক সংকটের মধ্যে দিয়ে, সন্দীপকে কেন্দ্র করে সম্পর্কের প্রায় ভেঙে পড়া বিমলা এবং নিখিলেশকে নিজের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। সামাজিকতার যে ঘরটি তারা গড়েছিল, বাইরের অভিঘাতে সেটা ভেঙে পড়লেও পারস্পরিকতা সহমর্মিতায় আবার নতুন করে পথ চলার তাগিদ তারা বোধ করল, কলকাতায় গিয়ে আবার নতুন জীবন শুরু করার সিদ্ধান্ত নিল। নিখিলেশ অনুভব করল ভালোত্বের জুলুমেই তারা কখন দুজনে আলাদা হয়ে গেছে সে বুঝতে পারে নি। বিমলা নিজে যা হতে পারত সেটা স্বামীর ভালত্বের 'ছাপে ফুটে উঠতে পারে নি বলেই নীচের তলা থেকে রুদ্ধ জীবনের ঘর্ষণে বাঁধ খুইয়ে ফেলেছে'। 'একরোখা আইডিয়া'য় সহধর্মিণী গড়তে গিয়ে স্ত্রীকে বিকৃত করেছে।

বিমলা যেমন নিজের 'জন্মতিথি' পালন করে নতুন হতে চেয়েছে, নিখিলেশেরও মনে হয়েছে আবার কি 'গোড়া' থেকে শুরু করা যায় না ! তাহলে সহজের রাস্তায় চলে, তার সঙ্গীকে কোন 'আইডিয়ার শিকল'-এ না বেঁধে শুধু ভালবাসায় পরস্পরের সঙ্গে এক হতে পারে,'আমার ফরমাশ একেবারে চাপা পড়ুক; তোমার মধ্যে বিধাতার যে ইচ্ছা আছে তারই জয় হোক, আমার ইচ্ছা লজ্জিত হয়ে ফিরে যাক'। নতুন করে শুরু করা যাবে কিনা এই সংশয় যখন নিখিলেশের, বিমলা ঘরের দরজা থেকে ফিরে যাচ্ছে দেখে নিখিল তাকে ঘরের মধ্যে নিয়ে এল। বিমলা প্রচণ্ড কান্নায় তার পায়ের উপর মাথা রেখে বলে, 'তোমার পা সরিয়ে নিও না — আমাকে পুজো করতে দিয়ো'। নিখিলেশ চুপ করে ভাবে, 'এ পূজায় বাধা দেবার আমি কে! যে পূজা সত্য সে পূজার দেবতা সত্য — সে দেবতা কি আমি যে আমি সংকোচ করব?

'চোখের বালির সঙ্গে একই সময়ে লেখা, বড় গল্প 'নষ্টনীড়' (বৈশাখ—অগ্রাণ , ১৩০৮)। নিজের সাহিত্যচর্চা নিয়ে ব্যস্ত থাকা ভূপতির সাহিত্য পত্রিকা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর সে স্ত্রী চারুর কাছে যাচ্ছে, এতদিন তার অবকাশ ছিলনা। গল্পকার বলছেন, 'বোধকরি ভূপতির একটা সাধারণ সংস্কার ছিল — স্ত্রীর ওপর অধিকার কাহাকেও অর্জন করিতে হয় না, স্ত্রী ধ্রুবতারার মতো নিজের আলো নিজেই জ্বালাইয়া রাখে — হাওয়ায় নেবে না, তেলের অপেক্ষা রাখে না। বাহিরে যখন ভাঙচুর আরম্ভ হইল তখন অন্তঃপুরে কোনো খিলানে ফাটল ধরিয়াছে কি না তাহা একবার পরখ করিয়া দেখার কথাও ভূপতির মনে স্থান পায় নাই'। আষাঢ় ১৩২৪-এ লেখা 'পয়লা নম্বর' গল্পে অনিলার স্বামী অদ্বৈতচরণ বলছে, 'পুরোহিতের হাত থেকে অনিলাকে আমি পেয়েছিলুম, কিন্তু তাঁর বিধাতার হাত থেকে তাকে গ্রহণ করবার মূল্য আমি কিছুই দিইনি'।

বিমলার শেষ আত্মকথা শুরু হচ্ছে, বিমলা বলছে, 'আর আমি ভয় করি নে, আপনাকে না, আর-কাউকেও না। আমি আগুনের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে এসেছি, যা বাকি আছে তার আর মরণ নেই। সেই আমি আপনাকে নিবেদন করে দিলুম তাঁর পায়ে যিনি আমার সকল অপরাধকে তার গভীর বেদনার মধ্যে গ্রহণ করবেন'। উপন্যাস শেষে

বিমলার অপেক্ষা নিখিলেশের জন্য। সে দাঙ্গা থামাতে গিয়েছিল, যে দাঙ্গা শুরু করে দিয়ে চলে গিয়েছে সন্দীপ। অত্যন্ত আহত অবস্থায় নিখিলেশকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হলেও, বাঁচবে কিনা বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু বিমলা তার অপেক্ষায় রয়েছে। এ প্রতীক্ষা সামাজিকতার নয়, ব্যক্তি অনুভবের, পারস্পরিক সহমর্মিতার। বিশ শতকের বদলে যাওয়া সময়ে যেন তৈরি হয়ে উঠছে দাম্পত্যের নতুন সংজ্ঞা।

৮.২ রবীন্দ্রনাথের দেশভাবনা ও 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাস

বিশ শতকের একেবারে গোড়ার দিকে বাঙালির নতুন ভাবনাবিশ্ব তৈরি হয়ে উঠেছিল ব্রিটিশ বিরোধী নতুন রাজনৈতিক বোধ ও বিশ্বাসে। বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতায়, ব্রিটিশ শাসকের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করে প্রথম ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন। এইসময় থেকেই দেশকে স্বাবলম্বী করার জন্য, দেশ গঠনের প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথ পল্লী-উন্নয়ন, পল্লী-সংগঠনের কথা বলছেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় গান্ধীজী যখন গঠনমূলক কাজের কথা বলছিলেন, রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে তাঁকে লিখেছিলেন,'আমি সর্বদাই মনে করিয়াছি, এবং বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছি যে, কোন জাতি দান রূপে স্বাধীনতার বিরাট সম্পদ লাভ করিতে পারে না। উহা সম্ভোগ করিবার পূর্বে আমাদিগকে উহা অর্জন করিতে হইবে। ভারতবর্ষ যেদিন প্রতিপন্ন করিতে পারিবে যে, কেবল বাহুবলে আধিপত্য বিস্তারের অধিকারে যাহারা এই দেশ শাসন করিতেছে, নীতির দিক হইতে তাহাদিগের তুলনায় ভারতবাসী অনেক অধিক উন্নত, সেই দিনই তাহার স্বাধীনতা লাভের সুযোগ আসিবে। দুঃখভোগের কৃচ্ছ্রতা তাহাকে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইতে হইবে। সেই দুঃখভোগই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগের জয়মুকুট। যাহারা আজ দম্ভ ভরে আত্মিক শক্তিকে উপহাস করিতেছে, কল্যাণের সম্বন্ধে অবিচলিত বিশ্বাসের বর্মে আবৃত হইয়া তাহাদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে হইবে' (*রবীন্দ্রনাথ*, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, ১৯৪১, বুক কোম্পানি লিমিটেড, কলকাতা, পৃ ৪১)। ১৯০৫-এ লর্ড কার্জনের উদ্যোগে বাংলা দ্বিখণ্ডিত হল। ১৬ই অক্টোবর 'বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ কার্যকরী' হচ্ছে, বাংলা বিভাগের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র বাংলা জুড়ে শুরু হয়েছিল মৌখিক প্রতিবাদ, ক্ষোভ প্রকাশ। ১৯০৪-এ 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ দেশের সমস্যা দূর করতে গ্রামের দিকে ফিরে তাকাতে বলেছিলেন, গ্রাম বাঁচানো, সংঘশক্তি জাগিয়ে তোলার বিস্তৃত কর্মপদ্ধতি এখানে আলোচনা করেছেন। কারণ গ্রামই বাংলার প্রাণশক্তি। রাজনীতিকরা তখন এটাকে খুব বাস্তব সমাধান হিসেবে গ্রহণ করেন নি। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে নিখিলেশের দেশভাবনা বারে বারেই সমালোচিত হয়েছে। ১৯০৬-এ বরিশাল সম্মেলনে 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' শিরোনামে পাঠ করা প্রবন্ধটিতে দেশের কর্মশক্তিকে একত্রিত করা, হিন্দু মুসলিমকে একসঙ্গে করে তাদের একত্রিত কর্তৃত্ব মেনে নেওয়ার কথা বলছেন।

'ঘরে-বাইরে'র দশ বছর আগে লেখা 'আত্মশক্তি' প্রবন্ধর অন্তর্গত 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ'-এ রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, দেশকে পেতে হবে ভোগের পথে নয়, ভিক্ষার পথে নয়, কর্মের পথে। নিজেদের উদ্যম-প্রচেষ্টার ভাবনা গুরুত্ব পাচ্ছে তাঁর লেখায় — পল্লী উন্নয়ন পল্লী-পঞ্চায়েত নিজস্ব বিদ্যালয় নিজেদের সংস্কার বিশ্বাসের প্রতি আস্থা-নির্ভরতার কথা বলছেন। ঘরে বাইরের কয়েকবছর আগে লেখা 'গোরা' উপন্যাসে গোরা সেই 'সত্য ভারতবর্ষ', 'পরিপূর্ণ ভারতবর্ষ'কেই খুঁজতে চেয়েছে। ভাল-মন্দ সত্য-অসত্য'র বিচার না করে 'ষোলো আনা' অনুভব করতে চেয়েছে 'আমরা আমরাই' — দেশ ও সমাজের নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি জেনে, দেশের দারিদ্র্যকে মেনে নিয়ে, 'দেশের প্রতি এমন একটি বলিষ্ঠ শ্রদ্ধা', 'দেশের অন্তর্নিহিত শক্তির প্রতি অবচলিত বিশ্বাস' ফুটে উঠেছে গোরা চরিত্রে। দেশের সঙ্গে একাত্ম হয়ে মিলতে চেয়েছে সে। বন্ধু বিনয়কে বলেছে 'সমস্ত জাত মিথ্যার কাছে মাথা বিকিয়ে রেখেছে। দেবতা অপদেবতা পেঁচো হাঁচি, বৃহস্পতিবার, ত্র্যহস্পর্শ — ভয় যে কত তাঁর ঠিকানা

নেই — জগতের সত্যের সঙ্গে কী রকম পৌরুষের সঙ্গে ব্যবহার করতে হয় তা এরা জানবে কী করে ?' গোরার ভাবনার ধারাবাহিকতা ঘরে বাইরের নিখিলেশ চরিত্রে। দেশের কাজের নামে কর্মহীন আবেগকে মেনে নিতে পারেন নি রবীন্দ্রনাথ,

'আমাদের পক্ষেও দেশহিতৈষার নেশা স্বয়ং দেশের চেয়ে বড়ো হইয়া উঠিয়াছিল। যে দেশ প্রত্যক্ষ তাহার ভাষাকে বিস্মৃত হইয়া, তাহার ইতিহাসকে অপমান করিয়া, তাহার সুখদুঃখকে নিজের জীবনযাত্রা হইতে বহুদূরে রাখিয়া আমরা দেশহিতৈষী হইতেছিলাম'।

সন্দীপের ছেলের দলকে এই প্রশ্নই করেছিলেন চন্দ্রনাথবাবু এবং এখানেই সন্দীপ ও নিখিলেশের দেশ ভাবনার বিরোধ। দেশের নামে মোহবিস্তারের অন্যায় মেনে নিতে পারেন নি রবীন্দ্রনাথ, তেমনই পারেন নি চন্দ্রনাথবাবু — নিখিলেশ। আর সন্দীপ ঠিক এই কাজটাই করছিল। সন্দীপের কথায় স্বামীর সিন্দুক থেকে টাকা চুরির আগে বিমলাও দেশের নামে সন্দীপের মিথ্যে মোহ বিস্তারের কৌশল বুঝতে পারে নি। রবীন্দ্রনাথের মনে হচ্ছে পরনির্ভরতাই সবচেয়ে বড় ত্রুটি, নিজেদের উদ্যমে চেষ্টায় দেশকে গড়ে তোলার কথাই বলছেন, যে কাজ নিখিলেশ করছে 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে।

'অবস্থা ও ব্যবস্থা' প্রবন্ধেও রয়েছে দেশকে গড়ে তোলার প্রসঙ্গ,'আর দ্বিধা না করিয়া গ্রামের স্বকীয় শাসনকার্য আমাদিগকে নিজের হাতে লইতেই হইবে। সরকারি পঞ্চায়েতের মুষ্টি আমাদের পল্লীর কণ্ঠে দৃঢ় হইবার পূর্বেই আমাদের নিজের পল্লী-পঞ্চায়েতকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে। চাষিকে আমরাই রক্ষা করিব, তাহার সন্তানদিগকে আমরাই শিক্ষা দিব, কৃষির উন্নতি আমরাই সাধন করিব, গ্রামের স্বাস্থ্য আমরাই বিধান করিব এবং সাহায্য লইবার কল্পনাও যেন আমাদের মাথায় না আসে। কারণ, এ স্থলে সাহায্য লইবার অর্থই দুর্বলের স্বাধীন অধিকারের মধ্যে প্রবলকে ডাকিয়া আনিয়া বসানো'। হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে বাংলার সব মানুষকে পরস্পরের কাছে আনার জন্য বাংলার মেলাগুলোকে বাঁচিয়ে তোলা এবং মেলায় মেলায় সাহিত্য সম্মেলনের প্রস্তাব করছেন, নিজেদের মতবিরোধ ব্রিটিশদের সুযোগ করে দিচ্ছে, জগদীশচন্দ্র বসুকে একটি চিঠিতে লিখছেন যে অন্য কোন কিছু দরকার নেই, 'আমাদের নষ্ট করিবার জন্য আর কারও প্রয়োজন হইবে না — মর্লিরও নয়, কিচেনারও নয় — আমরা নিজেরাই পারিব'। 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে নিখিলেশ-চন্দ্রনাথবাবু এবং সন্দীপ তার দলবল ও তার দ্বারা প্রভাবিত বিমলা অমূল্যদের মধ্যে দিয়ে সমকালের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আর রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব মত-প্রতিক্রিয়া-কাজ মিলিয়ে নেওয়া যায়।

'দেশনায়ক' প্রবন্ধে তিনি প্রকৃত দেশনায়কের কথা বলছেন, 'কলহ অক্ষমের উত্তেজনা-প্রকাশ, তাহা অকর্মণ্যের একপ্রকার আত্মনিবেদন'। 'মত্ত অবস্থায়' শুধুমাত্র আবেগ উন্মাদনায় বড় কোন লক্ষ্যে পৌঁছনো যায় না, নিজেদেরকে গড়ে তুলতে হবে। স্বাধীনতার বড় লক্ষে এগিয়ে যাবার জন্য সক্ষমতা অর্জন করা প্রয়োজন। কাজের থেকে উচ্ছ্বাসই তখন বড় হয়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথ বলছেন বয়কট শুধু ইংরেজের তৈরি কাপড়-লবণ ও অন্যান্য জিনিসপত্রে নয়, শাসন বিষয়েও আত্মশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বাংলার গ্রামে, গ্রামের ভিতরে অর্থাৎ দেশের অন্তস্থলে প্রবেশের প্রয়োজন উল্লেখ করেছেন।

বাংলা ভাগ 'কার্যকরী' হলে রবীন্দ্রনাথ গান লিখলেন, 'বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল —' প্রস্তাব দিলেন হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতির জন্য পরস্পরের হাতে রাখীবন্ধনের, প্রতিবাদস্বরূপ অরন্ধন পালন করতে। স্কুল-কলেজের ছাত্রদের স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেওয়া সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করে 'কার্লাইল সার্কুলার' প্রকাশ করা হল। স্বদেশী আন্দোলনের পক্ষে বলা হল, প্রতিবাদ জানাতে ইংরেজের তৈরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছেড়ে

বেরিয়ে আসতে হবে, সরকারি চাকরি ছাড়তে হবে অর্থাৎ ব্রিটিশদের সমস্ত সংস্রব ত্যাগ করতে হবে। জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার পরিকল্পনা শুরু হল, রবীন্দ্রনাথ অধৈর্য হতে নিষেধ করলেন দেশের মানুষকে। বিমলার কথায়, 'এই সময় সকলের চোখে পড়ল আমার স্বামীর এলাকা থেকে বিলিতি নুন বিলিতি চিনি বিলিতি কাপড় এখনো নির্বাসিত হয়নি। এমনকি, আমার স্বামীর আমলারা পর্যন্ত এই নিয়ে চঞ্চল ও লজ্জিত হয়ে উঠতে লাগল'। বিমলা নিজে লজ্জিত এবং বিরক্ত হয়েছিল তখন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন, গাছ পুঁতেই ফল চাওয়া যায় না, ফল পেতে সময় লাগে। বিমলা স্বদেশী আবেগে তার সমস্ত বিদেশী কাপড় পুড়িয়ে ফেলতে চাইলে নিখিলেশ নিষেধ করেছে, 'আমি বলছি গড়ে তোলবার কাজে তোমার সমস্ত শক্তি দাও — অনাবশ্যক ভেঙে ফেলবার উত্তেজনায় তার সিকি পয়সা বাজে খরচ করতে নেই'। ধ্বংসের কাজে শক্তি ব্যয় না করে গঠনমূলক কাজে লাগাতে বললে বিমলাও কিন্তু নিখিলেশের শান্ত স্থির যুক্তি গ্রহণ করতে পারে না। সে সময় দেশের মানুষ, স্বদেশী আন্দোলনের নেতৃস্থানীয়রা রবীন্দ্রনাথের ভাবনা গ্রহণ করতে পারেন নি।

রবীন্দ্রনাথ বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে আত্মশাসন প্রবর্তন করলেন। তাঁর মতে আত্মশসনই স্বরাজের বুনিয়াদ, আশ্রমের ছাত্র শিক্ষকরা গ্রামে যেতে শুরু করলেন, গ্রামসেবায় মন দিলেন, দরিদ্র ভাণ্ডার স্থাপন করা হল। বিদ্যালয় পরিচালনায় হেডমাস্টারি প্রথা বাদ দিয়ে শিক্ষক-সংঘ এবং ছাত্র-সংঘ স্থাপন করা হল, কোনও একক সিদ্ধান্তের পরিবর্তে সকলে মিলে কাজ করা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। গ্রামে গ্রামে পল্লীসমিতি গড়ে তুলে ছোট ছোট আত্মশক্তি চালনা করা, প্রকৃত কর্তৃত্বের অধিকারী হওয়া অর্থাৎ নিজ দায়িত্বে ও সিদ্ধান্তে কাজ করার 'হাতেখড়ি' করতে হবে। নিজের জমিদারিতে এই পরীক্ষা শুরু করলেন। 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে নিখিলেশ তার জমিদারিতে এভাবেই নানা কর্মদ্যোগ গ্রহণ করেছিল যার একমাত্র সমর্থক ছিলেন মাস্টারমশাই। অন্যদের কাছে ছিল হাসির খোরাক, বিমলা বলেছে, 'অথচ কিছুদিন পূর্বে আমার স্বামী যখন এখানে স্বদেশী জিনিসের আমদানি করেছিলেন তখন এখানকার ছেলে বুড়ো সকলেই মনে মনে এবং প্রকাশ্যে হাসাহাসি করেছিল। দিশি জিনিসের সঙ্গে যখন আমাদের স্পর্ধার যোগ ছিল না তখন তাকে আমরা মনে প্রাণে অবজ্ঞা করেছি। এখনো আমার স্বামী তাঁর দিশি ছুরিতে দিশি পেন্সিল কাটেন, খাগড়ার কলমে লেখেন, পিতলের ঘটিতে জল খান এবং সন্ধ্যার সময়ে শামাদানে দিশি বাতি জ্বালিয়ে লেখাপড়া করেন। কিন্তু তার এই অত্যন্ত সাদা ফিকে রঙের স্বদেশীতে আমরা মনের মধ্যে কোন রস পাই নি'। বিমলার কথাগুলো লক্ষ্য করার,'সাদা ফিকে রঙের স্বদেশী', এটাই তখন অধিকাংশের ধারণা ছিল। নিখিলেশের পরিবর্তে পাশের গ্রামের জমিদার হরিশ কুণ্ডুকে সন্দীপ এবং তার দলবল অনেক বেশি দেশপ্রেমী বলে প্রচার করতে পেরেছিল আর মানুষ তাতে যে খুব অবিশ্বাস করছিল, তাও নয়। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ ভাবনার প্রকাশ 'ঘরে বাইরে'র নিখিলেশ চরিত্রে — স্বদেশী ভাবনা এবং অভ্যাসের গ্রহণ দেশের সাধারণ দরিদ্র মানুষের জন্য যে সহজ স্বাভাবিক নয়, এটা নিখিলেশ জানত। তাদের ওপর ব্রিটিশ শাসকের অত্যাচারের মতো এটাও এক ধরনের জোর-জবরদস্তি, একপ্রকার অত্যাচারেরই সামিল। তার জমিদারিতে নিখিলেশ তাই এই সমস্ত কাজে বাধা দিয়েছে, উত্তেজনার বশে প্রজাদের ওপর কোন অন্যায় হতে দিতে চায়নি। প্রতিবাদ করেছে সন্দীপদের স্বদেশী উন্মাদনার অতি প্রচারে, 'তোমাদের পয়সা আছে, তোমরা দু-পয়সা বেশি দিয়ে দিশি জিনিস কিনছ, তোমাদের সেই খুশিতে ওরা তো বাধা দিচ্ছে না। কিন্তু ওদের তোমরা যা করাতে চাচ্ছ সেটা কেবল জোরের উপরে। ওরা প্রতিদিনই মরণ বাঁচনের টানাটানিতে পড়ে ওদের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত লড়ছে কেবলমাত্র কোনোমতে টিকে থাকবার জন্যে ওদের সঙ্গে তোমাদের তুলনা কোথায়?' তাই সমস্ত নিন্দা অপবাদ, প্রাণনাশের ভয়-দেখানো চিঠি অগ্রাহ্য করেও সে প্রতিবাদ করেছে, 'ওই গরীবদের স্বাধীনতা দলন করে তোমরা যখন স্বাধীনতার

জয়-পতাকা আস্ফালন করে বেড়াবে তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াব, তাতে যদি মরতে হয় সেও স্বীকার'।

নিখিলেশের দেশ সম্পর্কে নিজস্ব বোধ বিমলা বুঝতে পারে না, সন্দীপের মতো সেও দেশকে নিয়ে লোভ করতে চায়, 'আমি মানুষ, আমার লোভ আছে, আমি দেশের জন্যে লোভ করব, আমি কিছু চাই যা আমি কাড়ব-কুড়ব'। কিন্তু নিখিলেশ দেশকে 'সাদা ভাবে সত্যভাবে'ই পেতে চায়, মানুষকে মানুষ বলেই শ্রদ্ধা করতে চায়। 'চার অধ্যায়' উপন্যাসে অন্তু এলাকে বলেছে, 'নারীর মহিমায় অন্তরের ঐশ্বর্য যা তুমি দিতে পারতে, তা সরিয়ে নিয়ে তুমি বলছ — দেশকে দিলে আমার হাতে। পার না দিতে, পার না, কেউ পারে না। দেশ নিয়ে এক হাত থেকে আর এক হাতে নাড়ানাড়ি চলে না'। অন্তু অনুভব করে, এ দেশ বানিয়ে তোলা দেশ, সত্য নয় — এভাবেই সন্দীপরা দেশের এক মিথ্যে রূপ তৈরি করে তুলে বিভ্রান্ত করছিল মানুষকে। সেখানেই প্রতিবাদ চন্দ্রনাথ বাবুর নিখিলেশের। নিখিলেশ নিজের মতো করে দেশকে গ্রহণ করেছে। গ্রামের উন্নতির প্রয়োজনে দেশীয় ব্যবসার চেষ্টা, চাষিদের নিয়ে চাষের ক্ষেতে নানা ধরনের পরীক্ষামূলক উদ্যোগ, গ্রামীণ ব্যাংক খোলা।

ঐ সময়ে নিজের জমিদারি এলাকায় এই ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছিলেন রবীন্দ্রনাথ, চিঠিতে বা নানা সভাসমিতিতে এই বিষয়ে বলছেন যে পল্লি সংগঠন ও উন্নয়নের কাজের বিভিন্ন প্রসঙ্গ। ১৯০৮-এ পাবনা সম্মেলনে গ্রামে গ্রামে সমবায় নীতির প্রচলন, কুটির শিল্পের প্রতি গ্রামবাসীদের আগ্রহী করে তোলা, সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কাজ করা এবং 'মিত শ্রমিক' যন্ত্র অর্থাৎ যে সমস্ত সামান্য যন্ত্রের ব্যবহার ও খরচ তাদের সামর্থের মধ্যে, সেগুলোর প্রচলনের কথা বলছেন। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন হিংসা দিয়ে কোনও বড় কাজ হয় না, কোন বড় লক্ষ্যে পৌঁছনো যায়না। পল্লীসমাজের কাজের মধ্যে দিয়েই ধাপে ধাপে সেই লক্ষ্যে এগোতে হবে।

৮.৩ 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসের নামকরণ

'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে 'ঘর' এবং বাহির বা 'বাইরে'র সম্বন্ধ — দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও সমন্বয়ের বিন্যাসে উঠে এসেছে উপন্যাসে। 'ঘরে-বাইরে'র ইংরেজি অনুবাদটির নাম 'The Home and the World', ঘর এবং বহির্বিশ্ব। নিখিলেশের কথায়,'আজ আমাদের খাওয়া-পরা চলা-ফেরা ভাবা-চিন্তা সমস্তই সমস্ত পৃথিবীর যোগে'। বিশ শতকের প্রথমার্ধে লেখা এই উপন্যাসের প্রেক্ষিতে রয়েছে স্বদেশী আন্দোলনের রাজনৈতিক পরিবেশ, মত-পথের দ্বন্দ্ব, প্রকৃত পথের সন্ধান। উপন্যাসে 'বাইরে'র সূত্রে এসেছে সময়-সমকালীন রাজনীতির নানাপ্রবণতা —যেখানে সন্দীপের মত মানুষ, যারা স্বদেশী আন্দোলনের উন্মাদনা জাগিয়ে তোলে মানুষের মধ্যে কিন্তু তার কোনো সত্য ভিত্তি নেই। বরং অনেকটাই মিথ্যে আবেগ জোর করে চাপিয়ে দেওয়া, বিদেশী দ্রব্য বর্জনের নামে দেশের দরিদ্র মানুষের ওপর অন্যায় জোর জবরদস্তি করা। এরা দেশকে চেনে না, দেশের মানুষকেও কোনদিন চেনার চেষ্টা করেনি কিন্তু এক বিশেষ কালপর্বে মানুষের অনুভবকে ব্যবহার করেছে কাজে লাগিয়েছে, তাদের ভুল বুঝিয়েছে। অন্যদিকে রয়েছে নিখিলেশ, তার মাস্টারমশাই চন্দ্রনাথবাবু যারা দেশকে দেশের মানুষকে চিনতে জানতে চান। বুঝতে পারেন যে দেশের মানুষকে আগে সচেতন করে তুলতে হবে নিজেদের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে কিন্তু বিমলার কথায় নিখিলেশের ফিকে স্বদেশী ভাবনা সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে না। বরং সন্দীপদের আবেগের জোয়ার বাইরে থেকে পৌঁছে যায় বিমলাদের খাঁচার পৃথিবীতে। আর হঠাতই বদলে যায় যায় চেনা জীবন-ঘর-সম্পর্ক। বিমলার কথায়,

'সেদিন আমারও দৃষ্টি এবং চিত্ত, আশা এবং ইচ্ছা উন্মত্ত নবযুগের আবীরে লাল হয়ে উঠেছিল। এতদিন মন যে জগৎটাকে একান্ত বলে জেনেছিল এবং জীবনের ধর্মকর্ম আকাঙ্ক্ষা ও সাধনা যে সীমাটুকুর মধ্যে বেশ

গুছিয়ে-সাজিয়ে সুন্দর করে তোলবার কাজে প্রতিদিন লেগে ছিল সেদিনও তার বেড়া ভাঙেনি বটে, কিন্তু সেই বেড়ার উপরে দাঁড়িয়ে হঠাৎ যে একটি দূর দিগন্তে ডাক শুনলুম স্পষ্ট তার মানে বুঝতে পারলুম না, কিন্তু মন উতলা হয়ে গেল'।

রাজনীতির সূত্রে সন্দীপ প্রবেশ করেছে বিমলা ও নিখিলেশের সম্পর্কে এবং সন্দীপকে কেন্দ্র করেই রাজবাড়ির বৈঠকখানাটি উভচর জাতীয় হয়ে উঠেছে। সন্দীপের সঙ্গে পরিচয়ের পর থেকে অন্তঃপুরের পথটি চিকের আড়াল সরিয়ে বৈঠকখানায় পৌঁছে গিয়েছে। একসময় নিখিলেশ চাইলেও বিমলা চায়নি বাইরে আসতে কিন্তু যখন সন্দীপ স্বদেশী প্রচারের জন্য নিখিলেশের জমিদারিতে এল, 'সেদিন সন্দীপবাবু যখন বক্তৃতা দিতে লাগলেন আর এই বৃহৎ সভায় সভার হৃদয় দুলে দুলে ফুলে ফুলে উঠে কূল ছাপিয়ে ভেসে যাবার জো হোল, তখন তাঁর সে এক আশ্চর্য মূর্তি দেখলুম। বিশেষত এক সময় সূর্য ক্রমে নেমে এসে ছাদের নীচে দিয়ে তাঁর মুখের উপর যখন হথাত রৌদ্র ছড়িয়ে দিল তখন মনে হোল তিনি যে অমরলোকের মানুষ এই কথাটা দেবতা সেদিন সমস্ত নরনারীর সামনে প্রকাশ করে দিলেন। বক্তৃতার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক কথায় যেন ঝড়ের দমকা হাওয়া। সাহসের অন্ত নেই। আমার চোখের সামনে যেটুকু চিকের আড়াল ছিল সে আমি সইতে পারছিলুম না'। রাজবাড়ির ছোট রানীমার সমস্ত অস্তিত্ব যেন বদলে গেল। তার নিজের কথায়,'আমি কি তখন রাজবাড়ির বউ ? আমি তখন বাংলাদেশের সমস্ত নারীর একমাত্র প্রতিনিধি, আর তিনি বাংলাদেশের বীর'। সন্দীপের আগুন ঝরানো আইডিয়া সর্বস্ব ভাবনা, দ্বিধাহীন ব্যক্তিত্ব, মিথ্যে স্তুতি বিমলাকে মোহ মুগ্ধ করল। বদলে গেল বিমলার নিজস্ব পৃথিবী, তার জীবনভাবনা। প্রথাগত সামাজিক দাম্পত্যে পাওয়া স্বামী সম্পর্কের যে ঘর তাকে বেঁচে থাকার আশ্রয় দিয়েছিল, সে ঘর ভেঙে পড়তে লাগল। সন্দীপের প্রতি মোহ আকর্ষণ দ্বিধা দোলাচলতায় সংস্কারের পিছুটান ছিল সত্য, কিন্তু অস্বীকারও সে করতে পারছিল না, তার কথায়— 'সমস্ত জগতের সঙ্গে আমার সম্বন্ধের পরিবর্তন হয়ে গেছে'। তার মনে হয়েছে সে এতদিন ছিল গ্রামের ছোট নদী, ছিল সীমিত পরিধির নিজস্ব ছন্দ, ভাষা 'কিন্তু কখন একদিন কোনো খবর না দিয়ে সমুদ্রের বান ডেকে এল ; আমার বুক ফুলে উঠল, আমার কূল ছাপিয়ে গেল, সমুদ্রের ডমরুর তালে তালে আমার সরতের কলতান আপনি বেজে বেজে উঠতে লাগল'। তার সেই পুরনো 'আমি'কে আর যেন সে খুঁজে পেল না।

ঘরে বাইরে উপন্যাসে এভাবেই বাইরের সময় রাজনীতি সঞ্চারিত হয়েছে উপন্যাসের অন্দরে-অন্তর্বস্তুতে। চরিত্র গুলি নিজের মুখোমুখি, চেনা সম্পর্কও অন্য সত্যের সামনে বা বলা যায় অন্য সত্যকে গ্রহণ করতে, তার স্বরূপ বুঝতে বা চিনতে বাধ্য হচ্ছে। ভাঙা গড়ার মধ্য দিয়ে নিখিলেশ বিমলার জীবন সামাজিক সংস্কারের বাইরে অন্য বাস্তব সংকটের মুখোমুখি হচ্ছে, যার সঙ্গে সেই সম্পর্কের ঠিক পরিচয় ছিল না। সামাজিক পারিবারিক ক্ষেত্রে সুরক্ষিত দাম্পত্য বাইরের পৃথিবীর ধাক্কায় এক ঝঞ্ঝার সামনে। এই সংঘাত অবশ্যম্ভাবী। নিখিলেশ জানত ঘর থেকে বাইরে যাবার রাস্তাটা ঝোড়ো, সেই ধাক্কা সামলাতে হয়েছে তাদেরও। সেই ঝড় ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়ে সামাজিকতা পেরিয়ে তারা স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসেবে, পরস্পরের সহমর্মী রূপে নিজেদের নতুন করে খুঁজে পেয়েছে। বাইরের পৃথিবী ঘরের সীমাকে ব্যাপ্তি দিয়েছে, সামাজিক প্রথা মানা সম্পর্ক মুক্তি পেয়েছে জীবনের বড় পরিসরে।

৮.৪ উপন্যাসের আঙ্গিক ও ভাষারীতি

উপন্যাসের গঠনগত দিক থেকে বুদ্ধদেব বসু 'চতুরঙ্গ' ও 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসকে অন্য উপন্যাসের থেকে আলাদা করেছেন। তাঁর মতে এই দুই উপন্যাসে 'ভিক্টোরীয় উপন্যাসের আকার ও আকৃতি পরিহার করে রবীন্দ্রনাথ

উপন্যাসের নতুন রূপকল্পের প্রবর্তনা করেন' ('চতুরঙ্গ' ও 'ঘরে-বাইরে', *রবীন্দ্রনাথঃ কথাসাহিত্য*)। সবুজপত্র'র শুরু থেকেই উপন্যাস রচনায় আবার এক নতুন পথের খোঁজ শুরু হয়েছিল — নতুন পদ্ধতির প্রয়োগ এই দুটি লেখায়। ভাষারীতির দিক থেকে চতুরঙ্গ সাধু ভাষায় লেখা শেষ উপন্যাস এবং ঘরে বাইরে

চলিত ভাষায় লেখা প্রথম উপন্যাস কিন্তু '''চতুরঙ্গে'র সাধুভাষায় চলতিভাষার অনেক গুণই বর্তমান,'ঘরে বাইরে'র চলতিভাষা অনেকাংশেই সাধু"। সাধারণভাবে এই দুই রীতির পার্থক্য শুধুমাত্র ক্রিয়াপদের ব্যবহারের তফাৎ বলে মনে করা হলেও এর মধ্যে ভাষাগত অন্য আরও স্তরভেদ রয়েছে। বুদ্ধদেব বসুর কথায়, 'সাধুভাষা ও চলতি ভাষা নিয়ে বিতর্কের যখন আরম্ভ, সেই সময়ে 'চতুরঙ্গ' ও 'ঘরে-বাইরে' লেখা হয়েছিলো। এই আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ তার্কিক হয়ে এলেন না, এলেন স্রষ্টা হ'য়ে, চলতি ভাষাকে বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করার ভার নিলেন তিনি। 'ঘরে-বাইরে'র পর তিনি আর সাধুভাষা ব্যবহার করেননি, আর জীবনের শেষ পঁচিশ বছরই একদিক থেকে তাঁর গদ্যের স্বর্ণযুগ — গদ্যের শিল্পরূপে নানা রকম নতুন উদ্ভাবন, গদ্য-কবিতার আবিষ্কার, পদ্যের ভাষায় গদ্য মেজাজের আমদানি, গদ্য-পদ্যর দূরত্ব হ্রাস — সবই এই সময়ের মধ্যেই করেছিলেন'। প্রশ্ন ওঠে জীবনের পঞ্চাশ বছর পার করে 'বহুনিন্দিত অর্বাচীন' ভাষারীতির নির্বাচন -প্রয়োগ শুধুই কি প্রমথ চৌধুরী এবং সবুজ পত্র'র প্রভাবে ? কিন্তু এটা তো বাইরের দিক, তাঁর ভাবনার মধ্যেই ছিল বারে বারে নিজেকে ভেঙে গড়ার এই প্রবণতা, 'এই বিপ্লবের বীজ রবীন্দ্রনাথ তাঁর মনের মধ্যে প্রথম থেকেই বহন করে আসছেন, অনিবার্য ছিলো তাঁর হাতে এই নতুন ভাষার জন্ম —'সবুজপত্র' শুধু নিমিত্তের মতো কাজ করেছে, এনে দিয়েছে প্রয়োজনীয় অব্যবহিত উপলক্ষটি" (বুদ্ধদেব বসু)। ঘরে বাইরে 'সরকারি সাহিত্যরচনা'র ক্ষেত্রে প্রথম, তবে এর আগে চিঠি, কৌতুক রচনা, সংলাপ বা নটকের ক্ষেত্রেও চলিত ভাষার প্রয়োগের পরীক্ষানিরীক্ষা চলছিল।

'উপন্যাসের সমাজতত্ত্ব'-গ্রন্থে পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন, 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসটি তিনজন ব্যক্তির নিজেকে মূল্যায়ন ও বৃহত্তর পটে নিজেকে আবিষ্কারের "গল্প" — "আত্মকথা" শব্দটি এ উপন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ। আত্মআবিষ্কারই বিমলা, নিখিলেশ ও সন্দীপে তিনটি ব্যক্তির আত্মঅনুসন্ধানই এ উপন্যাসের মূল বিষয়। কিন্তু ব্যক্তি তিনজন পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়, বরঞ্চ পরস্পরের সংঘর্ষ, দ্বন্দ্বের আলোকেই তারা নিজেকে চিনছে, তেমনি স্বদেশী সন্ত্রাসবাদের বৃহত্তর রাজনৈতিক পটে, এক আলোড়িত দেশের নতুন চেতনার আধারে তাদের অন্বেষণ' (রবীন্দ্রনাথ,'ঘরে বাইরে')। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপুর্ণ, শুরু হয়েছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, বিশ্বজুড়ে অস্থিরতা — বাংলা সাহিত্যে তথা রবীন্দ্রভাবনার ক্ষেত্রেও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, প্রকাশিত হয়েছে প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায় 'সবুজপত্র' পত্রিকা। রবীন্দ্রনাথ এবং প্রমথ চৌধুরীর সম্পর্ক ও সবুজপত্র পত্রিকা, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যভাবনায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রকাশিত হচ্ছে একের পর এক 'বলাকা'র কবিতাগুলি, অচল অনড় সমস্ত স্থবিরতাকে ভেঙে দেবার আহবান জানিয়ে। লেখা হচ্ছে একঝাঁক ছোটগল্প, পরপর চারটি সংখ্যায় গল্পাকার রচনা, জ্যাঠামশাই শচীশ দামিনী শ্রীবিলাস। প্রকাশিত হচ্ছে ধারাবাহিক উপন্যাস 'ঘরে বাইরে', প্রথম চলিত ভাষায় লেখা উপন্যাস, আত্মকথন রীতিতে — প্রত্যেকে নিজের কথা বলছে এবং তার দেখার নিরিখে অন্যদের কথাও। বলাকার কবিতায় নতুন গতি-নতুন ভাবনা, এর আগে গীতাঞ্জলি গীতালি গীতিমাল্য'র জগৎ ছেড়ে নিজেকে ভেঙে আবার যেন এক নতুন নির্মাণ --- ভাবনার জগতে একটা বড় রকমের রদবদল। এরই সঙ্গে উল্লেখ করার যে ১৯১১-য় লেখা অচলায়তন নাটকটির প্রথম অভিনয় ১৯১৪-তে, গুরুর ভূমিকায় অভিনয় করছেন রবীন্দ্রনাথ। পুরনো কাঠামোয় ঘা দিচ্ছেন — 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে প্রশ্ন তুললেন প্রথাগত বিবাহের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে, যেখানে ব্যক্তি গৌণ পারস্পরিক যৌথতা গুরুত্বহীন, সামাজিক নিয়ন্ত্রণই প্রভুত্ব করছে। লেখা হচ্ছে 'সবুজের অভিযান','সর্বনেশে গো'---'এবার যে তোর ভিত নড়েছে,/ শুনিস নি কি ডাক পড়েছে / নিরুদ্দেশের

দেশে গো?'। দ্বারের শিকলটা ভাঙতে চাইছেন,'কিসের তরে চিত্ত বিকল, / ভাঙুক—না তোর দ্বারের শিকল, / বাহিরপানে ছোট্—না সকল/ দুঃখসুখের শেষে গো। এবার যে ওই এল সর্বনেশে গো'। বলছেন সম্মুখ পানে চলা পথিক কে বাঁধবে কে ?

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, 'ঘরে বাইরের ভাষা রবীন্দ্রনাথের ঔপন্যাসিক জীবনের নতুন পর্যায়ের। সামগ্রিক ভাবেই রবীন্দ্রনাথ তখন ভাষা নিয়ে নতুনভাবে ভাবিত। অবশ্য তাঁর চরিত্র অনুযায়ী এ ভাবনা এসেছে ধীরবিকাশের পথে, একই ফর্মের সম্ভাবনা তাঁর নিজের দিক থেকে, নিঃশেষ করেই। কথ্য ক্রিয়ায় এইটিই তাঁর প্রথম উপন্যাসঃ গদ্য ও কবিতার, মুখের ভাষার ও কবিতার ভাষার মধ্যে মেলবন্ধনের যে ভাবনা তাঁর অনেকদিনের, তাই গদ্য কবিতার দিকে তাঁকে নিয়ে যাচ্ছে এই সময়। ঘরে বাইরের ভাষাও এই পরীক্ষারই অন্যতম দৃষ্টান্ত নিখিলেশ কথা বলে অনেক সরাসরি, নিরাবরণভাবে, কিন্তু বিমলার (অনেকটা সন্দীপেরও) ভাষা উপমা-উৎপ্রেক্ষায় ভরা --- মাঝে মাঝেই কবিতার কোলে তার স্থান'। বিমলার কথায়,'আমাদের মিলন যেন কবিতার মিল; সে আসতো ছন্দের ভিতর দিয়ে, যতির ভিতর দিয়ে'। বিষয়, ভাষা এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের অবস্থান রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ভাবনার বাঁক ফেরার মুহূর্তে, স্বতন্ত্র ভূমিকায়।

৮.৫ উপন্যাসের পরিণতি প্রসঙ্গে

ঘরে বাইরে উপন্যাসের শেষে সামাজিক অনুশাসনে গড়ে ওঠা প্রথাগত দাম্পত্যের চেনা কাঠামোটা ভেঙে যাচ্ছে। বিমলা এবং নিখিলেশের সম্পর্কে প্রবেশ করেছে সমকাল, স্বদেশী উন্মাদনার জোয়ার — এসেছে সন্দীপ। সতীত্ব-একনিষ্ঠতার গর্ব করা জমিদার পরিবারের ছোটরানী সন্দীপের 'এই দুর্দান্ত ইচ্ছার প্রলয় মূর্তি'কে অস্বীকার করতে পারছে না। স্বামী নিখিলেশের সঙ্গে সম্পর্ক বদলে যাচ্ছে — বিমলার মেজ জা'র কথায় এতদিন তাদের বাড়িতে পুরুষরা মেয়েদের কাঁদিয়েছে, সময় বদলে গেছে, 'এইবার পুরুষদের পালা এল। এখন থেকে আমরাই কাঁদাব। কী বলো ভাই ছোট রানী' — তার এই শ্লেষ-উক্তি বিমলা অস্বীকারও করতে পারছে না কিন্তু মোহ ও সম্পর্কের টানাপোড়েনে ক্রমশ নিঃসঙ্গ হয়ে যাচ্ছে। বিমলার যন্ত্রণা অনুভব করছে নিখিলেশ, তাকে সম্পর্ক থেকে মুক্তি দিচ্ছে। সন্দীপের কথায় স্বামীর সিন্দুক থেকে মোহর চুরি করে, নিজের ঘরে নিজের অধিকার হারিয়ে ফেলেছে সে। অপরাধবোধের যন্ত্রণায় নিঃসঙ্গ বিমলার মনে হচ্ছে, সে যেন 'নিজের ঐশ্বর্য চুরি করে ফতুর হয়ে গেছে'। একাকীত্বের মুহূর্তে অমূল্যর স্নেহ-ভালবাসা-শ্রদ্ধা তাকে আশ্রয় দিচ্ছে, বিমলা আবার নতুন করে বাঁচতে চাইছে। সহমর্মিতার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে নিখিলেশ, স্বামী নিখিলেশের মধ্যে যে ব্যক্তি মানুষটি আছে তাকে নতুন করে খুঁজে পাচ্ছে বিমলা।

চন্দ্রনাথ বলেছিলেন বিমলাকে কলকাতায় নিয়ে যেতে, 'ওঁকে তুমি একবার পৃথিবীটা দেখিয়ে দাও — মানুষকে, মানুষের কর্মক্ষেত্রকে, উনি একবার বড়ো জায়গা থেকে দেখে নিন'। কলকাতায় গিয়ে আবার জীবন শুরু করার কথা ভাবছে তারা। বিমলার কথায়, আর আমি ভয় করি নে, আপনাকে না, আর-কাউকেও না। আমি আগুনের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে এসেছি ; যা পোড়বার তা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে , যা বাকি আছে, তার আর মরণ নেই'। গিনি গয়না জমিদারবাড়ির রাজপাট সবকিছুই যে কত তুচ্ছ বিমলা বুঝতে পারলো,'মনে হল কোনো জিনিসই নেবার দরকার নেই, কেবল বেরিয়ে চলে যাওয়াটাই দরকার'। খাঁচার পৃথিবীটা অর্থহীন হয়ে গেল, বাইরের বড় পৃথিবীতে জীবনের নতুন অস্তিত্ব খুঁজে নিতে চাইল বিমলা। দাঙ্গা থামাতে গিয়ে অত্যন্ত আহত অবস্থায় ফিরছে নিখিলেশ, বাঁচবে কিনা বলা যাচ্ছেনা, বিমলা অপেক্ষা করছে। বিমলার প্রতীক্ষায় উপন্যাস শেষ হচ্ছে — এখানে তার

প্রতীক্ষা শুধু স্বামীর জন্য নয়, তার মধ্যে যে সহমর্মী মানুষটিকে সে খুঁজে পেয়েছে তার জন্যও। সমাজ নির্দিষ্ট সংস্কারকে অতিক্রম করে সহমর্মিতায় নিজেদেরকে যেন নতুন করে আবিষ্কার করেছে, সম্পর্কের নতুন অর্থ খুঁজে পেয়েছে তারা। উপন্যাস শেষ হচ্ছে বিমলার নিখিলেশের জন্য প্রতীক্ষায়, ব্যক্তি সম্পর্কের অর্জনে। সামাজিক সংস্কার সত্য হয়ে হয়ে উঠছে ব্যক্তির আত্ম-অন্বেষণ এবং পরস্পরের চেনাজানায়।

৮.৬ উপন্যাসের শ্রেণিবিচার

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে বাংলা উপন্যাসে এক নতুন প্রয়োগ রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে। চলিত রীতিতে লেখা প্রথম উপন্যাসে আত্মকথন রীতির প্রয়োগে ঔপন্যাসিকের সর্বজ্ঞতা থেকে বের করে আনলেন উপন্যাসকে। আর বর্ণনাধর্মী লেখাও নয়, সবচরিত্রের সব কথা একক ভাবে লেখক আর বলে যাচ্ছেন না। প্রত্যেকেই তার নিজের কথা নিজেই বলছে আর তার কথনেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে অন্যদের সঙ্গে তার সম্পর্কের ভিন্ন ভিন্ন বিন্যাস ও সমীকরণ। খুলে যাচ্ছে ব্যক্তি মনের গভীর পরত গুলি, তার দ্বিধা দ্বন্দ্ব দোলাচলতা নিয়ে — তার অপরাধবোধ অসহায়তা ঈর্ষার নানা ছোট ছোট মুহূর্ত নিজের সঙ্গে দেখা হওয়ার বা নিজের মুখোমুখি হওয়ার নিভৃতিতে। আধুনিক উপন্যাসের এই লক্ষণ টিকেই খোঁজার চেষ্টা করছিলেন রবীন্দ্রনাথ, চরিত্রের অন্তর্জগতের কথা,'আঁতের কথা' বের করে দেখানো। অনেক পরে লেখা চোখের বালির ভূমিকায় উপন্যাসের এই ধরনটির উল্লেখ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। চোখের বালি থেকেই শুরু হয়েছিল চরিত্রের অন্তর্জগতের উন্মোচন, চরিত্রের পারস্পরিক ঘাত প্রতিঘাতে কাহিনীর সূত্র নির্মাণ। আর কাহিনীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত চরিত্র নয়, চরিত্রের পারস্পরিকতায় গড়ে ওঠা কাহিনী। চোখের বালি থেকেই বাংলা মনস্তাত্বিক উপন্যাসের সূচনা — 'চতুরঙ্গ'-এ কথক একজন কিন্তু চারটি চরিত্রের চারটি পৃথক অধ্যায় আকারে লেখা, পরে গ্রন্থ রূপে প্রকাশ কালে একত্রিত। 'ঘরে বাইরে' তে সরাসরি আত্মকথন রীতির প্রয়োগ। চরিত্রের জটিল মনস্তত্ত্বের খোঁজ এখানে।

সময় এবং সমকালীন রাজনীতি, ব্যক্তি চরিত্রের পৃথক রাজনৈতিক বোধ-বিশ্বাস প্রকাশের ধরন ব্যক্তি চরিত্রের বিবর্তনে সাহায্য করেছে। তিনজন পৃথক ব্যক্তিত্বের আত্মআবিষ্কারের পথটিও তৈরি হয়েছে সমকালীন রাজনীতিক পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে। সম্পর্কের টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়ে প্রতিটি চরিত্র নিজেকে বুঝতে চাইছে, খুঁজতে চাইছে মনের সমস্ত অন্ধকার কোণ গুলো, নিজের মুখোমুখি হচ্ছে। নিখিলেশের পরিশীলিত বুদ্ধিনির্ভর মনোজগৎ ছুঁতে পারেনি বিমলা, হয়ত খানিকটা শ্বাসরোধীও কিন্তু সন্দীপের রাজনৈতিক আবেগ তাকে আকর্ষণ করেছে। নিখিলেশ এবং সন্দীপের রাজনৈতিক ভাবনার নির্দিষ্ট ধরন সমকালের রাজনীতির দুটি পৃথক ধারাকে স্পষ্ট করে তুলেছে। উপন্যাসে সন্দীপের উপস্থিতি স্বদেশী আন্দোলনের উন্মাদনায়, আর সন্দীপের প্রতি বিমলার আকর্ষণেই বিমলা নিখিলেশের সম্পর্কের ভাঙন এবং আত্ম আবিষ্কার। 'ঘরে বাইরে' তাই তিনটি চরিত্রের আত্মকথন রীতিতে গড়ে ওঠা সার্থক মনস্তাত্বিক উপন্যাস, অন্যদিকে উপন্যাসের প্রেক্ষিত এবং চরিত্রের ও সম্পর্কের সংঘাতে রয়েছে সমকালীন রাজনীতি। রাজনীতির সূত্রেই ঘর এবং বাইরের নতুন সম্পর্ক ও পরিচয়।

৮.৭ অনুশীলনী

বিস্তৃত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী

১) 'আমি যে অমনি পেয়েছি, ফাঁকি দিয়ে পেয়েছি। কিন্তু ফাঁকি তো বরাবর চলে না, দাম দিতেই হবে, নইলে বিধাতা সহ্য করেন না —' মন্তব্যের আলোকে ঘরে বাইরে উপন্যাসের বিমলা চরিত্রটি বিশ্লেষণ করুন।

২) 'ঘরে বাইরে' মনস্তাত্ত্বিক না রাজনৈতিক, বা অন্য কোন শ্রেণিতেই এর প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় — নিজস্ব মতামত সহ আলোচনা করুন।

৩) 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে নিখিলেশ এবং সন্দীপের রাজনৈতিক ভাবনা ও বিশ্বাসের প্রেক্ষিতে সমকালের রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিচয় দিন।

৪) 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে ঘর এবং বাইরের সম্বন্ধ নির্ণয়ের মধ্য দিয়ে শিরোনামটি স্পষ্ট করুন।

৫) ঘরে বাইরে' উপন্যাসের শেষে প্রতিটি চরিত্র নিজের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে — চরিত্রের আত্মবিশ্লেষণের সূত্রে মনস্তাত্ত্বিকতার স্বরূপ বিশ্লেষণ করুন।

৬) 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে রয়েছে আধুনিক জীবনের সংকটের ছবি — উপন্যাস অবলম্বনে আলোচনা করুন।

৭) 'ঘরে বাইরে' উপন্যাস অবলম্বনে সন্দীপ চরিত্রটি বিশ্লেষণ করুন।

৮) 'ঘরে বাইরে' উপন্যাস অবলম্বনে নিখিলেশ চরিত্রটির পরিচয় দিন।

৯) 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে চন্দ্রনাথবাবু এবং মেজরানী চরিত্রের গুরুত্ব বিচার করুন।

১০) 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের গঠনরীতি বিষয়ে আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী

১) 'আজ ঘরকে লুটেছি, দেশকেই লুটেছি — এই পাপে একই সঙ্গে ঘর আমার রইল না, দেশও হয়ে গেল পর'। — উক্তিটি কার ? তাৎপর্য বুঝিয়ে দিন।

২) 'আমি বলছি, গড়ে তোলবার কাজে তোমার সমস্ত শক্তি দাও — অনাবশ্যক ভেঙে ফেলবার উত্তেজনায় তার সিকি পয়সা বাজে খরচ করতে নেই'। — কে, কোন প্রসঙ্গে কথাটি বলেছে ? সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিন।

৩) 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের পরিণতি সম্পর্কে সংক্ষেপে আপনার মতামত দিন।

৪) 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের ভাষারীতি সম্পর্কে সংক্ষেপে বলুন।

৫) 'চাঁদ সদাগরের মতো ও অবাস্তবের শিবমন্ত্র নিয়েছে, বাস্তবের সাপের দংশনকে ও মরেও মানতে চায়না'— নিখিলেশ সম্পর্কে সন্দীপের এরূপ বলার কারণ কি? বুঝিয়ে দিন।

৬) 'আমি মুক্তি পেয়েছি, আমি মুক্তি দিলুম। যেখানে আমার কাজ সেখানে আমার উদ্ধার'। — নিখিলেশের এরূপ উপলব্ধির কারণ সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করুন।

৭) 'অনেকবার আমি মনে মনে ভেবেছি, আর একটু মন্দ হবার মতো তেজ আমার স্বামীর থাকা উচিৎ ছিল' — বিমলার এই উক্তির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বুঝিয়ে দিন।

৮) 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে অমূল্য চরিত্রটির গুরুত্ব সংক্ষেপে বলুন।

৯) নিখিলেশের গঠনমূলক কাজের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

১০) চন্দ্রনাথবাবু বিমলাকে কলকাতায় নিয়ে যেতে বলেছিলেন কেন ? কারণটি বিশ্লেষণ করুন।

৮.৮ গ্রন্থপঞ্জি

১) ঘরে বাইরে — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর , বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ , কলকাতা, ২০০৬।

২) রবীন্দ্রনাথ (আলোচনা) — শ্রী হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বুক কোম্পানি লিঃ, কলকাতা, ১৩৪৮।

৩) রবীন্দ্রনাথ, শতবার্ষিকী প্রবন্ধ-সংকলন, সম্পাদক গোপাল হালদার, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিঃ, কলকাতা, ১৩৬৮।

৪) রবীন্দ্রনাথ ঃ কথাসাহিত্য — বুদ্ধদেব বসু, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৫৯।

৫) রবীন্দ্র সাহিত্য প্রসঙ্গ — ড. ভবতোষ দত্ত, বাণীশিল্প, কলকাতা, ১৯৮৭।

৬) বাংলা উপন্যাসের কালান্তর — সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮৮।

৭) আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস — অশ্রুকুমার সিকদার, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৩।

৮) উপন্যাসের সমাজতত্ত্ব — পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, ১৯৯৪।

৯) বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা — সত্যেন্দ্রনাথ রায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা , ২০০০।

১০) রবীন্দ্র-উপন্যাসের নির্মাণশিল্প — গোপিকানাথ রায়চৌধুরি

১১) রবীন্দ্রসাহিত্যের নরনারী — গোপীমোহন সিংহরায়

১২) রবীন্দ্র-উপন্যাস : ইতিহাসের প্রেক্ষিতে — ভূদেব চৌধুরী

১৩) রবীন্দ্র উপন্যাস : চেতনালোক ও শিল্পরূপ — আক্রাম হোসেন

মডিউল-২ (ক)
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : 'দেনাপাওনা' উপন্যাস

একক-৯ ❑ ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র

গঠন

৯.১ উদ্দেশ্য
৯.২ শরৎসাহিত্যের প্রকৃতি
৯.৩ শরৎচন্দ্রের লেখা উপন্যাস এবং গল্পগ্রন্থের প্রকাশকালসহ তালিকা
৯.৪ শরৎচন্দ্রের বাল্য-কৈশোর-যৌবন এবং ভবিষ্যতে লেখক হবার উপাদান সংগ্রহ
৯.৫ 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসের প্রকাশনা সংক্রান্ত তথ্য

৯.১ উদ্দেশ্য

ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের(১৮৭৬-১৯৩৮) প্রাথমিক পরিচয় সম্বন্ধে আমরা এখানে জেনে নেব। লেখক শরৎচন্দ্রের বাল্যকাল, কৈশোর, তাঁর জীবনসংগ্রাম, সর্বোপরি তাঁর লেখক হয়ে ওঠার পর্যায়গুলোর বিষয়ে আমরা এখানে আলোচনা করার চেষ্টা করব। এই আলোচনায় আমরা বুঝে নিতে চাইব তাঁর লেখালেখির বিষয় নির্বাচনের পশ্চাৎপটে কোন্ কারণগুলো নিহিত ছিল। আমরা পর্যালোচনা করব শরৎচন্দ্রের কালকে বা সময়কে এবং তিনি কতটা লেখক হিসেবে যুগের ফসল তাও এখানে বিশ্লেষণ করে দেখা হবে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের তালিকাও প্রকাশকালসহ এখানে উল্লেখ করা হবে। প্রসঙ্গত 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসের প্রকাশনা সংক্রান্ত তথ্যও এই অংশে উল্লেখ করা হবে।

৯.২ শরৎসাহিত্যের প্রকৃতি

ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাঙালি পাঠকের কাছে আজও জনপ্রিয় হয়ে আছেন। যদিও শরৎচন্দ্রের সময় এবং সমাজ থেকে বাঙালি অনেকটা পথ হেঁটে ফেলেছে। বাংলা সাহিত্যে একটি কথা প্রচলিত আছে— মৃত লেখকরাই আজও বাংলা সাহিত্যে রাজত্ব করে চলেছেন। কেন এবং কোন্ রহস্য এর পিছনে আছে তা নিরূপণ করা দুরূহ এবং বিতর্কিত বিষয়। শরৎচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের প্রথম তিন সফল ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-এর মধ্যে অন্যতম। কিন্তু উপন্যাসের ক্ষেত্রে তাঁর জনপ্রিয়তা সেকাল থেকে একাল পর্যন্ত সমানভাবে বহমান। তাঁর সফলতার অন্যতম চাবিকাঠি হল সাধারণ মানুষের সাধারণ দুঃখ-কষ্ট-ব্যথা-বেদনাকে তিনি তাঁর গল্প-উপন্যাসের কাহিনি হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো ইতিহাসের গোলোক ধাঁধায় তিনি ঘোরাঘুরি করেননি বা তৎসম শব্দবহুল সাধু ভাষাকে অবলম্বন করেননি। রবীন্দ্রনাথের মতো কঠিন-গভীর ভাবনা বা তত্ত্বকে পরিশীলিত ভাষায় তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে চাননি। ফলত শরৎচন্দ্র সাধারণ মানুষের দৈনন্দিনের সাধারণ দুঃখ-কষ্টকে প্রায় মুখের ভাষায় কথাসাহিত্যে স্থান দিয়ে আমজনতার লেখক হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। আমাদের এই কথার সমর্থন পাওয়া যায় স্বয়ং শরৎচন্দ্রের জবানীতেই ৫৭তম জন্মদিনের প্রতিভাষণে—

"আমার অকিঞ্চিৎকর সাহিত্য-সেবার পুরস্কার দেশের কাছে আমি অনেক দিক দিয়ে অনেক পেলাম— আমার প্রাপ্যেরও অনেক বেশী।

আজকের দিনে আমার সবচেয়ে মনে পড়ে এর কতটুকুতে আমার আপন দাবী, আর কত বড় এর ঋণ। ঋণ কি শুধু আমার পূর্ববর্তী পূজনীয় সাহিত্যাচার্যগণের কাছেই? সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছু, যারা বঞ্চিত, যারা দুর্বল, উৎপীড়িত, মানুষ হয়েও মানুষ যাদের চোখের জলের কখনও হিসাব নিলে না, নিরুপায় দুঃখময় জীবনে যারা কোনদিনই ভেবেই পেলে না সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতেই অধিকার নেই,

"এদের কাছেও কি ঋণ আমার কম? এদের বেদনাই দিলে আমার মুখ খুলে, এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে মানুষের নালিশ জানাতে"।

অর্থাৎ বড়ো ভাব, বড়ো মানুষ নয়; 'যারা বঞ্চিত, যারা দুর্বল, উৎপীড়িত' মানুষের কথা তিনি লিখতে এসেছিলেন এবং তিনি তা সফলভাবে পেরেছেন। শুধু লিখেই দায়িত্ব শেষ করেননি, লেখনী কৌশলে যাদের জন্য লিখেছেন তাদেরকে দিয়ে পড়িয়েও নিয়েছেন।

মনে রাখতে হবে শরৎচন্দ্রের এই উপন্যাস প্রকাশের আগেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চোখের বালি'(১৯০৩), 'গোরা'(১৯১০), 'ঘরে বাইরে'(১৯১৬) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলি প্রকাশিত হয়ে গেছে। অন্তত 'চোখের বালি'তে যে উপন্যাসের নতুন ধরণ- মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ দেখিয়েছেন তা প্রকাশিত হয়ে গেছে। আবার 'গোরা'র মতো তত্ত্বকথার উপন্যাসও প্রকাশিত হয়ে গেছে। আর শরৎচন্দ্র কলম ধরার আগেই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়(১৮৩৮-১৮৯৪) এবং রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯) বাংলা সাহিত্যে পূর্ণ বিকশিত হয়ে বিদায় নিয়েছেন। স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২), প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩-১৯৩২)-কেও এই দলের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। সুতরাং বাংলা গল্প-উপন্যাস যখন প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, সেই সময় শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব ঘটে এবং পূর্বসুরীদের মধ্যে পাঠকের মনের সব থেকে প্রিয় স্থানটি দখল করে নেন শরৎচন্দ্র। আসলে সাধারণ মানুষের সাধারণ দুঃখ-কথা সাধারণ ভাষায় বলতে গিয়ে সাধারণ পাঠকের মন জেতার বাজি শরৎচন্দ্র জিতে নিয়েছেন। এ বিষয়ে সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত বলেছেন— "তাঁহার নায়ক-নায়িকা খুব সাধারণ লোক; তিনি তাহাদের জীবন নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন ও তাহার গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবনের সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি তাঁহার রচনায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। মানবহৃদয়ের গোপনতম প্রদেশে সংস্কার ও অনুভূতির যে নিরন্তর দ্বন্দ্ব চলিতেছে তিনি তাহার অতি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। অনুভূতির গভীরতায় ও বিশ্লেষণের সূক্ষ্মতায় তাঁহার রচনা অনন্যসাধারণ'। (সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, শরৎচন্দ্র, এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, ১৩৬৮, পৃ. ১৭।)

৯.৩ শরৎচন্দ্রের লেখা উপন্যাস এবং গল্পগ্রন্থের প্রকাশকালসহ তালিকা

এবার আমরা শরৎচন্দ্রের লেখা উপন্যাসগুলির নাম প্রকাশকালসহ দেখে নেব—

বড়দিদি (১৩২০/১৯১৩), *বিরাজ বৌ* (১৩২১/১৯১৪), *পণ্ডিতমশাই* (১৩২১/১৯১৪), *পল্লী-সমাজ* (১৩২২/১৯১৬), *চন্দ্রনাথ* (১৯১৬), *শ্রীকান্ত* (১মপর্ব-১৩২৩/১৯১৭, ২য় পর্ব- ১৩২৫/১৯১৮, ৩য় পর্ব- ১৩৩৩/১৯২৭, ৪র্থ পর্ব- ১৩৩৯/১৯৩৩), *দেবদাস* (১৩২৪/১৯১৭), *চরিত্রহীন* (১৩২৪/১৯১৭), *দত্তা* (১৩২৫/১৯১৮), *গৃহদাহ* (১৩২৬/১৯২০), *বামুনের মেয়ে* (১৩২৭), *দেনা-পাওনা* (১৩৩০/১৯২৩), *নব-বিধান* (১৩৩১/১৯২৪), *পথের দাবী* (১৩৩৩/১৯২৬), *শেষ প্রশ্ন* (১৩৩৮/১৯৩১), *বিপ্রদাস* (১৩৪১/১৯৩৫), *শুভদা* (১৩৪৫/১৯৩৮), *শেষের পরিচয়* (১৩৪৬/১৯৩৯) ইত্যাদি।

এছাড়াও বেশ কিছু গল্প তিনি লিখেছিলেন। তাঁর রচিত গল্প, গল্পগ্রন্থগুলি হল— *বিন্দুর ছেলে ও অন্যান্য গল্প* (১৩২১/১৯১৪), *পরিণীতা* (১৯১৪), *মেজদিদি ও অন্যান্য গল্প* (১৩২২/১৯১৫), *বৈকুণ্ঠের উইল* (১৩২৩/১৯১৬), *অরক্ষণীয়া* (১৩২৩/১৯১৬), *নিস্কৃতি* (১৯১৭), *কাশীনাথ* (১৩২৪/১৯১৭), *স্বামী* (১৩২৪/১৯১৮), *ছবি* (১৩২৬), *হরিলক্ষ্মী* (১৩৩২/১৯২৬), *অনুরাধা-সতী ও পরেশ* (১৩৪০/১৯৩৪), *ছেলেবেলার গল্প* (১৩৪৫/১৯৩৮) ইত্যাদি।

উল্লিখিত গল্প-উপন্যাসের প্রকাশকাল থেকে মোটামুটি শরৎচন্দ্রের লেখালেখির সময়টাকে আমরা আনুধাবন করতে পারি। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই(১৯০০-১৯৫০) তিনি কলম চালিয়েছেন।প্রত্যেক লেখকই তাঁর যুগের ফসল। শরৎচন্দ্রের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। শরৎচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেছেন ১৮৭৬ সালে এবং পরলোকে গমন করছেন ১৯৩৮ সালে। অর্থাৎ ঊনবিংশ শতকে ২৪ বছর এবং বিংশ শতকে ৩৮ বছর পৃথিবীতে থেকেছেন এবং এই সময়কালে যা কিছু দেখেছেন, শুনেছেন, যাপন করেছেন, অনুভব করেছেন তাই-ই তিনি কলমের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। এখন প্রশ্ন উঠবে সমকালে আরও অনেকে ছিলেন এবং লেখালেখি করেছেন, তাহলে প্রত্যেকের লেখার বিষয় এবং ধরন আলাদা কেন। এর কারণ হল দৃষ্টিভঙ্গি। অর্থাৎ কোনো একজন লেখক বা সাহিত্যকর্মী তাঁর চারপাশে ঘটে চলা ঘটনার ঘনঘটাকে কোন্ দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখছেন। একই ঘটনা একই সময়ে ব্যক্তি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন বার্তা বহন করে। বিষয়টা আরও পরিস্কার বোধগম্য হবে যদি আমরা দেখি একই ঘটনা বিভিন্ন রাজনৈতিক দল যখন দলীয় মতাদর্শ অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করে। এখন প্রশ্ন হল একই সময়ে জীবন-যাপন করেও পৃথক পৃথক ব্যক্তি বা লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি পৃথক হয় কেন। এর কারণ সেই ব্যক্তি বা লেখক যে পারিবারিক ঐতিহ্য, সামাজিক পরিবেশে বড়ো হয়েছেন তা তাঁর মানসিকতা ঠিক করে দেয়। অর্থাৎ আমাদের বালক থেকে কৈশোর এবং যৌবনে পদার্পণের যে পথ সেই পথই স্থির করে দেয় আমাদের অন্তরগত দৃষ্টিভঙ্গি। ফলত শরৎচন্দ্রের বড়ো হয়ে ওঠার পরিবেশ এবং সেই সঙ্গে সমকালীন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী বা সামাজিক ইতিহাসের দিকে আমাদের অনুসন্ধানী দৃষ্টি ফেলতে হবে।

৯.৪ শরৎচন্দ্রের বাল্য-কৈশোর-যৌবন এবং ভবিষ্যতে লেখক হবার উপাদান সংগ্রহ

প্রথমে আমরা শরৎচন্দ্রের বাল্য এবং কৈশোরের দিকটা আগে দেখে নেব। বুঝতে চেষ্টা করব কোন্ পারিবারিক পরিবেশে লেখকের মানসিক গঠন তৈরি হয়েছিল। হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে শরৎচন্দ্রের জন্ম। পিতা মতিলাল চট্টোপাধ্যায়, মাতা- ভুবনমোহিনী দেবী। মুলত ভাগলপুরে মামার বাড়িতেই তিনি কৈশোর এবং যৌবনকালে ছিলেন। ভাগলপুরেই পড়াশুনা শুরু হয়। ১৮৯৪ সালে ভাগলপুরের টি.এন.জুবিলী কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এফ.এ.পড়বার জন্য টি.এন.জুবিলী কলেজে ভর্তি হলেও পরীক্ষা দিতে পারেননি। কারণ ১৮৯৫ সালে মায়ের মৃত্যু ঘটে। সেই সঙ্গে আর্থিক অনটন। তবে প্রথাগত পড়াশোনায় ছেদ টানলেও পড়াশোনা তিনি এরপরেও করেছেন। পাশ্চাত্য দর্শনে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। রেঙ্গুনে বার্নাড ফ্রী লাইব্রেরীর সদস্য হন বই পড়ার জন্য। বৈষ্ণব সাহিত্যের পাশাপাশি তিনি শারীরবিদ্যা, জীববিদ্যা, মনস্তত্ত্ব ইত্যাদিও তাঁর পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল। এরপর শরৎচন্দ্র নানাভাবে অর্থোপার্জনের চেষ্টা করেন এবং বনেলী এস্টেটে চাকুরি করেন কিছুদিন। কিন্তু মন বসল না। ১৯০০ সাল নাগাদ সন্ন্যাসীর বেশ গ্রহণ করে নিরুদ্দেশ হলেন। ১৯০৩ সালে পিতার মৃত্যু এবং তিনি ভাগলপুরে ফিরে এসে পিতার শেষকৃত্য সম্পন্ন করেন। এরপর ১৯০৩ সালে পুনরায়

তিনি কলকাতায় নিশ্চিত আশ্রয় ত্যাগ করে ব্রহ্মদেশ অর্থাৎ বর্তমানের মায়ানমারে পদার্পণ করেন। এখানে তিনি অ্যাকাউন্টটেন্ট জেনারেলের অফিসে কাজ করেন। ১৯১৬ সালের ১১ এপ্রিল পাকাপাকি ভাবে তিনি রেঙ্গুন ত্যাগ করে কলকাতায় ফিরে আসেন। প্রথমে হাওড়ার বাজে শিবপুর এবং পরে ১৯১৯ সালে তিনি হাওড়া জেলার পানিত্রাসে বাড়ি তৈরি করে বসবাস শুরু করেন।

ভাগলপুরে থাকাকালীন আদমপুর ক্লাবে শরৎচন্দ্র নিয়মিত যেতেন। ভাগলপুরের বাঙ্গালীটোলার পাশে আদমপুরে রাজা শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র সতীশচন্দ্র এই ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন। এই সতীশচন্দ্রের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। শরৎচন্দ্র এই ক্লাবের বিভিন্ন নাটকে রীতিমতো অভিনয়ও করেন। 'মৃণালিনী', 'বিল্বমঙ্গল', 'জনা' ইত্যাদি নাটকে এখানে অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন। এই সময়ে তিনি লেখালেখিও শুরু করেন। সন্ন্যাসীবেশে মজঃফরপুরে থাকাকালীন তাঁর সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ পায়। ১৩১৯-১৩২০ বঙ্গাব্দে 'যমুনা', 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় 'রামের সুমতি', 'বিন্দুর ছেলে', 'বিরাজ বৌ', 'পণ্ডিত মশাই', 'পল্লী-সমাজ' প্রকাশিত হয়। যা শরৎচন্দ্রকে যথেষ্ট সুনাম এনে দিয়েছিল। শরৎচন্দ্রের নিজের কথায়— 'আমার সত্যিকারের সাহিত্যিক জীবন বলতে যা বুঝায় তা ১৯১৩ সাল থেকেই আরম্ভ হয়েছে'। কিন্তু এর অনেক আগে ১৯০৩ সালে 'মন্দির' গল্প লিখে তিনি কুন্তলীন পুরস্কার পান। ১৯০৭ সালে 'ভারতী' পত্রিকায় 'বড়দিদি' গল্প প্রকাশিত হয়।

লেখালেখির উত্তরাধিকার নিয়ে শরৎচন্দ্র কী বলেছেন দেখা যাক- "My childhood and youth were passed in great poverty. I received almost no education for want of means. From my father I inherited nothing except– as I believe– his restless spirit and his keen interest in literature. The first made me a tramp and sent me out tramping the whole of India quite early– and the second made me a dreamer all my life. Father was a great scholar– and he had tried his hand at stories and novels– dramas and poems– in short– every branch of literature– but never could finish anything".[*সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা* ৪, ২০১৭, পৃ. ২৭৩। (Srikanta- E.J.Thompson, ১৯২২.)] অর্থাৎ শরৎচন্দ্র তাঁর লেখার উত্তরাধিকার পেয়েছিলেন স্বীয় পিতার কাছ থেকেই। সেই সঙ্গে পেয়েছিলেন ভবঘুরে স্বভাব। যা তাঁকে ভারত ভ্রমণ করিয়ে নিয়েছিল অল্পবয়সেই। অর্থাৎ তিনি অল্প বয়সেই দেশ ঘোরার সূত্রে বহুবিধ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। যা তাঁকে লেখার রসদ যুগিয়েছে। একটা বোহেমিয়ান স্বভাব তাঁর মধ্যে ছিল। এর প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর চার খণ্ডে লেখা 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে। এই হল শরৎচন্দ্রের লেখক হবার বা তাঁর মানসিক গঠনের পশ্চাৎপটে ক্রিয়াশীল সামাজিক ও পারিবারিক পরিবেশ। এই পরিবেশই মানুষের জীবনকে কোন্ দৃষ্টিভঙ্গিতে ভবিষ্যতে তিনি তাঁর লেখালেখির মাধ্যমে প্রকাশ করবেন তা গড়ে তুলেছিল। দারিদ্র্যের মধ্যে মানুষ হয়েছেন, পড়াশুনা করার যথেষ্ট সুযোগ পাননি বা পেলেও নিজেকে পড়াশুনায় নিবিষ্ট করতে পারেননি, ভাগলপুরে থাকাকালীন নাটক-গান ইত্যাদির চর্চা করেন, সন্ন্যাসী হয়ে ঘুরে বেড়ানো, জমিদারের অধীনে কাজ করা, সরকারি অফিসে কেরানীবৃত্তি ইত্যাদির মাধ্যমেই লেখক-পূর্ব জীবনে তিনি ভবিষ্যতের রসদ সংগ্রহ করেন। আর পেয়েছিলেন উত্তরাধিকার সূত্রে পিতার কাছ থেকে লেখালেখি করার গুণ। সঙ্গে পেয়েছিলেন বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়স্বজনের লেখালেখি করার জন্য নিরন্তর তাগাদা। 'যমুনা' পত্রিকার সম্পাদক ফণীন্দ্র পালের বারংবার অনুরোধে তিনি লেখালেখি করতে বাধ্য হন। সাহিত্যিক হবার পথে পা বাড়ান। ১৯১২ সালে রেঙ্গুন থেকে কলকাতা আসায় ফণীন্দ্র পালের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় এবং 'যমুনা' পত্রিকায় লেখার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন।

যদিও বাল্যকালেই তাঁর লেখালেখির সূত্রপাত ঘটে। ১৯০১ সালে শরৎচন্দ্রের উদ্যোগে ভাগলপুরে 'ছায়া' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয় এবং বন্ধুদের নিয়ে 'তরণী' নামে আরও একটি হাতে-লেখা পত্রিকা শুরু করেন। শরৎচন্দ্রের 'আলো ও ছায়া', 'বোঝা' গল্প এই 'ছায়া' পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়। 'ক্ষুদ্রের গৌরব' নামক প্রবন্ধটিও এই পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়। বাঁশি বাজাতেও শরৎচন্দ্র ভালোবাসতেন। সব মিলিয়ে শরৎচন্দ্র কৈশোর-যৌবনেই ভবিষ্যতের সুপ্রতিষ্ঠিত লেখক হবার বীজ বুনে ফেলেছিলেন।

শরৎচন্দ্র যে সময়ে জন্মেছিলেন সে সময় ভারতবর্ষ ছিল ব্রিটিশ শাসনাধীনে। সুদূর বর্মা (অধুনা মায়ানমার) ভারত সাম্রাজ্যের অংশ ছিল। সে ছিল সত্যই 'ভারতবর্ষ'। আজকের খণ্ডিত ভারত নয়। ছিল জমিদারি ব্যবস্থা অর্থাৎ সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা। গড়ে উঠেছিল সুদখোর মহাজন শ্রেণি। কৃষি ছিল জীবিকার মূল সংস্থান। কলিকাতা ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী (১৯১১ সাল পর্যন্ত) হওয়ায় বাঙালি আধুনিক শিক্ষা-সংস্কৃতির সুযোগ লাভ করে এবং নিজেকে সমগ্র ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে উন্নত জাতি হিসেবে নিজের স্বতন্ত্র মর্যাদা দাবি করে নেয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের (১৮২০-১৮৯১) উদ্যোগে তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড ডালহৌসির সহযোগিতায় 'বিধবা বিবাহ আইন' চালু হয় ১৮৫৬ সালের ২৬ জুলাই। বাল্যবিবাহ রদ আইন প্রণীত হয় ১৯২৯ সালে। সুতরাং সে সময় বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ এবং কৌলীন্যপ্রথা রক্ষা ইত্যাদি বিষয় সমাজকে পঙ্কিলতার চূড়ান্ত সীমায় নিয়ে গিয়েছিল। অন্যদিকে কয়েকটি ইংরেজি বুলি শিখে কলকাতা শহরে গড়ে উঠেছিল বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়(১৮৩৮-১৮৯৪) কথিত 'বাবু' সম্প্রদায়। কেউ বিলেত গেলে সে সময় তাকে প্রায়শ্চিত্ত করে হিন্দু সমাজে স্থান পেতে হোত। অনেক বাঙালি তখন ভাগ্যান্বেষণে রেঙ্গুন যেত, যেমন শরৎচন্দ্র স্বয়ং গিয়েছিলেন এবং দীর্ঘদিন থেকেছিলেন। সুতরাং ভাগ্যান্বেষণে রাজ্যের বাইরে যাওয়া কেবল একালে নয়, সেকালেও প্রচলিত ছিল। সে সময় মানুষের জীবনযাত্রা একালের মতো গতিশীল ছিল না। একান্নবর্তী বৃহৎ পরিবারই ছিল সে সময় স্বাভাবিক ব্যাপার। শরৎচন্দ্রের নায়কদের প্রায়শই দেখা যায় অচেনা জায়গায় গিয়ে দিনের পর দিন থেকে যাচ্ছে আত্মীয়তার সেবা-সুশ্রুষা নিয়ে। এসব সেকালেই সম্ভব ছিল। এই নিয়েই ছিল শরৎচন্দ্রের দেখা সমাজ এবং তাঁর শুশ্রূষা লেখনি উঠেছিল এই সমাজ ব্যবস্থাই সম্পূর্ণ দোষ-ত্রুটি নিয়ে। শরৎচন্দ্রের লেখা পড়লে আমরা সেকালের সময় এবং সমাজকে সহজভাবে জানতে পারি, চিনতে পারি। এইসব কিছুর সঙ্গে ছিল নারীর প্রতি শরৎচন্দ্রের অসম্ভব সহানুভূতি এবং দরদী মন। নারীর মনের অপ্রকাশিত বা গোপন ব্যথা-বেদনাকে সহমর্মিতার সঙ্গে ভাষারূপ দিয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্র কংগ্রেসের রাজনীতির সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। ১৯২০ সালে তিনি হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতিও হন। এই রাজনীতির সূত্রে তিনি গ্রামে-গঞ্জে ঘোরাঘুরি করেন। ফলে জমিদার শ্রেণি এবং জোতদার-মহাজন শ্রেণি সম্পর্কেও যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন। তাই বিভিন্ন উপন্যাসে তিনি এই দুই শ্রেণির চরিত্রকে সহজে তুলে ধরতে পেরেছেন।

৯.৫ 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসের প্রকাশনা সংক্রান্ত তথ্য

এবার আমরা আমাদের পাঠ্য 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসটি সম্পর্কে কিছু প্রাথমিক তথ্য জেনে নেব। 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৪ আগস্ট ১৯২৩ সালে। প্রকাশক কলকাতার গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স। উপন্যাসটি মোটামুটি ১৯২১-'২২ সালে শরৎচন্দ্র লেখেন। গ্রন্থাকারে প্রকাশের আগে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় বেশ কয়েকটি সংখ্যা ধরে এটি প্রকাশিত হয়। ১৩২৭ থেকে ১৩৩০ বঙ্গাব্দে 'ভারতবর্ষ'-এর কয়েকটি সংখ্যায় উপন্যাসটি ধারাবাহিকিভাবে প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসেরই নাট্যরূপ হল 'ষোড়শী'। লেখক স্বয়ং এই উপন্যাসের নাট্যরূপ

দেন। নাট্যরূপটি প্রকাশিত হয় ১৯২৭ সালে এবং নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীর নাট্যমন্দির রঙ্গালয়ে এই নাটকটির প্রথম অভিনয় হয় ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের ২১ শ্রাবণ। তবে এই বিষয়ে বিতর্ক আছে। জানা যায় লেখক শিবরাম চক্রবর্তী প্রথমে এই উপন্যাসের নাট্যরূপ দেন। কিন্তু পরে শরৎচন্দ্র নাটকটি কিছুটা পরিমার্জনা করেন। কিন্তু 'ভারতী' পত্রিকায় ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে শরৎচন্দ্রের নামেই প্রকাশিত হয়, কোথাও মূল নাট্যকার শিবরাম চক্রবর্তীর নাম ছিল না। শুধু তাই নয়, নাট্যমন্দিরে অভিনয়ের সময় নাট্যকার শিবরাম চক্রবর্তীকে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী 'বেনিফিট নাইট' দেবেন বলে কথা দেন। কিন্তু যেদিন শিবরামের টাকা নেবার কথা ছিল সেদিন স্বয়ং শরৎচন্দ্র শিশিরকুমার ভাদুড়ীর কাছ থেকে সব টাকা নিজে নিয়ে নেন। ওই টাকায় শিবরামের অধিকার শরৎচন্দ্র অস্বীকার করেন। সেই সময় শিবরামের অর্থকষ্টও ছিল সাঙ্ঘাতিক। এই ঘটনায় শিবরাম প্রচণ্ড আঘাত পান। শিবরাম এর আগে পর্যন্ত শরৎচন্দ্রকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা-ভক্তি করতেন।

এই সঙ্গে আমাদের জেনে রাখা প্রয়োজন যে, শরৎচন্দ্র আরও দুটি উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছিলেন- 'পল্লীসমাজ'(১৯১৬) উপন্যাসের নাট্যরূপ 'রমা'(১৯২৮) এবং 'দত্তা'(১৯১৮) উপন্যাসের নাট্যরূপ 'বিজয়া'(১৯৩৪)। পরবর্তীকালে 'দেনা-পাওনা' উপন্যাস অবলম্বনে পরিচালক প্রেমাঙ্কুর আতর্থী (১৮৯০-১৯৬৪) প্রথম বাংলা সবাক চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন ১৯৩১ সালে। 'দেনা-পাওনা' উপন্যাস লেখার সময় লেখক হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। এই সময় ভারতীয় রাজনীতিতে অসহযোগ আন্দোলন, খিলাফৎ আন্দোলনের সময়।

'দেনা-পাওনা' উপন্যাসেও শরৎচন্দ্রের অন্যান্য রচনার মতোই সাধারণ দুঃখ-কথাই বলা হয়েছে, যদিও উপন্যাসটির প্রধান পাত্র-পাত্রী গড়পড়তা সাধারণ মানুষ না হলেও উপন্যাসের শেষ পরিণতি সাধারণ মানুষের সাধারণ চাহিদাকেই স্বীকৃতি দিয়েছে। নর-নারীর প্রেম-ভালোবাসার বা সংসার গড়ার স্বপ্নই সব কিছু অতিক্রম করে উপন্যাসে জীবানন্দ-অলকা চরিত্রের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

পরবর্তী এককগুলিতে আমরা দেখে নেব 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসের কাহিনি, চরিত্র-বিশ্লেষণ, নির্মাণ কাঠামো ইত্যাদি বিষয়গুলি। 'দেনা-পাওনা' উপন্যাস বিষয়ক এই মডিউলের মাধ্যমে শিক্ষার্থী বাংলা উপন্যাসের সেই আলোকজ্জ্বল পর্বে শরৎচন্দ্রের ঔপন্যাসিক প্রতিভাহর পরিয় যেমন পাবেন, তেমনই উপন্যাসটির পুঙ্ক্ষানুপঙ্ক্ষ বিশ্লেষণ করতে সচেষ্ট হতে পারবেন। এই মডিউল উপন্যাসের পাঠ-বিষয়ক একটি ভূমিকা মাত্র; আলোচনার মাধ্যমে সেই ভূমিকাকে বিস্তৃত করার সক্ষমতা শিক্ষার্থীকে গড়ে তুলতে হবে।

একক-১০ □ উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত কাহিনি, কাহিনি-বিশ্লেষণ ও নামকরণ

গঠন

১০.১ উদ্দেশ্য
১০.২ উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত কাহিনি
১০.৩ উপন্যাসের কাহিনি বিশ্লেষণ
১০.৩ উপন্যাসের নামকরণ

১০.১ উদ্দেশ্য

এই অংশে আমরা 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসের কাহিনি সংক্ষেপে জেনে নেব এবং সেই সঙ্গে উপন্যাসের একটি বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করার চেষ্টা করব। সেই সূত্রে উপন্যাসের নামকরণ কাহিনির সঙ্গে কতদূর সঙ্গতিপূর্ণ তাও এই অংশে আমরা বিশ্লেষণ করে দেখব। অর্থাৎ 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসের সামগ্রিক পরিচয় আমরা এখানে জেনে নেবার চেষ্টা করব।

১০.২ উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত কাহিনি

আঠাশটি পরিচ্ছেদে সম্পূর্ণ 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসটি। উপন্যাসটির সূচনা এরূপ—

"চণ্ডীগড়ে চণ্ডী বহু প্রাচীন দেবতা। কিংবদন্তী আছে রাজা বীরবাহুর কোন্ এক পূর্বপুরুষ কি একটা যুদ্ধ জয় করিয়া বারুই নদীর উপকূলে এই মন্দির স্থাপিত করেন, এবং পরবর্তীকালে কেবল ইহাকেই আশ্রয় করিয়া এই চণ্ডীগড় গ্রামখানি ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিল। হয়ত একদিন যথার্থই সমস্ত চণ্ডীগড় গ্রাম দেবতার সম্পত্তি ছিল; কিন্তু আজ মন্দির-সংলগ্ন মাত্র কয়েক বিঘা ভূমি ভিন্ন সমস্তই মানুষে ছিনাইয়া লইয়াছে। গ্রামখানি এখন বীজগাঁর জমিদারিভুক্ত। কেমন করিয়া এবং কোন্ দুজ্ঞে রহস্যময় পথে অনাথ ও অক্ষমের সম্পত্তি এবং এমনি নিঃসহায় দেবতার ধন অবশেষে জমিদারের জঠরে আসিয়া স্থিতিলাভ করে, সে কাহিনী সাধারণ পাঠকের জানা নিষ্প্রয়োজন। আমার বক্তব্যটা কেবল এই যে, চণ্ডীগড় গ্রামের অধিকাংশই এখন চণ্ডীর হস্তচ্যুত। দেবতার হয়ত ইহাতে যায়-আসে না; কিন্তু তাঁহার সেবায়েত যাঁহারা, এ ক্ষোভ তাঁহাদের আজিও যায় নাই; তাই আজিও বিবাদ-বিসংবাদ ঘটিতে ছাড়ে না এবং মাঝে মাঝে সেটা তুমুল হইয়া উঠিবারই উপক্রম করে। অত্যাচারী বলিয়া বীজগাঁয়ের জমিদার-বংশের চিরদিনই একটা অখ্যাতি আছে; কিন্তু বৎসর-খানেক পূর্বে অপুত্রক জমিদারের মৃত্যুতে ভাগিনেয় জীবানন্দ চৌধুরী যেদিন হইতে বাদশাহী লাভ করিয়াছেন, সেদিন হইতে ছোট-বড় সকল প্রজার জীবনই একেবারে দুর্ভর হইয়া উঠিয়াছে। জনশ্রুতি এইরূপ যে, ভূতপূর্ব ভূস্বামী কালীমোহনবাবু পর্যন্ত এই লোকটির উচ্ছৃঙ্খলতা আর সহিতে না পারিয়া ইহাকে ত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু আকস্মিক মৃত্যু তাঁহার সে ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করিতে দেয় নাই"।

এই সূচনা অংশ থেকে সহজেই অনুমান করা যায় উপন্যাসের প্রেক্ষাপট একটি গ্রামের পটভূমিতে রচিত হয়েছে। দেবী চণ্ডীর মন্দির এবং তাঁর সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ এখানে স্পষ্ট। এই বিবাদের এক অংশে আছেন

জমিদার জীবানন্দ এবং তার সঙ্গে স্বার্থান্বেষী কুচক্রী পল্লীসমাজের কিছু মাতব্বর শ্রেণির মানুষ। আর অন্য দিকে আছে এই দেবী চণ্ডীর মন্দিরের ভৈরবী ষোড়শী। পরবর্তীকালে এই ষোড়শীর নাম অলকা বলে উপন্যাসে জানা যাবে।

বীজগাঁর জমিদার জীবানন্দ চণ্ডীগড়ে এসে হঠাৎ বসবাস করতে শুরু করেছে। কারণ জমিদারের দশ হাজার টাকা প্রয়োজন। যেনতেন প্রকারে সেই দশ হাজার টাকা এই অত্যাচারী জমিদারের হাতে প্রজাদের তুলে দিতে হবে। সবই ঠিক ছিল। জমিদারের লোকজন প্রজাদের কাছ থেকে নানাভাবে টাকা আদায় করতে শুরু করল। তৎকালীন জমি কেন্দ্রিক কৃষি-অর্থনীতিতে জমিদার প্রজাকে যেভাবে শোষণ করে এই উপন্যাসেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। কিন্তু সমস্যা হল যখন দেবী চণ্ডীর সম্পত্তি নিয়ে টানাটানি শুরু করল জমিদার। উপন্যাসে আবির্ভাব ঘটল ভৈরবীর। কে এই ভৈরবী? ঔপন্যাসিক প্রথম পরিচ্ছেদেই বর্ণনা দিয়েছেন—'ভৈরবী কাহারও নাম নয়, গড়চণ্ডীর প্রধান সেবিকাদের ইহা একটি সাধারণ উপাধি। যেমন বর্তমান ভৈরবীর নাম ষোড়শী এবং ইহার পূর্বে যিনি ছিলেন তাঁহার নাম মাতঙ্গিনী ভৈরবী। মাতার আদেশে তাঁহার সেবায়েত কখনও পুরুষ হইতে পারে না, মেয়েরাই এ পদ চিরদিন অধিকার করিয়া আসিতেছে"। এই ভৈরবীর পিতা তারাদাস চক্রবর্তী হলেন গড়চণ্ডীর সেবায়েত। তারাদাসকে জমিদার জীবানন্দের লোক ধরে আনলেও 'নজর' অর্থাৎ টাকা সে দিতে অস্বীকার করে। জমিদারের লোক তারাদাসের উপর অত্যাচার শুরু করে। একদিন তারাদাস দীর্ঘক্ষণ নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। তারাদাসকে খুঁজতে এসে জমিদারের লোক তারাদাসের মেয়ে ভৈরবীকে জমিদারের কাছে হাজির করল। উপন্যাসের মূল কাহিনির সূচনা এখানেই হল বলা যায়। ভৈরবীকে সেদিন রাত্রে ঘরে আটকে রাখার নির্দেশ দেয় জমিদার জীবানন্দ। কিন্তু ঘরে আটকানোর ঠিক পূর্বমুহূর্তে জীবানন্দ ষোড়শীকে বলে— "ওই যে বাক্সটা— ওর মধ্যে আর একটা ছোট কাগজের বাক্স পাবে। কয়েকটা ছোট-বড় শিশি আছে, যার গায়ে বাংলায় 'মরফিয়া' লেখা, তার থেকে একটুখানি ঘুমের ওষুধ দিয়ে যাও। কিন্তু খুব সাবধান, এ ভয়ানক বিষ"। সুতরাং যার ওপর অত্যাচার করার জন্য জীবানন্দ বদ্ধপরিকর ছিল বা সেটাই তার পক্ষে স্বাভাবিক, সেই জীবানন্দ ভৈরবীর হাতেই মৃত্যুতুল্য মরফিয়া ওষুধ সেবন করল। ভৈরবীর হাতে নিশ্চিন্তে ওষুধ সেবন করল অত্যাচারী, নারীলোলুপ জীবানন্দ।

পরের দিন বদ্ধ ঘর থেকে মুক্তি পায় ভৈরবী। কিন্তু সেই ভৈরবীর কাছেই জীবানন্দকে হাত পেতে সাহায্য চাইতে হয়। কারণ ভৈরবীর পিতা ম্যাজিস্ট্রেটকে সাহেবের কাছে অভিযোগ করে যে ভৈরবীকে জমিদার জোর করে আটকে রেখেছে। জীবানন্দ অনুরোধ করে ষোড়শী যেন বলে সে নিজের ইচ্ছায় এসেছে জমিদারের কাছে। কেউ তাকে আটকে রাখেনি। সবাইকে অবাক করে ভৈরবী এই মিথ্যা স্বীকারোক্তি করে ম্যাজিস্ট্রেট এবং পুলিশের কাছে- "ষোড়শী মাথা নাড়িয়া কহিল, না, আমি নিজের ইচ্ছেয় এসেচি, কেউ আমার গায়ে হাত দেয়নি"। জীবানন্দ রেহাই পেয়ে যায়।

ষোড়শী সেদিন গরম জল ক'রে দিয়ে জীবানন্দের সেবা-শুশ্রূষা করে। সেদিনই চলে আসার আগে ষোড়শী জীবানন্দকে প্রশ্ন করে "কিন্তু আমাকে কি সত্যিই এখনো চিনতে পারেন নি? ভাল করে চেয়ে দেখুন দিকি?" জীবানন্দ এর উত্তরে ভৈরবীকে ভালো করে দেখে বলে " বোধ হয় পেরেছি। ছেলেবেলায় তোমার নাম অলকা ছিল না?" সুতরাং ভৈরবী-জীবানন্দ পরস্পরের যে পূর্বপরিচিত তা বোঝা গেল। আসলে ন-দশ বছর বয়সে একশত টাকা যৌতুকের বিনিময়ে অলকাকে অলকার মা জীবানন্দের হাতে তুলে দিয়েছিল। যদিও জীবানন্দ ওই টাকাটা ধার হিসেবেই নিতে চেয়েছিল। সে তখন বাদুড়বাগানের মেসে থাকত। এই অংশেই অর্থাৎ ৫ম পরিচ্ছেদেই

ঔপন্যাসিক জানান '' জীবানন্দ আহত হইয়া কহিল, তাই মনে করতে পারতাম যদি না তিনি ওই ক'টা টাকার জন্য তাঁর মেয়েকে বিবাহ করতে আমাকে বাধ্য করতেন"। এর উত্তরে ষোড়শী জানায় '' বিবাহ করতে তিনি বাধ্য করেন নি, বরঞ্চ চেয়েছিলেন আপনি"। যাইহোক বোঝা গেল ভৈরবী ওরফে অলকা এবং জীবানন্দ বিবাহিত, যদিও বিবাহের পরে তাদের মধ্যে আর কোনও যোগাযোগ ছিল না।

পল্লীসমাজের নিয়ম অনুযায়ী ভৈরবীর জমিদার গৃহে রাত্রি যাপন এবং স্বেচ্ছায় জমিদারের ঘরে রাত্রি কাটানো নিয়ে রীতিমতো গবেষণা শুরু হল। গবেষণায় পল্লীসমাজের তথাকথিত মাতব্বররা প্রমাণ করতে সচেষ্ট হলেন যে ভৈরবী ব্যভিচারী এবং তাকে দিয়ে দেবী চণ্ডীর পুজো করানো যাবে না। এই ষড়যন্ত্রে ভৈরবীর পিতা তারাদাস চক্রবর্তীও যোগ দেয়। কারণ মেয়ে তার কথামতো জীবানন্দের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়নি। যে জীবানন্দের প্রাণ বাঁচিয়েছিল ভৈরবী সেই জীবানন্দও গ্রামের মাতব্বরদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে যোগ দিল দেবোত্তর সম্পত্তি বিক্রি করে টাকা আদায়ের জন্য। পল্লীসমাজের মাতব্বর ধনী জনার্দন রায় নিজের স্বার্থেই এই ষড়যন্ত্রের অন্যতম অংশীদার হয়।

ভৈরবীর বিরুদ্ধে অশুচিতার অভিযোগ এনে ভৈরবীর পদ ছেড়ে দেবার জন্য নানারকম ভাবে চেষ্টা করা হয়। তারাদাস আবার একজন মেয়েকে নিয়ে আসে নতুন ভৈরবী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। আশ্চর্য হতে হয় ভৈরবী কোথাও এসবের প্রতিবাদ করেনি। একই সঙ্গে ভৈরবী মন্দিরের পুজোর কাজ থেকেও নিজেকে সরিয়ে নেয়। প্রবল সমালোচনা এবং কুৎসা রটনা সত্ত্বেও ষোড়শী ওরফে ভৈরবী নিজের স্বপক্ষে একটি কথাও বলেননি। নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেনি। এই সব প্রশ্নের উত্তর আমরা পাই ২২নং পরিচ্ছেদে। এই পরিচ্ছেদে ভৈরবী মন্দিরের চাবি, হিসেবের খাতা জনার্দন রায়ের জামাতা উকিল নির্মলবাবুর সামনে জমিদার জীবানন্দের হাতে তুলে দেয়। ভৈরবী বলে ''আরও একখানা কাগজ পাবেন যাতে ভৈরবীর সকল দায়িত্ব ও কর্তব্য ত্যাগ করে আমি সই করে দিয়েচি"। নির্মলবাবু এসেছিলেন ভৈরবীকে গ্রামের মাতব্বরদের ষড়যন্ত্রের হাত থেকে বাঁচাতে। কিন্তু তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে ভৈরবী নিজেই সর্বস্ব ত্যাগ করে দিয়ে চলে যেতে সঙ্কল্পবদ্ধ হন। নির্মলবাবু ভৈরবীর কাছ থেকে বিদায় নেবার আগে বলেন '' আমাকে আর বোধ হয় কোন আবশ্যক নেই? আমাদের শীঘ্র ভুলে যাবেন না আশা করি?" এই প্রশ্নে বা আকাঙ্ক্ষায় জীবানন্দ অন্যরকম ইঙ্গিত করে ভৈরবীকে প্রশ্ন করে ''তাঁকে মনে রাখবার জন্য কিরকম ব্যাকুল প্রার্থনা জানিয়ে গেলেন, দরখাস্ত মঞ্জুর করলে তো?" ষোড়শী এর উত্তরে যা বলেছে তাইই হল তার ভৈরবী পদ ত্যাগ করার বা এত মিথ্যা অপবাদ শুনেও নীরব থাকার উত্তর। কেন সে মন্দিরের পুজো ভৈরবী থাকা সত্ত্বেও করেনি, এ সবের উত্তর ভৈরবীর এই উত্তরের মধ্যেই নিহিত আছে। জনার্দন রায়ের কন্যা হৈমবতী, জামাতা নির্মল এবং তাদের সন্তানের কথা মনে রেখে ভৈরবী বলে '' আমার যা-কিছু কল্পনা, যত কিছু আনন্দের ভাবনা, সে ত কেবল তাঁদের নিয়েই। তাঁদের দেখেই ত আমি সে ষোড়শী আর নেই। এই যে চণ্ডীগড়ের ভৈরবী-পদ, যা ভাগ করে নেবার লোভে আপনাদের ছেঁড়াছেঁড়ির অবধি নেই, যে জন্যে কলঙ্কে দেশ আপনারা ছেয়ে দিলেন, সে যে আজ জীর্ণবস্ত্রের মত ত্যাগ করে যাচ্চি, সে শিক্ষা কোথায় পেয়েচি জানেন? সে ওইখানে। মেয়েমানুষের কাছে এ যে কত ফাঁকি, কত মিথ্যে, সে কথা ওঁদের দেখেই বুঝতে পেরেছি"। এটাই ভৈরবীর ভৈরবীত্ব ত্যাগ করার মূল কথা।

অর্থাৎ ভৈরবী সব ত্যাগ করতে স্বীকার করেছে তার ভিতরকার নারীসুলভ বুভুক্ষু হৃদয়ের কারণে। প্রথম দিন জীবানন্দকে দেখে তার বিবাহের রাত্রির কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। অনাস্বাদিত এক স্বাদ অর্থাৎ দাম্পত্যজীবনের স্বপ্ন হয়ত তার মনে উঁকি দিয়েছিল। তারপরে যখন এককালের বান্ধবী হৈমর স্বামী-সন্তান সহ সুখী দাম্পত্য জীবন

দেখে তখন তা তার মনে অনুঘটকের কাজ করে। স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য সম্পর্ক তাকে প্রলুব্ধ করে। আর ভৈরবী এতটাই নিষ্ঠাবতী ছিল যে নিজের মনে উঁকি মারা স্বাদকে সে অস্বীকার করেনি। নিজের মনের এই ভাবনার কারণেই সে আর মন্দিরের পুজোর কাজ করতে চায়নি। নিজেকে সব কিছু থেকে সরিয়ে নিয়েছে। গ্রামের মাতব্বর এবং তারই স্বামী জীবানন্দ জমিদারের ছদ্মবেশে যখন তার বিরুদ্ধে নানারকম ষড়যন্ত্র করে ভৈরবীর পদ থেকে সরাতে চাইছে, তখন ভৈরবী নিজেই সব ত্যাগ করে চলে যায়। কারণ মাতব্বরদের ভয় নয়, জমিদারের অত্যাচার নয়; কারণ ভৈরবী থাকা সত্ত্বেও তার মনে স্বামী-সন্তানের স্পৃহা জেগেছে- এটাই তার অপরাধ। নিজেকে সে নিজের কাছে প্রবঞ্চিত করেনি। মিথ্যে মুখোশ পড়ে ভৈরবীর কাজ সে চালিয়ে যেতে চায়নি। এখানেই ভৈরবী সব্বাইকে হারিয়ে জিতে যায়। উপন্যাসে যে ক্লাইম্যাক্সের সূচনা হয়েছিল জমিদার জীবানন্দের ঘরে, তার সমাপ্তি ঘটে ভৈরবীর এই বক্তব্যে। আর এই ক্লাইম্যাক্সের সম্পূর্ণ পরিণতি ঘটে যখন ষোড়শী ওরফে অলকা জীবানন্দের হাত ধরে নিরুদ্দেশের পথে পা বাড়ায়। ষোড়শী আগেই চণ্ডীগড় ত্যাগ করেছিল। পরে 'স্বামী' জীবানন্দকে গ্রাম থেকে নিয়ে যায় নতুন জীবনের খোঁজে। জীবানন্দ বলে "কোথায় আমাকে নিয়ে যাবে?" এরপর "ষোড়শী কহিল, যেখানে আমার দু'চোখ যাবে"। এখানেই উপন্যাসের সমাপ্তি ঘটে।

১০.৩ উপন্যাসের কাহিনি বিশ্লেষণ

উপন্যাসে শরৎচন্দ্র ব্রিটিশ শাসনাধীন এক গ্রামীণ ভারতের একটি গ্রামের চিত্র তুলে ধরেছেন। ঔপন্যাসিক ভৈরবী বা সধু-সন্ন্যাসীর অন্তরের গোপন কুঠিতে যে সুপ্ত বাসনা থাকে গৃহী হবার তাই-ই এই উপন্যাসে তুলে ধরতে চেয়েছেন। ভৈরবী ষোড়শীকে তিনি কঠোর সংযমী হিসেবে দেখিয়েছেন। অন্যান্য ভৈরবীদের মতো তার পদস্খলন হয়নি। কিন্তু সেই ভৈরবীর মনেই জীবানন্দকে নিয়ে সংসার বাঁধার স্বপ্ন দেখা দিয়েছে। এখন প্রশ্ন ওঠে অলকা জীবানন্দকে চিনতে পারলেও জীবানন্দ সহজে তাকে চিনতে পারেনি। আর চিনতে পেরেও বা সব কিছু জেনেও উপন্যাসের অনেকটা অংশ জুড়ে জীবানন্দ অলকার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। শুধু তাই নয় অলকা জীবানন্দকে সাহেবের হাতে ধরা পড়ার হাত থেকে বাঁচালেও ষড়যন্ত্রের হাত থেকে রক্ষা পায়নি। নিজের বিবাহিতা স্ত্রী (যদিও তাদের নাকি সত্যিকারের বিবাহ হয়নি, সম্প্রদান হয়েছিল কেবলমাত্র) হিসেবে জানার পর এবং তাকে ম্যাজিস্ট্রেটের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য মিথ্যে অপবাদ নিজের মাথায় তুলে নেবার পরেও জীবানন্দ অলকাকে পল্লীসমাজের জটিল আবর্ত থেকে মুক্ত করার কোনো চেষ্টাই করেনি। যা কতকটা বিস্ময়ের উদ্রেক করে। ধরে নেওয়া গেল জীবানন্দ জমিদার, অত্যাচারী জমিদার, অনেক মেয়ের জীবন সে নষ্ট করেছে জমিদার সুলভ ব্যভিচারী মানসিকতায়; সুতরাং তার কাছ থেকে এটা অপ্রত্যাশিত নয়। কিন্তু ষোড়শী ইচ্ছা করলেই তো মরফিয়ার ডোজ একটু বাড়িয়ে দিয়ে জীবানন্দের প্রাণ নিয়ে নিতেও পারত। জীবানন্দ এ কথা উপন্যাসে স্বীকারও করেছে। তা সত্ত্বেও জীবানন্দের পরবর্তী ব্যবহার ঠিক যুক্তি-পারম্পর্যপূর্ণ মনে হয় না। এ বিষয়ে সমালোচক বলেছেন- "দেনাপাওনা Realistic পরিবেশে Idealistic রচনা। একজন অতি পাষণ্ড পিশাচ সহসা প্রেমের স্পর্শ লাভ করিয়া কী আদর্শ চরিত্রের মানুষ হইল How a lost soul is redeemed. তাহাই এই উপন্যাসের মূলকথা"। [কবিশেখর কালিদাস রায়, 'দেনাপাওনা', "*শরৎ-সাহিত্য*", বুকস্ ওয়ে, ২০০৯, পৃ. ১৩৯।

আবার একটা সময় দেখি জীবানন্দের মধ্যে হঠাৎ পরিবর্তন। সে নারীলোলুপ, অত্যাচারী জমিদার থেকে প্রজাদরদী জমিদার হয়ে উঠছে। কিন্তু এই পরিবর্তনের যে ক্রমিক ধাপ তা ঔপন্যাসিক দেখাননি। ষোড়শীই তার এই চারিত্রিক পরিবর্তনের প্রেরণা, কিন্তু পরিবর্তনের পর্যায়গুলি পাঠকের চোখে ধরা পড়ে না। পাঠক হঠাৎ দেখে

জীবানন্দ চাষিদের সুবিধার জন্য পাকা নালা তৈরি করিয়ে দিচ্ছে। এমনকি নিজের সবকিছু প্রজাদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেও প্রস্তুত। উপন্যাসের শেষাংশে জীবানন্দ অলকাকে বলে " কিন্তু আমার প্রজারা? তাদের কাছে আমাদের পুরুষানুক্রমে জমে থাকা ঋণ?" ষোড়শী উত্তরে জানায় " পুরুষাণুক্রমে আমাদের তা শোধ দিতে হবে"। শোষক জমিদারের এই পরিবর্তন কীভাবে হল তা উপন্যাসে শরৎচন্দ্র বিস্তৃতভাবে দেখাননি। আমাদের বক্তব্য লেখকের ধ্যান-জ্ঞান সমস্তই ছিল ভৈরবীর উপর। ভৈরবী সন্ন্যাসিনী হলেও মানুষ। ভৈরবী সন্ন্যাসিনী হলেও শেষপর্যন্ত একজন নারী। একজন ভৈরবী কীভাবে একজন সাধারণ রমণী হয়ে ওঠে তা দেখানোই লেখকের মূল লক্ষ্য ছিল।

ভৈরবীর এই বিবর্তন দেখানোর জন্য লেখক অনেকটা জায়গা জুড়ে ভৈরবীর কথা বলেছেন। ভৈরবী এত নিন্দা, সমালোচনা, ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও কাউকেই পরিস্কার উত্তর দেয়নি- কেন সে মন্দিরে পুজোর কাজ করছে না। ধীরে ধীরে তার অন্তরের পরিবর্তন ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন। তার অন্তরের এই পরিবর্তনের জন্য লেখককে নির্মল-হৈমর সুখী দাম্পত্যের ছবি আঁকতে হয়েছে। ভৈরবীর জীবনের এত বড় পরিবর্তনের কারণ যে হৈম, তার ডাকেই শেষপর্যন্ত অলকা ফিরে আসে চণ্ডীগড়ে জীবানন্দকে ওখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য। যাতে জীবানন্দের সত্য স্বীকারোক্তির পরিণতিতে হৈমর পিতা জনার্দন রায় ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দোষী সাব্যস্ত না হয়। মূল চরিত্রকে প্রস্ফুটিত করার জন্য অন্য একটি বিপরীতধর্মী চরিত্রকে তৈরি করা শরৎচন্দ্রের অনেক উপন্যাসেই দেখা যায়। যেমন 'গৃহদাহ' উপন্যাসে অচলার চরিত্রকে স্পষ্ট করার জন্য মৃণাল চরিত্রের সৃষ্টি করেছিলেন। হৈম-নির্মলের দাম্পত্যজীবন ষোড়শীকে দেখিয়ে দেয় তার নারী-জীবনের অসাড়তা। নারী মাত্রেই যে সংসার বোনার একটা গোপন স্বপ্ন অন্তরে সর্বদা প্রচ্ছন্ন থাকে তারই প্রমাণ লেখক ভৈরবীর মধ্য দিয়ে হয়তো দেখাতে চেয়েছিলেন। তাই বিস্মৃত অতীত থেকে স্বামী জীবানন্দ একবার দেখা দিতেই নিজের ভৈরবীর মহিমাকে অস্বীকার করতে শুরু করে ষোড়শী। তারপর হৈমকে দেখে নিজের অনাস্বাদিত নারীত্বের স্বাদকে সে আর অস্বীকার করতে পারে না। তাই নিজের সঙ্গে নিজে ছলনা না করে ভৈরবীর কাজ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয়। ভৈরবী থেকে অলকাতে পরিণত হয় সে।

ভৈরবী কেন অলকাতে পরিণত হল তার অন্যতম কারণ তার সতীত্ব। শরৎসাহিত্য পাঠ করলে দেখা যায় তিনি সতীত্বকে বারবার জিতিয়ে দিয়েছেন। এই কারণেই ভৈরবী জীবানন্দকে স্বামী হিসেবে চিনতে পেরে সমস্ত কলঙ্ক মাথা পেতে নেয়। একদিন একশত টাকার বিনিময়ে যার সঙ্গে তার বিবাহ হয়েছিল এবং বিবাহের রাত্রের পরে যার মুখ সে কোনো দিন দেখতে পায়নি, সেই 'স্বামী'কে সে ভৈরবী হয়েও অস্বীকার করতে পারেনি। তাই যথেষ্ট সুযোগ পেয়েও কে সাহেবের কাছে সে সত্য ঘটনা অস্বীকার করে কলঙ্ককে মাথায় তুলে নিয়েছে। একই কারণে চণ্ডীগড় ত্যাগের মুহূর্তে জীবানন্দকে সে প্রণাম করেছে। উপন্যাসের পরিণতিতে ষোড়শী জীবানন্দকে হাত ধরে চণ্ডীগড় থেকে নিয়ে গেছে সে কি কেবলমাত্র হৈমর পিতা জনার্দন রায়কে বাঁচানোর জন্য? ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বিচারে জীবানন্দেরও শাস্তি পাওনা ছিল। জীবানন্দ নিজেও তা জানত। স্বামী যতই খারাপ হোক, দুষ্ট চরিত্রের হোক না কেন বিপদের দিনে সতী নারী তারই পাশে এসে দাঁড়ায়। ষোড়শী এ কারণেও জীবানন্দকে চণ্ডীগড় থেকে নিয়ে গিয়ে আদালতের শাস্তির হাত থেকে বাঁচাতে চেয়েছে। একদিন যাকে যে-কোনো কারণেই হোক স্বামী হিসেবে গ্রহণ করতে হয়েছে তাকে কোনোমতেই অস্বীকার করা যায় না— এই কথাই ষোড়শীর মনের মধ্যে ক্রিয়াশীল থেকেছে। সেই সঙ্গে নির্মল-হৈমর সুখী দাম্পত্যজীবন ষোড়শীকে অলকায় পরিণত করেছে।

শরৎচন্দ্র এই ভৈরবী বা জীবানন্দের চরিত্রের প্রেরণা পেয়েছিলেন কোথা থেকে? গোপালচন্দ্র রায় তাঁর 'শরৎচন্দ্র' গ্রন্থে এ বিষয়ে জানিয়েছেন তথ্য সন্ধান করে। গোপালবাবু অনুসন্ধান করে জানতে পারেন কয়েকজন

ছাত্র ১৯২৬ সালে শিলচরে শরৎচন্দ্র যাওয়ার পর 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসে কতটা সত্য আছে জানতে চান। এর উত্তরে শরৎচন্দ্র যা বলেছিলেন— "আমি একবার বীরভূম গিয়েছিলাম। সেখানে একটা চণ্ডীর মঠ দেখি। তার মধ্যে জমিদারের কুকীর্তি জড়িত ছিল। জমিদার নাকি কার সম্পত্তি পেয়েছিলেন। দেনাপাওনার জীবানন্দও তাই"। (গোপালচন্দ্র রায়, 'শরৎচন্দ্র', নয়া উদ্যোগ, ৪র্থ খণ্ড, ১৯৯৯, পৃ. ২৭৪।) সুতরাং বীরভূমের চোখে দেখা কাহিনিকে লেখক বাঁকুড়ার পটভূমিতে স্থাপন করেছেন।

১০.৪ উপন্যাসের নামকরণ

উপন্যাসের নামকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আসলে নাম হল উপন্যাসে প্রবেশের প্রথম চাবিকাঠি। অচেনা লেখকের অজ্ঞাত লেখকের গল্প-উপন্যাস পাঠের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা নাম দেখেই ঠিক করি কোন্ গল্প বা কোন্ উপন্যাস আমরা পাঠ করব। আবার নামের মধ্য দিয়েই লেখক কী বলতে চাইছেন বা কোনো বক্তব্যকে উপস্থিত করতে চাইছেন কিনা তাও বলে দেন। অর্থাৎ নামের মধ্য দিয়ে প্রথমেই লেখক কোন্ পথে, কোন্ দৃষ্টিভঙ্গিতে রচনাটিকে তিনি দেখতে চাইছেন বা পাঠককে দেখাতে চাইছেন তার একটা ইঙ্গিত দিয়ে রাখেন। আকর্ষণীয় নামের মধ্য দিয়ে লেখক অনেক গল্প-উপন্যাস পাঠ করিয়ে নেন। লেখা হয়ে গেলে লেখকের মৃত্যু ঘটে বলা হয়, অর্থাৎ ওই লেখার বিষয়ে লেখকের আর কিছু বলার থাকে না। ঠিক কথা। কিন্তু নামকরণ করে দিয়ে লেখক যা বলার বলে দেন। তার বাইরে পাঠক সচরাচর যেতে পারে না। তবে হ্যাঁ কিছু ক্ষেত্রে ব্যর্থ নামকরণও ঘটে। দেখা যাক 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসের নামকরণ এ বিষয়ে কতদুর তাৎপর্যপূর্ণ।

এই উপন্যাসের নামকরণ কোনও ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে হয়নি। কোনও ঘটনাকে কেন্দ্র করেও নামকরণ হয়নি। বলা যায় একটি ভাবকে কেন্দ্র করে লেখক নামকরণ করেছেন। অর্থাৎ নামকরণের ক্ষেত্রে লেখক তাঁর উদ্দিষ্ট বক্তব্যকে প্রাধান্য দিয়েছেন। দেনা-পাওনা বললেই বাঙালি সংস্কৃতিতে বিবাহের দেনা-পাওনার কথাই মূলত আমাদের মনে আসে। এই দেনা-পাওনা আবার কন্যা বা কন্যার বাড়ির দিক থেকেই হয়ে থাকে। পুরুষতান্ত্রিক বাঙালি সমাজে এটাই প্রচলিত প্রথা। উপন্যাসেও এরকম একটি দেনা-পাওনার ঘটনা ঘটেছে। উপন্যাসের যে ঘটনা-কাল সেখানে ঘটেনি এই দেনা-পাওনা। ঘটেছে উপন্যাস শুরু হওয়ার অনেক আগে। ষোড়শী এবং জীবানন্দের মুখে সেই দেনা-পাওনার কথা শোনা যায়। জীবানন্দ একশত টাকা ষোড়শী ওরফে অলকার মায়ের কাছে বিপদে পড়ে ধার চেয়েছিল। অলকার মা এর পরিবর্তে তার কন্যাকে জীবানন্দের হাতে সমর্পণ করেছিল। উপন্যাসের পঞ্চম পরিচ্ছেদে ম্যাজিস্ট্রেট কে সাহেব এবং পুলিশ কর্মচারীরা চলে যাবার পর ষোড়শী-জীবানন্দ কথোপকথনের সময় একশত টাকার বৃত্তান্ত জানা যায়। বাদুড়বাগানের মেসে থাকাকালীন জীবানন্দ বলে- " একবার বিপদে পড়ে তাঁর কাছে একশ' টাকা ধার নিয়েছিলাম, সেটা বোধ হয় আর শোধ দেওয়া হয়নি"। এর উত্তরে ষোড়শী বলে- "আপনি সেজন্য কোন ক্ষোভ মনে রাখবেন না। অলকার মা সে টাকা ধার বলে আপনাকে দেননি, যৌতুক বলেই দিয়েছিলেন"। সুতরাং অলকার সঙ্গে জীবানন্দের বিবাহের দেনা-পাওনা স্থির হয়েছিল একশত টাকায়। একালে একশত টাকার অর্থমূল্য অনেক কমে গেছে। কিন্তু যে সময় এই উপন্যাস লেখা হচ্ছে বা যে সময় উপন্যাসের ঘটনা ঘটছে, সে সময় একশত টাকার যথেষ্ট মূল্য ছিল। এই দেনা-পাওনার ঘটনা থেকেই কিন্তু উপন্যাসের ঘটনাক্রম জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে।

অলকার মায়ের একশত টাকার বিবাহের যৌতুকই জীবানন্দকে তার বিবাহকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে দেয়নি। কারণ ওই পঞ্চম অধ্যায়েই ষোড়শী বলে- "কিন্তু বিবাহ তো আপনি করেন নি, করেছিলেন শুধু একটা তামাশা।

সম্প্রদানের সঙ্গে সঙ্গেই সেই যে নিরুদ্দেশ হলেন, এই বোধ হয় তারপরে কাল প্রথম দেখা"। জীবানন্দ কিন্তু কোথাও এই বিবাহকে অস্বীকার করেনি। জমিদার সুলভ দাপটে তিনি এই বিবাহকে অস্বীকার করতেই পারতেন। একবার মাত্র জীবানন্দ বলেছে যোড়শীর কথার প্রত্যুত্তরে— "তাই মনে করতে পারতাম যদি না তিনি ওই ক'টা টাকার জন্য তাঁর মেয়েকে বিবাহ করতে বাধ্য করতেন"। সেই টাকা জীবানন্দ শোধ করেনি। আর কোনদিন শোধ করতে পারবেও না। কারণ অলকার মুখেই শোনা যায় যেদিন জীবানন্দ-যোড়শীর চণ্ডীগড়ে দেখা হয় তার "বছর দশেক পূর্বে তাঁর কাশীলাভ হয়েচে"। এই দেনা-পাওনার সূত্র ধরেই যোড়শী তার স্বামী জীবানন্দকে পায় এবং তার জীবনে ভৈরবী-অলকার দ্বন্দ্ব শুরু হয়। যা উপন্যাসের সংকটকে ঘনিয়ে তোলে। উপন্যাসও একমুখী গতিতে পরিণতির দিকে ধাবিত হয়। সুতরাং এই দেনা-পাওনার ঘটনার উপরেই উপন্যাসটি দাঁড়িয়ে আছে বা বলা যায় এটিই উপন্যাসের মূল বীজ। দেনা-পাওনার ঘটনা না ঘটলে উপন্যাসের কাহিনি আর অগ্রসর হোত না। শরৎচন্দ্রীয় পদ্ধতিতেই নায়িকার জীবনের পূর্বেকার ঘটনা অর্থাৎ দেনা-পাওনা উপন্যাসের মূল সংকটের কারণ হয়ে উঠেছে।

অলকা-জীবানন্দের বিবাহ না হয়ে থাকলে যোড়শীর ভৈরবী এবং নারীত্বের দ্বন্দ্ব বাঁধত না। জীবানন্দের হাতে অন্যান্য অত্যাচারিত নারীর মতোই তার পরিণতি হোত। কেবলমাত্র তা পল্লীবাংলার জমিদারের কুকীর্তির কাহিনি হিসেবেই থেকে যেত। তা নিয়ে মহৎ কোনো উপন্যাস শরৎবাবুর পক্ষে লেখা সম্ভব হোত না। এদিক থেকে 'দেনা-পাওনা' নামটি উপন্যাসে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

আবার জীবনের দেনা-পাওনার কথা যদি ভাবা যায় তাহলে সেখানেও দেনা-পাওনা ঘটেছে এই উপন্যাসে। ভারতীয় দর্শন অনুযায়ী এ জীবনের সমস্ত লেনদেন এই জীবনেই মিটিয়ে যেতে হয়। উপরওয়ালা কোনো না কোনোদিক থেকে তাঁর পাওনা-গণ্ডা ঠিক বুঝে নেন। যদি তা না হয় তাহলে তার উত্তরসূরীর উপর সেই লেনদেনের বোঝা বর্তায় বা তার পরবর্তী জন্মে সেই পাওনা মেটাতে হয়। সঙ্গে আসে কর্মফলবাদের কথা। যেমন কর্ম তেমন ফল। জীবানন্দ চৌধুরী যে বংশের জমিদার সেই বংশের অত্যাচারের কথা ঔপন্যাসিক বিস্তৃত না বললেও ইঙ্গিত দিয়েছেন। উপন্যাসের ১ম পরিচ্ছেদের ১ম অনুচ্ছেদেই লেখক বলেছেন— " অত্যাচারী বলিয়া বীজগাঁয়ের জমিদার-বংশের চিরদিনই একটা অখ্যাতি আছে; কিন্তু বৎসরখানেক পূর্বে অপুত্রক জমিদারের মৃত্যুতে ভাগিনেয় জীবানন্দ চৌধুরী যেদিন হইতে বাদশাহী লাভ করিয়াছেন, সেদিন হইতে ছোট-বড় সকল প্রজার জীবনই একেবারে দুর্ভর হইয়া উঠিয়াছে"। পূর্বসুরীর তুলনায় উত্তরসূরী আরও অত্যাচারী, তার প্রজা শোষণের মাত্রা আরও বেশি। উপন্যাসে সে প্রমাণও আছে।

এই অত্যাচারী, নারীলোলুপ, মদ্যপ, প্রজাশোষক জীবানন্দকেই উপন্যাসের শেষে আমরা দেখি অন্যরূপে। যোড়শী ওরফে অলকা তাকে নতুন ভাবে বাঁচার পথ দেখিয়েছে। এই জীবানন্দই টাকার জন্য অন্যের সম্পত্তি বিক্রি করে দিয়েছিল। ভৈরবীর কাছে প্রজারা এসে জানায় তাদের বাপ-ঠাকুর্দার কালের জমি জমিদার বিক্রি করে তাদের পথে বসিয়ে দিচ্ছে। চতুর্দশ অধ্যায়ে ভৈরবীর প্রজারা এসে জানায়- " কে একজন মাদ্রাজী সাহেবকে সমস্ত দক্ষিণের মাঠ জমিদার-তরফ থেকে বিক্রি করা হচ্চে। আমাদের যথাসর্বস্ব। কেউ তাহলে আর বাঁচব না- না খেতে পেয়ে সবাই শুকিয়ে মারা যাবো মা!" এই ষড়যন্ত্রে কেবলমাত্র জমিদার নয়, মহাজন জনার্দন রায়ও যুক্ত ছিল। যখন ঘটনা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এবং আদালত পর্যন্ত গড়ায়, তখন জীবানন্দ অন্য মানুষ। যোড়শীর ত্যাগ, জীবানন্দের অলকা ডাকে তার বিচলিত হওয়া ইত্যাদি জমিদারকে তখন অন্য মানুষে পরিণত করেছে। তাই ছাব্বিশ নং অধ্যায়ে জমিদার সম্পর্কে এককড়ি জনার্দন রায়কে বলে- " কিন্তু এটুকু জানতে পারলাম তারা সাক্ষী মানলে হুজুর কিছুই গোপন করবেন না। দলিল তৈরির কথা পর্যন্ত না"। 'হুজুর' অর্থাৎ জীবানন্দ চৌধুরী। ব্যারিস্টার নির্মলকে জীবানন্দ

বলেছে চাষাদের উপর অত্যাচার তিনি আর হতে দেবেন না। এও বলেছে "আমার কৃতকর্মের ফল আমি ভোগ করলেই যথেষ্ট"। তাই আমরা দেখি জমিদার প্রজাদের সঙ্গে হাত লাগিয়ে জলনিকাশির সাঁকো তৈরি করছে। অর্থাৎ এ জীবনের লেনদেন জীবানন্দ এই জীবনেই শোধ করতে নেমে পড়েছেন। উপন্যাসের একেবারে শেষ অংশে যোড়শীকে উদ্দেশ্য করে জীবানন্দ বলে- " কিন্তু আমার প্রজারা? তাদের কাছে আমাদের পুরুষানুক্রমে জমে থাকা ঋণ"। যোড়শী উত্তরে জানায়- " পুরুষানুক্রমে আমাদের তা শোধ দিতে হবে"। দেনা-পাওনার কথা উপন্যাসে এই পথেও বলা হয়েছে। অর্থাৎ নিজেদের কৃতকর্মের দেনা-পাওনার হিসাবও পরিশোধ করার কথা উপন্যাসে বলা হয়েছে। এদিক থেকেও উপন্যাসটির 'দেনা-পাওনা' নামকরণ সার্থক।

জীবনের লেনদেনের কথাও উপন্যাসে আছে। জীবনকে উপবাসী রেখে বা আত্মাকে কষ্ট দিয়ে বেঁচে থাকার কোনো অর্থ হয় না। ভৈরবী যোড়শী কঠোর নিয়ম সাধনায় নিজের জীবনকে বেঁধে রেখেছিল। বাহ্যিক আচারে নিজের জীবনাচারণের চতুর্দিকে গণ্ডী কেটে রেখেছিল। যেখানে সাধারণ নারীর চাওয়া-পাওয়া থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেছিল। কিন্তু যেদিন ভৈরবী-পূর্ব জীবনের স্বামী-দর্শন হল সেদিন তার সংযমের ভিত নড়ে গেল। জীবানন্দকে সে চিনেছিল ডান চোখের তিল দেখে। তাই মুখের আদলের পরিবর্তন হলেও স্বামী জীবানন্দকে তার চিনে নিতে ভুল হয়নি। তার মধ্যেও তখন অনাস্বাদিত স্বামী-সন্তানসহ সুখী নীড়ের স্বপ্ন দেখা দিয়েছে। তাই দেখি পেটের ব্যথার জন্য যোড়শী জল গরম করে দিয়েছে এবং ঝাঁটা দিয়ে জীবানন্দের ঘরও পরিস্কার করে দিয়েছে। আর হৈম-নির্মল ও তাদের সন্তানসহ সুখী দাম্পত্যের ছবি তার এই স্বপ্নে শিলমোহর বসিয়েছে। তার অন্তরের এই সুপ্ত বাসনাকে সে প্রকাশ্যে স্বীকৃতি না দিলেও অস্বীকার করতে পারেনি। তাই মন্দিরের পুজো থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয়। উপন্যাসের শেষে যোড়শী তার স্বামীকে হাত ধরে নিয়ে যায় অনির্দেশের পথে। অর্থাৎ জীবনকে বা জীবনের সুপ্ত বাসনাকে উপবাসী রাখা চলে না। তারও পাওনা-গণ্ডা মেটাতে হয়। মিথ্যে উপরের আবরণ একদিন ঠিক খসে পড়ে।

আবার জীবানন্দ ব্যভিচারী জীবন কাটানোতেই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। এ নিয়ে তার কোনো অনুশোচনা ছিল না। যোড়শীর উপরেও অত্যাচার করতে সে পিছপা হয়নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত করেনি। ভৈরবীকে মন্দির থেকে তাড়ানোর ষড়যন্ত্রে সেও যুক্ত থকেছে। কিন্তু যোড়শী যখন চণ্ডীগড় ছেড়ে চিরদিনের জন্য চলে যাচ্ছে, তখন জীবানন্দ ব্যথা অনুভব করেছে। জীবানন্দের তখনকার অনুভূতি লেখকের জবানীতে- " আজ সমস্ত হৃদয় তাহার যোড়শীকে— একান্ত মনে চাহিতেছে, এ তাহার অধিকারের দাবী, অথচ চিরিদিন ইহাকেই উপেক্ষা করিয়া, অপমান করিয়া, মিথ্যার পরে মিথ্যা জমা করিয়া, সে যে প্রাচীর গড়িয়া তুলিয়াছে, আজ তাহাকে লঙ্ঘন করিবার পথ তাহার কৈ?" জীবানন্দ এবার যোড়শীকে অর্থাৎ তার অলকাকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চাইছে। এতদিনের ভোগবিলাসের জীবন এখন তার কাছে অর্থহীন মনে হয়েছে। এতদিন ভোগই জীবনের সার সত্য বলে সে মনে করেছিল। সে এও জানত শরীরের উপর অত্যাচারের ফলে তার আয়ুও হয়তো বেশিদিন নেই। কিন্তু তাও সে নিজেকে ভোগের জীবন থেকে নিবৃত্ত করতে পারেনি। সতীর সতীত্ব নাশেই ছিল তার উল্লাস, এজন্য এতটুকু অন্যায়বোধ তার মধ্যে কাজ করেনি। যে প্রজাদের সর্বস্ব কেড়ে নিতে এতদিন দৃঢ়সঙ্কল্পবদ্ধ ছিল, এখন তাদের জন্যই কিছু করতে সে উৎসুক। অলকার মতো সেও জীবনের স্বাভাবিক চাহিদা, স্বাভাবিক ধর্মকে উপেক্ষা করতে চেয়েছিল। কিন্তু অলকার সংস্পর্শে এসে তার চৈতন্যোদয় হয়। সেও জীবনের দেনা-পাওনার হিসেব মেটাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এদিক থেকেও লেখক 'দেনা-পাওনা'র ভাবনাকে উপন্যাসে গুরুত্ব দিয়েছেন। সুতরাং সবদিক থেকেই এই উপন্যাসের 'দেনা-পাওনা' নামকরণ সার্থক।

একক-১১ □ 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসের চরিত্র বিচার

গঠন

১১.১ উদ্দেশ্য
১১.২ ভৈরবী ষোড়শীর চরিত্র বিচার
১১.৩ জমিদার জীবানন্দ চৌধুরীর চরিত্র চিত্রণ
১১.৪ ব্যারিস্টার নির্মল বসু ও তার স্ত্রী হৈমবতীর চরিত্র বিচার
১১.৫ মহাজন জনার্দন রায়
১১.৬ গোমস্তা এককড়ি নন্দীর চরিত্র
১১.৭ ষোড়শীর পিতা তারাদাস চক্রবর্তী
১১.৮ সর্বেশ্বর শিরোমণি
১১.৯ ফকির সাহেব
১১.১০ প্রফুল্ল চরিত্র

১১.১ উদ্দেশ্য

এই অংশে আমরা উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীদের চরিত্র বিশ্লেষণ করব। সেই সঙ্গে দেখতে চাইব চরিত্রটির উপন্যাসে গুরুত্ব কতটুকু এবং সেই চরিত্রচিত্রণ কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ। শরৎচন্দ্র নিজেই স্বীকার করেছেন চরিত্রই তাঁর কাছে প্রধান। ফলত চরিত্রগুলির সামগ্রিক বিশ্লেষণ করা যে-কোনো উপন্যাস পাঠের ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। উপন্যাসের চরিত্রগুলো বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে আমরা উপন্যাসটি বিষয়ে আরও সামগ্রিকভাবে জানতে পারব এবং সেই সঙ্গে প্রতিটি চরিত্র-নির্মাণের পশ্চাৎপটে লেখকের কোন মানসিকতা কাজ করেছে তাও আমরা এই অংশের আলোচনায় বুঝে নিতে পারব।

এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র নিঃসন্দেহে দুটি— ষোড়শী এবং জীবানন্দ। পাশাপাশি আছে বেশি কিছু অপ্রধান চরিত্র। যেমন— নির্মল ও হৈমবতী, হৈমবতীর পিতা জনার্দন রায়, ষোড়শীর পিতা তারাদাস চক্রবর্তী ইত্যাদি। শরৎচন্দ্র মূলত চরিত্রকে কেন্দ্র করেই তাঁর কাহিনি নির্মাণ করে থাকেন। বাকি অস্থি-মজ্জা এমনিই যুক্ত হয়ে যায় বলে তাঁর মত।

১১.২ ভৈরবী ষোড়শীর চরিত্র বিচার

ষোড়শী এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। উপন্যাসের শুরু থেকে শেষ ঘটনাক্রম তাকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে। ভৈরবীকে শরৎচন্দ্র কঠোর সংযমী এক চরিত্র হিসেবে এঁকেছেন। দেবী চণ্ডীর অন্যান্য ভৈরবীর মতো তার পদস্খলন হয়নি। গ্রামের মানুষের তার উপর ছিল অগাধ বিশ্বাস। অনেক অসহায় মানুষকে ভৈরবী জমি দিয়ে বসবাস করতে দিয়েছে। সাগর ও তার খুড়ো হরিহর বাউড়ি ছিল এরকমই ভূমিহীন পরিবার। সুতরাং ভৈরবী বেশ কিছু কল্যাণধর্মী কাজ করেছিল। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সে রুখে দাঁড়াত। তাই মহাজন জনার্দন রায় বা তার অনুগামীরা দেবী চণ্ডীর দেবোত্তর সম্পত্তি দখল করতে পারে নি বা বিক্রি করে দিতে পারেনি।

ভৈরবী ষোড়শীর ব্যক্তিগত জীবনে কোনও লোভ-লালসাও ছিল না। ভৈরবীর স্বাভাবিক কৃচ্ছ্রসাধন ও সংযমের পাশাপাশি সে নিজস্ব একটা ব্যক্তিত্বও তৈরি করতে পেরেছিল।

তার সাহসিকতার পরিচয় বারংবার পাওয়া গেছে। প্রথমেই দেখা যায় জমিদারের পেয়াদা পিতা তারাদাসকে ধরতে এসে না পেয়ে জমিদারের লোকেরা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ষোড়শীকে বলে-" অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করিয়া কহিল, না আছে ত তুই চল। গোলায় গামছা লাগিয়ে খিঁচে লিয়ে যাবো। সে একটা প্রচণ্ড ধমক দিয়া কহিল, খবরদার বলচি। চল আমিই যাবো- তোদের মাতালটা আমাকে কি করতে পারে দেখি গে। বলিয়া সে পরিণাম ভয়হীন উন্মাদিনীর ন্যায় নিজেই দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া চলিল"। পরে জমিদারের শান্তিকুঞ্জে প্রবেশ করতে ভয় পেলেও শেষপর্যন্ত দ্বিধাহীনভাবেই একাই প্রবেশ করে। এ তার সাহসিকতার পরিচয়ই বহন করে। অত্যাচারী, নারীলোলুপ, মদ্যপ জেনেও ষোড়শী জীবানন্দের কাছাড়িবাড়িতে প্রবেশে পিছিয়ে আসেনি।

মহাজন জনার্দন রায়ের জামাতা ব্যারিস্টার নির্মল বসুকে একদিন ঘন অন্ধকারে ঝড়-জলের রাতে হাত ধরে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এসেছিল। একদিকে ছিল লোকলজ্জার ভয়, অর্থাৎ কেউ যদি তাদের দুজনকে হাত ধরে হাঁটতে দেখে ফেলে। ষোড়শীর নামে রটনা ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। অন্যদিকে ঝড়-জলের অন্ধকারে অন্য কোনও বিপদ হতে পারত। কিন্তু কোনকিছুতেই সে ভয় পায়নি। নিজের নামে নতুন করে কলঙ্কের দাগ লাগতে পারে জেনেও ষোড়শী পিছপা হয়নি। সে নির্মল বসুকে সাহায্য করেছে। সে তার সই-এর স্বামীকে অন্ধকারে পথ দেখিয়েছে। ষোড়শী এ ক্ষেত্রে সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে তার মানবতাকে জিতিয়ে দিয়েছে।

ষোড়শী তার নিজের জীবনে সঙ্কট ঘনিয়ে আসা থেকে উপন্যাসের শেষ পর্যন্ত নিজের সিদ্ধান্তে অটল থেকেছে। কোনোকিছুই তার সিদ্ধান্ত থেকে তাকে টলাতে পারেনি। গ্রামের মাতব্বর জনার্দন রায়, শিরোমণি, এককড়ি নন্দীর চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র এমনকি প্রকাশ্য আলোচনাসভাও ষোড়শীকে কোনোভাবেই বিচলিত করতে পারেনি। ব্যারিস্টার হিসেবে নির্মল তাকে বারবার সাহায্য করতে এসেছে, কিন্তু সে সাহায্য তার দরকার হয়নি। স্বামী জীবানন্দকে সে স্পর্শ করেছে এবং তার মনে নারীর চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা স্পর্শ করার ফলে ষোড়শী আর মিথ্যে ভৈরবীর ভান করেনি। নিজের কাছে নিজেকে পরিস্কার রেখেছে। এতটুকু প্রবঞ্চনার সুযোগ নেয়নি কারও কাছ থেকে। হৈম-র অনুরোধ সত্ত্বেও তার সন্তানের আশীর্বাদী পুজো সে করেনি। কাউকে সে মনে এক, বাইরে আর এক মুখোশ পরে ঠকায়নি। তাই যখন নিজের মনের দ্বিধা সে সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পেরেছে, তখনই ভৈরবীর পদ স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে চলে গেছে। শুধু তাই নয়, উপযুক্ত লোকের হাতেই ষোড়শী দেবীচণ্ডীর সম্পত্তি হস্তান্তর করে গেছে। এই সময় জমিদার জীবানন্দ অন্য মানুষে পরিণত হয়েছে। সেই পরিবর্তনও ষোড়শী পর্যবেক্ষণ করেছিল। সে দায়িত্বজ্ঞানহীনের মতো দায়িত্ব ত্যাগ করেই বিদাই নিতে পারত। কিন্তু তা সে করেনি। সে জানত জনার্দন রায়, শিরোমণিদের হাতে দেবীর সম্পত্তি পড়লে সব লুটেপুটে খাবে। সব শেষ হয়ে যাবে। তাই উপযুক্ত পাত্রের হাতেই সে সম্পত্তি তুলে দেয়। কেবল তাই নয়। এই হাতবদলের সময় ব্যারিস্টার নির্মলবাবুকে সাক্ষীও রেখে দেয়। এক্ষত্রে তার বুদ্ধিমত্তারও পরিচয় পাওয়া যায়। নির্মলবাবুর সামনেই ষোড়শীর ঘরে জীবানন্দকে দেবীর জিনিসপত্র অর্পণ করে ২২নং পরিচ্ছেদে- " এই নিন মন্দিরের চাবি, এবং এই নিন হিসাবের খাতা। বলিয়া সে অঞ্চল হইতে চাবির গোছা খুলিয়া এবং তাকের উপর হইতে একখানা খেরো-বাঁধানো মোটা খাতা পাড়িয়া জীবানন্দের পায়ের কাছে রাখিয়া দিয়া কহিল, মায়ের যা-কিছু অলঙ্কার, যত-কিছু দলিল-পত্র সিন্দুকের ভিতরেই পাবেন, এবং আরও একখানা কাগজ পাবেন যাতে ভৈরবীর সকল দায়িত্ব ও কর্তব্য ত্যাগ করে আমি সই করে দিয়েচি"। নির্মলবাবু এবং জীবানন্দ ষোড়শীর এই পদক্ষেপকে প্রথমে বিশ্বাস করতে পারেনি। নির্মলবাবু ষোড়শীর এই সিদ্ধান্তে 'অভিভূত'

হয়ে পড়েন। আর জীবানন্দ মনে করে ষোড়শী তার সঙ্গে 'তামাশা' করছে। ষোড়শীর এই পদক্ষেপে তার নির্লোভ এবং দৃঢ় চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে ষোড়শীর বিচক্ষণতাও স্বীকার করতে হয়।

ষোড়শী যে উপযুক্ত পাত্রের হাতে দেবীর সম্পত্তি অর্পণ করেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় ২৬নং অধ্যায়ে। জনার্দন রায়, শিরোমণি ঠাকুর যখন জমিদারকে বারংবার দেবীর সম্পত্তির হিসেব দেখাতে বলে তখন জীবানন্দ বলে- " মা চণ্ডীর সমস্ত দলিল-পত্র, নকা, ম্যাপ প্রভৃতি যা-কিছু ছিল আমি কলকাতায় এটর্নির বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েচি"। সুতরাং জমিদার জীবানন্দ দেবী চণ্ডীর সম্পত্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে বদ্ধপরিকর। অর্থাৎ উপযুক্ত লোককেই ষোড়শী সম্পত্তি দেখভালের দায়িত্ব দিয়েছে। দায়িত্ব জ্ঞানহীনের মতো সবকিছু ত্যাগ করে যায়নি। এখানেই ষোড়শীর বিবেচনাবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

ষোড়শী স্বামীর সংস্পর্শে আসার কারণে বা সংসারের স্পৃহা জাগার কারণে ভৈরবীর পদ স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেছে। তাহলে প্রশ্ন ওঠে জীবানন্দকে নিয়ে সে সংসার গড়ল না কেন? জীবানন্দের অনুরোধ উপেক্ষা করেই সে ফকির সাহেবের আশ্রমে আশ্রয় নিয়েছে। ষোড়শীর এই ব্যবহারের ব্যাখ্যা কী? আমাদের মতে ষোড়শী দীর্ঘদিন ভৈরবীর জীবন অতিবাহিত করেছে। ভৈরবীর সংযম, কৃচ্ছ্রসাধনা তাকে একরকম মানসিক গঠন দিয়েছে। তারপক্ষে নতুন ক'রে স্বামী নিয়ে সংসার করা একটু কষ্টসাধ্যই বটে। সে ভৈরবীর পদ ত্যাগ করেছিল সংসার বাঁধার জন্য নয়। তার মনে যে সংসারের স্পৃহা জেগেছে, যা ভৈরবীত্বের বিরুদ্ধাচারণ; তাই সে চণ্ডীগড়ের ভৈরবীর পদ ত্যাগ করেছিল। তার এই সিদ্ধান্ত তার নিষ্কলুষ ব্যক্তিত্বের পরিচয় বহন করে। কেন ষোড়শী সংসার বাধল না সে বিষয়ে সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত যথার্থ ব্যাখ্যা দিয়েছেন- "কিন্তু এত করিয়াও জীবানন্দের স্ত্রী হইয়া সে সংসারে প্রবেশ করিতে পারে নাই, কারণ সে সর্বত্যাগিনী সন্ন্যাসিনী। যে প্রয়োজন অলকার ছিল, সে প্রয়োজন ষোড়শীর নাই, যে প্রবৃত্তি একবার উৎসাদিত হইয়াছে তাহা আর সঞ্জীবিত হইতে পারিবে না, যে যৌবন নিরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে তাহাকে ফিরাইবে কে?" [শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত,' শরৎচন্দ্র,' ১৩৬৮, পৃ. ৫০] আর ষোড়শীর এই মানসিকতা যে সুচিন্তিত তার প্রমাণ ষোড়শী ২৩নং পরিচ্ছেদে জীবানন্দকে বলেছে " কিন্তু আমি ত সন্ন্যাসিনী। পৃথিবীতে স্ত্রীলোকের অভাব নেই- কিন্তু এর মধ্যে আমাকে তুমি জড়াতে চাইচ কেন?" সুতরাং ষোড়শীর এই পদক্ষেপ ছিল তার মনেরই প্রতিফলন। চেষ্টাকৃত কিছু নয়। এখানেই ষোড়শীর ব্যক্তিত্বের জয় হয়।

ষোড়শীর চরিত্র লেখক আগাগোড়া সামঞ্জস্যপূর্ণ করেই চিত্রিত করেছেন। তাই দেখি চণ্ডীগড় এবং ভৈরবীত্ব ত্যাগ করে ষোড়শী আশ্রয় নিয়েছে ফকির সাহেবের আশ্রমে। কুষ্ঠরোগীদের সেবার কাজ সে নিয়েছে। ভৈরবী জীবনে সে গ্রামের সমস্ত মানুষের উপকার করতে চাইত ঈশ্বরের আরাধনার মাধ্যমে এবং সেই সঙ্গে অনেক নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিয়েও সে সেবার কাজেই ব্রতী ছিল। ভৈরবী-পরবর্তী জীবনেও সে সেবার কাজকেই বেছে নিয়েছে। এতে চরিত্রটি সামঞ্জস্যপূর্ণও হয়েছে। অর্থাৎ ভোগের জীবনের মায়া যে সে কাটিয়ে উঠেছিল এখানেই তার প্রমাণ। আরও একটি কথা ফকির সাহেবের আশ্রমে গিয়ে ভৈরবী যে গুরুর পরিবর্তন করেনি তারও প্রমাণ রাখল। ভৈরবী এবং ভৈরবী-পরবর্তী জীবনে তার গুরু একই। তাই সে কৃচ্ছ্রসাধনের জীবনও সহজে গ্রহণ করতে পেরেছে।

এবার আমরা ভৈরবীর রূপের দিকে একটু লক্ষ করি। লেখক তাঁর নিজের বয়ানে ভৈরবীর রূপের বর্ণনা দেননি। দিয়েছেন গোমস্তা এককড়ি নন্দীর বয়ানে। জমিদার জীবানন্দ একদম প্রথম পরিচ্ছেদেই দুষ্ট প্রজার খোঁজ করতে গিয়ে তারাদাস এবং তার মেয়ে ষোড়শীর কথা জানতে পারে। ষোড়শীর 'কত বয়স? দেখতে কেমন?' জানতে চাইলে— "এককড়ি কহিল, বয়স তেইশ-চব্বিশ হতে পারে। আর রূপের কথা যদি বলেন হুজুর, ত সে

যেন এক কাটখোট্টা সেপাই। না আছে মেয়েলি ছিরি, না আছে মেয়েলি ছাঁদ। যেন চুয়াড়, যেন হাতিয়ার বেঁধে লড়াই করতে চলেছে"। এই হল ষোড়শীর রূপের বর্ণনা। আর কোথাও ষোড়শীর রূপের বর্ণনা পাওয়া যায়নি। এখন প্রশ্ন লেখক ষোড়শীকে এই রূপে দেখালেন কেন? আমাদের মতে ষোড়শী চরিত্রের সঙ্গে এই রূপের বর্ণনা সামঞ্জস্যপূর্ণ। ষোড়শী কঠোরতম কৃচ্ছ্রসাধন করে চলে এবং মন্দিরের শুচিতা সে রক্ষা করে নিজের জীবনে কঠোর আচার পালনের মাধ্যমে। উপন্যাসে খুব ভোরে স্নান করতে যাবার কথা আছে। আবার তার ছোটোবেলাও খুব স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে অতিবাহিত হয়নি। সমাজপতিদের বিরুদ্ধে নিরন্তর লড়াই করার জন্য, দরিদ্র নিরক্ষর প্রজাকে তার অধিকার আদায় করে দেবার জন্য, দেবী চণ্ডীর বিপুল সম্পত্তি রক্ষার জন্য 'হাতিয়ার বেঁধে লড়াই করা' চেহারাই তো প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে আমাদের মনে আসে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'মিছিলের মুখ' কবিতার সেই 'মিছিলে দেখেছিলাম একটি মুখ মুষ্টিবদ্ধ শাণিত হাত' অথবা 'সুন্দর' কবিতার সেই ভিড়ে হারিয়ে যাওয়া নারীর কথা। প্রসঙ্গ আলাদা, সময়, প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ আলাদা হলেও ষোড়শীর সঙ্গে কবির ওই নারীদের তুলনা অনর্থক নয়। ষোড়শীও সমাজের আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য লড়াই করেছে। তারই পরিণামে তো ভৈরবীর পদ থেকে তাকে সবাই তাড়াতে ব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং লেখক ষোড়শীর চরিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করেই বা লড়াকু মানসিকতার প্রতিফলন করেই তার রূপের বর্ণনা দিয়েছেন। কিন্তু তার 'চুয়াড়' রূপায়বের অন্তরালেই ছিল মানসিক সৌন্দর্য। ২২নং পরিচ্ছেদে জীবানন্দ ষোড়শীর মন্দিরের সব স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে যাওয়া প্রসঙ্গে ষোড়শীকে উদ্দেশ্য করেই বলে- "তোমার পুরুষমানুষ, আর আমার মেয়েমানুষ হওয়া উচিত ছিল;"। জীবানন্দের এই উক্তিও লেখকের ষোড়শীর রূপের বর্ণনা এবং কার্যকলাপের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ষোড়শী জীবানন্দের সংস্পর্শে এসে ভৈরবীর পদ ত্যাগ করেছে। তাকে স্বামী হিসেবে বাস্তবের জীবনে গ্রহণ করতে পারেনি। কিন্তু ভারতীয় সনাতন নারীর আদর্শে জীবানন্দকে স্বামী হিসেবে শ্রদ্ধা পোষণ করেছে। তাই দেখি চণ্ডীগড় ত্যাগ করার পূর্বে ষোড়শী জীবানন্দকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করেছে। বা উপন্যাসের একদম সূচনাতে পেটে ব্যথার জন্য জীবানন্দকে গরম জল করে দিতে দেখি। এ সবই তার স্বামীর প্রতি কর্তব্যের পরিচয়। ষোড়শীও যে অন্যান্য নারীদের মতো পতিব্রতা স্ত্রী হতে পারত তারই পরিচয় এগুলি। ভৈরবীর উচ্চ স্থান থেকে সে অন্যান্য সম্পর্কগুলিকে বিবেচনা করেনি। তাই সে নির্মলকে হাত ধরে অন্ধকার ঝড়-জলের রাস্তা পার করে দিতে পেরেছে। সে কারণেই সাগর বা তার খুঁড়ো ইত্যাদি বাউড়ি সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে সহজে মিশতে পেরেছে। পিতা তারাদাস ঘরে চাবি দিয়ে দিলে ভাঙাচোড়া পরিত্যক্ত ঘরে থাকতেও সে দ্বিধা করেনি। অর্থাৎ ভৈরবীর মতো সমাজের উচ্চস্থানে তার অবস্থান হলেও সেরূপ কোনও অহঙ্কার ষোড়শীর মধ্যে ছিল না।

সব মিলিয়ে ষোড়শী একজন ব্যক্তিত্বময়ী নারী। ৯নং পরিচ্ছেদে নির্মল ও হৈমকে ষোড়শী জানায়- " আমি স্ত্রীলোক, আমি নিরুপায়, কিন্তু আমার ভৈরবীর অধিকার একতিল শিথিল হয়নি। তাঁরা পুরুষমানুষ, তাঁদের জোর আছে, কিন্তু সেই জোরটা তাদের ষোল আনা সপ্রমাণ না করে আমার হাত থেকে কিছুই পাবার জো নেই- মাটির একটা ঢেলা পর্যন্ত না। নির্মলবাবু, আমি মেয়েমানুষ, কিন্তু সংসারে সেটাই আমার বড় অপরাধ যাঁরা স্থির করে রেখেছেন, তাঁরা ভুল করেছেন। এ ভ্রম তাঁদের সংশোধন করতে হবে"। এরকম দৃঢ় সাহসী মানসিকতা ছিল বলেই ষোড়শী প্রজাদের রক্ষা করতে পেরেছিল এবং প্রজাদের প্রিয় হয়ে উঠেছিল। গড়পড়তা ভৈরবী বা মন্দিরের পূজারীতেই শরৎবাবু তাকে সীমাবদ্ধ রাখেননি। তাকে ব্যক্তিত্বময়ী একজন নারী চরিত্র হিসেবেও দাঁড় করাতে পেরেছেন। 'শরৎ-সাহিত্যে নারী' বিষয়ে বলতে গিয়ে সমালোচকের পর্যবেক্ষণ "নারীর মনকে তিনি দেখিয়াছেন একটি সংঘাতের মধ্য দিয়া যেখানে তাহার স্বতঃস্ফূর্ত আকাঙ্খার ধারা বাধা পাইয়াছে চিরাগত সংস্কারের পাষাণ

প্রাচীরে"। [শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, *শরৎচন্দ্র*, ১৩৬৮, পৃ. ৩০] ষোড়শী সম্পর্কেও একথা সম্পূর্ণভাবে প্রযোজ্য। ষোড়শী এবং অলকার দ্বন্দ্ব শরৎচন্দ্র এই উপন্যাসে সফলভাবেই চিত্রিত করেছেন।

গল্প-উপন্যাসে নারী-চরিত্রগুলির মধ্যে যে কাহিনির কেন্দ্রবিন্দুতে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত থাকে বা কাহিনিকে নিয়ন্ত্রণ করে তাকেই নায়িকা বলা হয়। সুতরাং নায়িকা চরিত্র কাহিনির অন্যান্য নারী চরিত্রগুলোর তুলনায় কিছু বিশেষত্ব নিয়েই উপস্থিত হবে। সেক্ষেত্রে এসব গুণ বিচার করে 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসের প্রধানা নারী চরিত্র হল ষোড়শী। ষোড়শীকে কেন্দ্র করেই উপন্যাসের সূত্রপাত এবং তাকে কেন্দ্র করেই উপন্যাসের ঘটনাবলী নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। তার ব্যক্তিত্বই উপন্যাসকে বা উপন্যাসের ঘটনাকে একটি নির্দিষ্ট অভিমুখে টেনে নিয়ে গেছে। সুতরাং ষোড়শীকে 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসের প্রধান নারী চরিত্র বা নায়িকা হিসেবে আমাদের স্বীকার করে নিতে হয়।

১১.৩ জমিদার জীবানন্দ চৌধুরীর চরিত্র চিত্রণ

জীবানন্দ চৌধুরী এই উপন্যাসের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। চরিত্রটি বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ। ঔপন্যাসিক সূচনাতেই এই চরিত্রের বর্ণনা দিয়েছেন- "অত্যাচারী বলিয়া বীজগাঁয়ের জমিদার-বংশের চিরদিনই একটা অখ্যাতি আছে; কিন্তু বৎসরখানেক পূর্বে অপুত্রক জমিদারের মৃত্যুতে ভাগিনেয় জীবানন্দ চৌধুরী যেদিন হইতে বাদশাহী লাভ করিয়াছেন, সেদিন হইতে ছোট-বড় সকল প্রজার জীবনই একেবারে দুর্ভর হইয়া উঠিয়াছে। জনশ্রুতি এইরূপ যে, ভূতপূর্ব ভুস্বামী কালীমোহনবাবু পর্যন্ত এই লোকটির উচ্ছৃঙ্খলতা আর সহিতে না পারিয়া তাহাকে ত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন,"। জমিদারি ব্যবস্থার ইতিহাসে আমরা দেখেছি জমিদার মাত্রই অল্প-বিস্তার অত্যাচারী বা প্রজাশোষক। বীজগাঁয়ের জমিদাররাও এর ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু জীবানন্দ এ বিষয়ে এমনই মাত্রাছাড়া ছিল যে তাকে পূর্বতন জমিদার ত্যাগ করবার সঙ্কল্প পর্যন্ত করেছিলেন। কিন্তু জীবানন্দের এ বিষয়ে কোনো অনুতাপ বা অনুশোচনা নেই। সে নিজে জানে যা সে করছে তা অন্যায়। কিন্তু নিজের অন্যায়কে সে জমিদারি শাসন দিয়ে ন্যায় বলে চালাতে চায়নি। এখানেই জীবানন্দ ব্যতিক্রম। সে যা চায় তা ছিনিয়ে নিতে চায়। এটাই তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে জীবানন্দ আমাদের শরৎচন্দ্রেরই 'গৃহদাহ'(১৯২০) উপন্যাসের সুরেশের কথা মনে করিয়ে দেয়। সুরেশও যা চেয়েছে ছিনিয়ে নিতে চেয়েছে। বন্ধু মহিমের কথা ভেবে সে বন্ধু-পত্নী অচলার থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয়নি। এই একই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে-বাইরে'(১৯১৬) উপন্যাসের সন্দীপের মধ্যেও দেখা গেছে। যা চেয়েছে সে ছিনিয়ে নিয়েছে। প্রয়োজনে অন্যায় পথ অবলম্বন করতেও দ্বিধা করেনি। জীবানন্দও অন্যায় জেনেও স্বামীগতপ্রাণার দেহভোগ করতে কুণ্ঠাবোধ করেনি। প্রজার উপর অতিরিক্ত খাজনা চাপিয়ে নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিতে সে দ্বিধাবোধ করেনি।

জীবানন্দ প্রজা শোষণ করে যে অর্থ আদায় করে তা কিন্তু জমিদারির আয় বৃদ্ধির জন্য নয়। সে ভোগী মানুষ। তার ভোগের চাহিদা মেটাতেই তাকে ধার পর্যন্ত করতে হয়। তাই তাকে বাদুড় বাগানের মেসে থাকার সময় অলকার মায়ের কাছ থেকে একশত টাকা ধার করতে হয়। তার ব্যক্তিগত সচিব প্রফুল্লর কথাতেও আমরা জানতে পারি তার চতুর্দিকে ধার-কর্জ হয়ে আছে। সেই ধার শোধের জন্যই চণ্ডীগড়ে এসে দশ হাজার টাকা প্রজাদের কাছে আদায় করতে চায়। জীবানন্দ গোমস্তা এককড়ি নন্দীকে নির্দেশ দেয়- "হাজার-পাঁচেক? বেশ আমি দিন-আষ্টেক আছি, তার মধ্যে হাজার-দশেক টাকা চাই" (১ম পরিচ্ছেদ)। এই টাকা আদায় করতে গিয়েই উপন্যাসে ষোড়শীর আবির্ভাব এবং জটিলতার সূত্রপাত। পঞ্চম পরিচ্ছেদে ম্যাজিস্ট্রেটের হাত থেকে বাঁচিয়ে দিলে জীবানন্দ ষোড়শীর কোনো না কোনোভাবে উপকার করতে চায়। ষোড়শী তা নিতে অস্বীকার করে। তখন জীবানন্দের নিজের চরিত্র

সম্পর্কে স্বীকারোক্তি- " আমার ঢের দোষ আছে, কিন্তু পরের উপকার করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ি, এ দোষ আজও কেউ আমাকে দেয়নি। তা ছাড়া এখন বলচি বলেই যে ভালো হয়েও বলবো, তারও কোনও নিশ্চয়তা নেই- এমনই বটে"। নিজের সম্পর্কে স্পষ্ট স্বীকারোক্তি তার চরিত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। সে যে সতীর সতীত্ব নাশ করে এবং এ বিষয়ে তার কোনো অপরাধ বোধ নেই তাও দ্বিধাহীনভাবে ষোড়শীর কাছে স্বীকার করেছে। এ বিষয়ে সমালোচক সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত বলেছেন- " তাহার সমস্ত পাপাচারের মধ্যে কোথাও সঙ্কোচ নাই, লজ্জা নাই, লুকাইবার ইচ্ছা নাই। নিজের কৃতকর্মের সে নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক; কারণ তাহার ধর্মাধর্মবোধ নাই"। [সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, 'শরৎচন্দ্র', ১৩৬৮, পৃ. ৭৩] অর্থাৎ তার মধ্যে অন্যায়কে গোপন করার বা মিথ্যে ছলনা করার কোনো লক্ষণ নেই। তার পাপবোধ নিয়ে কোনো অপরাধবোধ নেই। জীবানন্দ কিছু পড়াশুনা করেছিল তারও প্রমাণ শরৎবাবু দিয়েছেন। ১৮নং পরিচ্ছেদে ষোড়শীর ঘরে এসে জীবানন্দ তামাক চায়। তামাক না পেয়ে জীবানন্দ ষোড়শীকে বঙ্কিমচন্দ্রের 'দেবী চৌধুরাণী'(১৮৮৪) উপন্যাসের ব্রজেশ্বরের অম্বুরী তামাক খাওয়ার উদাহরণ দিয়েছে।

অপরাধীও একজন মানুষ। একজন মানুষ সম্পূর্ণরূপে খারাপ বা ত্রুটিপূর্ণ কখনও হতে পারে না। তাই অলকার পরিচয় পেয়ে তার ভেতরটাও নরম হয়েছে। তার ভেতরেও সংসার তৈরির সাধ জেগেছে। ১৮নং পরিচ্ছেদে জীবানন্দ অলকার কাছে কিছু খেতে চাইলে অলকা জিজ্ঞাসা করে- " আপনি সারাদিন খাননি, আর বাড়িতে আপনার খাবার ব্যবস্থা নেই, এ কি কখনো হতে পারে?" এর প্রত্যুত্তরে জীবানন্দ বলে- " আমি খাইনি বলে আর একজন উপোস করে থালা সাজিয়ে পথ চেয়ে থাকবে, এ ব্যবস্থা ত করে রাখিনি"। অর্থাৎ তার মনেও কোথাও সংসারের স্বপ্ন ছিল বা কেউ যে তার জন্য অপেক্ষা করবে তা জীবানন্দও চাইত। অলকাকে তাই বারবার তার সঙ্গে জড়াতে চেয়েছে। অলকা যখন চণ্ডীগড় চিরতরে ত্যাগ করে যেতে প্রস্তুত তখন জীবানন্দ বলেছে ২৪নং অধ্যায়ে- " এখন কেবল এই কথাই আমার সমস্ত মন ছেয়ে আছে অলকা, কি করলে তোমাকে একটা দিনও ধরে রাখতে পারি"। এরপরে যতদিন গেছে অত্যাচারী জীবানন্দ ক্রমাগত নিজেকে পরিবর্তন করেছে। এমনকি নিজের অপরাধ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে স্বীকার করতেও প্রস্তুত হয়েছে। এতে যে তার শাস্তি প্রাপ্য হবে তা ব্যারিস্টার নির্মল বসু তাকে বলেছে। কিন্তু জীবানন্দ তার এই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেনি। প্রজাদের জন্য সমস্ত কিছু বিলিয়েও দিতে চেয়েছে। এখানেই জীবানন্দ চরিত্রটি অনেক বেশি সজীব, অনেক বেশি জীবন্ত। অর্থাৎ জীবানন্দ চরিত্রকে আগাগোড়া একই সরলরেখা দিয়ে চিহ্নিত করা যায় না। তার মধ্যে পর্বান্তর আছে। তার এই পর্বান্তর উপন্যাসে আগাম অনুমান করা যায় না।

জীবানন্দের মধ্যে পাপ-পুণ্য বোধও ছিল। ষোড়শীর কাছে তার পাপের কথা বারবার স্বীকার করেছে। তাই হয়তো প্রায়শ্চিত্ত করতে চেয়েছে। তাই প্রজাদের সঙ্গে মাঠে নেমে তাকে কাজ করতেও দেখা গেছে। উপন্যাসের একেবারে শেষ অংশে ২৮নং পরিচ্ছেদে তার অলকা তাকে হাত ধরে চণ্ডীগড় থেকে নিয়ে যেতে এসেছে। তখন "জীবানন্দ তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া ধীরে ধীরে কহিল, কিন্তু আমার প্রজারা? তাদের কাছে আমাদের পুরুষানুক্রমে জমে থাকা ঋণ?" পাঠক ভাবুন উপন্যাসের সূচনায় এই জীবানন্দকে আমরা কী হিসাবে দেখেছিলাম। একটা আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে জীবানন্দের চরিত্রের মধ্যে। যে সতী নারীর ধর্ম নাশ করতেই এতদিন অভ্যস্ত ছিল সে এখন অন্য মানুষ। যে জীবানন্দ প্রজার সম্পত্তি গ্রাস করতেই এতদিন ব্যস্ত ছিল সে এখন পুরুষানুক্রমে সেই ঋণ শোধ করতে বদ্ধপরিকর। যে ষোড়শীকে একদিন অপমান করাই তার ধর্ম ছিল, সেই ষোড়শীর হাত ধরেই জীবানন্দ নতুন জীবনের পথে পা বাড়িয়েছে। এখানেই জীবানন্দের চরিত্রের সজীবতা। যে কে সাহেবের হাত থেকে বাঁচতে সে একদিন ষোড়শীর আশ্রয় নিয়েছিল, সেই কে সাহেবের কাছে উপন্যাসের শেষে সে নিজেই ধরা দিতে চেয়েছে।

এখানেই জীবানন্দ চরিত্রের বৈচিত্র্য।

আমরা আগেই বলেছি শরৎ-সাহিত্যে জীবানন্দের সমগোত্রের চরিত্র 'গৃহদাহ' উপন্যাসের সুরেশ। দুজনেই বেশ সক্রিয় চরিত্র। নিজের চাহিদার বিষয়টি এরা কেড়ে নিতে জানে। দুজনেই প্রথমে পাপাচারে লিপ্ত থেকেছে। সুরেশ বন্ধুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে বন্ধুর বাগদত্তাকে নিজের প্রেমের জালে আবদ্ধ করার জন্য। জীবানন্দকে বিশ্বাসঘাতক বলা যাবে না, সে যা করেছে মাথা উঁচু করে জোর গলায় করেছে। উপন্যাসের শেষে জীবানন্দ নিজেকে পরিবর্তন করে জীবনের কাছে ফিরে এসেছে প্রবলভাবে। তাই প্রজাদের উপকারে সে মাঠে নেমেছে। অলকার হাত ধরে নতুন করে বাঁচতে চেয়েছে। আর সুরেশ জনসেবায় নিজেকে নিয়োজিত ক'রে কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ দিয়েছে। শরৎচন্দ্রের এই দুই চরিত্রই উপন্যাসে সজীব এবং জীবন্ত। দুজনেই উপন্যাসের শেষে নিজেদেরকে জনসেবায় নিয়োগ করেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে পাপীকে শাস্তি দেওয়ার বিধান বা প্রায়শ্চিত্ত ইত্যাদি আমরা 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসে রোহিণী বা 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে শৈবলিনী চরিত্রের ক্ষেত্রে দেখেছি। কিন্তু শরৎচন্দ্রও জীবানন্দ এবং সুরেশ দুজনকে দিয়েই সমাজসেবা করিয়ে কি প্রায়শ্চিত্ত করাতে চাইলেন? লেখক এভাবেই কি তাদের পাপের বা অন্যায়ের শাস্তি দিলেন? এও লক্ষণীয় ভৈরবী তখনই জীবানন্দের হাত ধরে নিয়ে গেছে, যখন জীবানন্দের চিত্তশুদ্ধি ঘটেছে, যখন তার মধ্যে প্রজাদরদী মনের পরিচয় পাওয়া গেছে। তার আগে ভৈরবী অর্থাৎ পবিত্রতার মূর্ত প্রতীক জীবানন্দের অনুরোধ সত্ত্বেও তার হাত ধরেনি বা একসঙ্গে নীড় বাধার অনুরোধ উপেক্ষা করেছে। জীবানন্দের পরিবর্তনের পরেই ষোড়শী তার হাত ধরেছে। যদিও সেক্ষেত্রে জনার্দন রায়কে ম্যাজিস্ট্রেটের হাত থেকে বাঁচানোর একটা কারণও যুক্ত ছিল।

আবার জীবানন্দের মধ্যে একটা বৈরাগ্যের বোধও ছিল বলা যায়। জীবানন্দ প্রজাদের উপর অত্যাচার করেছে কেবলমাত্র টাকার জন্য। সেই টাকায় তার মদের খরচ মিটিয়েও বাজারে ধার ছিল। ১৩নং অধ্যায়ে জীবানন্দের ব্যক্তিগত সচিব প্রফুল্ল-জীবানন্দের কথোপকথনের সময় জীবানন্দ বলে- " কি বলেন সাহেব, ডিক্রি জারি করবেন, না এই রাজবপুখানি নিয়ে টানাহেঁচড়া করবেন- জানাচ্চেন? আঃ- সেকালের ব্রাহ্মণ্যতেজ যদি কিছু বাকী থাকতো তো এই ইউদি-বেটাকে একেবারে ভস্ম করে দিতাম। মদের দেনা আর শুধতে হত না"। অর্থাৎ ধার শোধ করাই তার মূল চাহিদা ছিল। তাই অলকার সংস্পর্শে এসে সহজেই সে নিজেকে বদলে নিয়েছে। সবকিছু সে অনায়াসে ত্যাগ করতে পেরেছে। শুধু তাই নয় বংশানুক্রমে সে তাদের জমিদার বংশের ঋণ শোধ করতে চেয়েছে। এই বৈরাগ্য কিন্তু ষোড়শীর মধ্যেও ছিল। ভৈরবী হবার নীতগত প্রাথমিক শর্তই তো হল মর্ত্যজীবনের লোভ-লালসা, কামনা-বাসনা ত্যাগ করতে হবে। ভৈরবী ষোড়শীকে উপন্যাসের আগাগোড়াই আমরা কোনোকিছুর প্রতি আসক্ত হতে দেখিনি। তাই ভৈরবী পদ সে সহজেই ত্যাগ করে কুষ্ঠ আশ্রমের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেছে। অর্থাৎ ষোড়শী-জীবানন্দ দুজনের মধ্যেই বৈরাগ্য এবং সেবা করার একটা বীজ নিহিত ছিল। তাই শেষপর্যন্ত সেবার পথেই দুজনের মেলবন্ধন ঘটে। এ বিষয়ে কবিশেখর কালিদাস রায় বলেছেন- " জীবনে প্রথম ভালোবাসা পাইল অলকার কাছেই, জীবনে প্রথম ভালোবাসিল অলকাকেই। কল্যাণী নারী হস্তের সেবা, জীবনে সে পায় নাই। এই প্রেমই একটা নরপশুকে দেবতায় পরিণত করিল। রূপের আকর্ষণে ইহা নয়, ইহা প্রেমই, পবিত্র দাম্পত্যজীবনের জন্য আকুল আকাঙ্ক্ষা"। [কবিশেখর কালিদাস রায়, 'দেনাপাওনা', "শরৎ-সাহিত্য", বুকস ওয়ে, ২০০৯, পৃ. ১৪৩।] জীবানন্দের জীবনে প্রেমের পথেই সেবার ব্রত এসেছে।

পুরুষ চরিত্রগুলোর মধ্যে জীবানন্দ অবশ্যই প্রধান— উপন্যাস পাঠের পর এ বিষয়ে পাঠকের কোনো সন্দেহ থাকে না। পুরুষ চরিত্রগুলোর মধ্যে উপন্যাসে জীবানন্দের ব্যক্তিত্ব অনস্বীকার্য। উপন্যাসে সমস্যার সূত্রপাত তার

মাধ্যমেই হয়েছে বা তার ব্যক্তিগত চাহিদা পূরণের স্বার্থেই উপন্যাসে সমস্যার সূচনা হয়েছে। নায়িকা যোড়শীকে কেন্দ্র করে জীবানন্দ আবর্তিত হয়েছে উপন্যাসের সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত। সবদিক বিচার করে বলা যায় জীবানন্দ চৌধুরী 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসের নায়ক চরিত্র।

১১.৪ ব্যারিস্টার নির্মল বসু ও তার স্ত্রী হৈমবতী

নির্মল ও হৈম সম্পর্কে স্বামী-স্ত্রী। উপন্যাসের মূল পাত্র-পাত্রী যোড়শী-জীবানন্দের সঙ্গে এদের যোগ আছে। এখন এদের চরিত্র বিচার করা যাক—

উপন্যাসে নির্মলের প্রবেশ চণ্ডীগড়ের মহাজন জনার্দন রায়ের জামাই এবং যোড়শীর বান্ধবী হৈমর স্বামী হিসেবে। যোড়শীর ভৈরবীত্ব নিয়ে সমস্যার সূত্রপাত থেকে নির্মল উপন্যাসে চরিত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। প্রথমে নির্মল এই সমস্যাকে গুরুত্ব দেয়নি। পরে হৈমকে সঙ্গে নিয়ে যোড়শীর সঙ্গে দেখা করে। তারপরে একা-একাই যোড়শীর সঙ্গে দেখা করেছে। যেদিন ঝড়-জলের রাতে যোড়শী নির্মলকে হাত ধরে পথ পার করে দিয়েছিল সেদিনই যোড়শীর প্রতি নির্মলের দুর্বলতা তৈরি হয়। আসলে যোড়শীর ব্যক্তিত্ব নির্মলকে দুর্বল করে। গ্রামের একজন ভৈরবী অন্ধকারে একাকী একজন প্রায় অপরিচিত এক পুরুষ মানুষের হাত ধরে রাস্তা দেখাচ্ছে এতে মুগ্ধ হওয়াটাই স্বাভাবিক। কারণ সমাজে নারী-প্রগতি তখনও খুব একটা হয়নি। সেদিন বাড়ির কাছাকাছি এসে নির্মল যোড়শীর হাত ছাড়ার আগে "ধরা-হাতটির উপর আর একটুখানি চাপ দিয়া ছাড়িয়া দিয়া" (৯নং পরিচ্ছেদ) ছিল। তারপরে নির্মল ক্রমে ক্রমে যোড়শীর ঘনিষ্ঠ হতে সচেষ্ট হয়েছে।

যোড়শীকে ব্যারিস্টার হিসেবে সাহায্য করতে চেয়েছিল নির্মল। তাও তার স্ত্রীর পরামর্শে। কিন্তু সে যে যোড়শীর প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় ২২নং পরিচ্ছেদে যখন যোড়শী তার সর্বস্ব জীবানন্দের হাতে তুলে দিয়েছে তার পর্ণকুটিরে— "নির্মল একমুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, আমাকে আর বোধ হয় কোন আবশ্যক নেই?" অর্থাৎ যোড়শীর জন্য আইনি সহায়তা ছাড়াও কোনও কাজে তার প্রয়োজন আছে কিনা নির্মল জানতে চেয়েছে। এটা নির্মলের অভিমান থেকে প্রশ্ন। কারণ এরপর যোড়শীর কাছে আসার আর কোনও সুযোগ রইল না তার কাছে। যোড়শীও নির্মলের এই দুর্বলতা বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু তা সে উপেক্ষা করেছে। অর্থাৎ নির্মলের মধ্যে বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অভাব দেখা যায়। স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও সে অন্য নারীর প্রতি আসক্ত হয়েছে। যদিও আসক্তির স্পষ্ট কোনো চিহ্ন উপন্যাসে নেই। কিন্তু তার মনের দূরতম কোণে এর আভাসটুকু বোধ হয় দেখা গেছে। নির্মল যোড়শীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে চিঠি পেয়ে। ২০নং পরিচ্ছেদে নির্মল যোড়শীর ঘরের কাছে আসলে বলে— " যে এতদূর থেকে টেনে আনতে পারে, সে এটুকুও নিয়ে যেতে পারবে"। এই কথা শোনার পর নির্মলের মনের ভাবনা— " তাহাকে অনেক ভাবিয়াছে- কর্মের মধ্যে, বিশ্রামের মধ্যে এই যোড়শীকে সে চিন্তা করিয়াছে— সমস্ত অন্তর রসে ভরিয়া উঠিয়াছে, নির্মল অন্তরের একপ্রান্তে যেমন বেদনা বোধ করিল, তেমনি আর একপ্রান্তে তাহার কি একপ্রকার কলুষিত আনন্দে একনিমেষে পরিপ্লুত হইয়া গেল"। অর্থাৎ যোড়শী নির্মলের মনে বেশ ভালোভাবেই বাসা বেঁধেছিল। এ তো নির্মলের চারিত্রিক দুর্বলতা। তার এই দুর্বলতা স্ত্রী হৈম এবং অন্যান্যদের কাছে প্রকাশিতও হয়েছে। নাহলে শ্বশুরবাড়ির অঞ্চলের কোনো এক ভৈরবীর জীবনে কী দুর্বিপাক হয়েছে এবং তাও শ্বশুরের বিরুদ্ধে গিয়ে তাকে সাহায্য করার জন্য দূরদেশ থেকে একজন স্বনামধন্য ব্যারিস্টার বারবার ছুটে আসবে কেন!

নির্মলের যোড়শী-বিষয়ক মনের স্পষ্ট স্বীকারোক্তি পাওয়া যায় ২৭নং পরিচ্ছেদের প্রথম অনুচ্ছেদেই। সেখানে তাকে অনুশোচনা করতে দেখা যায় তার এই মানসিক দুর্বলতার জন্য। এমনকি হৈমর কাছ থেকে এইসব বিষয় যে গোপন করতে হবে তাও তাকে পীড়া দিয়েছে। এখানে হৈমকে সে যে প্রকৃতই ভালোবাসত তার প্রমাণ পাওয়া যায়। নির্মল শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত নেয় যে যোড়শী 'চরিত্রহীনা' তাই 'একদিন মন তাহার আসক্ত হইয়াছিল'। নির্মল ঠিক করে সে আর কোনোদিন চণ্ডীগড়ে পা দেবে না। নির্মল অনেক মানুষকেই বিপদের সময় সাহায্য করে থাকে। কারণ ২১নং পরিচ্ছেদে জনার্দন রায়ের বাড়িতে শিরোমণি মশায় জানতে চায় কোন গরজে নির্মল যোড়শীকে সাহায্য করছে। নির্মল তখন বলে- " আমি যেখানে থাকি সেখানে যদি একবার খোঁজ নেন ত শুনতে পাবেন, জীবনে অনেক গরজই আমি মাথায় তুলে নিয়েচি"। সতরাং তার মধ্যে একটা পরোপকারী মানসিকতাও ছিল। সেইকারণেই সে যোড়শীকেও হৈমর অনুরোধে সাহায্য করতে গিয়েছিল। দ্বিধাবোধ করেনি।

হৈমবতী :

হৈম এই উপন্যাসের কাহিনিকে কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণ করেনি। বলা যায় তার উপস্থিতি টুকুই উপন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। অন্তত যোড়শী হৈম-নির্মলের সুখী দাম্পত্যজীবন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে বলে স্বীকার করেছে। এটুকুই উপন্যাসে তার ভূমিকা।

হৈমকে উপন্যাসে খুব অল্প অংশেই দেখা যায়। যখন সকলেই যোড়শীকে দোষী সাব্যস্ত করতে ব্যস্ত, তখন একা হৈম তার ছেলের আশীর্বাদী পুজো তাকে দিয়েই করাতে চেয়েছে। অর্থাৎ সে তার বিশ্বাসে অচল থেকেছে। সপ্তম পরিচ্ছেদে হৈম শিরোমণি এবং নিজের পিতাকে উদ্দেশ্য করে বলে- "আমি ওকে দিয়েই পুজো করাবো; এতে আমার ছেলের কল্যাণই হোক আর অকল্যাণই হোক"। এমনকি তার বাবা এবং গ্রামের অন্য মাতব্বররা সবাই যখন যোড়শীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে ব্যস্ত, তখন হৈম তার স্বামী ব্যারিস্টার নির্মলকে বলেছে যোড়শীকে সাহায্য করতে। এখান থেক হৈমর উদার মনের পরিচয় পাওয়া যায়। অর্থাৎ হৈমর মধ্যে একটা প্রতিবাদী সত্তা ছিল। অন্যায়ের প্রতিবাদ সে করতে চেয়েছে। কিন্তু সমাজের প্রবল মাথাদের বিরুদ্ধে গিয়ে সরাসরি সেই প্রতিবাদে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেনি। কারণ তার পিতাই ছিল প্রবল প্রতিপক্ষদের একজন। তবে সপ্তম পরিচ্ছেদে সবাই যখন যোড়শীর মুখ দিয়েই তার মায়ের চারিত্রিক দোষের কথা বলাতে চাইছে, তখন "হৈম দ্রুতপদে তাহার কাছে আসিয়া হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া শান্ত দৃঢ়স্বরে বলিল না, আপনি কিছুতেই কোন কথা বলবেন না। পিতার মুখের প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, আপনারা ওঁর বিচার করতে চান নিজেরাই করুন, কিন্তু ওঁর মায়ের কথা ওঁর নিজের মুখ দিয়ে কবুল করিয়ে নেবেন, এতবড় অন্যায় আমি কোনোমতে হতে দেব না"। এতবড়ো প্রতিবাদ উপন্যাসে আর কাউকে করতে দেখা যায়নি। স্বয়ং যোড়শীও নিজের উপর হওয়া অন্যায়ের প্রতিবাদ করেনি। হৈম নিজের পিতা এবং সমাজপতিদের সকলের সামনে এই প্রতিবাদ করেছে। লক্ষণীয় লেখক হৈমর প্রতিবাদ বোঝাতে বলেছেন ব্যবহার করেছেন 'শান্ত দৃঢ়স্বরে' এবং 'তীব্র দৃষ্টিপাত' শব্দ সমষ্টি। আবার হৈম একজন নারী হয়ে আর একজন নারীর অপমান মেনে নিতে পারেনি। সেইসঙ্গে আর একজন অনুপস্থিত নারীকেও অপমানের হাত থেকে রেহাই দিয়েছে। সে হল যোড়শীর মৃত মা। সুতরাং হৈমকে লেখক সম্পূর্ণ গৃহবধূ হিসেবে আঁকেননি। প্রতিবাদী সত্তাও তার মধ্যে আরোপ করেছেন। তবে এসবের মূলে ছিল হৈমর বিশ্বাস। সে নির্দ্বিধায় যোড়শীকে বিশ্বাস করেছে। তাই সর্বসমক্ষে যোড়শীকে অপমানের হাত থেকে বাঁচাতে মন্দিরের সভা থেকে জোর করে ঠেলে বের করে নিয়ে আসে। এই মন্দিরের সভাতে যোড়শীর বিচারসভায় হৈমর স্বামী নির্মল উপস্থিত ছিল। অর্থাৎ তার স্বামীর উপস্থিতিতেই যোড়শীর সঙ্গে শিরোমণি, জনার্দনরা অনভিপ্রেত আচরণ করে। এজন্য হৈম ফকির সাহেবের

কাছে ক্ষমা চায় এবং তার কুটিরে গিয়ে দেখা করতেও চায়। যা হৈমর চরিত্রের বিশেষ গুণ। ব্যারিস্টারের স্ত্রী হিসেবে এবং মহাজনের মেয়ে হিসেবে সমাজের উপর তলাতে তার অবস্থান হলেও মাটিতে পা দিয়েই সে চলেছে। কোনোরকম অহঙ্কার তার মধ্যে দেখা যায়নি।

এখন প্রশ্ন হল যোড়শীর প্রতি হৈমর এরকম অচলা ভক্তি বা বিশ্বাসের কারণ কী? এর উত্তরও লেখক উপন্যাসে দিয়েছেন। সপ্তম পরিচ্ছেদে লেখক জনার্দন রায়ের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন মন্দির প্রাঙ্গণে যে পাঠশালা বসে সেখানে হৈমও একসময় পড়তে আসত এবং সেই সময় থেকেই হৈম যোড়শীকে ভৈরবী হিসেবে চেনে এবং সেই হিসেবেই তাকে শ্রদ্ধা করে এসেছে। সকলের বিশ্বাস এবং হৈমর নিজেরও বিশ্বাস এই দেবীর কৃপাতেই এত বড়ঘরে তার বিয়ে হয়েছে। হৈমর যোড়শীর প্রতি আরও ভক্তির কারণ "হতাশ হইয়া হৈম বিদেশে এই দেবীকেই মানত করিয়া পুত্রলাভ করিয়াছে"। সব মিলিয়ে হৈমর বর্তমান সুখী জীবনের কারণ এই দেবী চণ্ডী ও তার ভৈরবী। এছাড়াও আগের ভৈরবীদের যে চারিত্রিক ত্রুটি ছিল তা যোড়শীর ছিল না। এইসব কারণেই হৈম যোড়শীকে উপন্যাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করেছে বা তার পাশে দাঁড়িয়েছে।

নির্মল বারংবার যোড়শীর কাছে গেলেও হৈম তা নিয়ে স্বামীর উপরে অবিশ্বাস বা সন্দেহ পোষণ করেনি। সে সরল মনেই সবকিছু গ্রহণ করেছে। আবার উপন্যাসের শেষে দেখি হৈম তার পিতা জনার্দন রায়কে ম্যাজিস্ট্রেটের হাত থেকে বাঁচাতে যোড়শীর কাছে গেছে সাহায্য চাইতে। এ বিষয়েও হৈমর মধ্যে কোনো দ্বিধা দেখা যায় না। চিঠি বিতর্কে যোড়শীর সঙ্গে নির্মলকে জড়িয়ে যে রটনা গ্রামে চলছিল তা যে হৈমর কানে যায় নি তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। এসব জেনেও হৈম যোড়শী বা তার স্বামী কাউকেই সন্দেহ বা ঘৃণা করেনি। আর এখানেই চরিত্রের বিচার করতে গিয়ে তাকে সরল চরিত্র (flat character) বলা যায়।

নির্মলকে যোড়শী ঝড়-জলের অন্ধকারে হাত ধরে রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে এসেছে। নির্মল সেই সন্ধ্যার বর্ণনা দিয়ে বলে ভৈরবীকে সে ঠিক বুঝতে পারেনি। তার সবকিছুই যেন রহস্যে মোড়া। হৈম জানতে চায়- "তোমার জেরাও মানলে না, বন্ধুত্বও স্বীকার করলে না? নির্মল কহিল, না, কোনোটাই হল না। হৈম এবার হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, একটুও না? তোমার দিক থেকেও না?" স্বামীর প্রতি এই সন্দেহ প্রকাশ করার জন্য পরের দিন হৈম নিজেই লজ্জা পেল এবং নিজেকেই দোষী সাব্যস্ত করল। শুধু তাই নয়, স্বামীকে অন্ধকার রাতে পথ দেখিয়ে সাহায্য করার জন্য যোড়শীর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং পায়ের ধুলো পর্যন্ত নিতে চায়। এখানেই হৈমর চরিত্রের মহত্ত্ব। উপন্যাসে কেউ না কেউ ক্ষণিকের জন্য হলেও ভৈরবীর কলঙ্কে বিশ্বাস করেছে বা সন্দেহ করেছে, কিন্তু হৈম এরকম সন্দেহ পর্যন্ত করেনি। তার এই স্থির বিশ্বাসের জোরের কারণ হল " হৈম কহিল, যে যাই বলুক, আমি কিন্তু নিশ্চয়ই জানি তিনি নির্দোষী। চণ্ডীর এমন ভৈরবী আর কখনো ছিলে না। তাঁর দয়াতেই ছেলের মুখ দেখতে পেয়েচ, তা জানো?"(১৭নং পরিচ্ছেদ) হৈমর এই দৃঢ় বিশ্বাস কখনও ভৈরবীকে সন্দেহের চোখে দেখতে দেয়নি। এমনকি স্বামীকে নিয়ে মনে সন্দেহ জাগলেও তাকে তৎক্ষণাৎ দূরে সরিয়ে দিয়েছে। সে সকলের উপর সবসময় বিশ্বাস রেখেছে, তাই উপন্যাসে তার মানসিক দ্বন্দ্বও সর্বাপেক্ষা কম। আর অসহায় ভৈরবীকে সাহায্য করার জন্য সে সবসময় সচেষ্ট থেকেছে। হৈমর মনের এই বিশ্বাসের জোরের কারণেই সে উপন্যাসের শেষে নিজের অপরাধী বাবাকে বাঁচাতে যোড়শীর শরণাপন্ন হতে পেরেছে। সবমিলিয়ে হৈমকে লেখক উপন্যাসে একটি সরল চরিত্র হিসেবেই দাঁড় করিয়েছেন।

১১.৫ মহাজন জনার্দন রায়

জনার্দন রায় উপন্যাসে মহাজন চরিত্র হিসেবে উপস্থাপিত। গ্রামীণ মহাজনের চরিত্র যেরকম হয় জনার্দন রায় তাদেরই প্রতিনিধি মাত্র। 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসেও এ ধরনের চরিত্র আছে। কিন্তু আমাদের আলোচ্য উপন্যাসে জনার্দন রায় মহাজনের পাশাপাশি কন্যা হৈমবতীর পিতা। এখানেই শরৎচন্দ্র দ্বন্দ্ব তৈরি করার সুযোগ পেয়েছেন। কন্যা হৈমর সঙ্গে সঙ্গে এসেছে জামাই নির্মল। ফলত জনার্দন চরিত্রে দ্বন্দ্ব যেমন এসেছে, একইভাবে উপন্যাসও জমে ওঠে।

জনার্দন মহাজনের সমস্ত গুণাবলী নিয়েই উপন্যাসে উপস্থিত হয়েছে। সুদের কারববার করেই তার সম্পত্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। আর জমিদারের গোমস্তা এককড়ি নন্দী তার সাহায্যকারী। জমিদার কালেভদ্রে গ্রামে দর্শন দেন। বাকি সময়টুকু জনার্দন-এককড়ি-শিরোমণি নিজেদের উদরপূর্তির জন্য যা যা করার তা করে থাকে। তাই বর্তমান ভৈরবী থাকায় দরিদ্র কৃষকের জমি আত্মসাৎ করায় অসুবিধা হচ্ছে বলে তার বিরুদ্ধে কলঙ্ক রটনা বা ষড়যন্ত্র করতে পিছপা হয়নি। অথচ মাতঙ্গী ভৈরবীর ব্যভিচারী জীবন জানা থাকা সত্ত্বেও তাকে মন্দির থেকে সরানোর কোনো চেষ্টা করেনি। কারণ মাতঙ্গী ভৈরবী গোমস্তা এককড়ি বা মহাজন জনার্দন রায়ের অন্যায় কাজে বাঁধা দেয়নি। কোথাও প্রলোভন দেখিয়ে, কোথাও অত্যাচার করে কৃষকের জমি জনার্দন রায় দখল করেছে। কোনোরকম পাপাচারের তোয়াক্কা করেনি। কিন্তু সেই জনার্দনই আবার ভৈরবীর পাপাচারের বিচার করতে বসেছে। নিজের স্বার্থের ব্যাপারে তার ধর্মাধর্মের বোধ কাজ করে না। এরকম একজন চরিত্র জনার্দন।

জনার্দনের অর্থের জোরে বা তার লোকবলের কারণে তাকে গ্রামের সকলেই ভয় করে। শুধু তাই নয়, তার কূটবুদ্ধিও সবার আগে চলে। জমিদার জীবানন্দও তাকে ভয় করে। কারণ মহাজন সহায় না হলে জীবানন্দের হিসেব বহির্ভূত টাকা আদায় করাও সম্ভব হবে না। আবার সরকারের ঘরে বকেয়া খাজনার যোগান জনার্দনের মতো জমিদাররাই দিত। জনার্দনের জমির পরিমাণ ছিল প্রায় দুশো বিঘা। এছাড়াও নানারকম ব্যবসা জনার্দনের ছিল। দেবোত্তর সম্পত্তি নিজের নামে করার জন্য নানারকম ফন্দি জনার্দন করেছে। এমনকি ষোড়শীর মৃত মায়ের নামে মিথ্যা অপবাদ পর্যন্ত দিয়েছে। অর্থাৎ যেনতেন প্রকারে নিজের সম্পত্তি বৃদ্ধি করাই জনার্দন রায়ের উদ্দেশ্য। সর্বোপরি স্বার্থপর এবং লোভী এই জনার্দন রায়।

জমিদার জীবানন্দ ও মহাজন জনার্দন কৃষকদের জমি মাদ্রাজী চিনিকলের মালিককে নকল দলিল দেখিয়ে বিক্রি করে। কৃষকরা আদালতে যায় এবং স্বয়ং ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তদন্তে আসবেন জানা যায়। জীবানন্দ নিজের সব অপরাধ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে স্বীকার করে নেবে ঠিক করে। বিপদে পড়ে জনার্দন রায়। জমিদারের তখন আর কোনো ভয় নেয়। সে আত্মসমর্পণ করতে প্রস্তুত, কিন্তু জনার্দন এ কারণেই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। নিরুপায় মহাজন তখন নিজের মেয়ে হৈমকে কাজে লাগায় ষোড়শীকে বোঝানোর জন্য। যাতে ষোড়শী জীবানন্দকে চণ্ডীগড় থেকে সরিয়ে নেয়। তাহলে ম্যাজিস্ট্রেট আর জীবানন্দের সাক্ষ্য নিতে পারবে না। অর্থাৎ জনার্দন রায়ের মতো চরিত্র ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য সবকিছুই করতে পারে। যে ষোড়শীকে সে চণ্ডীগড় থেকে সরাতে চেয়েছিল, তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল, সেই ষোড়শীই শেষপর্যন্ত জনার্দন রায়কে বাঁচিয়ে দেয়। অর্থাৎ ষোড়শীর সাহায্য নিতে তার কুণ্ঠাবোধ হয়নি।

জনার্দন চরিত্রটিকে বলা যায় 'টাইপ' চরিত্র। অর্থাৎ এই ধরনের চরিত্রের যে প্রকৃতি হয়ে থাকে তা জনার্দনের মধ্যেও আছে। 'পল্লী-সমাজ'(১৯১৬) উপন্যাসে বেণী ঘোষালের চরিত্রও এই একই ধরনের। লেখক সার্থকভাবেই

অত্যাচারী মহাজন হিসেবে জনার্দন রায়কে চিত্রিত করতে পেরেছেন। সেকালের জমিদারি নির্ভর অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যে মহাজন সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়েছিল জনার্দন রায় তাদেরই প্রতিনিধি। জনার্দন রায়ের কার্যকলাপ থেকে সেকালের আর্থিক বৈষম্য এবং সামাজিক বিভিন্ন স্তরের পরিচয় পাওয়া যায়।

১১.৬ গোমস্তা এককড়ি নন্দীর চরিত্র

এককড়ি নন্দী জমিদারের গোমস্তা। অর্থাৎ জমিদারি ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে হলে বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড় গোমস্তাও রাখতে হয়। জমদার ধরে আনতে বললে গোমস্তা বেঁধে আনে। জমিদারি ব্যবস্থায় গোমস্তা বিভীষিকাময় একটি চরিত্র। এককড়ি জমিদার জীবানন্দের ডানহাত। তার সমস্ত অন্যায়-অত্যাচারের কাজ এককড়িকে দিয়েই করানো হয়। জমিদারের অনুপস্থিতিতে গোমস্তা প্রায়-জমিদার হয়ে ওঠে। ছলে-বলে-কৌশলে অন্যের জমি করায়ত্ত করা এককড়ির কাজ। তার এই কাজের সুবিধার জন্য মহাজনের সঙ্গে সে সুসম্পর্ক রেখে চলে। বরং বলা যায় এককড়ি আর জনার্দন দুজনেই দুজনের ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য একে অপরের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলে। তাই জনার্দন রায় বুড়ো বয়সে জেল খাটার ভয় পেলে এককড়ি বলে " ভয় কি রায়মশাই, ফাটক খাটতে হয় ত আমিই খাটবো, আপনাদের যেতে দেব না। কিন্তু গরিবের প্রতি দৃষ্টি রাখবেন, ভুলবেন না"। এককড়ির কাছ থেকে এরকম উক্তিই প্রত্যাশিত। আসলে এককড়ি, জমিদার, মহাজন একে অপরের সঙ্গে সিঁড়ির ধাপের মতো সম্পর্কযুক্ত। এককড়ি না থাকলে জমিদার আর মহাজনও উপরের তলায় থাকতে পারবে না। তাই জমিদার যখন ভালো মানুষ হয়ে যায় মহাজন এবং এককড়ির অবস্থান নড়বড়ে হয়ে যায়।

জমিদার জীবানন্দ গ্রামে আসছে শুনে এককড়ি নন্দী প্রথমে বিরক্ত হয়। কিন্তু সে জানে জমিদারের কাছে কখনও খারাপ হওয়া যাবে না। তাই সে জমিদারকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে কাজে লেগে পড়ে। নাহলে নিজের অতিরিক্ত আয়ের পথ বন্ধ হয়ে যাবে। জমিদারির খাজনা দেওয়ার পরে যা অতিরিক্ত আয় হয় সবই এককড়ি নন্দীর। কারণ জমিদার কোনোদিন গ্রামে এসে খাজনা সংগ্রহে যায় না। সেই সুযোগে গোমস্তা দরিদ্র প্রজাকে নিঃস্ব করে ছাড়ে।

ভৈরবীর ভৈরবীত্ব কেড়ে নেওয়ার জন্য এককড়িও যথেষ্ট ইন্ধন দিয়েছে মহাজন জনার্দন রায়কে। এদের মতো মধ্যস্বত্বভোগীদের কারণেই গ্রামীণ কৃষি অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত কৃষকরা কোনোদিন সুদিন দেখেনি। জমিদার যত অত্যাচারী হয়, এককড়ির মতো কর্মচারীদের ততই সুবিধে। কারণ তার স্বকপোলকল্পিত অত্যাচারটাও জমিদারের উপর দিয়েই চালিয়ে দেওয়া যায়। মায়া-মমতা বলে কোনো বস্তু এদের হৃদয়ে থাকে না। পাঁচ হাজার টাকার জমিদারি থেকে আট দিনে হাজার টাকা আদায় করে দিতে এককড়ি এতটুকু দুঃশ্চিন্তা করেনি। সে বরং খুশিই হয়েছে। আর সমাজের ক্ষমতাবানদের তৈলমর্দন করে চলাই এদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এককড়িও এর ব্যতিক্রম নয়। গোমস্তা চরিত্র যেরকম হয়ে থাকে বাস্তবে, সেভাবেই এককড়ি নন্দীকে উপন্যাসে উপস্থিত করেছেন লেখক। এককড়ি টাইপ চরিত্র—সে তার জীবিকার সমস্তরকম বৈশিষ্ট্য নিয়েই উপন্যাসে উপস্থিত থেকেছে। এককড়িকে জীবন্ত চরিত্র বলেও স্বীকার করতে হবে। সে কেবলমাত্র জমিদার বা মহাজনের আদেশ প্রতিপালন করেছে তাই নয়, সেই সঙ্গে তাদের পরামর্শ দিয়ে সাহয্যও করেছে। ২৬নং পরিচ্ছেদে এককড়ি জনার্দন রায়ের বাড়িতে রাত্রিতে গোপনে আসে পরামর্শের জন্য। সেদিন অনেক রাত্রে জনার্দনের বাড়িতে আহারাদি করে ফেরার সময় এককড়ি- "অভিমান করিয়া বলিল, সেদিন সাগর সর্দারের প্রসঙ্গে আপনারা

সবাই তাঁর মন যুগিয়ে মুখ টিপে হাসলেন, কিন্তু পুলিশের কাছে সেদিন খবরটি দিয়ে রাখলে আজ এ বিপদ আপনাদের ঘটত না"। এর উত্তরে "জনার্দন সলজ্জে ত্রুটি স্বীকার করিলেন"। এককড়ির মতো চরিত্র এভাবেই জমিদার এবং মহাজনকে সন্তুষ্ট করে চলে।

এককড়ির মতো চরিত্র যখন যে পাত্রে থাকে সেই পাত্রের আকার ধারণ করে। অর্থাৎ যে যেমন তার সঙ্গে সে সেভাবেই মেলামেশা করে। এসবের পিছনে তার মূল লক্ষ্য অবশ্য নিজের আখের গোছানো। জমিদারের কাছে সে জমিদারকে সন্তুষ্ট করে চলে, আবার মহাজনের কাছে মহাজনকে খুশি করে চলে। যখন জমিদার জীবানন্দ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে সবকিছু স্বীকার করে নেবে ঠিক করেছে, তখন সে জনার্দন রায়কে পরামর্শ দিয়েছে। কারণ দলিল জাল করা বা জোর করে জমি দখল করা এসব কাজ তো এককড়ি নন্দীই জমিদার এবং মহাজনের হয়ে করেছে। ফলত সবার আগে বিপদ তো তারই হবে। তাই সে জমিদারের গোপন খবর মহাজনকে দিয়েছে। ২৬নং পরিচ্ছেদে আছে "এককড়ি তখন প্রভুর সম্বন্ধে বিশেষ একটি সংবাদ তাঁহার গোচর করিয়া কহিল, মদ খেয়ে বরঞ্চ ছিল ভাল, এখন কথা বলাই ভার"। সব মিলিয়ে এককড়ি অত্যাচারী জমিদারের যোগ্য গোমস্তা হয়ে উঠেছে উপন্যাসে।

১১.৭ ষোড়শীর পিতা তারাদাস চক্রবর্তী

তারাদাস চক্রবর্তী সম্পর্কে ভৈরবী ষোড়শীর পিতা। উপন্যাসে তারাদাসের প্রথম উপস্থিতি দেখা যায় শান্তিকুঞ্জে জমিদারের আস্তানায়। মেয়ে ষোড়শীকে জমিদারের হাত থেকে উদ্ধারের জন্যই ম্যাজিস্ট্রেট কে সাহেবের কাছে অভিযোগ করে নিয়ে আসে জীবানন্দের কাছে। কিন্তু ষোড়শী পিতার কথা মতো জীবানন্দের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়নি। নিজের মিথ্যা কলঙ্ক মাথা পেতে নিয়ে জমিদারকে বাঁচিয়ে দেয়। এখানেই শুরু হয় পিতা তারাদাসের সঙ্গে ষোড়শীর লড়াই। পিতাই হয়ে ওঠে তার প্রধান বিপক্ষ। চতুর্থ পরিচ্ছেদে তারাদাস ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে বলেছে- "গ্রামসুদ্ধ সাক্ষী আছে। মা আমার ভাত রাঁধছিল, আটজন পাইক গিয়ে মাকে বাড়ি থেকে মারতে মারতে টেনে এনেছে"। লক্ষণীয় কন্যার প্রতি পিতার সম্বোধন — 'মা আমার'। কিন্তু ঠিক পরের পরিচ্ছেদে তারাদাসকে বলতে শোনা যায়- "তারাদাস আস্ফালন করিয়া বলিল, বাড়ি কার? বাড়ি আমার। আমিই ভৈরবী করেছি, আমিই ওকে দূর করে তাড়াবো"। অর্থাৎ তারাদাস নিজের স্বার্থসিদ্ধি হয়নি বলে মেয়েকে অভিশাপ দিতে পিছপা হয়নি। শুধু তাই নয় মহাজনের সঙ্গে ষোড়শীর বিরুদ্ধে সমস্তরকম ষড়যন্ত্রে মূল সহায় হয়ে ওঠে তারাদাস।

এমনকি তারাদাস ষোড়শীর মায়ের সম্বন্ধে 'যা-তা বলিতে' শুরু করল। ষোড়শীর ভৈরবী পদ চলে গেলে এবং তারাদাস যদি ষোড়শীর পক্ষে দাঁড়ায়, তাহলে চণ্ডীগড়ের দেবত্ত সম্পত্তি তার হাতছাড়া হয়ে যাবে। এই কারণেই তারাদাস মরিয়া হয়ে ওঠে ষোড়শীকে মন্দির থেকে তাড়ানোর জন্য। জনার্দন রায়দের কথা শুনে ষোড়শীর ঘরে তালা পর্যন্ত লাগিয়েছে তারাদাস। ষোড়শীকে পরিত্যক্ত একটি ঘরে আশ্রয় নিতে হয়। অর্থাৎ পিতা তখন হয়ে ওঠে শত্রু। তারাদাস পিতা হয়ে একবারও জানতে চায়নি জীবানন্দ সম্পর্কে তার মিথ্যা সাক্ষ্যর কারণ কী। জানতে চায়নি তার মনের কথা। অর্থাৎ দেবীর সম্পত্তি ভোগ করাই ছিল তার মূল লক্ষ্য। এরজন্য সে যতদূর যেতে হয় গিয়েছে। এমনকি রাতারাতি আর একজনকে ভৈরবী করার জন্য মন্দিরে নিয়েও চলে আসে। সুতরাং তারাদাস কোনোভাবেই পিতাসুলভ ব্যবহার ষোড়শীর সঙ্গে করেনি। নিজ কন্যা ষোড়শী ছিল তার জীবনধারণের, দেবীর সম্পত্তি ভোগ করার অবলম্বন মাত্র।

তারাদাসের মধ্যে কোনো ব্যক্তিত্ব বলেও কিছু ছিল না। ষোড়শীকে মন্দির থকে তাড়াতে গিয়ে সে জনার্দন এবং শিরোমণির হাতের খেলার পুতুলে পরিণত হয়। আসলে জনার্দনরা তারাদাসকে ব্যবহার করেছিল দেবীর সম্পত্তি দখল করার জন্য। যা ষোড়শী ভৈরবী থাকলে কোনোমতেই সম্ভব হোত না। তাছাড়া ষোড়শীর ব্যক্তিত্বের কাছেও তারাদাসকে হার স্বীকার করতে হোত। আসলে তারাদাসের আচরণের মধ্যে ছিল দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপার। কিন্তু ষোড়শীর এরূপ কোনো অভিসন্ধি ছিল না। ফলত তারাদাস পাঠকের কাছে ষোড়শীর পিতা হয়েও জনার্দন-শিরোমণি-এককড়ির মতো ভিলেন চরিত্র হয়ে ওঠে। তারাদাসের কাছে পিতৃসত্তার তুলনায় বড়ো হয়ে উঠেছে তার আর্থিক নিরাপত্তার স্বার্থ। ষোড়শী অনায়াসে সবকিছু ত্যাগ করে চণ্ডীগড় ত্যাগ করেছে। এই ত্যাগের গুণাবলী পিতা হয়েও তারাদাসের মধ্যে ছিল না। এদিক থেকে তারাদাসের হার হয়েছে নিজ কন্যার কাছে। পিতা নিজ কন্যার কাছে আশ্রয়দাতা না হয়ে আশ্রয়চ্যুত করার প্রধান কাণ্ডারী হয়ে উঠেছে উপন্যাসে। অর্থাৎ গ্রামীণ সমাজব্যবস্থায় পিতা যে নিজ কন্যার ক্ষতিসাধনে কতদূর অগ্রসর হতে পারে তাও লেখক এই উপন্যাসে আমাদের দেখিয়ে দিলেন। বরং উপযুক্ত পিতার স্থান গ্রহণ করতে পেরেছে ফকির সাহেব। যে ষোড়শীকে আশ্রয় দিয়েছে, ষোড়শীর ইচ্ছাকে মর্যাদা দিয়েছে।

১১.৮ সর্বেশ্বর শিরোমণি

শিরোমণি মশায় গ্রামের মাতব্বরদের অন্যতম। লেখক সর্বেশ্বর শিরোমণিকে টাইপ চরিত্র হিসেবেই উপন্যাসে উপস্থিত করেছেন। এদের নিজস্ব কোনো ক্ষমতা থাকে না। সমাজে ক্ষমতার ভরকেন্দ্র যেদিকে থাকে এরা সেইদিকেই থাকে। তাই মহাজন জনার্দন রায়ের সঙ্গে শিরোমণি মশায়ের ওঠাবসা। যেখানে মহাজন থাকে, সেখানেই শিরোমণি উপস্থিত থাকে। আসলে দুজনে দুজনের সহায়ক। আর শিরোমণির নিজস্ব পরিচয় সে গ্রামের সম্মাননীয় ব্যক্তি, সকলেই তাঁকে মেনে চলে। উপন্যাসে শিরোমণি মশাইকে প্রথম দেখা যাচ্ছে দেবীচণ্ডীর মন্দির প্রাঙ্গনে। জনার্দন রায়ের কন্যা হৈমর ছেলের কল্যাণে যে পুজো হবার কথা ছিল সেই সময় শিরোমণিকে পাওয়া যায়। শিরোমণি জনার্দনের ইচ্ছেমতো ষোড়শীকে এই পুজোয় অংশগ্রহণ করতে দিতে চান না। কারণ ষোড়শী জমিদারের সঙ্গে রাত্রি যাপন করেছে। তাই শিরোমণি ষোড়শীকে উদ্দেশ্য করে সাত নং পরিচ্ছেদে বলেন- '' ষোড়শীকে উদ্দেশ করিয়া অতিশয় সাধুভাষায় তাঁহাদের অভিমত ব্যক্ত করিয়া বলিলেন, আজ হৈমবতী তাঁর পুত্রের কল্যাণে যে পূজা দিতেছেন, তাতে তোমার কোন অধিকার থাকবে না, তাঁর সঙ্কল্প তিনি আমাদের জানিয়েছেন। তাঁর আশঙ্কা, তোমাকে দিয়ে তাঁর কার্য সুসিদ্ধ হবে না"। শিরোমণি মশায় এই কথাগুলো হৈমর নামে বললেও হৈম এধরনের কোনো কথাই বলেনি। হৈমর ষোড়শী সম্পর্কে কোনো অভিযোগই ছিল না। শুধু তাই নয়, হৈম সমাজপতিদের তোলা কোনো অভিযোগ বিশ্বাসও করেনি। আসলে শিরোমণির মতো চরিত্ররা নিজেদের কার্যসিদ্ধির জন্য এরকম মিথ্যে কথা বলতে দ্বিধাবোধ করে না।

এর পরেই শিরোমণি বলেন- ''আমরা গ্রামস্থ ভদ্রমণ্ডলী আজ স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েচি যে, দেবীর কাজ আর তোমাকে দিয়ে হবে না। মায়ের ভৈরবী তোমাকে আর রাখা চলবে না"। এখন প্রশ্ন হল শিরোমণির এই 'গ্রামস্থ ভদ্রমণ্ডলী' কারা? জনার্দন রায়, শিরোমণি মশায় এরাই তো ভদ্রমণ্ডলী। এরা তো নিজের স্বার্থের জন্য ষোড়শীকে ভৈরবীর পদ থেকে সরাতে চাইছে। তাই নিজেদের কল্পিত যুক্তি বা কার্য-কারণকে হৈমর কথা বলে চালিয়ে দিতে দ্বিধাবোধ করেনি। হৈমর উপস্থিতিতেই শিরোমণি এই কাজ করেছে। যদিও হৈম এর প্রতিবাদ করেছিল।

শিরোমণি মশায়ের ভৈরবীকে তাড়ানোর পরিকল্পনা হিসেবেই তারাদাসকে দিয়ে পরবর্তী ভৈরবীও ঠিক করানো হয়। একটি বছর দশেকের মেয়েকে তারাদাস ইতিমধ্যেই নিয়ে এসেছে পরবর্তী ভৈরবী করার জন্য। শিরোমণি কতদূর পর্যন্ত নিচে নামতে পারেন তার প্রমাণ, যখন সর্বসমক্ষে ষোড়শীর মায়ের চরিত্র নিয়ে আলোচনা করতে চায়। সেকালের পল্লীসমাজের ঘৃণ্য রাজনীতির স্তম্ভ এই শিরোমণি মশায়রা যতদূর সম্ভব নিজেদেরকে কালিমালিপ্ত করে অন্যকে জব্দ করার চেষ্টা করত। তাই কোনোকিছুতেই তাদের আটকাত না। আর চণ্ডীগড়ে এই শিরোমণিমশায়দের অন্যায় কার্যকলাপের প্রধান প্রতিবাদী চরিত্র ছিল ষোড়শী। সুতরাং পথের কাঁটা সরানো তাদের অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। আর সেই অস্ত্র ষোড়শী নিজে তাদের হাতে তুলে দিয়েছে। শিরোমণি যে মন্দিরে দাঁড়িয়ে মিথ্যে কথা বলছে তা হৈম প্রমাণ করে দেয়। হৈম শিরোমণিকে উদ্দেশ্য করে বলে— " আপনি নিজেও ত তাই শিরোমণি জ্যাঠামশাই। অথচ এই দেবমন্দিরে দাঁড়িয়েই ত মিছে কথার বৃষ্টি করে গেলেন। আমি বলেচি ওঁকে দিয়ে পুজো করালে আমার কাজ সিদ্ধ হবে না, এর বিন্দুবিসর্গও ত সত্যি নয়"। অর্থাৎ সর্বসমক্ষে মিথ্যে কথা বলতে শিরোমণির আটকায়নি।

শিরোমণি এতকিছু করেও যখন হৈমর বিশ্বাসের কাছে হেরে গেলেন, তখন শেষ চাল হিসেবে বললেন ষোড়শী "চণ্ডীর দিকে মুখ করে ও-ই নিজের মায়ের কথা নিজেই বলে যাক"। যা ষোড়শীর পক্ষে কোনোদিনই সম্ভব ছিল না। শিরোমণি নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সবকিছুই করতে পারেন। কিন্তু শিরোমণির একটা সুবিধা ছিল সে নিজের স্বার্থকে সমাজের সর্বজনের হিতের জন্য করছে বলে প্রমাণ করে দিত। ফলত নানাবিধ অন্যায় তারা সমাজের দরিদ্র এবং ভূমিহীন কৃষকের উপর সমাজ শোধনের নামে চাপিয়ে দিত। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতিনিধি হিসেবে সমাজকে এরা যুগের পর যুগ শোষণ করে এসেছে। আর সেজন্যই বিদ্যাসাগরের মতো ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। ষোড়শীর চারিত্রিক শুদ্ধতা নিয়ে যখন শিরোমণির এতই চিন্তা, তখন গ্রামের অন্য মেয়ে-গৃহবধূর ওপর হওয়া জমিদারের অত্যাচারের বিরোধিতা করতে কিন্তু দেখা যায়নি। কারণ সে প্রতিবাদ করলে শিরোমণির ক্ষতি হবে, যা করার মতো সাহস বা ত্যাগ স্বীকার করার মতো ক্ষমতা কোনোটাই শিরোমণি চরিত্রে ছিল না।

আবার ফকির সাহেবকে নিয়েও শিরোমণির ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ লক্ষণীয়। নিজে হিন্দু ধর্মের ধ্বজাধারী হয়ে মুসলমান ফকিরকে সহ্য করতে পারে না। ফকিরকে আরও সহ্য করতে না পারার কারণ তিনি ষোড়শীর গুরু। ষোড়শী তাঁকে সম্মান এবং শ্রদ্ধা করে। ফকির সাহেবকে উদ্দেশ্য করে শিরোমণি বলেন- "ভালো না ছাই, মোচলমান আবার সিদ্ধ পুরুষ! হাজার হোক ম্লেচ্ছ তো!" ফকির সাহেব কারও ক্ষতি করে না এসব স্বীকার করেও শিরোমণি বলে 'হাজার হোক ম্লেচ্ছ তো'। ধর্ম যেখানে মনের বিস্তার ঘটায়, অন্যধর্মের প্রতি তখন শিরোমণি অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করেছেন। গোঁড়া ধর্মীয় বিশ্বাসে আচ্ছন্ন শিরোমণি। সমাজের পবিত্রতা রক্ষা করা যেন তার নৈতিক কর্তব্য। আর তা করতে গিয়ে সমাজের উপর নানা আচার-অনাচারের বোঝা চাপিয়ে দিতে ওস্তাদ এই শিরোমণির মতো ব্যক্তিরা। এদের নিজেদের ক্ষমতা কিছুই নেই।আসলে সমাজের, ধর্মের প্রতিনিধি হিসেবে শিরোমণিকে দাঁড় করিয়ে মহাজন-জমিদার নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে। মহাজন-জমিদার যেরকম চায় শিরোমণির মতো ব্যক্তিদের যুক্তিবিন্যাস সেরকম ভাবেই নিজে নিজেই সজ্জিত হয়ে যায়। আসলে এরা ব্যক্তিত্বহীন কাপুরুষ চরিত্র। এদের জন্যই হিন্দুধর্ম নিয়ন্ত্রিত সমাজ ক্রমাগত পিছিয়ে গিয়েছে। শরৎচন্দ্র পল্লীসমাজের যথাযথ চিত্র তুলে ধরতে এই শিরোমণির মতো চরিত্রকে সমস্ত দোষ-ত্রুটি নিয়ে সার্থকভাবেই চিত্রিত করেছেন।

১১.৯ ফকির সাহেব

ফকির সাহেবকে উপন্যাসে উপস্থিত হতে দেখা যায় যোড়শীর সূত্র ধরে। উপন্যাসে তাঁর উপস্থিতি যোড়শীর গুরু হিসেবে। ফকির সাহেব ধর্মে মুসলমান এবং তিনি চণ্ডীগড়ের একপ্রান্তে থাকেন। তাও তিনি মাঝে মাঝে আসেন এবং সবসময় থাকেন না। তাঁর মাথার চুল এবং দীর্ঘ দাঁড়ি গোঁফ সবই সাদা হয়েছে বয়সের কারণে। আমাদের মতে এই সাদা আসলে ফকিরের চরিত্রের প্রতীক। তার অন্তরের পবিত্রতার প্রতীক। নাহলে লেখক হয়তো এই বর্ণনা দিতেন না। তিনি মুসলমান ফকিরের যেরকম পোশাক হয়, তাই পড়ে থাকেন। আসলে ফকির তো লোভ-লালসার ঊর্ধ্বে অবস্থান করেন। তাই ফকিরের বেশেই লেখক তাঁকে পাঠকের সামনে উপস্থিত করেছেন। অষ্টম পরিচ্ছেদে ফকিরকে ব্যারিস্টার নির্মল প্রথম যোড়শীর বিচার সভায় দেখে যা অনুভব করেছিলেন তা হল— ‘‘এই ফকিরটির মাথার চুল হইতে দীর্ঘ দাড়ি-গোঁফ সমস্তই একেবারে তুষারশুভ্র, অঙ্গে মুসলমান ফকিরের সাধারণ পোশাক। সচরাচর যাহা দেখা যায় তাহার অধিক কিছু নয়, অথচ মনে হয় এই সবল সুদীর্ঘ দেহের উপর এগুলি সমস্ত যেন তাদের সামান্যতাকে বহু ঊর্ধ্বে অতিক্রম করিয়া গেছে। তাঁহার গায়ের রঙ জলে ভিজিয়া এবং রৌদ্রে পুড়িয়া এমন একপ্রকার হইয়াছে, যাহা আগে কি ছিল কিছুতেই অনুমান করা যায় না। ফকিরের মুখ ও চোখের উপর সামান্য একটুখানি কৌতূহলের ছায়া পড়িয়াছে বটে, কিন্তু আরও একটু মন দিয়া দেখিলেই দেখা যায়, ইহারই অন্তরালে, যে চিত্তখানি বিরাজ করিতেছে, তাহা যেমন শান্ত তেমনি নিরুদ্বেগ এবং তেমনি ভয়হীন’’। উদ্ধৃতি দীর্ঘ হলেও এই একটি অনুচ্ছেদেই লেখক ফকির সাহেবের যা পরিচয় দেবার দিয়ে দিয়েছেন। তাঁর প্রবল ব্যক্তিত্বেরও পরিচয় এখানেই পাওয়া যায়। যোড়শীর বিচার সভায় ফকির সাহেবই যোড়শীকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। আর ফকির সাহেব যোড়শীকে নিয়ে গিয়েছিলেন ব্যারিস্টার নির্মল সেই সভায় আছে জানতে পেরে। কারণ তাঁর বিশ্বাস ছিল ‘‘আপনার নাম শুনে আমি বললুম, চল মা, আমরা যাই। তিনি আইনজ্ঞ মানুষ, তাতে বাইরের লোক- যদি সম্ভব হয় তিনি সুমীমাংসাই করে দেবেন’’। এই মন্তব্যে ফকির সাহেবের বিচক্ষণতা প্রমাণিত। বাইরের লোক এবং একজন ব্যারিস্টার সুবিচার করবেন সেটাই স্বাভাবিক, অন্তত সেটাই প্রত্যাশিত। ফকির সাহেবের এই অনুমান মিথ্যে হয়নি, উপন্যাসে তার প্রমাণ আছে। আর এই অষ্টম পরিচ্ছেদেই ব্যারিস্টার নির্মল বুঝেছিলেন- ‘‘ইনি যেই হোন, অশিক্ষিত সাধারণ ভিক্ষুক শ্রেণীর নয়’’। এই ফকিরের কাছে যোড়শী কিছু পড়াশুনাও করেছে বলে তারাদাস জানিয়েছে। ফকির সাহেব যোড়শীর কাছে ছিলেন অভিভাবকের মতো। যোড়শী কোনো সমস্যায় পড়লে তাঁর মতামত নেয়। উপন্যাসে তাঁর স্বল্প সময়ের উপস্থিতি পাঠকের সম্ভ্রম আদায় করে নেয়।

ফকির সাহেব উপন্যাসে একজন আদর্শস্থানীয় চরিত্র। তাঁর ব্যক্তিত্ব কেউ অস্বীকার করতে পারে না। শিরোমণি মশায় তাঁকে ম্লেচ্ছ বলে কটূক্তি করলেও স্বীকার করেছে ফকির কারও ক্ষতি করে না। ব্যারিস্টার নির্মল বসুও তাঁকে দেখে বুঝেছে যে ফকির সাধারণ মানুষ নন। ফকির চণ্ডীগড়ে থাকলেও তিনি আসলে উচ্চবংশজাত এবং তিনি একজন আইনজীবীও বটে। উপন্যাসের শেষাংশে তাঁর আইনজীবী পরিচয় পাওয়া যায়।আদালত চত্বরে ফকির সাহেবকে দেখে নির্মল বসু জানতে চান তিনি কোথায় এসেছেন। উত্তরে ফকির জানান- ‘‘কিন্তু সংসারের মোহ সহজে ছাড়ে না বাবা, তাই শেষ বয়সে আবার বিষয়ী হয়ে উঠেচি’’। আসলে যোড়শী ওরফে অলকাকে জীবানন্দের দান করা সম্পত্তির বিষয়ে তদারকি করতে ফকির আদালতে এসেছিলেন। অর্থাৎ প্রয়োজন পড়লে ফকির আদালত পর্যন্ত যেতে পারেন। তবে তিনি ব্যক্তিগত প্রয়োজনে আদালতে

যাননি, গিয়েছিলেন ষোড়শীর জন্য।

গ্রামের সবাই যখন ষোড়শীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে নেমেছে, তখনও ফকির সাহেব ষোড়শীর হয়ে প্রতিবাদ করেছেন। যদিও ষোড়শী কেন জীবানন্দের হয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে মিথ্যে সাক্ষ্য দিয়েছিল তার উত্তর তিনি পাননি। কিন্তু তিনি এ বিষয়ে জানার জন্য ষোড়শীকে জোর করেননি। উত্তর না পেয়ে ফকির সাহেব চিন্তিত হয়েছেন কিন্তু কন্যাসম ষোড়শীকে দূরে সরিয়ে দেননি। বরং ষোড়শীর ইচ্ছে মতোই তাঁর কুষ্ঠ আশ্রমে ষোড়শীকে স্থান দিয়েছেন। অর্থাৎ ফকির সাহেবের সেবাব্রতে ষোড়শীকেও তিনি সামিল করেছেন। সকলে উপেক্ষা করলেও ফকির তাকে উপেক্ষা করেনি। বরং তাকে আশ্রয় দিয়েছে। যে কাজ ষোড়শীর পিতার করার কথা ছিল তা ফকির সাহেব করেছেন। ফকিরের সঙ্গে ষোড়শীর আলাপের মূলেও ছিল সেবা করার ঘটনা। ব্যারিস্টার নির্মল প্রথম ফকিরের কথা শুনে ব্যঙ্গ করলে তারাদাস পর্যন্ত ''লজ্জিত হইয়া বলিল, আজ্ঞে, বুড়োমানুষ তিনি। বয়স ষাট-বাষট্টির কম নয়, মা বলে ডাকেন। একবার ষোড়শীর ভারী অসুখ হয়েছিল— প্রায় মরতে বসেছিল— উনিই ভালো করেন"। সুতরাং ষোড়শীর জীবনে ফকিরের অবদান কম নয়।

ফকির সাহেবের সেবাধর্মের কারণে বা তাঁর আশ্রমের কারণে হয়তো ষোড়শীর ভৈরবীর পদ ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিতে সুবিধে হয়েছে। ভৈরবীর পদ ত্যাগ করার পর তার কী হবে তা নিয়ে তাকে দুশ্চিন্তা করতে হয়নি। এদিক থেকে বলা যায় ফকির উপন্যাসের পরিণতিতে সাহায্য করেছেন। আবার আদালতে ফকির সাহেবের কাছে যে কাগজপত্র ছিল তা দেখে এবং জীবানন্দের একটি চিঠি ফকির সাহেবকে উদ্দেশ্য করে লেখা যা ২৫নং পরিচ্ছেদে ষোড়শী পাঠ করেছিল তা দেখে ব্যারিস্টার নির্মল বসু জানতে পারেন জীবানন্দ-ষোড়শী স্বামী-স্ত্রী। উপন্যাসের এই রহস্য উদ্ঘাটনেও ফকির সাহেবের ভূমিকা আছে। এদিক থেকেও ফকির সাহেব উপন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

ফকির সাহেবই উপন্যাসে ষোড়শীর একমাত্র আশ্রয়। ষোড়শী যাঁকে নির্দ্বিধায় ভরসা করেছে। হৈম-নির্মল তাকে সাহয্য করলেও তাদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারেনি। আসলে উপন্যাসের ভৈরবী এবং ফকির প্রকৃতপক্ষে দুজনেই একই পথের পথিক। দুজনের ধর্ম আলাদা। কিন্তু দুজনের সাধনাতেই যুক্ত ছিল মানুষের সেবা করার কাজ। দুজনেরই ইহজাগতিক কোনো চাহিদা ছিল না। তারা ধর্মসাধনার পথে থাকলেও অন্ধভাবে ধর্মের পথ অনুসরণ করেনি। বিপদে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সত্যকারের ধর্ম পালন করেছে। তাই ফকিরের আশ্রমেই ষোড়শী আশ্রয় নিয়েছে। সুতরাং ফকির ধর্মের ধ্বজাধারী কোনো ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব নন, প্রকৃত মানুষ হিসবেই শরৎচন্দ্র তাঁকে উপন্যাসে স্থান দিয়েছেন। ষোড়শীর মধ্যেও আচারসর্বস্ব কোনো ধর্মীয় কার্যকলাপ আমরা দেখিনি। কেবলমাত্র তার কৃচ্ছ্রসাধনের কথাই জানা গেছে। তাই ফকিরই শেষপর্যন্ত ষোড়শীর আশ্রয় হয়ে উঠেছে। শরৎচন্দ্র এর মাধ্যমে হয়তো বলতে চাইলেন মানুষের সেবা করাই পরম ধর্ম। জীবানন্দকেও দিয়ে শেষপর্যন্ত তিনি সেবার পথে নামিয়েছেন। জীবানন্দের যে চিঠির মাধ্যমে সবাই জানতে পারল ষোড়শী তার স্ত্রী সেই চিঠিও ফকিরকে উদ্দেশ্য করেই লেখা। সুতরাং all roads leads to Rome-এর মতো এই উপন্যাসের সবকিছুই গিয়ে ফকির সাহেবের কাছে গিয়ে শেষ হয়েছে বা ফকিরের সাধনার পথেই সবাই চালিত হয়েছে। ফকির শব্দের অর্থই তো হল দরিদ্র মুসলমান সন্ন্যাসী বা যিনি চারিত্রিক সৌন্দর্যের অধিকারী। ষোড়শী, জীবানন্দ, নির্মল-হৈম সকলেই ফকিরের সংস্পর্শে এসে তার চারিত্রিক সৌন্দর্যে কম-বেশি স্নাত হয়েছে। বলা যেতে পারে ফকির চরিত্রটি এই উপন্যাসে ভারসাম্য রক্ষার কাজ করেছে। জনার্দন-শিরোমণির

দল পর্যন্ত তাঁকে শ্রদ্ধা করেছে, পুরোপুরি উপেক্ষা করতে পারেনি। আর ফকিরের মাধ্যমেই কিন্তু চণ্ডীগড়ের সঙ্গে আবার ষোড়শীর যোগাযোগ ঘটে এবং উপন্যাসটি পরিণতির পথে অগ্রসর হয়।

১১.১০ প্রফুল্ল চরিত্র

প্রফুল্ল চরিত্রটি যেন উপন্যাসের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত টানটান উত্তেজনায় একটু পাঠককে বিশ্রাম নেবার সুযোগ দেয়। প্রফুল্লকে জমিদার জীবানন্দের একান্ত সচিব হিসেবে উপন্যাসে দেখানো হয়েছে। জীবানন্দ যখন উপন্যাসের সকলের সঙ্গেই কোনো না কোনোভাবে লড়াই করেছে, তখন একমাত্র প্রফুল্লই তার কাছে বন্ধুর মতো থেকেছে। জীবানন্দের সঙ্গে একমাত্র দেখা যায় প্রফুল্লের কোনো স্বার্থের সম্পর্ক নেই। প্রফুল্ল জীবানন্দের কর্মচারী হলেও তাদের মধ্যে অনেকটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক দেখা যায়। যদিও প্রফুল্ল তার সীমা কখনও অতিক্রম করে যায়নি।

১৩নং পরিচ্ছেদে প্রফুল্লের আবির্ভাব— ''সম্মুখের বারান্দা ঘুরিয়া একজন ভদ্রবেশধারী শৌখিন যুবক প্রবেশ করিল। হাতে তার ইংরেজী বাংলা কয়েকখানা সংবাদপত্র এবং কতকগুলো খোলা চিঠিপত্র''। লেখকের এই বর্ণনা বুঝিয়ে দেয় প্রফুল্ল শিক্ষিত এবং শহুরে যুবক। তবে এসত্ত্বেও সে চন্ডীগড়ের মতো গ্রামে আছে প্রফুল্লের একান্ত সচিব হিসেবে। জীবানন্দকে সে-ই একমাত্র দাদা বলে সম্বোধন করেছে। এরকম সম্পর্ক উপন্যাসে জীবানন্দের সঙ্গে কারও দেখা যায়নি। ষোড়শীও জীবানন্দকে ভয় অথবা ভক্তি-শ্রদ্ধা করেছে। আর সকলেই উপন্যাসে তার অধস্তন অথবা প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কে যুক্ত থেকেছে। ব্যতিক্রম কেবলমাত্র প্রফুল্ল।

প্রফুল্ল জীবানন্দের সমস্ত অপরাধ এবং চারিত্রিক ত্রুটি সবথেকে ভালোভাবে জানত। তবে হ্যাঁ এইসব বিষয় নিয়ে জীবানন্দের লঘুচালে সমালোচনা করলেও প্রফুল্লকে কখনও বাধা দেয়নি। ষোড়শীর জোর করে মন্দিরের সমস্ত সম্পত্তি জীবানন্দের হাতে তুলে দেবার কারণ প্রফুল্ল বুঝতে পারে না। জীবানন্দ বলে জনার্দন রায় প্রমুখের তুলনায় ষোড়শী তাকেই নির্ভরযোগ্য মনে করেছে। এই শুনে ২৩নং অধ্যায়ে প্রফুল্ল বলে— ''কিন্তু আপনাকে সে চিনতে পারেনি''। উপন্যাসে জীবানন্দকে এভাবে বলার সাহস আর কারও ছিল না। প্রফুল্ল জমিদারের বারবার সমালোচনা করলেও বা তার দোষ-ত্রুটি ধরিয়ে দিলেও কখনও তাকে ছেড়ে যেতে পারেনি। অনেকবার সে জমিদারের মোসাহেবি করা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সচিবের কাজে ইস্তফা দিয়েছে। কিন্তু জীবানন্দকে সে চিরতরে ত্যাগ করে যেতে পারেনি। অর্থাৎ জমিদারের মুখের উপর সত্যি কথা বলার সাহস তার ছিল। ষোড়শীর সংস্পর্শে না এসেও তাকে সে শ্রদ্ধা করেছে দূর থেকে দেখেই।

প্রফুল্ল চরিত্রের উপন্যাসে সেরকম গুরুত্ব নেই। তাকে উপন্যাস থেকে বাদ দিলেও এমন কিছু ক্ষতি হত না। প্রফুল্ল উপন্যাসে থাকায় জীবানন্দ সম্বন্ধে আমরা আরও কিছু সংবাদ জানতে পারি। তবে তাকে এনে লেখক জীবানন্দ-ষোড়শী সম্পর্কের টানাপোড়েন, জীবানন্দ-জনার্দন রায়দের লড়াই বা ভৈরবীকে তাড়ানোর ষড়যন্ত্র ইত্যাদি জটিল ঘটনা পরম্পরা থেকে পাঠককে কিছুটা বিশ্রাম বা রিলিফ দিতেই প্রফুল্ল চরিত্রের সৃষ্টি করেছেন। Comic relie বলতে বোঝায় যেখানে গুরুগম্ভীর বা দুঃখের পরিবেশের মধ্যে হাস্যরসের উপাদান আনা হয়। গুরুগম্ভীর বা প্রচণ্ড টানটান উত্তেজনার মাঝে পাঠককে বিশ্রাম বা relief দেওয়ার জন্য এই হাস্যরসের উপাদান মূলত নাটকে যোগ করা হয়। 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসের শুরু থেকেই ভৈরবীকে নিয়ে বা তার ভবিষ্যৎ নিয়ে পাঠক দুঃশ্চিন্তায় থাকে বা একটা tension পাঠকের মধ্যে কাজ করে। প্রফুল্লকে এনে

ঔপন্যাসিক যেন পাঠককে মাঝে মাঝে বিশ্রাম নেবার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তাই প্রফুল্লকে উপন্যাসের প্রথমদিকে দেখা যায়নি। ১৩নং পরিচ্ছেদে তাকে প্রথম দেখা যায়। আবার তাকে দেখা যায় ২৩নং পরিচ্ছেদে যোড়শী চণ্ডীগড় থেকে বিদায় নেবার পর। সুতরাং লেখক সুচিন্তিতভাবেই প্রফুল্লকে উপন্যাসে এনেছেন উপন্যাসের গম্ভীর পরিবেশকে কিছুটা হালকা করার জন্য। তাই প্রফুল্ল-জীবানন্দের সংলাপে প্রায়শই হাসির উপাদান তিনি এনেছেন।

এই এককে 'দেনা-পাওনা' উপন্যসের চরিত্রগুলি সম্বন্ধে শিক্ষার্থীকে একটা ধারণা দেওয়া গেল। শরৎচন্দ্র নিজেই তাঁর চরিত্রদের অত্যন্ত যত্নে গড়ে তুলেছেন— চরিত্ররাই তার উপন্যাসের মূল গন্তব্য। বাস্তবতার যে বোধ শরৎচন্দ্রের ঔপন্যাসিক গড়ন তৈরি করেছিল তার মূল ছিল এই চরিত্র। আলোচ্য উপন্যাসে চরিত্রগুলির দিকে দেখলে শিক্ষার্থীরা এই উপন্যাসের গড়ন সম্বন্ধেও ধারণা পাবেন। পরের এককে যা আলোচিত হয়েছে।

একক-১২ ❑ 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসের গঠনশৈলী ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

গঠন

১২.১ উদ্দেশ্য
১২.২ 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসের প্লট
১২.৩ 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসের উপকাহিনি
১২.৪ 'দেনা-পওনা' উপন্যাসের ভাষা
১২.৫ 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসের সময়
১২.৬ 'দেনা-পাওনা'র পল্লীসমাজ ও অর্থনৈতিক পরিকাঠামো
১২.৭ সামাজিক উপন্যাস হিসেবে 'দেনা-পাওনা' পাঠ
১২.৮ ভৈরবী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিমত
১২.৯ 'দেনা-পাওনা' উপন্যাস পাঠের প্রাসঙ্গিকতা
১২.১০ সংক্ষীপ্ত টীকা
১২.১১ অনুশীলনী
১২.১২ সহায়ক গ্রন্থ

১২.১ উদ্দেশ্য

এই অংশে আমরা 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসের গঠনকৌশল বিষয়ে আলোচনা করা হবে। অর্থাৎ কীভাবে বা কোনকোন উপাদান সহযোগে উপন্যাসটি রচিত হয়েছে তা আলোচনা করা হবে। সেই সঙ্গে উপন্যাসের উপাদানগুলো সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে উপন্যাস-দেহে সংযোজিত হয়েছে কিনা তাও এই অংশে আমরা বিশ্লেষণ করে দেখব।

১২.২ 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসের প্লট

প্লট হল যখন গল্প বা কাহিনি কার্য-কারণ ও কাল পারম্পর্য রক্ষা করে রচিত হয়। গল্পের ঘটনার মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক এবং সময়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারলে তবেই প্লট হয়ে ওঠে। 'The king died– and then the queen died'- এটি প্লট নয়, এটি একটি বক্তব্য মাত্র। কিন্তু যদি বলা হয় "The king died– and then the queen died of grie"- এটি প্লট। কারণ এখানে রাণী কেন মারা গেল সেই কার্যকারণ বলা হয়েছে। এই কার্যকারণ সমন্বিত বেশ কিছু ঘটনার সমন্বয়ে একটি গল্প বা উপন্যাস গড়ে ওঠে। আমাদের পাঠ্য 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসেও জীবানন্দ-ভৈরবীকে কেন্দ্র করেই প্লট গড়ে উঠেছে। জীবানন্দকে স্বামী হিসেবে চিনতে পারার কারণেই ষোড়শীর জীবনে পরিবর্তন আসে। সে ভৈরবীর পদে থেকেও ভৈরবীর কাজ করতে পারে না। কারণ বিবাহের তিন রাত্রির পর ভৈরবী স্বামী-সংস্পর্শে আসতে পারে না। তার থেকেও বড়ো হয়ে ওঠে ভৈরবীর মধ্যেকার অন্তর্দ্বন্দ্ব; যা উপন্যাসকে ছুটিয়ে নিয়ে চলে পরিণতির দিকে। সময়েরও সামঞ্জস্য রক্ষা করেছেন লেখক উপন্যাসে। সব মিলিয়ে 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসকে দৃঢ়পিনদ্ধ গঠন (organic) প্লটের উপন্যাস বলা যায়। কারণ এই উপন্যাসের প্লটে কোনো শিথিলতা নেই।

শরৎচন্দ্র চরিত্রকে নির্ভর করেই যে তাঁর গল্প-উপন্যাসের প্লট নির্মাণ করতেন একথা বিভিন্ন সময়ে জানিয়েছেন। অর্থাৎ চরিত্র আগে তারপর অন্যান্য বিষয় আপনা হতেই চলে আসে। এই চরিত্রদের মধ্যে নারী চরিত্র তাঁর কাছে বারবার প্রাধান্য পেয়েছে। 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসেও আমাদের মনে হয় ভৈরবীর চরিত্রই তাঁর কাছে অগ্রাধিকার পেয়েছে। ভৈরবীর জীবনের মতাদর্শগত বা অন্তরের ঘুমিয়ে থাকা বাসনাকে বের করে আনার জন্যই তাঁর এই কাহিনির সূত্রপাত করা। এটা করতে গিয়ে তিনি নির্মল-হৈমবতীর কাহিনি উপন্যাসে সংযোজন করতে বাধ্য হয়েছেন। আবার অন্য মতে জীবানন্দের মতো নিষ্ঠুর জমিদারের পরিবর্তন দেখানোর জন্যই তিনি এই কাহিনি নির্মাণ করেছেন। উপন্যাসে ভৈরবী এবং জমিদার দুজনেই পরিবর্তিত হয়ে জীবনের ধর্মকে স্বীকার করে নিয়েছে এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। দুজনের প্রবলভাবে জীবনে ফিরে আসার গল্প বুনতে গিয়েই নানারকম দ্বন্দ্ব-সংঘাত বা চরিত্রকে লেখক কাহিনিতে স্থান দিয়েছেন। ফলত উপন্যাসটি শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠেছে যৌগিক প্লট বা compound plot-এর উপন্যাস। যৌগিক প্লটের উপন্যাসে মূল কাহিনির পাশাপাশি অন্যান্য কাহিনিও থাকে। মূল কাহিনির সমান্তরালে এক বা একাধিক কাহিনি সংযোজন করে মূল কাহিনিকে সার্থকভাবে প্রস্ফুটিত করা হয়। অর্থাৎ নির্মল-হৈমবতীর উপকাহিনি এই উপন্যাসকে যৌগিক বা জটিল প্লটের উপন্যাস করে তুলেছে। ফলত একাধিক চরিত্রও উপন্যাসে সন্নিবেশিত হয়েছে।

১২.৩ 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসের উপকাহিনি

এই উপন্যাসের প্রধান কাহিনি ভৈরবী-জীবানন্দকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এদের জীবনের কথাই, মানসিক জটিলতার কথা বলাই ঔপন্যাসিকের প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু এই মূল কাহিনিকে ভালো করে পাঠকের কাছে স্পষ্ট করার জন্য বা মূল কাহিনির চরিত্রের দোষ-গুণ স্পষ্ট করার জন্য অন্য একটি ক্ষুদ্রায়তন কাহিনিকে উপন্যাসে যোগ করার রীতি লেখকরা গ্রহণ করে থাকেন। যেমন 'গৃহদাহ' উপন্যাসে অচলার মনের দোলাচলতাকে স্পষ্ট করার জন্য মহিমের গ্রামের বাড়িতে সতী-সাধ্বী মৃণাল চরিত্রকে শরৎচন্দ্র হাজির করেছিলেন। 'চরিত্রহীন' উপন্যাসে সতীশ-সাবিত্রীর কাহিনির সমান্তরালে উপেন্দ্র-কিরণময়ীর কাহিনিকে লেখক এনেছিলেন। 'শেষপ্রশ্ন' উপন্যাসেও শরৎচন্দ্র শিবনাথ-কমলের পাশাপাশি অজিত-মনোরমার কাহিনিকে একইসঙ্গে এনেছেন। যদিও শেষপর্যন্ত এটি উপন্যাসে কমল-অজিত এবং শিবনাথ-মনোরমার কাহিনিতে পরিণত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁর একাধিক উপন্যাসে এই শাখাকাহিনি বা উপকাহিনিকে উপন্যাসে এনেছিলেন। এখন দেখা যাক, আমাদের আলোচ্য উপন্যাসের গঠনকে নির্মল-হৈমর উপকাহিনি কতটা দৃঢ় করেছে।

সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে নির্মল-হৈমর দাম্পত্য জীবন ষোড়শীকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে বলে মনে করেন না। তাঁর মতে "হৈম-নির্মলের দাম্পত্য-জীবনে ষোড়শীর লোভ করিবার মতো বিশেষ কিছু ছিল ইহা বিশ্বাস করা কঠিন"। [শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রা.লি., ২০১১-২০১২, পৃ. ১৩৫।] সমালোচক কবিশেখর কালিদাস রায়ও এই উপকাহিনি সংযোজনের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেছেন। আমাদের মতে এই উপকাহিনির একেবারেই প্রয়োজন ছিল না তা নয়। জীবানন্দের শান্তিকুঞ্জে গিয়ে বিস্মৃত স্বামীকে স্পর্শ করে সে ভৈরবীর নিয়মনিষ্ঠা থেকে বিচ্যুত হয়েছে। তার মনে সংসারের সাধ জেগেছে। চণ্ডীগড়ের ভৈরবী হওয়ার নিয়ম অনুযায়ী বিবাহের তিন রাত্রির পর আর স্বামীকে স্পর্শ করা যায় না। সেই কারণেই ভৈরবী আর মন্দিরের পুজোয় অংশগ্রহণ করেনি। কিন্তু

শান্তিকুঞ্জে সেদিন আর এমন কিছু ঘটেনি যার ফলে যোড়শী জীবানন্দকে স্বামী হিসেবে মেনে নিয়ে নতুন জীবন শুরু করবে। জীবানন্দের কথাতেও সেরকম কোনও স্বীকৃতি ছিল না। শুধু তাই নয় জীবানন্দকে ম্যাজিস্ট্রেটের হাত থেকে বাঁচানোর পরেও সে জনার্দন রায়দের ভৈরবীকে তাড়ানোর চক্রান্তে সামিল হয়েছিল।

শান্তিকুঞ্জের ঘটনার পরে আমরা মন্দিরে হৈমবতীকে পাই। হৈমর স্বামী-সন্তানসহ সুখী জীবনের ছবি দেখেই যোড়শী অলকাতে ফিরে যাবার অনুপ্রেরণা পেয়েছে। এ কথা যোড়শী স্বীকারও করেছে। ২২নং পরিচ্ছেদে জীবানন্দের নির্মলকে নিয়ে ঈর্ষাকাতর প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছে— " আমার যা-কিছু কল্পনা, যত কিছু আনন্দের ভাবনা, সে ত কেবল তাঁদের নিয়েই। তাঁদের দেখেই ত আমি সে যোড়শী আর নেই। এই যে চণ্ডীগড়ের ভৈরবী-পদ, যা ভাগ করে নেবার লোভে আপনাদের ছেঁড়াছেঁড়ির অবধি নেই, যে জন্যে কলঙ্কে দেশ আপনারা ছেয়ে দিলেন, সে যে আজ জীর্ণবস্ত্রের মত ত্যাগ করে যাচ্চি, সে শিক্ষা কোথায় পেয়েচি জানেন? সে ওইখানে। মেয়েমানুষের কাছে এ যে কত ফাঁকি, কত মিথ্যে, সে কথা ওঁদের দেখেই বুঝতে পেরেছি"। যদি হৈম-নির্মলের উপকাহিনি না থাকত তাহলে যোড়শী থেকে অলকা হবার মত জোরালো যুক্তি তার কাছে থাকত না। ১৯নং পরিচ্ছেদে হৈমকে লেখা চিঠি পাঠ করে জীবানন্দ অন্যরকম ইঙ্গিত করলে যোড়শীর মনের ভাব— "তাহার চক্ষের পলকে হৈমর ঘর-সংসারের চিত্র- তাহার স্বামী, তাহার ছেলে, তাহার বহু দাসদাসী, তাহার ঐশ্বর্য, তাহার সুন্দর-স্বচ্ছন্দ জীবনাযাত্রার ধারা— যে ছবি সে দিনের পর দিন কল্পনায় দেখিয়াছে—"। এই যে দিনের পর দিন নির্মল-হৈমর সুখী ঘর-সংসারের ছবি সে কল্পনায় দেখেছে এই উপকাহিনি না থাকলে কী করে সম্ভব হোত!

মাতঙ্গী ভৈরবীর ব্যভিচারী জীবনের ঘটনা জানা থাকা সত্ত্বেও তাকে গ্রামের মাতব্বররা ভৈরবীর পদ থেকে সরাতে চায়নি। জীবানন্দ-অলকার বিবাহটাও না হওয়ার মতোই হয়েছিল। এমনকি জীবানন্দ সেই বিবাহকে অস্বীকারও করেছে। বিবাহের রাত্রেই তার স্বামী বেপাত্তা হয়ে গিয়েছিল। যোড়শীর মতে নয়-দশ বছর বয়সে অলকার বিবাহ হয়েছিল। অর্থাৎ স্বামী ব্যাপারটি কী জিনিস অলকা সেদিন জানেওনি বোঝেওনি। সম্ভবত সেই বিস্মৃতকালের বিবাহ রাত্রির কথা মনে পড়ায় এবং সেই সময়কার স্মৃতি যোড়শীকে শান্তিকুঞ্জে বিহ্বল করেছিল। সে নিজেই সবকিছু পরিস্কার বুঝে উঠতে পারেনি। তার মন পরিবর্তনের বাকি কাজটা হয়েছে হৈমর দাম্পত্য জীবন দেখে। যোড়শী শান্তিকুঞ্জে জীবান্দকে মনে করিয়ে দিয়েছিল "আপনার মনেও হতে পারে তার মা তাকে আপনার বাহন বলে পরিহাস করতেন"। এইসব স্মৃতিই যোড়শীকে তার অতীতের ঘটনা মনে করিয়ে অভিভূত করে দিয়েছিল। আমাদের বক্তব্য হল ওই একদিনের দেখাতেই যোড়শী তার বাকি জীবনের গতিপথ স্থির করে নেয়নি। তার ভবিষ্যৎ ঠিক করার জন্য তার নিজের মনের উত্তর জানার জন্যই বেশ কিছুটা সময়ের প্রয়োজন ছিল। যে সময়ে হৈমর জীবন তাকে সাহায্য করেছে তার কী করা উচিত কী করা উচিত নয়। সুতরাং হৈম-নির্মলের উপকাহিনির প্রয়োজন উপন্যাসে অস্বীকার করা যায় না। তবে নির্মলের মনে যোড়শী সম্পর্কিত যে দুর্বলতা উপন্যাসে দেখানো হয়েছে তার কোনও প্রয়োজন ছিল না। সুতরাং উপকাহিনি মূল কাহিনিকে সার্থকতা দান করেছে 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসে। সমালোচক বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য এ বিষয়ে বলেছেন— "তবে একথাও ঠিক যে উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার জীবনে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষেত্রে হৈম-নির্মলের অন্তত কিছুটা ভূমিকা রয়েছে"। [বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য, 'শরৎচন্দ্রের দেনা পাওনা', গ্রন্থ বিকাশ, ২০১৯, পৃ. ১৬।] হৈমর দাম্পত্যজীবন যোড়শীর মনে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে এবং সেই দ্বন্দ্ব থেকে উত্তরণের কাহিনিই এই উপন্যাস। নাহলে শান্তিকুঞ্জের পর উপন্যাস আর অগ্রসর হোত না।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের ক্ষেত্রে দেখা যায় তিনি মূল পাত্র-পাত্রীর পূর্ব জীবনের একটা ইঙ্গিত উপন্যাসে দেন। আর পূর্ব জীবনের এই ইঙ্গিতই উপন্যাসে দ্বন্দ্ব বা জটিলতার সৃষ্টি করে। সম্পূর্ণরূপে পাঠকের কৌতূহলের নিরসন

করেন না। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে রাজলক্ষ্মী কীভাবে পিয়ারী বাঈজীতে পরিণত হল তার বিস্তৃত বিবরণ দেননি। কিন্তু এই রাজলক্ষ্মীর অতীত ইতিহাসের কারণেই শ্রীকান্তের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয় এবং উপন্যাসের কাহিনি তৈরি হয়। লেখকের সংযম এখানে লক্ষণীয়। 'দেনা-পাওনা'য় জীবানন্দ-অলকার বিবাহের কথা লেখক বলেছেন। কিন্তু তার বেশি তিনি কিছুই বলেননি। সংযম রক্ষা করেছেন। অথচ এই বিবাহের কারণেই উপন্যাস শান্তিকুঞ্জের পরেও অগ্রসর হয়েছে এবং জীবানন্দ-ষোড়শীর জীবনে সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এটা শরৎচন্দ্রের উপন্যাস রচনার একটা রীতি বা গঠনকৌশল। অর্থাৎ পাঠকের মনে প্রথম থেকেই একটা ঔৎসুক্য বা আগ্রহ শরৎচন্দ্র এই পথে তৈরি করে নেন। যা 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসের ক্ষেত্রেও তিনি সফলভাবে প্রয়োগ করেছেন। সমালোচক সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের আরও পর্যবেক্ষণ ছিল, নায়িকা চরিত্রের ক্ষেত্রেই শরৎবাবু বিশেষত এই রীতি অবলম্বন করে থাকেন। ষোড়শীর ক্ষেত্রেও এই মন্তব্য প্রযোজ্য।

১২.৪ 'দেনা-পওনা' উপন্যাসের ভাষা

শরৎচন্দ্রের প্রতিটি গল্প-উপন্যাসের ভাষাই সহজ-সরল। এটা ঠিক বিষয় অনুযায়ী ভাষার ধরনও নির্ধারিত হয়ে যায়। শরৎচন্দ্র যেসব বিষয় নিয়ে গল্প-উপন্যাস লিখেছেন তা খুব একটা জটিল বিষয়কে অবলম্বন করেনি। তাঁর পাত্র-পাত্রীরাও সাধারণ মানুষ। সমাজের উচ্চস্তরের মানুষকে নিয়ে তিনি খুব একটা টানাটানি করেননি। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো তৎসম শব্দবহুল সাধুভাষা তিনি ব্যবহার করেননি। রবীন্দ্রনাথের মতো শিক্ষিত বাঙালির মার্জিত ভাষাও ব্যবহার করেননি। সাধারণ মানুষের সাধারণ দ্বন্দ্ব-জটিলতার কথা সাধারণ ভাষাতেই লিখেছেন। তাঁর কাহিনি বয়নে অলংকারের ব্যবহারও সেরকম দেখা যায় না। 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসে তিনি ঔপন্যাসিকের বয়ান সাধুভাষাতেই রচনা করেছেন। কিন্তু উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীরা চলিত ভাষায় কথা বলেছেন। যেমন ১ম পরিচ্ছেদ থেকে উদাহরণ দেওয়া যাক- ''জীবানন্দ এতক্ষণ চুপ করিয়া শুনিতেছিলেন, আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিলেন, বিধবা হলে বুঝি ভৈরবীগিরি খারিজ হয়ে যায়?" লেখকের বয়ান ''জীবানন্দ এতক্ষণ চুপ করিয়া শুনিতেছিলেন, আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিলেন,"-সাধুভাষায় লেখা। জীবানন্দের উক্তি চলিত ভাষায় লেখা- ''বিধবা হলে বুঝি ভৈরবীগিরি খারিজ হয়ে যায়?" ভাষার সহজতা বা সরলতার কারণে পাঠককে কোথাও ঠোক্কর খেতে হয়নি। ভাব অনুযায়ী ভাষা বা শব্দ চয়ন করেছেন লেখক। গোপালচন্দ্র রায় তাঁর 'শরৎচন্দ্র' গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে 'দেনা-পাওনা'র ভাষা বিষয়ে বলতে গিয়ে শরৎচন্দ্রের সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে লম্পট জমিদার জীবানন্দ যখন প্রথম ভৈরবী ষোড়শীকে '' এরকম কান্নাও নতুন নয়, মেয়ে মানুষের ওপর আমার এওতটুকুও লোভ নেই— ভাল না লাগলে চাকরদের দিয়ে দিই"-ইত্যাদি ভাষা চয়ন ঠিক হয়নি। গোপালবাবু আরও 'সংযত' করে অংশটুকু লেখার কথা বলেছেন। তিনি এও বলেছেন এই ভাষা ব্যবহার করে লেখক 'নারীর অবমাননা' করেছেন। আমাদের মতে একজন লম্পট নারীলোলুপের মুখের ভাষা যেমন হওয়া উচিত লেখক সে ভাষাই ব্যবহার করেছেন। নারীর প্রতি শরৎচন্দ্রের সহমর্মিতা সব সময়ই থেকেছে, কিন্তু তা বলে লম্পট জীবানন্দের মুখের ভাষাকেও শুদ্ধ করতে হবে এটা হতে পারে না। তাতে বাস্তবতা লঙ্ঘিত হয়। তৃতীয় পরিচ্ছেদে জীবানন্দ ষোড়শীকে রাত্রে ঘরে বন্ধ করে রাখতে নির্দেশ দেয়। তখন জীবান্দের লোক ''মহাবীর তাড়া দিয়া বলিল, আরে ওঠনা মাগী- চোল। এই শুনে জীবানন্দ তীব্র প্রতিবাদ করে বলে ''জীবানন্দ ভয়ানক ধমক দিয়া কহিল, খবরদার শুয়োরের বাচ্চা, ভাল করে কথা বল। মহাবীরের মতো কর্মচারীর মুখের ভাষা যেমন স্বাভাবিক, জীবানন্দের ক্ষেত্রেও তাই। শুদ্ধ ভাষা প্রয়োগ করলে তা উপন্যাসে অশুদ্ধই হোত। লেখক নারী দরদী বলে সব চরিত্রের ভাষাতেই নারীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হবে

সবসময় এটা হতে পারে না। তাতে উপন্যাসের শিল্পরূপেরই ক্ষতি হয়। প্রতিটি চরিত্রকে লেখক তার সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী শব্দ নির্বাচন করে বর্ণনা করেছেন। গভীর পর্যবেক্ষণ শক্তি ও অনুভূতি দিয়ে তিনি ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন এই উপন্যাসে। ভাষার সরলতা এবং অলংকারের রহস্য ভেদ করে পাঠককে কাহিনিতে প্রবেশ করতে হয় না বলেই বোধহয় শরৎচন্দ্রের লেখা সমাজের সব স্তরের পাঠকের কাছে এতটা জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পেরেছে। ভাষার ক্ষেত্রে তিনি যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই লেখেন, অতিরিক্ত বর্ণনা দিয়ে কাহিনিকে বিপথে নিয়ে যান না বা পাঠকের মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটান না। 'দেনা-পাওনা'র ক্ষেত্রেও এ মন্তব্য সত্য। তাই পাঠক দ্রুত গতিতে এই উপন্যাস পাঠ করেও ফেলে।

১২.৫ 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসের সময়

উপন্যাসের সময়কাল মোটামুটি দশ মাস। সপ্তম পরিচ্ছেদে ষোড়শী যখন জীবানন্দের শান্তিকুঞ্জ থেকে বেরিয়ে এসেছিল সেই সময় লেখক প্রকৃতির বর্ণনা দিয়েছেন— "কিন্তু গেটের বাহিরে বসিয়ে দেখিল আর একপদও অগ্রসর হওয়া চলে না। এবার নাবী বর্ষায় কৃষকদের ধান্য-রোপণের কাজকর্ম তখনও মাঠে শেষ হইয়া যায় নাই, উহাদের মাঝখান দিয়া গ্রামের একমাত্র পথ"। 'নাবী' শব্দের অর্থ নির্দিষ্ট সময়ের পরে বা শেষে ইত্যাদি। সুতরাং এক বর্ষার শেষের কথা এখানে বলা হয়েছে। অর্থাৎ বর্ষা ঋতুর শেষে উপন্যাসের সূচনা। ষোড়শীর শান্তিকুঞ্জ থেকে বের হবার দিনটি ছিল জীবানন্দ চণ্ডীগড়ে প্রবেশ করার ষষ্ঠ দিন। কারণ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ শুরু হয়েছে- "জমিদার জীবানন্দ চৌধুরী মাত্র পাঁচদিন চণ্ডীগড়ে পদার্পণ করিয়াছেন,"। এই পঞ্চম দিনেই ষোড়শীকে জীবানন্দের কাছে ধরে আনা হয়েছিল। জীবান্দের চণ্ডীগড়ে প্রবেশ করা থেকেই উপন্যাসের সূচনা হয়েছে। অর্থাৎ এক বর্ষার শেষের দিকে উপন্যাসের কাহিনির সূচনা হয়েছে।

আবার ২৮নং পরিচ্ছেদের প্রথম অনুচ্ছেদের শুরু হয়েছে "অকস্মাৎ দিনকয়েকের অবিশ্রান্ত বারিপাতে" এবং ঠিক পরের অনুচ্ছেদের শুরুতেই আছে "শেষরাত্র হইতেই বর্ষণ থামিয়াছে, কিন্তু আকাশের চেহারা বদলায় নাই"। ধরে নেওয়া যায় এটা বর্ষাকালের বৃষ্টি। আরও প্রমাণ এই অনুচ্ছেদেই যখন ষোড়শী নৌকা করে জীবানন্দের কাছে আসে তখন লেখক নদীর বর্ণনা দিয়েছেন— "এ নদীতে নৌকা চলাচল অত্যন্ত বিরল। বৎসরের অধিকাংশ দিন যথেষ্ট জল থাকে না বলিয়াই শুধু নয়, বর্ষাকালেও একটানা খরস্রোতে যাতায়াতের সুবিধা বড় হয় না"। সুতরাং উপন্যাসের শেষও হচ্ছে বর্ষার আগমন দিয়ে। এক বর্ষার শেষে উপন্যাসের সূচনা এবং পরবর্তী বর্ষার শুরুতে উপন্যাসের সমাপ্তি হয়েছে। সব মিলিয়ে প্রায় দশ মাসের কাহিনি উপন্যাসে বিবৃত হয়েছে।

১২.৬ 'দেনা-পাওনা'র পল্লীসমাজ ও অর্থনৈতিক পরিকাঠামো

'দেনা-পাওনা' উপন্যাসে তৎকালীন বাংলার পল্লীসমাজের চিত্র বিম্বিত হয়েছে। ঠিক নির্দিষ্ট করে সময়কে ধরার মতো চিহ্ন উপন্যাসে লেখক দেননি। ব্রিটিশ শাসনাধীন বাংলার কথা বলা হয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেট কে সাহেবের নাম থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় ব্রিটিশ শাসিত ভারতের কথাই এখানে আছে। অন্যদিকে উপন্যাসের প্রকাশকাল এবং লেখার সময় ধরলে বিংশ শতাব্দীর প্রথম এবং দ্বিতীয় দশকের কথা ঔপন্যাসিকের মগ্নচৈতন্যে যে ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসে বাংলার পল্লী অঞ্চলে যে দলাদলি বা বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠী ক্রিয়াশীল থাকে জমিদারি ব্যবস্থায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়। শুধু এই উপন্যাস নয় 'মহেশ' গল্প এবং আরও অন্যান্য লেখায় আমরা পল্লী অঞ্চলের চিত্র পেয়েছি। 'দেনা-পাওনা'তেও জমিদারি ব্যবস্থায় শাসনাধীন গ্রামবাংলার কথা উঠে এসেছে। জমিদারের মর্জিতেই প্রজার বাঁচা-মরা নির্ভর করে। জমিদারের ভোগ-বিলাসের জন্য ঋণ হওয়া টাকা শোধ করতে প্রজার উপর শোষণ চালায় নায়েব-গোমস্তা। সে সময়ের গ্রাম-বাংলার ক্ষুদ্র কৃষক-প্রজার এই সঙ্কট দিয়েই উপন্যাসের সূচনা হয়। জমিদারের ঋণ শোধ করতে গোমস্তার উপর নির্দেশ জারি হয় দশ হাজার টাকা আট দিনের মধ্যে আদায় করে দিতে হবে। অর্থাৎ গোমস্তা এককড়ি নন্দী প্রজার উপর চাপ দিয়েই এই টাকা সংগ্রহ করবে। ফলত তার অত্যাচারের মাত্রা বাড়াতে হয়। কৃষক-প্রজা ভিটেমাটি ছাড়া হয়। গোমস্তা এককড়ি নন্দীর সম্পত্তি চক্রবৃদ্ধি হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এর মধ্যে অনেকেই থাকে ভূমিহীন কৃষক। অর্থাৎ অন্যের জমি চাষ করার বিনিময়ে বসবাসের সুযোগ পায়।

ইতিহাসের পাতায় চোখ রাখলে দেখা যায় ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিশ বাংলা, বিহার এবং ওড়িশায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন। এর ফলে নির্দিষ্ট খাজনা বা রাজস্ব ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে প্রদানের মাধ্যমে জমিদাররা চিরস্থায়ীভাবে জমির মালিকানা ভোগ করবে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়েও এই রাজস্বের হারের কোনও পরিবর্তন হবে না। বছরের শেষদিনে সূর্যাস্তের আগেই খাজনা রাজকোষে জমা করলে জমিদার বংশানুক্রমিকভাবে জমিদারিস্বত্ব ভোগ করবে। এই রাজস্ব জমিদার প্রজার কাছ থেকে কীভাবে আদায় করবে তা কর্নওয়ালিশ সাহেব বিধিবদ্ধ করে দেননি। ফলত সরকারের রাজস্ব মেটানোর কারণে বা ব্যক্তিগত চাহিদা মেটানোর স্বার্থে জমিদারের প্রজা শোষণের মাত্রা অনেকসময়েই লাগামছাড়া হয়ে যেত। যা আমাদের আলোচ্য উপন্যাসেও দেখি। এমনকি দেবোত্তর সম্পত্তিও যে জমিদারের লোলুপ দৃষ্টি থেকে রেহাই পেত না তাও আমরা উপন্যাসে দেখলাম। শুধু তাই নয়, চণ্ডীগড়ের দেবী চণ্ডীর জমি বিক্রি করে দিতেও দেখেছি উপন্যাসে। এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পুরোপুরি অবসান ঘটতে প্রায় ১৯৫০ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। এই আইনের সব থেকে খারাপ দিক ছিল বোধ হয় এই যে, কৃষকদের স্বার্থ এতে সুরক্ষিত ছিল না। জমিদার ইচ্ছা করলেই কৃষককে জমি থেকে উৎখাত করতে পারত। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কৃষক আন্দোলন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে ক্রমাগত দুর্বল করে দেয়। জমিদাররাও এই আইনকে পুরোপুরি মেনে নেয়নি। কারণ জমির চরিত্র অনুযায়ী রাজস্বের পরিমাণ এই আইনে স্থির করা হয়নি। প্রাকৃতিক দুর্যোগেও এই আইনে রাজস্বের পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকত।

জমিদার এবং কোম্পানি যেমন প্রজা বা কৃষকের মাথার উপর ছিল, ঠিক এর মাঝামাঝি কিছু স্বার্থগোষ্ঠীর জন্ম হয়েছিল। যারা হল মহাজন শ্রেণি। উপন্যাসে জনার্দন রায় হল এই মহাজন শ্রেণির প্রতিনিধি। এরা খাজনা পরিশোধে অপারগ কৃষককে যেমন সাহায্য করত, তেমনি জমিদারকেও সূর্যাস্তের আগে রাজস্ব পরিশোধের ব্যবস্থা করে দিয়ে জমিদারি রক্ষা করে দিত। ফলত জমিদারও অনেকসময় এই মহাজন শ্রেণির হাতের পুতুল হয়ে পড়ত। উপন্যাসে মহাজন জনার্দন রায় জমিদার জীবানন্দকে বারবার নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেছে, কিন্তু জীবানন্দের হঠাৎ পরিবর্তনে সে বিপদে পড়ে যায়। উপন্যাসে এই ঘটনা ঘটলেও বাস্তবে জীবানন্দের মতো হঠাৎ প্রজাদরদী হয়ে ওঠা জমিদার যে বিশেষ দেখা যেত না তা বলাই বাহুল্য। এই মহাজনরাই একসময় জমিদারকে সাহায্য করতে গিয়েই তার জমিদারি নিলামে তুলে নিজেই কিনে নিত। নিজেই জমিদার হয়ে যেত। এই মধ্যস্বত্বভোগী সম্প্রদায়কেও লেখক সুন্দরভাবে উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। এরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে-কোনো পথই যে অবলম্বন করতে পারে তার প্রমাণ বিপদের দিনে নিজের ব্যারিস্টার জামাই এবং মেয়েকে দিয়ে চরম শত্রু ভৈরবীকেও

কাজে লাগাতে গ্লানি বোধ না করায়। এই মহাজন শ্রেণি নিরক্ষর চাষীর জমি দখল করার নানারকম ফন্দি-ফিকির আবিষ্কার করেছিল। এদের হাতে দেবীর সম্পত্তিও যে সুরক্ষিত নয় তা লম্পট জমিদার জীবানন্দ পর্যন্তও বুঝতে পেরেছিল। একদিকে শিরোমণি মশায়কে নিয়ে মহাজন সর্বদা ওঠাবসা করছে এবং মন্দিরে নিজের নাতির মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের পূজা করাচ্ছে, অন্যদিকে সেই দেবীরই সম্পত্তি গ্রাস করার জন্য ষড়যন্ত্র করে এই মহাজন সম্প্রদায়।

সুতরাং লেখক শরৎচন্দ্র এখানে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব শরৎচন্দ্রের যেন পাঠকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। সচেতনভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে লেখক এখানে পল্লীবাংলার অর্থনৈতিক অবস্থার চিত্র তুলে ধরেছেন। এছাড়া প্রজাদের একজোট হওয়ার বার্তা এখানে আছে। সাগরদের মতো প্রজারা জমিদার-মহাজনদের বিরুদ্ধে লাঠি ধরতেও পিছপা হয় না। ভৈরবী এই প্রজাদের সংগঠিত করেছে। এমনকি জমিদারকে খতম করার কথাও ভৈরবীর মুখে শোনা গেছে। লেখকের এই রাজনৈতিক সচেতনতার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর এই উপন্যাস লেখাকালীন রাজনৈতিক কার্যকলাপের সাপেক্ষে। আমরা আগেই আলোচনা করেছি ১৯২০ থেকে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত শরৎচন্দ্র জাতীয় কংগ্রেসের রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। এই সময় তাঁর মধ্যে 'সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার উদয়' হয়েছিল বলে ড. অজিতকুমার ঘোষ '*শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্যবিচার*' গ্রন্থে মত প্রকাশ করেছেন। এ বিষয়ে তিনি আরও বলেছেন— ''দেনা-পাওনা' রচনাকালে সমাজতন্ত্রবাদের বীজ শরৎচন্দ্রের মনে ছিল বলিয়াই এই উপন্যাসে তিনি জমিদারের সঙ্গে প্রজাদের প্রত্যক্ষ সংঘাতের চিত্র আঁকিয়াছেন এবং দরিদ্র প্রজাদের বৈপ্লবিক সঙ্ঘশক্তির রূপও ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। 'দেনা-পাওনা'র পূর্বে শরৎচন্দ্র যে-সব গল্প-উপন্যাস লিখিয়াছেন সেগুলিতে বর্ণবৈষম্য এবং সামাজিক নীতি ও সংস্কারের উৎপীড়নের দিকই দেখাইয়াছেন"। (ড. অজিতকুমার ঘোষ, *শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্যবিচার*, দে'জ পাবলিশিং, ২০০০, পৃ. ২২১।) এর আগে তিনি সরাসরি রাজনীতির বিষয়কে কেন্দ্র করে 'পথের দাবী' উপন্যাস লিখেছেন। কিন্তু জমিদার-মহাজনের বিরুদ্ধে প্রজাদের সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনের প্রস্তুতি আমরা 'দেনা-পাওনা'য় দেখলাম। তিনি এর আগে পল্লী-বাংলার নানারূপ সংস্কার ও সামাজিক অনাচারকে লক্ষ্য করে উপন্যাস লিখলেও এই উপন্যাসেই তিনি কৃষকদের দুরবস্থার কথা তাদের মধ্য থেকেই উঠে আসা প্রতিবাদের রূপ দেখালেন। আর এই প্রতিবাদকে শক্তি যুগিয়েছে বাইরে থেকে আসা কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব নয়, সাম্যবাদী ভাবধারায় দীক্ষিত কোনো নেতা নয়; গ্রামের মন্দিরের ভৈরবী এই কাজ করেছে। যদিও ভৈরবী কিছু পড়াশুনা করেছিল বলে আমরা জীবানন্দের মুখে শুনি। তাই জীবানন্দ তাকে মরফিন লেখা পড়ে ওষুধ দিতে বলেছিল। 'বাংলাদেশে একটি সোস্যালিস্ট পার্টি গঠনের পরিকল্পনা' করেন শরৎচন্দ্র তা তাঁর রাজনৈতিক জীবনীকার শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় আমাদের জানিয়েছেন। সুতরাং 'দেনা-পাওনা' উপন্যাস লেখার সময় সাম্যবাদী রাজনৈতিক ভাবনা শরৎচন্দ্রের মধ্যে চলছিল অনুমান করা যায়। এই উপন্যাসে একদিকে তিনি ভৈরবী এবং জীবানন্দের জীবনের দাবি দেখিয়েছেন, অন্যদিকে জীবনের দাবি মানতে গিয়ে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনে জমিদারের বিরুদ্ধেও যে রুখে দাঁড়াতে হয় তাও দেখিয়েছেন। আরও একটি বিষয় লক্ষণীয় মন্দিরের ভৈরবী কৃষক-প্রজাদের পথ দেখিয়েছে লড়াই করার, অর্থাৎ বলতে পারা যায় ধর্মের পথ ধরেই প্রজারা নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয়েছে। কেবল তাই নয় প্রজাদের এই আত্মসচেতনতার পাঠ দিয়েছে কোনো পুরুষ নয়, একজন নারী।

'মহেশ' গল্পে গফুর কেবলমাত্র আল্লার কাছে অভিযোগ জানিয়ে জমিদারের অত্যাচারে গ্রাম ত্যাগ করে যেতে বাধ্য হয়েছিল। ব্রাহ্মণ জমিদার গফুরকে মানুষ বলে মনে করেনি। গফুরকে সাহায্য করতেও কেউ এগিয়ে আসেনি। কিন্তু 'দেনা-পাওনা'য় লেখক ভৈরবীকে দাঁড় করালেন গফুরের মতো দরিদ্র মানুষের পাশে। এও লক্ষণীয় ভৈরবী কৃষকদের পাশে দাঁড়ালেও অলকা কিন্তু এসবের মধ্যে আর থাকেনি। তাই জীবানন্দকে কোনোকিছু না ভেবেই হাত

ধরে নিয়ে গেছে। অর্থাৎ একজন ভৈরবীর শক্তিতে সমাজপতিদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো গেলেও একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে বোধহয় তা সম্ভব নয়, এরকম বার্তাই লেখক দিলেন। 'মহেশ' গল্পেও আমরা এর প্রমাণ পেয়েছি।

১২.৭ সামাজিক উপন্যাস হিসেবে 'দেনা-পাওনা' পাঠ

বিষয়বস্তুর দিক থেকে উপন্যাসের গোত্রবিচার করলে সামাজিক উপন্যাস, রাজনৈতিক উপন্যাস, ঐতিহাসিক উপন্যাস ইত্যাদি শ্রেণিবিভাগগুলি পাওয়া যায়। সামজিক উপন্যাস কাকে বলে? "... বিশেষভাবে যে উপন্যাসে সম্পূর্ণ বাস্তব সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের বিবরণ, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ তথা সামাজিক সমস্যা ও তজ্জনিত প্রতিক্রিয়া, ফলত চরিত্রসমূহের মানসবৃত্তের ভাঙচুর ইত্যাদি প্রাধান্য পায় তাকে আমরা সামাজিক উপন্যাস হিসেবে চিহ্নিত করে থাকি। ... উপন্যাসের সঙ্গে সমাজগতির সম্পর্কটি বাস্তব পরিবেশ ও লেখকের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির নিজস্বতায় পরিস্ফুট হয় 'সামাজিক উপন্যাসে'। লেখকের সমকালীন সমাজজীবনের চিত্র, সামাজিক সমস্যা, বিশেষ ও বাস্তব সমাজ-প্রেক্ষিতে বিভিন্ন চরিত্রের দ্বন্দ্ব-সংকট ইত্যাদি সামাজিক উপন্যাসের উপাদান। ... এ-জাতীয় উপন্যাসের চরিত্রেরা অধিকাংশই টাইপধর্মী ও উপন্যাসের বাস্তবতা/সমস্যায় আলোড়িত"। [কুন্তল চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, রত্নাবলী, ২০০৯, পৃ. ২৪৮।] এই উদ্ধৃতিটিকে সামজিক উপন্যাসের সংজ্ঞা বা বৈশিষ্ট্য হিসেবে ধরে দেখা যাক 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসটিকে সামাজিক উপন্যাস বলা যায় কিনা।

'দেনা-পাওনা' উপন্যাসকে বিষয়বস্তুর দিক থেকে সামাজিক উপন্যাসের শ্রেণিভুক্ত করা যায়। এই উপন্যাসে সামাজিক বিষয়ই স্থান পেয়েছে। কোনো রাজনৈতিক ঘটনা এই উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দুতে নেই বা কোনো ঐতিহাসিক ঘটনাও এই উপন্যাসের মূল লক্ষ্য নয়। চণ্ডীগড় নামক এক গ্রামের জমিদার এবং গ্রামের মন্দিরের ভৈরবীকে কেন্দ্র করে যে সামাজিক জটিলতা তৈরি হয়েছে তাই-ই এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে গ্রামের ভৈরবী ও জমিদারের ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যা বা জটিলতা। ভৈরবী জমিদারের গৃহে রাত্রিযাপন করেছে; যা ভৈরবীর পদে থেকে গর্হিত কাজ- এই নিয়েই উপন্যাসে সামাজিক জটিলতা তৈরি হয়েছে বা সমাজে আলোড়ন তৈরি হয়েছে। সুতরাং সামাজিক বিষয়ই যেহেতু এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় বিষয় তাই এটিকে নিঃসন্দেহে সামাজিক উপন্যাস বলা যায়। অর্থাৎ সমকালীন সামাজিক সমস্যা, বিভিন্ন চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব ইত্যাদি এই উপন্যাসে স্থান পাওয়ায় এটিকে সামাজিক উপন্যাস বলা যায়।

আবার কিছু 'টাইপ' চরিত্রও উপন্যাসে দেখা যায়। টাইপ চরিত্র বলতে বোঝায় যে চরিত্রদেরকে সব সময় একই ভূমিকায় দেখা যায় বা যারা উপন্যাসে একই ধরনের ভূমিকা পালন করে থাকে। 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসে সমাজপতি সর্বেশ্বর শিরোমণি, গোমস্তা এককড়ি নন্দী ইত্যাদি টাইপ চরিত্র। শিরোমণি বা গোমস্তা সেকালের সব সমাজেই বা এই বিষয়বস্তু নিয়ে লেখা সব উপন্যাসেই একই ধরনের ভূমিকা পালন করে থাকে। গোমস্তা বললেই আমাদের চোখের সামনে একটি নির্দিষ্ট ধরনের বা টাইপের চরিত্রের কথা মনে পড়ে। সুতরাং সামাজিক উপন্যাসের একটি বৈশিষ্ট্য টাইপ-ধর্মী চরিত্র; তাও এই উপন্যাসে বর্তমান। সুতরাং সবদিক বিচার করে 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসটিকে সামাজিক উপন্যাস বলা যায়।

১২.৮ ভৈরবী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিমত

'দেনা-পাওনা'র ভৈরবী যে গ্রাম-বংলার সত্যিকারের ভৈরবী চরিত্র হয়নি তা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের

৪ ফাল্গুন এক চিঠিতে শরৎচন্দ্রকে জানিয়েছিলেন— ''যে কাহিনীর মধ্যে আমাদের পাড়াগাঁয়ের সত্যকার ভৈরবী আত্মপ্রকাশ করতে পারত, সে এই কাহিনী নয়। সৃষ্টিকর্তারূপে তোমার কর্তব্য ছিল এই ভৈরবীকে একান্ত সত্য করা, লোকরঞ্জনকর আধুনিক কালের চলতি সেন্টিমেন্ট মিশ্রিত কাহিনী রচনা করা নয়"। যদিও রবীন্দ্রনাথ এই মন্তব্য করেছিলেন 'দেনা-পাওনা'র নাট্যরূপ 'ষোড়শী' পাঠ করে। তবে নাটকের সঙ্গে উপন্যাসের কাহিনি এক থাকলেও চার অঙ্কের নাটকে কিছু ঘটনা আগে-পরে করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মূল অভিযোগ ছিল ভৈরবী চরিত্রের বাস্তব রূপ নিয়ে। উপন্যাস বা নাটক কোথাও ভৈরবীর ভৈরবী রূপের কিন্তু কোনো প্রমাণ আমরা পাইনি। ভৈরবীর বাইরের রূপটাই উপন্যাসে বাস্তব হয়ে উঠেছে, কিন্তু দেবীচণ্ডীর মন্দিরে ষোড়শীর ভৈরবীরূপের কোনো পরিচয় উপন্যাসে পাওয়া যায়নি। রবীন্দ্রনাথ ভৈরবী যেসব অনুষঙ্গ নিয়ে সত্যকার ভৈরবী হয়ে উঠতে পারত তার অভাবের কথাই বলেছেন। আসলে যথাযথ ভৈরবী চরিত্র চিত্রণের থেকেও শরৎচন্দ্রের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়েছিল তার মধ্যেকার দ্বন্দ্ব। যে দ্বন্দ্ব উপন্যাসকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেছে। ষোড়শীর চরিত্রে ভৈরবী সত্তা এবং সাধারণ নারী-সত্তার দ্বন্দ্ব দেখানোই শরৎচন্দ্রের মূল লক্ষ্য ছিল। তাই পল্লীসমাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ (detailing) ভৈরবী চরিত্র চিত্রণ নিয়ে শরৎচন্দ্র বেশি ভাবেননি। ভৈরবীর তান্ত্রিক আচার-আচরণ নিয়েও একটি কথাও শরৎচন্দ্র বলেননি। রবীন্দ্রনাথের পর্যবেক্ষণ একেবারে ভুল হতে পারে না, তার অন্যতম প্রমাণ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ডাইনীর বাঁশী' গল্পের ডাইনিকে চিনে নিতে তিনি কিন্তু ভুল করেননি। অনেকে ডাইনীকে বিদেশের ধার করা বললেও রবীন্দ্রনাথ প্রতিবাদ করে জানান তারাশঙ্করের ডাইনী গ্রাম-বাংলার দেখা ডাইনী। আবার শিশিরকুমার ভাদুড়ী 'ষোড়শী' অভিনয়ের সময় জীবানন্দের মৃত্যু ঘটান নাটকে সঙ্গতি আনার জন্য।

১২.৯ 'দেনা-পাওনা' উপন্যাস পাঠের প্রাসঙ্গিকতা

উপন্যাসটি লেখা হয়েছে ১৯২১-২২ সালে এবং প্রকাশিত হয়েছে ১৯২৩ সালে। অর্থাৎ উপন্যাসটির রচনাকাল থেকে অনেকটা সময় আমরা অতিক্রম করে এসেছি। ফলত সময়-সমাজ সবকিছুরই আমুল পরিবর্তন ঘটে গেছে এবং সেটাই স্বাভাবিক। চলিষ্ণুতাই জীবনের ধর্ম। এখন আমাদের মনে প্রশ্ন উঠবে সেকালের এরকম একটা উপন্যাস পড়ব কেন? আমাদের মনে রাখতে হবে সাহিত্য সমাজের আয়না। অর্থাৎ যে সময় গল্প-উপন্যাস লেখা হচ্ছে সেই সময়ের ছবি ওই গল্প-উপন্যাসে ধরা পড়ে। আমাদের 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসটিও এর ব্যতিক্রম নয়।

আমরা ইতিহাস পাঠ করি অতীতের ঘটনা সাল-তারিখসহ জানার জন্য। কিন্তু সামাজিক যে ইতিহাস তা আমরা সবসময় ইতিহাসের পাতায় জানতে পারি না। সেই সামজিক ইতিহাসকে জানতে হলে সাহিত্য পাঠের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। 'দেনা-পাওনা'য় একদিকে গ্রামীণ সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে পারি। অন্যদিকে মন্দিরের এই ভৈরবীপ্রথার মতো যে প্রথা প্রচলিত ছিল তাও জানতে পারলাম। চণ্ডীগড়ের মন্দিরের ভৈরবীকে কেন্দ্র করে মহাজন-জমিদার এবং ভৈরবীর মধ্যেকার যে রাজনীতি তা সাহিত্য পাঠেই জানা সম্ভব। সেই সময়কার কৃষিনির্ভর অর্থনীতির কথাও জানা যায় এই উপন্যাসে। জমিদারি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল সে সবের পশ্চাৎপটে যে দীর্ঘ ঐতিহাসিক পটভূমিকা আছে তা এই উপন্যাসে কৃষকদের দুরবস্থা দেখলেই বোঝা যায়। ভূমিহীন কৃষকদের এই দুরবস্থা স্বাধীনতার পরেও যে বজায় ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় যখন দেখি, বিনোবা ভাবে (১৮৯৫-১৯৮২)-কে পঞ্চাশের দশকে ভূদান যজ্ঞ করে ভূমিহীন কৃষকদের হাতে জমি তুলে দিতে হয়।

ঐতিহাসিকরা রাজা-রাজড়ার বড়ো বড়ো ইতিহাসের ঘটনা নিয়ে যখন আলোচনা করে, সাহিত্য তখন কোনো

গ্রামের এই প্রান্তিক ইতিহাসকে পাঠকের গোচরে আনে। সেই সময়কার গ্রামের মন্দিরের প্রথা, জমিদার-মহাজনের গ্রামের মানুষের জমি দখল করার মানসিকতা ইত্যাদি জানার জন্য আমাদের এই উপন্যাস পাঠ করতে হবে। সুতরাং 'দেনা-পাওনা' উপন্যাস পাঠ করে যেমন আমরা সাহিত্যের রস আস্বাদ করি, ঠিক একই সঙ্গে সেকালের সামাজিক ইতিহাস সম্বন্ধে আমরা জানতে পারি। তাই একালেও এই উপন্যাস পাঠের প্রয়োজনীয়তা আছে। আমাদের পূর্ববর্তী সমাজ কেমন ছিল, সেই সমাজ বিবর্তনের পথে আজ কোথায় এসেছে তাও জানা আমাদের কর্তব্য।

১২.১০ সংক্ষীপ্ত টীকা

ভৈরবী : দশমহাবিদ্যার অন্যতম রূপ। সংগীতের প্রাতঃকালীন রাগ। শৈব সন্ন্যাসিনী। ভয়ঙ্কর, ভীষণ ইত্যাদি।

দশমহাবিদ্যা- কালী, তারা, ষোড়শী, ভৈরবী, মাতঙ্গী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী।

দেবোত্তর সম্পত্তি : দেবতার সেবার জন্য প্রদত্ত সম্পত্তি। এই সম্পত্তিতে জমিদার বা সরকারের কোনো অধিকার থাকে না। এরূপ জায়গা ব্যক্তিগত মালিকানার মধ্যেও পড়ে না। প্রকৃতপক্ষে দেবতা বা ঈশ্বর এই সম্পত্তির মালিকানা ভোগ করে থাকে। ফলত দেবতার সেবায়েত যারা থাকে তারাই এই সম্পত্তির দেখাশোনা করেন। 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসে ভৈরবী ছিলেন এরকমই একজন সেবায়েত।

অলকা : ধনদেবতা কুবেরের পুরীর নাম অলকা। আবার আট-দশ বছরের মেয়েকেও বোঝায়। উপন্যাসে জীবানন্দের সঙ্গে অলকার বিবাহ হয়েছিল নয়-দশ বছর বয়সে। তারপরে সে ভৈরবীতে পরিণত হয়। সুতরাং লেখক যথেষ্ট ভাবনা-চিন্তা করেই অলকা নাম দিয়েছেন।

১২.১১ অনুশীলনী

রচনাধর্মী প্রশ্ন

১। 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসের নামকরণ কতদূর সার্থক তা ব্যাখ্যাসহ আলোচনা করুন।

২। উপন্যাসের মূল বক্তব্য আলোচনা করুন।

৩। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র দুটি সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

৪। 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসে উপকাহিনি সংযোজন কতদূর সার্থক হয়েছে বলে আপনি মনে করেন তা ব্যাখ্যা করুন।

৫। জনার্দন রায় এবং সর্বেশ্বর শিরোমণির টাইপ চরিত্র চিত্রণ কতদূর সার্থক হয়েছে বলে আপনি মনে করেন তা লিখুন।

৬। 'দেনা-পাওনা'র পল্লীসমাজ চিত্রণ কতদূর সার্থক হয়েছে বলে আপনি মনে করেন তা ব্যাখ্যা করুন।

৭। ষোড়শীর ভৈরবীর পদ ছাড়ার কারণ কী বলে আপনি মনে করেন তা যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করুন।

৮। জীবানন্দ চরিত্রের রূপান্তরের কারণ কী তা ব্যাখ্যা করুন।

৯। 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসের গঠনশৈলী বিচার করুন।

১০। 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসে ফকির সাহেব চরিত্রটি বিশ্লেষণ করুন।

১১। লেখখ শরৎচন্দ্রের বাল্য ও কৈশোরকাল বিষয়ে আলোচনা করুন। পরবর্তী সাহিত্যিজীবনকে এই কালপার্যায় কীভাবে প্রভাবিত করেছিল?

১২। শরৎচন্দ্রের বড়ো হয়ে ওঠার পর্যায়গুলো কীভাবে তাঁর লেখনীকে প্রভাবিত করেছে তা আলোচনা করুন।

১৩। 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসে ফকির সাহেব চরিত্রটির গুরুত্ব কতখানি তা বিশ্লেষণ করুন।

১৪। প্রফুল্ল চরিত্রটির উপন্যাসে অবদান কতটা তা আলোচনা করুন।

১৫। 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসে সময়ের যে পটচিত্র ধরা পড়েছে তা আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন

১। 'দেনা-পাওনা' উপন্যাস অবলম্বনে ষোড়শীর ভৈরবী-পূর্ব জীবনের ইতিহাস বিবৃত করুন।

২। ব্যারিস্টার নির্মল বসু ও ষোড়শীর সম্পর্ক আলোচনা করুন।

৩। চণ্ডীগড়ের ভৈরবীপ্রথা বিষয়ে আলোচনা করুন।

৪। চণ্ডীগড়ের বর্ণনা সংক্ষেপে লিখুন।

৫। প্রফুল্ল চরিত্রটি সম্বন্ধে সংক্ষেপে লিখুন।

৬। উপন্যাসে ফকির সাহেব চরিত্রটি কতদূর গুরুত্বপূর্ণ তা সংক্ষেপে লিখুন।

৭। চণ্ডীগড়ে আসার আগে জীবানন্দ চরিত্র সম্বন্ধে যা জানা যায় তা লিখুন।

৮। উপন্যাসে যে দুটি চিঠির কথা এসেছে সে বিষয়ে আলোচনা করুন।

৯। উপন্যাসে গ্রামীণ অর্থনীতির যে চিত্র ধরা পড়েছে তা লিখুন।

১০। বর্তমান সময়ে উপন্যাসটির পাঠের প্রাসঙ্গিকতা কোথায় তা সম্বন্ধে নিজের মতামত লিখুন।

১১। ভৈরবী চরিত্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিমত কতদূর যুক্তিসঙ্গত বিচার করুন।

১২। দেবোত্তর সম্পত্তি বলতে কী বোঝায়? প্রসঙ্গত বিষয়টির উপন্যাসে গুরত্ব কতখানি তা আলোচনা করুন।

১৩। 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসের নাট্যরূপ নিয়ে শিবরাম চক্রবর্তী এবং শরৎচন্দ্রের মধ্যেকার বিতর্কটি আলোচনা করুন।

১৪। 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসে বাংলার পল্লীসমাজের জমিদারি ব্যবস্থার যে চিত্র ধরা পড়েছে তা আলোচনা করুন।

১৫। 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসের ভাষা বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

১২.১২ সহায়ক গ্রন্থ

১। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড।

২। ড. অজিতকুমার ঘোষ, *শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্যবিচার*, দে'জ পাবলিশিং।

৩। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা: ৫২*, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।

৪। শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, *শরৎচন্দ্র*, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ।

৫। গোপালচন্দ্র রায়, *শরৎচন্দ্র*, ৪র্থ খণ্ড, নয়া উদ্যোগ।

৬। ক্ষেত্র গুপ্ত, *বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস*, ৩য় খণ্ড, গ্রন্থনিলয়।

৭। হুমাউন কবীর, শরৎসাহিত্যের মুলতত্ত্ব

মডিউল—২ (খ)
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : পদ্মানদীর মাঝি

একক-১৩ □ লেখক পরিচিতি—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

গঠন

১৩.১. উদ্দেশ্য
১৩.২. প্রস্তাবনা
১৩.৩. লেখকের ব্যক্তিজীবন ও পারিবারিক ঐতিহ্য
১৩.৪. লেখকের শিল্পীসত্তা
১৩.৫. লেখকের সামগ্রিক উপন্যাস তালিকা
১৩.৬. সারাংশ
১৩.৭. অনুশীলনী
১৩.৮. গ্রন্থপঞ্জি

১৩.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে

- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক প্রেক্ষাপট ও তাঁর বাংলা সাহিত্যে আবির্ভাবের কাল সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- লেখকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও তাঁর সাহিত্যিকসত্তা সম্পর্কে অবহিত হবেন।
- লেখকের জীবনের ইতিবাচক ও নেতিবাচক ঘটনা, নানান সংকট এবং বিপন্ন মানসিকতার পরিচয় পাবেন।
- লেখকের রচিত উপন্যাসসমূহের তালিকা পাওয়া যাবে।
- লেখকের শিল্পীমানস সম্পর্কে এক স্বচ্ছ ধারণা গঠন করতে পারবেন।
- লেখকের সামগ্রিক সাহিত্যসৃজন এবং তাঁর ব্যক্তিজীবনের গতি পরিবর্তন কীভাবে তাঁর রচনায় প্রতিফলিত হয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাবেন।
- উপন্যাসটি রচনাপর্বে লেখকের বিশেষ মানসিকতার পর্বটিকে বুঝতে পারবেন।
- সমকালীন বাংলা উপন্যাস ধারার ক্ষেত্রে এই উপন্যাসটির স্বাতন্ত্র্য ও অভিনবত্ব চিহ্নিত করতে পারবেন।
- উপন্যাসের কাহিনিসূত্রটিকে সংক্ষেপে চিহ্নিত করতে পারবেন।
- এটি আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবে সার্থক কি না তা অবহিত হতে পারবেন।
- উপন্যাসে রোমান্টিকতার অস্তিত্ব ও প্রভাব সম্পর্কে একটা ধারনা গঠন করতে পারবেন।
- উপন্যাসের চরিত্র নির্মাণে লেখকের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে পরিচিত হতে পারবেন।

- কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে কুবের চরিত্রের সার্থকতা বিচার করতে পারবেন।
- উপন্যাসে মালা চরিত্রের প্রয়োজনীয়তা ও বিশেষত্বগুলির সঙ্গে অবহিত হতে পারবেন।
- কপিলা চরিত্রটি কুবেরের জীবনের নিয়ন্তা হিসেবে কতখানি গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে এবং তার সাথে বাংলা নারী চরিত্রসমূহের মধ্যে কপিলা চরিত্রের অভিনবত্ব বিচার করতে পারবেন।
- হোসেন মিয়ার মহত্ত্ব ও শয়তানির সহাবস্থানে এই উপন্যাসের সর্বাপেক্ষা জটিল চরিত্র হিসেবে আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করবে।
- অপ্রধান চরিত্র হিসেবে রাসু ও যুগল চরিত্রের সার্থকতা বিচার করতে পারবেন।
- উপন্যাসে বিধৃত নিয়তিবাদ সম্পর্কে বিশদে ধারণা অর্জন করতে পারবেন।
- উপন্যাসের গঠন, কাহিনির বিস্তার, ঘটনাবলির স্থানিক পরিমণ্ডল এবং কাল সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা অর্জন করতে পারবেন।
- কাহিনির উপস্থাপনাভঙ্গি এবং বিন্যাস প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে লেখকের মূল উদ্দেশ্য বুঝতে পারবেন।
- উপন্যাসে যে পূর্ববঙ্গীয় উপভাষা ব্যবহৃত হয়েছে তার যৌক্তিকতা ও বাস্তবতা সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন।
- উপন্যাসটিতে গান ব্যবহারের প্রাসঙ্গিকতা ও সার্থকতা বিচার করতে পারবেন।

১৩.২ প্রস্তাবনা

বাংলা কথাসাহিত্যে যে তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি যাঁরা রবীন্দ্রযুগে আবির্ভূত হয়েও নিজেদের এক স্বতন্ত্র ঘরানা তৈরি করেছিলেন, সেই তিনজন হলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১) এবং সর্ব কনিষ্ঠ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬)। এঁদের মধ্যে সবদিক দিয়েই আধুনিক ও জটিল জীবনের রূপকার হলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম হয় ১৯ মে, ১৯০৮ সালে, জীবনাবসান হয় ৩রা ডিসেম্বর, ১৯৫৬। মাত্র আটচল্লিশ বছরের জীবনকাল তাঁর। সৃজনশীল, প্রতিভাধর মানুষের পক্ষে এই ব্যাপ্তিকাল মোটেই পর্যাপ্ত নয়। তবু এই সংক্ষিপ্ত জীবনকালের মধ্যেই তিনি উপন্যাস, ছোটগল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ও নিবন্ধ রচনার ধারায় স্বকীয়তায় উজ্জ্বল এক বিশাল রচনার সম্ভার রেখে গেছেন। সাহিত্যে ভাবালুতা বর্জনের আদর্শকে তিনি গ্রহণ করে এক ব্যতিক্রমী ও বিরল সাহিত্যিকসত্তা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও প্রতিভা আলোচনা করার সময় আমাদের মনে পড়ে আরও এক প্রতিভাধারী বাঙালি সাহিত্যিকের কথা। তিনি হলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। সমকালীন অন্যান্য সাহিত্যিকদের অতিক্রম করে জীবনদৃষ্টিকে অনাগত ভবিষ্যতে প্রসারিত করা, দারিদ্র্য ও অসুস্থতার সঙ্গে আমৃত্যু সংগ্রাম, তীব্র মদ্যাসক্তি এবং উভয়েরই অপ্রত্যাশিত সংক্ষিপ্ত জীবনকাল এক অদ্ভুত ঘটনাচক্রের যোগাযোগ বলে আমাদের মনে হয়। বাংলা সাহিত্যকে প্রথানুগত্যের পথ থেকে স্বতন্ত্র পথে চালিত করার কৃতিত্বও তাঁদের উভয়েরই প্রাপ্য।

তবে মধুসূদন দত্ত সমাজ পরিবর্তনের কোনো স্বপ্ন নিয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হননি, যা তাঁর উত্তরসূরী হিসেবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় আমরা দেখতে পাই। মানিক আপোশহীন মনোভাবে বরণ করে নিয়েছিলেন দারিদ্র্যকে। সাধারণ মানুষের কথা বলতে গিয়ে তিনি নিজেকেও তাদের মতোই একজন করে তুলেছিলেন। মানুষের

প্রতি, মানবসমাজের প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাবোধ থেকেই তিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁর অমূল্য সম্পদরূপ উপন্যাসগুলি। জীবনের জটিল দুরূহ জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজতে খুঁজতে তিনি মানবজীবনের কাছে এসেছেন। হয়ে উঠেছেন জীবনদরদী লেখক।

১৩.৩ লেখকের ব্যক্তিজীবন ও পারিবারিক ঐতিহ্য

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯০৮ সালের ২৯ মে সাঁওতাল পরগণার দুমকায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা নীরজাসুন্দরী দেবী। এঁদের আদি নিবাস ঢাকার বিক্রমপুরের মালবাদিয়া গ্রামে। পিতা ডেপুটি রেজিস্ট্রার ছিলেন বলে নানান জায়গায় বদলি হতে হয়েছিল তাঁকে। তাঁর আট পুত্র ও ছয় কন্যা সন্তানের মধ্যে মানিক ছিলেন পঞ্চম পুত্র। মানিক মাত্র ষোল বছর বয়সে মাতৃহীন হন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আসল নাম প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। জীবনের প্রথম গল্প 'অতসীমামী' প্রকাশের সময় ছদ্মনাম 'মানিক' ব্যবহার করেছিলেন। আকস্মিকতা ও ভাগ্য শেষ পর্যন্ত তাঁকে 'মানিক' নামেই প্রতিষ্ঠা এনে দিয়েছিল।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতার সরকারি চাকরির বদলির কারণে কোথাও দীর্ঘ দিন থাকা হয়নি, তাই মানিকের লেখাপড়াও হয়নি খুব বাঁধাধরা নিয়মে। ফলে তাঁর স্কুলজীবনটা বেশ ছন্নছাড়া বলা যায়। তাঁর প্রথম শিক্ষারম্ভ হয় কলকাতার মিত্র ইন্সটিটিউশনে, তাঁর বড়দাদা সুধাংশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে। কিন্তু চাকরির কারণে তিনি কলকাতার বাইরে চলে যাওয়াতে শেষ পর্যন্ত পিতার কাছেই মানিককে ফিরে যেতে হয়। এইভাবে কখনো টাঙ্গাইল, কখনো মহিষাদল বা মেদিনীপুরের নানা স্কুলে ঘুরে শেষ পর্যন্ত তিনি ১৯২৬ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাঁর ছন্নছাড়া স্কুলজীবন শেষ হয়। পরবর্তীকালে ১৯২৮ সালে বাঁকুড়ার ওয়েসলিয়ন কলেজ থেকে আই.এস.সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯২৮ সালে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে অঙ্কে অনার্স নিয়ে বি.এস.সিতে ভর্তি হন। তিনি মনে প্রাণে বিজ্ঞানশিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্লেষণপ্রিয়তা তাঁর পরবর্তীকালের সাহিত্যকর্মে প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছিল। স্নাতকপর্ব শেষ হওয়ার আগেই 'বিচিত্রা' পত্রিকায় তাঁর 'অতসীমামী' গল্পটি প্রকাশিত হয়। এই গল্পই ঘুরিয়ে দিল মানিকের জীবনের মোড়। তিনি একাধিকবার চেষ্টা করেও বি.এস.সি পাশ করতে ব্যর্থ হন। কারণ তখন তিনি সাহিত্যসৃষ্টিতে বিভোর। এরপর থেকে তিনি সাহিত্যরচনায় তাঁর সম্পূর্ণ মনোনিবেশ প্রয়োগ করেন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাল্যকালে যেমন দুরন্ত ও খেয়ালি প্রকৃতির ছিলেন, পরিণত বয়সে এসে তিনি নির্জন প্রকৃতিতে রূপান্তরিত হলেন। তাঁর কঠোর ব্যক্তিত্ব, আত্মশক্তি সচেতনতা, রহস্যময় ঔদাসীন্য তাঁকে চারপাশের মানুষদের থেকে স্বতন্ত্র করে তুলেছিল। এই অনন্যতা তাঁর সৃষ্টিসম্ভারকেও সমকালীন অন্যান্য লেখকদের রচনার থেকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দান করেছিল। মাত্র ষোল বছর বয়সে তিনি মাকে হারান। শৈশবসংক্রান্ত যাবতীয় স্মৃতিচারণায় তাঁর মাতৃপ্রসঙ্গ গৌণ হলেও পিতৃপ্রসঙ্গ কিন্তু প্রাধান্য নিয়েই উপস্থিত হয়েছে। কুড়ি বছর বয়স থেকে নিরন্তর সাহিত্যরচনা, ত্রিশ বছর বয়সে বিবাহ, চারটি সন্তানের পিতৃত্ব, ১৯৪৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান তাঁর জীবনের ইতিবাচক ঘটনা। তাঁর রচনার সাফল্যের উপযুক্ত আর্থিক প্রতিদান তিনি না পেলেও অগণিত মানুষের মধ্যে তিনি জনপ্রিয়তা অর্জনে অবশ্যই সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু দুভার্গ্যবশত মানিকের শরীরে প্রবেশ করেছিল দুরারোগ্য ব্যাধি, যার থেকে তিনি মুক্তি পাওয়ার জন্য সুরাসক্তিতে ডুব দেন। আট ভাই ও ছয় বোনের অন্তর্গত

একজন মানুষের ক্ষেত্রে উপযুক্ত স্নেহ ও পরিচর্যার অভাবই তাঁর জীবনের মূল বিপর্যয়ের ভিত্তি স্থাপন করেছিল। অবশেষে ৩ ডিসেম্বর, ১৯৫৬ সালে তিনি পরলোক গমন করেন। মাত্র আটচল্লিশ বছরের আয়ু ছিল তাঁর। তবে এই সংক্ষিপ্ত জীবনের মধ্যেই অভাবনীয় সাহিত্যসৃষ্টি করে তিনি আপামর বাঙালির মনে চির স্মরণীয় হয়ে আছেন।

১৩.৪ লেখকের শিল্পীসত্তা

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পারিবারিক ইতিহাস গ্রামনির্ভর, সামন্ত সভ্যতাপুষ্ট, প্রাচীন মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে ক্রমশ ঔপনিবেশিক ব্যবস্থাজাত, ইংরেজি শিক্ষিত আধুনিক মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে রূপান্তরিত। এই জাতীয় পরিবর্তনে একদিকে যেমন প্রাচীনত্বের অংশবিশেষ কিছুটা হলেও আমাদের মধ্যে থেকে যায়, তেমনি অন্যদিকে নতুন আধুনিক জীবনের উদার মানসিকতা আমাদের প্রভাবিত করে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনেও প্রাচীন মূল্যবোধ যেমন তাঁকে তাঁর পারিবারিক সীমায় আবদ্ধ করে রেখেছিল, তেমনি ফ্রয়েড ও মার্কস নব্য মানবতার দীক্ষা দান করেছিল। সমগ্র মানবজীবন সম্পর্কে এক নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি তিনি গ্রহণ করেছিলেন। তার ফলে তাঁর রচনায় যে চিন্তাচেতনা, আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি পরিলক্ষিত হয় তার স্বরূপ একান্তভাবে অভিনবত্বের দাবি করে। বাংলা সাহিত্যে সমাজ-বাস্তবতার যে গভীর রূপায়ণ তিনি করেছেন, তা আজ অবধি বিরল।

কথাসাহিত্যে 'কল্লোল'-পরবর্তীর প্রথম মহাবিস্ময় হলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। 'কল্লোল', 'কালিকলম' ও 'প্রগতি'র পাতায় ভাববিদ্রোহী তরুণের দল নতুন দৃষ্টি নিয়ে নতুন পথের সন্ধানে যে যাত্রা শুরু করেছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ে এসে তার চরম সার্থকতা দেখা দিল। গোত্রে ও ধর্মে কল্লোলীয়। স্বপ্নে ও সাধনায় 'কল্লোল'-এরই পরিণাম। বস্তুত, 'কল্লোল'-এর সমস্ত শক্তি ও বৈশিষ্ট্য যেন সংহতিবদ্ধ হতে দেখা দিল এই নতুন প্রতিভার মধ্যে। তারুণ্যের দুঃসাহসী কল্পনার সঙ্গে শিল্পীর সংহতিবোধ মিলিত হল। কলকাতা-বিকেন্দ্রিত আঞ্চলিক সাহিত্যের যে হাতছানি শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সৃষ্টিতে প্রথম দেখা দিয়েছিল, তারই ক্ষেত্র প্রসারিত হল 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে। আবিষ্কৃত হল সাহিত্যের এক সুবিশাল নতুন দিগন্ত। অবহেলিত পূর্ববঙ্গের মাঝিদের জীবনালেখ্য ভাষা পেল সাহিত্যের পাতায়। মানুষের মনের গহনে যে অজানা জীবনরহস্যের সূক্ষ্ম ইঙ্গিত প্রেমেন্দ্র মিত্র দিয়েছিলেন, তারই আলো-আঁধারি লীলায় শুধু মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্তই নয়, সমাজের সর্বস্তরের মানুষের বিচিত্র মানসলোক উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠল। কিন্তু শুধু উদ্‌ভাসনই নয়, মানবজীবন ও মানবপ্রকৃতির দিগ্‌দর্শনও মানিকের শিল্পসৃষ্টির অন্যতম লক্ষ্য। রহস্যের সন্ধান করেই তিনি ক্ষান্ত হননি, তার আবরণ উন্মোচন করে একেবারে সত্যের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করার পর তাঁর শিল্পীসত্তা পরিতৃপ্তি লাভ করে। জীবন সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব একটি দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। তাঁর ব্যক্তিত্ব, জীবনবোধ এবং সেই অবিচলিত দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেই তাঁর সাহিত্যের বিশিষ্টতা নিহিত।

'কল্লোল' ধারার থেকে কিছুটা বিমুক্ত হয়ে অন্যপথ অন্বেষণ করেছিলেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকগণ। তাঁদের রচনায় মানবতার আবেগ বর্তমান ছিল। তাঁরা সাহিত্যে যে বাস্তবতাকে রূপায়িত করেছিলেন, তাও বিশ্বাসযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য ছিল। কিন্তু তাঁরা কেউই মানবতাকে সমাজ পরিবর্তনের প্রকরণ হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন নি। এইখানেই মানিকের সঙ্গে এঁদের পার্থক্য। মানিকের প্রথম দিকের রচনাগুলি ছাড়া পরবর্তীকালের অধিকাংশ রচনার নেপথ্যে একটি সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য তাঁর ছিল। তিনি তাঁর সৃষ্টিকে সচেতনভাবে সমাজ পরিবর্তনের একটি হাতিয়ার হিসেবে তুলে ধরতে চেয়েছেন। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা যত ব্যাপক ও গভীর হয়েছে, তত অধিক পরিমাণে তিনি মানুষের বেদনার স্বরূপ উপলব্ধি

করতে সক্ষম হয়েছেন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শুধুমাত্র সাহিত্যের ক্ষেত্রেই সমাজ পরিবর্তনের কথা বলেন নি, জীবনের এলাকাতেও সমাজ পরিবর্তনের উদ্দেশ্যকে জয়যুক্ত করার জন্য ব্রতী হয়েছিলেন। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন তিনি। একজন নিষ্ঠাবান রাজনৈতিক দলীয় কর্মীর মতোই দলের সমস্ত শৃঙ্খলাবিধি, কর্তব্য ইত্যাদি বিশ্বস্ততার সঙ্গে অনুসরণ করেছিলেন। এই অনুশীলনেরই প্রকাশ ঘটেছে তাঁর সাহিত্যকর্মে। মানিকের সাহিত্যের একদিকে অবস্থান করছে মার্কসবাদ। তার প্রয়োগ বিশেষ করে সাহিত্যে, মানুষ ও সমাজের মধ্যে; অন্যদিকে জীবনের কেন্দ্রমূলে যৌনসমস্যা যা তিনি ফ্রয়েড থেকে পেয়েছিলেন। তিনি নেহাত শখের জন্য কিংবা খ্যাতি পাওয়ার লোভে সাহিত্য রচনায় ব্রতী হন নি। জীবন সম্পর্কে তাঁর যে সহমর্মী দৃষ্টিভঙ্গি তাই-ই তাঁকে প্রেরণা দিয়েছিল মানুষের কথা বলতে। তিনি উৎসাহী হয়েছিলেন কৃষক,মজুর, মাঝিদের জীবনকাহিনি রচনায়। সমাজের তথাকথিত নিম্নশ্রেণির লোকেরাই তাঁর রচনায় ভিড় করেছে। কৃষক, শ্রমিক, কুলি, মজুর ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতি রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক শোষণের মূল ব্যাধির স্বরূপ সন্ধানে ও বিশ্লেষণে তিনি নিজেকে গভীরভাবে নিয়োজিত করেছিলেন। সমাজ-পরিবর্তনের স্বপ্নই ছিল তাঁর সাহিত্যরচনার মূল অভীপ্সা।

১৩.৫ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস

মানিক-সাহিত্য বাংলা ভাষায় ফ্রয়েডবাদ থেকে মাকর্সবাদে উত্তরণের এক মহোজ্জ্বল শৈল্পিক প্রতিরূপক'। তাঁর উপন্যাসগুলিকে প্রাক্-মার্কসীয় এবং মাকর্সবাদ-প্রভাবিত এই দুটি ধারায় শ্রেণিবদ্ধ করা যায়। তিনি উপন্যাস লেখা শুরু করেন ১৯৩৫ সালে। তাঁর মৃত্যুর পরও তাঁর কয়েকটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়। তাঁর উপন্যাসগুলি হল 'জননী' (মার্চ, ১৯৩৫), 'দিবারাত্রির কাব্য' (ডিসেম্বর, ১৯৩৫), 'পুতুলনাচের ইতিকথা' (১৯৩৬), 'পদ্মানদীর মাঝি' (মে, ১৯৩৬), 'জীবনের জটিলতা' (নভেম্বর, ১৯৩৬), 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' (জুলাই, ১৯৩৮), 'সহরতলী', ১ম পর্ব (জুলাই, ১৯৪০), 'সহরতলী' ২য় পর্ব (১৯৪১), 'অহিংসা' (১৯৪১), 'ধরাবাঁধা জীবন' (১৯৪১), 'প্রতিবিম্ব' (১৯৪৩)।

১৯৪২ সাল থেকে মাকর্সবাদের প্রতি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আকৃষ্ট হন। আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯৪৪ সালে কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য হন। এর পরবর্তীকালে তাঁর প্রকাশিত উপন্যাসগুলি হল 'দর্পণ' (জুন, ১৯৪৫), 'সহরবাসের ইতিকথা' (ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬), 'চিন্তামণি' (জুলাই, ১৯৪৬), 'চিহ্ন' (জানুয়ারি, ১৯৪৭), 'আদায়ের ইতিহাস' (১৯৪৭), 'চতুষ্কোণ' (১৯৪৮), 'জীয়ন্ত' (জুলাই, ১৯৫০), 'পেশা' (১৯৫১), 'স্বাধীনতার স্বাদ' (জুন, ১৯৫১), 'সোনার চেয়ে দামী', ১ম খণ্ড (জুন, ১৯৫১), 'ছন্দপতন' (১৯৫১), 'সোনার চেয়ে দামী', ২য় খণ্ড (১৯৫২), 'ইতিকথার পরের কথা' (আগষ্ট, ১৯৫২), 'পাশাপাশি' (সেপ্টেম্বর, ১৯৫২), 'সার্বজনীন' (সেপ্টেম্বর, ১৯৫২), 'আরোগ্য' (মে, ১৯৫৩), 'নাগপাশ' (১৯৫৩), 'তেইশ বছর আগে পরে' (অক্টোবর, ১৯৫৩), 'চালচলন' (১৯৫৩), 'শুভাশুভ' (অক্টোবর, ১৯৫৪), 'হরফ' (মে, ১৯৫৫), 'হলুদ নদী সবুজ বন' (ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৬), 'মাশুল' (অক্টোবর, ১৯৫৬), 'প্রাণেশ্বরের উপাখ্যান' (ডিসেম্বর, ১৯৫৬), 'মাটি ঘেঁষা মানুষ' (অসমাপ্ত ১৯৫৭), 'শান্তিলতা' (আগষ্ট, ১৯৬০), 'মাঝির ছেলে' (১৯৬০)।

সর্বমোট ছত্রিশটি উপন্যাস মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যিক জীবনের ফসল। এই উপন্যাসগুলির বিষয়বস্তু যেমন বিচিত্র ও ব্যাপক, ঠিক তেমনি দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রকাশভঙ্গির ক্ষেত্রেও তা বৈচিত্র্যপূর্ণ; যা তাঁর গভীর সৃজন ক্ষমতারই স্বাক্ষর বহন করে।

১৩.৬ সারাংশ

সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অল্প সময়ের মধ্যেই বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের জগতে নিজের স্থায়ী অধিকার স্থাপন করেছিলেন। তাঁর পিতার স্বল্প উপার্জন, বদলির চাকরি, বহু সন্তানের মধ্যে একজন হওয়া এবং কৈশোরে মাতৃবিয়োগের ফলে মানিকের জীবনে অনাদর, অনিশ্চয়তা ও অনিয়মিত শিক্ষার সংকট ঘনিয়ে আসে। এছাড়াও মৃগীরোগ ও মদ্যাসক্তি তাঁর পরিণত বয়স থেকে নিত্যসঙ্গী হয়ে উঠেছিল। এরূপ অস্থির জীবনপ্রক্রিয়ার মধ্য থেকেই নিষ্কাশিত হয়ে আসে তাঁর সমগ্র জীবন-অভিজ্ঞতার সারাৎসার তাঁর ছত্রিশটি উপন্যাস।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন। তাই তিনি বৈজ্ঞানিক যুক্তি, নিরাবেগ ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে জীবনকে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করেছেন। কঠোর ব্যক্তিত্ব, দৃঢ় আত্মশক্তি ও নির্ভীক মনোভাব তাঁকে নির্জন প্রকৃতির মানুষে পরিণত করেছে। তাঁর এই স্বভাবের অনন্যতাই তাঁর সাহিত্যসৃষ্টিকে সমকালীন অন্যান্য লেখকদের থেকে অভিনবত্ব দান করেছিল। মাত্র কুড়ি বছর বয়স থেকে নিরন্তর সাহিত্যসৃষ্টি, ত্রিশ বছর বয়সে বিবাহ, চার সন্তানের পিতৃত্ব, ১৯৪৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান তাঁর জীবনের কয়েকটি ইতিবাচক ঘটনা। তবে সৃজনক্ষেত্রে তাঁর জনপ্রিয়তা যতটা, সেইরূপ আর্থিক প্রতিদান না পাওয়ার ফলে দারিদ্র্য তাঁর নিত্যসঙ্গী হয়ে উঠেছিল।

তবে এই দারিদ্রের কারণে তিনি কখনও স্বধর্মচ্যুত হন নি। তিনি সাহিত্যকে সমাজ পরিবর্তনের একটি হাতিয়ার হিসেবে তৈরি করতে চেয়েছিলেন। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা যতই গভীর ও ব্যাপক হয়েছে, তত পরিমাণেই তিনি মানুষের স্বরূপ উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন। দরিদ্র, লাঞ্ছিত, নিপীড়িত মানুষের জীবন-যন্ত্রণার স্বরূপ তাঁর লেখক সত্তাকে নাড়া দিয়েছিল। এই অবস্থার জড় অন্বেষণ করতে গিয়ে তিনি তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিকে কাজে লাগাতে সক্ষম হয়েছিলেন। সেখান থেকেই শুরু হয়েছিল তাঁর সাহিত্যে স্পষ্ট কোনো সামঞ্জস্য বা সমাধান খোঁজার চেষ্টা। এ বিষয়ে তার একহাতে ছিল মার্কসবাদ আর অন্যহাতে ছিল ফ্রয়েডীয় মতবাদ। তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন 'সাহিত্য মানুষের জন্য'। সেই কারণেই নিম্নবিত্ত বা মধ্যবিত্ত শ্রেণির রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক শোষণের মূল ব্যাধির স্বরূপ বিশ্লেষণে তিনি সাহিত্যকর্মে নিজেকে গভীরভাবে নিয়োজিত করেছিলেন। তাঁর সামগ্রিক সৃষ্টিকর্মে এই মহৎ উদ্দেশ্যই প্রতিফলিত হয়েছে।

১৩.৭ অনুশীলনী

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্নাবলী :

১) লেখকের ব্যক্তিগত প্রবণতা তাঁর রচনায় কোন বিশেষ প্রভাব ফেলতে পারে কি না এই প্রসঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর উপন্যাসগুলি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২) বাংলা সাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর সমকালীন যুগের প্রবণতা সম্পর্কে আলোকপাত করুন।

খ. বিস্তৃত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্নাবলী :

৩) সমকালীন লেখকবর্গের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় অভিনবত্ব কোথায় তা চিহ্নিত করুন। (১০০০ শব্দের মধ্যে)

৪) 'সমাজ পরিবর্তনের যে স্বপ্ন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দেখেছিলেন, তার উৎস ছিল তাঁর নিজের পারিবারিক জীবন' — এই মন্তব্যের সত্যতা বিচার করুন। (১০০০ শব্দের মধ্যে)

১৩.৮ গ্রন্থপঞ্জি

ক) নিতাই বসু, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়,* ফাল্গুন ১৩৬৮, ফসল প্রকাশনী, সালকিয়া, হাওড়া।

খ) সরোজমোহন মিত্র, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জীবন ও সাহিত্য,* গ্রন্থালয়, কলকাতা।

গ) লিলি দত্ত, *জীবনশিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়,* উত্তরণ, কলকাতা।

ঘ) নারায়ণ চৌধুরী (সম্পা.), *মানিক সাহিত্য সমীক্ষা,* পুস্তক বিপনি, কলকাতা।

ঙ) সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

চ) শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা,* মডার্ন বুক এজেন্সি, কলকাতা।

ছ) সরোজ দত্ত, *ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়,* ১৯৭৬

ঝ) Nirmal Kanti Bhattacharya– *Manik Bandopadhyay - A Centenary Tribute in the Indian Literature*– Nov Dec. ২০০৮

একক-১৪ □ পদ্মানদীর মাঝি : কাহিনি-পরিচিতি

গঠন

১৪.১. প্রস্তাবনা

১৪.২. পদ্মানদীর মাঝি : বিশ্লেষণাত্মক পাঠ

১৪.৩. পদ্মানদীর মাঝি : আঞ্চলিকতার প্রসঙ্গ

১৪.৪. রোমান্টিকতার প্রভাব ও অস্তিত্ব : পদ্মানদীর মাঝি

১৪.৫. সারাংশ

১৪.৬. অনুশীলনী

১৪.৭. গ্রন্থপঞ্জি

১৪.১ প্রস্তাবনা

'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাদেশের পদ্মা নদীর প্রেক্ষাপটে দরিদ্র মাঝি, জেলেদের জীবন ও জীবিকার কথা বলেছেন। উপন্যাসটিতে খুব সঙ্গত কারণে ধীবর পল্লীর জীবনালেখ্য তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। পদ্মার এই মাঝিরা প্রকৃতপক্ষে দীন-দরিদ্র। তারা শিক্ষা-সংস্কৃতির সঙ্গে চির অপরিচিত। রুচি ও আদর্শের বিষয়টি এখানে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক। কোনক্রমে দিন যাপনের গ্লানিতে নির্বাহ হয় তাদের শ্রম ও কষ্টের সময়। জন্মগ্রহণ, পদ্মার পাড়ে পালিত হওয়া, অবর্ণনীয় দুঃখ ও বঞ্চনার মধ্য দিয়ে কাল কাটানো এইভাবেই তাদের জীবন অতিবাহিত হয়। পদ্মা নদী ও তার তীরবর্তী অন্ত্যজশ্রেণির মানুষগুলি যেন এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। মাঝি, জেলেদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, প্রেম ও অপ্রেম এই সবই যেন খেয়ালি পদ্মার মেজাজ-মর্জির উপর নির্ভরশীল। পদ্মার দুর্বার জলপ্রবাহের সঙ্গে নিরন্তর সংগ্রাম করেই তাদের জীবন বাঁচাতে হয়, দুমুঠো অন্নের জন্য নিদ্রাহীন রাত পদ্মায় কাটিয়েও স্বাচ্ছন্দ্য দূরের কথা, বছরের অধিকাংশ সময় উদরপূর্তিতে তারা অপারগ। তবে বর্ষার মরশুমে ইলিশ মাছের কৃপায় তাদের জীবনে সাময়িককালের স্বাচ্ছন্দ্য আসে। তারপর সারাবছরের দারিদ্র্য, হোসেন মিয়ার কৃপালাভ এবং তার কাছে ঋণের জালে জড়িয়ে পড়ে ধীবরশ্রেণির অনিবার্য নিয়তি। জীবন-জীবিকার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানে ব্যাপৃত এই ধীবর সম্প্রদায়। দারিদ্র্য মোচনের বাইরে অন্য কোনো বিশেষ দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে তারা সক্ষম হতে পারেনি। জীবনপ্রাপ্তি, সংগ্রামের মধ্য দিয়েই সেই জীবনকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য জীবিকাকে আঁকড়ে ধরে রয়েছে, তার মধ্যে ক্ষুধা ও কাম চরিতার্থতা এই জীবনকে বারংবার পাক খাইয়ে দিতে বাধ্য করেছে। এর বাইরে লেখক কোনও কথা শোনাতে চাননি। বস্তুত এর মধ্যে পরিপূর্ণভাবে উদ্‌ভাসিত হয়েছে ধীবরকূলের জীবনালেখ্য। ধীবর সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক অসহায়তা, অশিক্ষাজনিত নানান কুসংস্কার, বেঁচে থাকার তাগিদে অবধারিত নীচতা এবং স্বীয় ক্ষমতা সম্পর্কে অজ্ঞতাজাত এক অদ্ভুত হীনমন্যতা বিশেষ প্রাধান্য নিয়ে 'পদ্মানদীর মাঝি'তে রূপায়িত হয়েছে।

১৪.২ পদ্মানদীর মাঝি : বিশ্লেষণাত্মক পাঠ

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'পদ্মানদীর মাঝি' একটি জনপ্রিয় উপন্যাস। এই উপন্যাসে পূর্ববঙ্গের ধীবর শ্রেণির জীবনালেখ্য চিত্রিত হয়েছে। উপন্যাসটির নামকরণ থেকেই বোঝা যায় যে এখানে বাংলাদেশের এক ভয়াল নদীর কথা রয়েছে। নদীটি হল পদ্মানদী। পদ্মার এই জেলে মাঝিরা বস্তুত দরিদ্র, কোনোরকম শিক্ষা-সংস্কৃতির সাথে তারা অপরিচিত। উক্ত উপন্যাসে ধীবর শ্রেণির জীবনযাত্রায় শিক্ষিত আভিজাত্যের মার্জিত রুচি ও উচ্চ আদর্শবাদের ছায়াপাত ঘটাননি লেখক। রুচি ও আদর্শের বিষয়টি তাদের কাছে নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক। কোনোক্রমে দিনযাপনের গ্লানিতে তাদের শ্রম ও কষ্টের সময় নির্বাহ হয়। পেট ও শারীরিক ক্ষুধা ব্যাপৃত করে রেখেছে তাদের জীবন। জন্মগ্রহণ, পদ্মার তীরে লালিত হওয়া, অবর্ণনীয় দুঃখ ও বঞ্চনার মধ্য দিয়ে কাল কাটানো এছাড়া তাদের বিশেষ করণীয় আর কিছুই নেই। পদ্মার দুর্বার জলপ্রবাহের সঙ্গে নিরন্তর সংগ্রাম করেই তাদের বেঁচে থাকতে হয়। দু'মুঠো অন্নের জন্য অসংখ্য রাত নিদ্রাহীনভাবে কাটিয়েও তারা স্বাচ্ছন্দ্য পায় না। বছরের অধিকাংশ সময় উদরপূর্তির ব্যবস্থাটুকু করতেও তারা অপারগ। দিবারাত্রি দারিদ্র্য তাদের ঘিরে রেখেছে। আশা-আকাঙ্ক্ষা তাদের সামান্য হলেও, তারা এমনি অভাগা যে সেটুকুও তাদের ভাগ্যে জোটে না। এছাড়াও আছে অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন মানুষদের বঞ্চনা, পদ্মার রুষ্টতা, প্রকৃতির অনিবার্য অমোঘ অভিসম্পাত। এসব কিছু সহ্য করেই তাদের দিনযাপন করতে হয়। লেখক কাহিনির শুরু থেকে দারিদ্র্য, বঞ্চনা ও অনিশ্চিত নিয়তির হাতে সমর্পিত মানুষদের জীবনালেখ্য রচনা করেছেন।

কুবের এই উপন্যাসের নায়ক। সে নিজেকে অত্যন্ত গরীব ও ছোটলোক বলেই জানে। তাই তার মতো অত্যন্ত দরিদ্র মানুষদের বঞ্চিত করার অধিকার সকলের আছে। সামাজিক, ধর্মীয় নিয়মের মতো এই অধিকারকেও সে এক অমোঘ প্রথা হিসেবে নিজের জীবনে স্বীকার করে নিয়েছে। আমরা তার মধ্যে এর প্রতিবাদের কোন চেষ্টা দেখতে পাই না। অর্থনৈতিক পীড়ন কুবেরের মতোই গণেশ, ধনঞ্জয়, রাসু, যুগল, পীতম এদের সকলকেই সমাজের যেন এক পঙ্কিল আবর্তে নিক্ষেপ করে দিয়েছে। এরা সকলেই জেলেপাড়ার সংকীর্ণ পরিসরে আদিম অন্ধকারময় জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। তবে এদের মধ্যেও বীরত্ব, আস্ফালন, ক্রোধ, উত্তেজনা দেখা যায়; কিন্তু তার সবটাই ঘটে নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সংঘাতে। কিন্তু কেতুপুরের জেলেপাড়ার অমার্জিত পরিবেশের স্রষ্টা ও রক্ষকদের বিরুদ্ধে তাদের সম্মিলিত প্রতিবাদ বা বিদ্রোহ দেখতে পাওয়া যায় না। জেলেপাড়ার জীবনচর্যার বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখক তির্যক কটাক্ষের সঙ্গে বলেছেন—

জেলেপাড়ার ঘরে ঘরে শিশুর ক্রন্দন কোনদিন বন্ধ হয় না। ক্ষুধাতৃষ্ণার দেবতা, হাসিকান্নার দেবতা, অন্ধকার আত্মার দেবতা, ইহাদের পূজা কোনদিন সাঙ্গ হয় না। এদিকে গ্রামের ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর ভদ্র মানুষগুলি তাহাদের দূরে ঠেলিয়া রাখে, ওদিকে প্রকৃতির কালবৈশাখী তাহাদের ধ্বংস করিতে চায়, বর্ষার জল ঘরে ঢোকে, শীতের আঘাত হাড়ে গিয়া বাজে কন্‌কন্‌। আসে রোগ, আসে শোক। টিকিয়া থাকিবার নির্মম অনমনীয় প্রয়োজনে নিজেদের মধ্যে রেষারেষি কাড়াকাড়ি করিয়া তাহারা হয়রান হয়। জন্মের অভ্যর্থনা এখানে গম্ভীর, নিরুৎসব, বিষণ্ণ। জীবনের স্বাদ এখানে শুধু ক্ষুধা ও পিপাসায়, কাম ও মমতায়, স্বার্থ ও সঙ্কীর্ণতায়। আর দেশী মদে। তালের রস গাঁজিয়া যে মদ হয়, ক্ষুধার অন্ন পচিয়া সে মদ হয়। ঈশ্বর থাকেন ওই গ্রামে, ভদ্রপল্লীতে। এখানে তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, 'পদ্মানদীর মাঝি', মডেল পাবলিশিং হাউস, পৃ. ১১।

উপন্যাসে নায়ক কুবের। ঘরে তার পঙ্গু স্ত্রী মালা, লখা ও চণ্ডীকে নিয়ে অসহায় তিনটি শিশু, গ্রাম সমাজের

পক্ষে বয়স্কা মেয়ে গোপী। কুবের ও গণেশ ধনঞ্জয়ের নৌকায় চড়ে মাছ ধরে বেড়ায় ধৃত মৎস্যের এক চতুর্থাংশের চুক্তিতে। রোগ, শোক, অভাব, প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং সর্বোপরি মালার শারীরিক অক্ষমতা কুবেরের জীবনে এক স্থায়ী বিষণ্ণতা তৈরি করেছিল। এমন সময়ে কুবেরের জীবনে এল উদ্ধত যৌবনা লীলাচপলা নারী। আকুর-টাকুর গ্রামের শ্যামাদাসের পরিত্যক্তা স্ত্রী কপিলা। কপিলা মালার সহোদরা। কুবেরের সঙ্গে তার রহস্য-চপলতা কুবেরের উপবাসী জীবনে যেন এক সঞ্জীবনী সুধার স্বাদ নিয়ে এল। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে গোপী পায়ে আঘাত পাওয়ায় কুবের তাকে আমিনবাড়ির হাসপাতালে নিয়ে যায়। তখন তার সঙ্গী হয় কপিলা। সেখানে কুবের ও কপিলার মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে এবং পরবর্তীকালে কপিলার শ্বশুরবাড়িতে কুবেরের প্রতি তাদের দুর্ব্যবহারের জন্য কপিলার অশ্রুসজল আকুতি কুবেরের হৃদয়ে কপিলার আসনকে দৃঢ় করে। সমান্তরালে অবস্থার দাস হিসেবে দুর্জ্ঞেয় ও রহস্যময় মানুষ হোসেন মিয়ার হাতছানিতে কুবের বিভ্রান্ত হয়ে ওঠে। কুবের হোসেন মিয়ার কুটিল ব্যবসায়ের জটিল জালে ক্রমশ জড়িয়ে পড়ে। কিন্তু তার পক্ষে হোসেন মিয়ার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করা সম্ভব হয়নি। আমিনুদ্দি বা কুবের কেউই হোসেন মিয়ার সংস্রব এড়াতে চেয়েও পারে না, তারা আত্মসমর্পণে বাধ্য হয় হোসেন মিয়ার সুকৌশলে পাতা জালে। পীতমের টাকার ঘটি রামু চুরি করে গোপীকে বিয়ে করার জন্য কন্যাপণ জোগাড় করে। এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়েই চৌর্যবৃত্তির মিথ্যা অভিযোগে কুবেরকে বাধ্য করা হয় হোসেন মিয়ার কাছে নিঃশর্ত আত্মনিবেদনে। কেতুপুর ছেড়ে ময়নাদ্বীপের অগস্ত্যযাত্রায় কুবেরের ভাবী জীবনের সঙ্গী হয় কপিলা, হোসেন মিয়ার পরিকল্পিত ধর্মহীন, জাতহীন নতুন সমাজে পুরুষ ও নারীর মিলিত জীবনযাত্রার অবশ্যম্ভাবী ফসল ফলানোর তাগিদে।

উপন্যাসটি বিশ্লেষণ করলে একটি বিষয় আমরা বুঝতে পারি যে, লেখক ধীবর শ্রেণির জীবন আলেখ্য বর্ণনায় লোক-জীবনকে যথেষ্ট মনোযোগের সঙ্গে চিত্রিত করার প্রয়োজন অনুভব করেননি। এই উপন্যাসটিতে রথ এবং দোল উৎসবের উল্লেখ থাকলেও, কিন্তু তা জনজীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে একটি সার্বজনীন উৎসবের রূপ নেয়নি। উপন্যাসটিতে পদ্মানদীর তীরকে কেন্দ্র করে জীবনকথা বিন্যস্ত হয়েছে, তা একাধারে গোষ্ঠী ও ব্যক্তি উভয়েরই। উপন্যাসের প্রথম দিকে দেখা যায় তা মুখ্যত গোষ্ঠী-আশ্রিত, পরে তা ক্রমশ উন্মোচিত হয়েছে ব্যক্তির গূঢ় জীবনরহস্যে। দারিদ্র্য, বঞ্চনা, পদ্মার রুক্ষতা, হোসেন মিয়ার চক্রান্ত ইত্যাদি প্রতিকূলতা কখনোই মাথা তুলে দাঁড়াতে দেয়নি মাঝিকুলকে। নিজেদের সংস্কার, নিজশক্তির ওপর বিশ্বাসহীনতা প্রতিকূল পরিস্থিতির কাছে তাদের অসহায় করে তুলেছে। প্রকৃতপক্ষে গোষ্ঠীর মধ্যের রূপটি প্রত্যক্ষ করানোর প্রচেষ্টার আধিক্যের জন্যে ব্যক্তিজীবনের স্বরূপ তেমনি করে ফুটে না উঠলেও কুবেরই লেখকের উদ্দিষ্ট ছিল। তাই কাহিনির অধিকাংশ দিকটি কুবেরের দিক থেকে ফুটে উঠেছে। হোসেন মিয়াও বেছে নিয়েছিল কুবেরকে। এভাবে গোষ্ঠীর সামগ্রিক দিকটি প্রকাশমান হলেও গৃহাঙ্গনের চিত্রে কুবেরের দিকেই লেখককে ঝুঁকতে দেখা যায়। ব্যক্তির যন্ত্রণার দিকটি প্রকট হয়ে তাতে প্রতিবিম্বিত হয়ে উঠতে পারে গোষ্ঠীর জীবন, সেইকারণেই কুবেরকে লেখক বেছে নিয়েছেন। জীবন-জীবিকার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানে ব্যাপৃত ধীবরসমাজ, তাই দারিদ্র্য মোচনের বাইরে অন্যতর বিশেষ কোনো দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে সক্ষম হয়নি। জীবনপ্রাপ্তি, সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সেই জীবনকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য জীবিকা আঁকড়ে ধরে রয়েছে, তার মধ্যেই ক্ষুধা ও কাম চরিতার্থতা এই জীবনকে বারংবার পাক খাইয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। এর বাইরে কোনো কথা শোনাতে চান নি লেখক। বস্তুত এর মধ্য দিয়েই পরিপূর্ণভাবে ধীবরকুলের জীবনালেখ্য উদ্ভাসিত হয়েছে।

১৪.৩ পদ্মানদীর মাঝি : আঞ্চলিকতা প্রসঙ্গ

'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসটি পূর্ববঙ্গের একটি বিশেষ অঞ্চলের মানুষদের জীবনালেখ্য ও সেই অঞ্চলের ভাষাপ্রয়োগে গঠিত হওয়ায় সঙ্গতভাবেই এখানে আঞ্চলিকতার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়ে থাকে। একথা বলা বাহুল্য যে সব উপন্যাসেরই একটি বাস্তব পটভূমি থাকে, থাকতে বাধ্য। বিশেষত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমসাময়িককালে আঞ্চলিক উপন্যাস রচনার একটি প্রবণতা বাংলা সাহিত্যে প্রকট হয়েছিল। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪—১৯৫০), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১), শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০১-১৯৭৬), সতীনাথ ভাদুড়ী (১৯০৬-১৯৬৫), অদ্বৈত মল্লবর্মন (১৯১৪-১৯৫১) প্রমুখ লেখকের রচনা আঞ্চলিক সাহিত্য হিসেবে এইসময় বিশেষ এক পরিমণ্ডল তৈরি করেছিল।

'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসটি আঞ্চলিক কিনা তা বিচার করার আগে আঞ্চলিক উপন্যাসের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্যগুলি আমাদের জানা প্রয়োজন। মূলত, কোনো একটি বিশেষ অঞ্চল এবং তার প্রাকৃতিক, সামাজিক ও মানবিক বাস্তবতা যে-কোনো উপন্যাসেই দেখতে পাওয়া যায়। সেই অর্থে হয়তো প্রায় সব উপন্যাসই আঞ্চলিক উপন্যাস। তাই আঞ্চলিক উপন্যাসের নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া খুবই দুরূহ ব্যাপার। আঞ্চলিক পরিবেশ কোথাও একটি কাঠামো হিসেবে কাজ করে; আবার কোথাও দেখা যায় কোনো বিশেষ অঞ্চলের জনজীবনের সামগ্রিক সত্তার এক অখণ্ড রূপ হিসেবে ঔপন্যাসিকের সৃষ্ট চরিত্রগুলি 'সেই বিশেষ পরিবেশের শক্তি ও সত্তার প্রতীক হয়ে ওঠে।' ইংরেজ ঔপন্যাসিক হার্ডির 'ওয়েসেক্স' নভেলগুলি প্রকাশিত হোয়ার পর থেকেই বিশেষভাবে 'আঞ্চলিক উপন্যাস' বা 'regional novel' অভিধাটি ব্যবহৃত হতে থাকে। মূলত কোনো এক বিশেষ অঞ্চলের মানুষের কথা, তার পরিবেশ, জীবন-জীবিকা-ভাষা-আচরণ-ভবিতব্য সবকিছু শিল্পসম্মতভাবে যে উপন্যাসে পরিবেশিত হয়, তাকে আঞ্চলিক উপন্যাস বলা যাতে পারে। সমালোচক এম.এইচ. আব্রাহাম এই উপন্যাসের স্বরূপ সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন

The regional novel emphasizes the setting– speech and customs of a particular locality– not merely as local Colour– but as important Conditions affecting the temperament of characters and their ways of thinking– feeling and acting. (*A Glossary* of *Literary Terms*)

সমালোচক মার্টিন গ্রে-র ভাষায়—

A novel which emphasises and documents the geography– customs and speech of a particular place– with a more serious explanatory focus than for mere background information. The environment is often used to explain the character and actions of its inhabitants. (*A Dictionary of Literary Terms*)

আঞ্চলিক উপন্যাসের বিভিন্ন লক্ষণগুলিকে এভাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

ক. আঞ্চলিক উপন্যাসে একটি বিশেষ অঞ্চলের মানুষের জীবনালেখ্য থাকবে। ভৌগোলিক সীমা-সংহতি এর প্রথম শর্ত। ভূ-প্রকৃতির বিশেষ বৈশিষ্ট্য তার সীমা সংহতির মধ্যেই ধরা পড়ে। যেমন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে বীরভূমের বিশেষ ভূ-প্রকৃতি ধরা পড়ে। অর্থাৎ আঞ্চলিক উপন্যাসের মধ্যে একটি বিশেষ অঞ্চল তথা ভৌগোলিক অঞ্চলের পরিচয় থাকবেই।

খ. উপন্যাসে যে অঞ্চলের বা ভূ-প্রকৃতির কথা বলা হবে, সেই ভূ-প্রকৃতি মানবমনের উপর সর্বাত্মক প্রভাব বিস্তার করবে।

গ. আঞ্চলিক উপন্যাসের একটি অন্যতম প্রধান শর্ত এখানে ব্যক্তিচেতনার থেকে গোষ্ঠীচেতনা প্রাধান্য পাবে।

ঘ. আঞ্চলিক উপন্যাসে আমরা সেই অঞ্চলের নানা রঙ, বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশিত হতে দেখি। জীবনচর্চা ও জীবনচর্যার ক্ষেত্রে যেমন বৃত্তি, জীবিকা, রীতিনীতি, অন্ধবিশ্বাস, নিয়তিবাদ, নৃত্যগীতবাদ্যের বিশেষত্ব, প্রেম সম্পর্কিত চিন্তা ইত্যাদি প্রকাশিত হতে দেখি। তারাশঙ্করের উপন্যাসে আমরা বাউল-ভাদুর কথা পাই। এসবই 'Local Colour'.

ঙ. অঞ্চলের অনিবার্য ও সর্বাত্মক প্রভাব পড়ে চরিত্রদের উপর। যেমন বলা যায় নদী অঞ্চলের মাঝি-জেলেদের সমুদ্র যাত্রার স্বপ্ন, হাঙর শিকারের সংগ্রাম, নদীর মতোই জীবনপ্রবাহকে মেনে নেওয়া সেই নদীজ স্বভাবেরই ফল।

চ. আঞ্চলিক উপন্যাসে প্রধানতম দিক হল লোকজীবন-স্বভাবকে বাস্তব ও বিশ্বাসযোগ্যভাবে দলিলীকরণ করা। তারাশঙ্কর কিংবা সতীনাথ ভাদুড়ী এদিক থেকে সফল হয়েছেন। তাঁদের উপন্যাসে লোকজীবন-স্বভাব যথাযথভাবে আঞ্চলিকতাকে প্রকাশ করেছে।

ছ. আঞ্চলিক উপন্যাসের আর একটি শর্ত হল তার ভাষা। উপন্যাসে যে অঞ্চলের কথা বলা হবে সেই অঞ্চলের ভাষা বা উপভাষায় চরিত্রদের কথোপকথন ঘটবে।

এইসব বৈশিষ্ট্যের আলোকে আমরা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসটির আঞ্চলিকতা বিচার করে দেখব।

প্রথমত : 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসটির মধ্যে একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমা লক্ষ্য করা যায়। একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল পদ্মানদী তীরবর্তী কেতুপুর-চরডাঙা, আকুরটাকুর আমিনবাড়ি এবং নোয়াখালি অঞ্চলের ময়নাদ্বীপের কাহিনি তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া আছে বরিশাল-চট্টগ্রাম-ঢাকা-দেবীগঞ্জের কথাও। আছে পদ্মানদীর অনিবার্য প্রভাবও।

দ্বিতীয়ত : এই অঞ্চলের জেলেপাড়ার মধ্যে কয়েক ঘর মাঝি, জেলে পরিবারের চিত্র আছে। যাদের জীবনের মধ্যে একইরকম সুখ-দুঃখ, অভাব-দারিদ্র্য। তাদেরই প্রতিনিধিত্ব করেছে কুবের। লেখক ঐ মাঝি-মাল্লাদের কথা বলতে গিয়ে জেলেপাড়ার কথা বলেছেন। জেলেপাড়ার বর্ণনার মধ্যে আমরা এখানকার 'Local Colour' টি পেয়ে যাই। যেমন

ক. পদ্মানদীতে ইলিশ মাছ ধরার প্রসঙ্গ। এই নদীর দুই মাইল উজানে কেতুপুর গ্রাম।

খ. জেলেপাড়ার মানুষদের জীবনের নানা দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণার কথা। রয়েছে তাদের জীবিকার কথা। পদ্মানদীকে কেন্দ্র করেই এদের মূল জীবিকা।

গ. তাদের বাড়িঘর অত্যন্ত সংকীর্ণ। পোষাক-পরিচ্ছদ অনেকেরই আদুল গা। ছেলেমেয়ে অর্ধ উলঙ্গ। কপিলাকে একটি শাড়িতেই দেখতে পাই আমরা। বাড়ির আসবাবপত্র বলতে মাটির হাঁড়ি-কলসি, জীর্ণ বালিশ-কাঁথা, নৌকায় ভেসে যাওয়া কাঠ থেকে বানানো ঢেঁকি।

ঘ. দরিদ্র, বঞ্চিত মানুষগুলোর জীবনে হোসেন মিয়ার মতো ধূর্ত প্রতাপশালী লোকের অলঙ্ঘনীয় প্রভাব।

ঙ. স্থানীয় উৎসবের বর্ণনা রয়েছে। যেমন রথের মেলা, দোলের উৎসব ইত্যাদি।

চ. মাঝি জীবনের উপযুক্ত গান যা হোসেন মিয়া ও গণেশের কণ্ঠে শোনা যায়। নদীর মাঝিদের ভাটিয়ালি-সারি ইত্যাদি গানেরই পরম্পরা যা আঞ্চলিক জীবনপুষ্ট।

ছ. অশিক্ষা-কুশিক্ষা, অন্ধবিশ্বাস-কুসংস্কার, আদিমতা উপন্যাসটির অধিকাংশ চরিত্রের জীবনের পরতে পরতে দেখতে পাওয়া যায়।

জ. প্রকৃতির কাছে, নিয়তির কাছে, নদীর কাছে অবনমিত হয়েছে ধীবরপল্লীর মানুষজন। এই আঞ্চলিক স্বভাবই তাদের বারবার পরাজিত করেছে।

ঝ. কুবের, কপিলা প্রমুখ চরিত্রগুলি নদী-নিয়ন্ত্রিত। স্থানিক রঙ ফুটে উঠেছে হোসেন মিয়ার ময়নাদ্বীপ প্রসঙ্গেও।

ঞ. আঞ্চলিকতার স্বভাব বেশি ফুটে উঠেছে এই অঞ্চলের ভাষা বৈশিষ্ট্যে। বঙ্গালী উপভাষার ছাঁদে উপন্যাসের চরিত্রগুলি কথোপকথন রয়েছে।

তবু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সচেতনভাবেই উপন্যাসটিকে নিছক 'আঞ্চলিক' করতে চাননি। গোষ্ঠীজীবন ও লোকজীবনের স্বভাবকে উপন্যাসের প্রথম তিনটি পরিচ্ছেদে অত্যন্ত সংযত ও সংক্ষিপ্ততার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। তারপর তিনি গোষ্ঠী চেতনা থেকে সরে এসে ডুব দিয়েছেন ব্যক্তিচরিত্রের মধ্যে। কুবের, কপিলা ও হোসেন মিয়া মূলত এই তিনটি ব্যক্তিচরিত্রই তার মূল বাচ্য হয়ে উঠেছে। উপন্যাসের আখ্যানে ব্যক্তি কুবেরের চিন্তাচেতনা, প্রেমভাবনা, মনোবিশ্লেষণ প্রাধান্য পেয়েছে। গোষ্ঠী ও আঞ্চলিকতার সীমা ভেঙে উপন্যাসটি অগ্রসর হয়েছে সমুদ্রের বিশালতায়। উপন্যাসের মধ্যে আমরা দেখি লেখক আঞ্চলিক উপাদানের সমাবেশের ঘটিয়েও ঘটনাবাহুল্যকে বর্জন করে, ব্যক্তিচেতনার নিগূঢ় রহস্য উন্মোচনের উপরই অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। লেখক কুবের, কপিলা, হোসেন মিয়ার ব্যক্তিত্ব-ব্যক্তিসংকট-আত্মজিজ্ঞাসা ইত্যাদিকে গুরুত্ব দিয়েছেন।

প্রকৃতপক্ষে একথা অনস্বীকার্য যে আঞ্চলিকতার কিছু কিছু উপাদানে সমৃদ্ধ বলেই 'পদ্মানদীর মাঝি' সম্পর্কে আঞ্চলিকতার প্রসঙ্গ ওঠে। পূর্ববঙ্গের অনুপুঙ্খ বর্ণনাসমৃদ্ধ যে চিত্র এখানে প্রকাশিত হয়েছে তাও আঞ্চলিকতার প্রতিভাস গড়ে তুলতে অনেকখানি সহায়ক হয়েছে। কিন্তু পরিণতিতে আমরা দেখি উপন্যাসের কাহিনি পদ্মানদী-তীরবর্তী কেতুপুরের জেলেপাড়ার সীমিত গণ্ডি ভেঙে অগ্রসর হয়েছে সামুদ্রিক বিশালতায়। কুবের ও কপিলা হোসেন মিয়ার নৌকায় যাত্রী হয়ে ময়নাদ্বীপের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে। যখনই তারা ময়নাদ্বীপ অভিমুখে রওনা হয়েছে তখনই একটি বিশেষ অঞ্চলের সীমা চূর্ণ করে, গোষ্ঠীজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, ব্যক্তিচরিত্র বিস্তৃততর জীবনের প্রেক্ষাপটে আভাসিত হয়ে উঠেছে। আর এখানেই আঞ্চলিকতার পরিসমাপ্তি ঘটে।

১৪.৪ রোমান্টিকতার প্রভাব ও 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাস

'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছে ১৯৩৬ সালে। এটি মানিকের আঠাশ বছরের রচনা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমকালে বাস্তব-জীবনকেন্দ্রিক উপন্যাস রচনার একটি প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। বিশেষত 'কল্লোল', 'কালিকলম' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে এটি গড়ে উঠতে দেখা যায়। তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, প্রেমেন্দ্র মিত্রের মতোই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও জীবনকে মাটির কাছাকাছি এনেছেন। মানিক বিজ্ঞাননিষ্ঠ ছিলেন। তাই ভাববাদ বা কল্পনা বিলাসিতার বিরুদ্ধে ছিল তাঁর প্রতিবাদ। এই বাস্তবচেতনাই পরবর্তীকালে এনেছে 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা'। সমকালীন অন্যান্য লেখকেরা যখন বাস্তবতাকে আনার জন্য জীবনের পঙ্কিল কদর্যতাকে সাহিত্যে স্থান দিয়েছেন, সেই সময় মানিক আনলেন নির্মোহ-নিরপেক্ষ এক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি। এদিক থেকে তাঁর ব্যক্তিত্ব স্বতন্ত্র।

'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসটির মধ্যে দরিদ্র শ্রমজীবী জেলে-মাঝিদের জীবনালেখ্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। পদ্মানদীর তীরে অবস্থিত কেতুপুর গ্রামের ধীবর শ্রেণির মানুষদের দারিদ্র্যক্লিষ্ট জীবন বর্ণনা এবং তার পাশাপাশি

হোসেন মিয়ার ময়নাদ্বীপের মধ্যে বেঁচে থাকার ও টিকে থাকার সংগ্রামকে তিনি নিষ্ঠার সাথে চিত্রিত করেছেন। পদ্মানদীর বর্ণনা, জেলে-মাঝিদের মাছ ধরা, তাদের জীবন-যন্ত্রণা, স্বামী-স্ত্রীর প্রতিদিনের কলহ-বিষাদ ইত্যাদি সমস্ত কিছুতেই বাস্তবতার চিত্র খুব সহজেই ধরা পড়ে। এইসব বর্ণনায় আবেগের আতিশয্য নেই। মানুষের জীবনযাত্রার পাশাপাশি প্রকৃতি বিন্যাসেও বাস্তবনিষ্ঠার পরিচয় মেলে।

'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের যে বাস্তবতা তা নিছক বাস্তবতা নয়। বাস্তবতার পাশাপাশি এসেছে রোমান্টিকতা। তাই উপন্যাসের প্রথম তিনটি অধ্যায়ে আঞ্চলিক জনজীবনের বর্ণনা জেলেপাড়ার বাস্তবতার বিন্যাসের পরই আখ্যান প্রবেশ করেছে ব্যক্তি কুবেরের মানস চৈতন্যের জগতে। গোষ্ঠীচেতনা কমে এসেছে, ধীরে ধীরে বড় হয়েছে ব্যক্তিচেতনা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। কুবেরের অনুভব-উপলব্ধি প্রধানত কপিলাকে কেন্দ্র করে তার স্বপ্ন কল্পনা আর এই রোমান্টিক চেতনার বহিঃপ্রকাশ।

পাশ্চাত্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে 'Romanticism'-এর আন্তর্বৈশিষ্ট্যগুলির প্রধান হল কল্পনাপ্রবণতা, সৌন্দর্যচেতনা, বিস্ময়বোধ, সুদূরের প্রতি আগ্রহ, প্রকৃতিপ্রেম ইত্যাদি। এইসব চেতনা হয়তো কুবেরের মনে তেমনভাবে দেখা যায় না। কুবেরের দরিদ্র অশিক্ষিত জীবনে সেই পরিশীলিত চৈতন্যকে আমরা দেখতে পাই না ঠিকই; তবু তার মাঝে কুবেরের মনোজগতে একটি অন্যজগতের কামনা, কপিলাকে কেন্দ্র করে তার স্বপ্ন-কল্পনা হোসেন মিয়ার ময়নাদ্বীপের জগতে যাওয়ার অবচেতন আকর্ষণ বারবার যেন প্রকাশিত হয়েছে। আমরা বলতে পারি, আমাদের বাস্তব জীবনের অন্তরে অন্তঃস্রোতা ফল্গুর মতো রোমান্সের প্রবাহ রয়েছে। অন্তর্লীন সেই রোমান্টিকতাকে লেখক কুবেরের চিন্তাচেতনা প্রকাশের মধ্য দিয়ে বিবৃত করেছেন।

এই উপন্যাসটির মধ্যে জেলেপাড়ার স্থানিকতা ও বাস্তবতার পাশাপাশি লেখক রোমান্টিক চিন্তা-চেতনার বেশ কিছু পরিসর রচনা করেছেন। বিশেষ করে চতুর্থ পরিচ্ছেদে কপিলার আগমনের পর থেকে এই রোমান্টিকতার আবেশ রচিত হয়েছে কুবেরের মনে। একদিকে পদ্মানদীকে কেন্দ্র করে কুবেরের সংগ্রাম, অন্যদিকে কপিলাকে কেন্দ্র করে একটি চেতন-অবচেতন বিস্তারী প্রেমভাবনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। শ্যালিকা কপিলাকে নিয়ে ময়নাদ্বীপে যাওয়ার স্বপ্নে বিভোর হয় কুবের। এর মধ্যে একটি রোমান্টিক চেতনার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

মালাকে কেন্দ্র করে কুবেরের মনে কোনো বিরাগ-বিতৃষ্ণা এতদিন ছিল না, কপিলা আসার পর থেকেই তার মনে দুই নারীকে কেন্দ্র করে একটি তুলনা কাজ করেছে দেখা যায়। পঙ্গু মালার কাছে সহাস্য রহস্যময়ী কপিলার লীলাচাঞ্চল্য কুবেরের মনে এক মুগ্ধতার আবেশ এনে দিয়েছে। কুবেরের দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে কপিলার রূপ ও যৌবনের লাবণ্য যা তাকে অভিভূত করে রেখেছে। পদ্মানদীর প্রমত্ততার পাশে কপিলার চাপল্য যেন গতিময়তা-রোমান্টিকতার সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। কপিলাকে কেন্দ্র করে কুবেরের রোমান্টিক চিন্তা-চেতনা উপন্যাসের বেশ কয়েকটি অংশে অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। এইরকমই একটি রোমান্টিক আবেশ লক্ষ্য করা যায় কুবেরের মানসলোকে

আধ-জাগা আধ-ঘুমানো অবস্থায় সে স্বপ্ন দেখিতে থাকে, রচনা করিয়া চলে আকাশ-কুসুম। সর্বশক্তিমান হোসেনকে সে যেন বলিয়াছে কপিলাকে পাইলে সপরিবারে সে ময়নাদ্বীপে গিয়া বাস করিবে গণেশকেও বলিয়া সে রাজি করিবে যাইতে। হোসেন তার চিরন্তন হাসি হাসিয়া যেন বলিয়াছে, তাই করুম কুবির বাই, তাই করুম আইনা দিমু কপিলারে।

পদ্মানদী ও তাকে কেন্দ্র করে বেঁচে থাকায় রয়েছে জীবিকার প্রশ্ন, যা একান্তভাবে বাস্তব। অন্যদিকে নদী ও নারীকে কেন্দ্র করে প্রকৃতি-প্রেম রোমান্টিকতার প্রকাশ। কুবেরের চেতনায় নদী ও নারী যেন এক হয়ে গেছে।

মানবী আর প্রকৃতির সম্মিলন লক্ষ্য করা যায়। পদ্মা ও কপিলার মধ্যে যেন সূচিত হয়েছে এক অনন্যনির্ভর সম্পর্ক।

উপন্যাসে আমরা দেখি কুবেরের স্ত্রী মালা পঙ্গু। সে গৃহবন্দী। প্রতিবন্ধী এই নারীকে লেখক আবদ্ধতার প্রতীক হিসেবে গড়েছেন। মালা যেন বাস্তবজীবনের সীমা আর কপিলা নদীর মতো গতিশীলা। সে বারবার অসীমের হাতছানি দেয়। কুবের অবচেতনে কপিলাকেই চায়। সে কুবেরের রোমান্টিক মনের সার্থক সঙ্গী হয়ে উঠেছে। এইভাবেই উপন্যাসটিতে বাস্তবতা ও রোমান্স কুবেরের ব্যক্তিচৈতন্যে মিলে মিশে যেন একাকার হয়ে গেছে।

আমাদের মনের মধ্যে একটি প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবে জাগতেই পারে যে, কুবেরের মতো একজন অশিক্ষিত, নিম্নশ্রেণির মাঝির জীবনে রোমান্টিক আসবে কী করে? কিংবা কুবের রোমান্টিকতা কী জিনিস তা আদৌ বোঝে? এর উত্তরে আমরা বলতে পারি, রোমান্টিকতা, ভাবুকতা, কল্পনাবিলাসিতা শুধুমাত্র উচ্চ বা মধ্যবিত্ত মানসিকতার বৈশিষ্ট্য নয়। প্রকৃতপক্ষে এইসব আচরণ ও মানসিকতা সর্বজনীন। তা মাঝিরও থাকতেই পারে। রোমান্টিকতা কোনো একটি যুগ বা শ্রেণির একার সম্পদ নয়। বাংলা সাহিত্যের পরম্পরায় আমরা দেখতে পাই বাংলাদেশের 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' বা 'ময়মনসিংহ গীতিকা'য় মলুয়া-মহুয়া-রেখাদের জীবনে প্রেম-রোমান্স। সেই পরম্পরার অনুবর্তন লক্ষ্য করি কুবের-কপিলার প্রেমের মধ্যে। রোমান্টিকতার সুর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে কুবেরকে উজ্জ্বল করে তুলেছে। অবশেষে নদী-নারীকেন্দ্রিক রোমান্টিকতা লাভ করেছে সামুদ্রিক বিশালতা।

পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের রোমান্টিক মেজাজকে আরও বেশি প্রাঞ্জল করে তুলেছে এই উপন্যাসের গান। হোসেন মিয়া ও গণেশের গানের প্রাঞ্জলতা উপন্যাসের মধ্যে একটি সুন্দর মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। কাব্যভাষামণ্ডিত এই গান উপন্যাসের চরিত্রদের মধ্যে এনেছে বিরাম ও স্বস্তি। শুধু তাই নয়, তার সাথে পাঠকেরাও স্বস্তি পেয়েছে।

উপন্যাসের মধ্যে বাস্তব জগতকে এঁকেছেন লেখক। সেই জগতের বর্ণনা দিয়েছেন প্রসঙ্গবিশেষে রোমান্টিক কাব্যময় ভাষায়। মানিকের দৃষ্টিভঙ্গিতে যতই নির্মম নির্মোহ নিরাসক্তি থাকুক না কেন, জীবনের রূপ-রস-গন্ধ সম্পর্কে তিনি উদাসীন ছিলেন না। প্রকৃতি বিন্যাসের কৌশলে, নারীর রূপ বর্ণনায় কিংবা নদীর গতিময়তা প্রকাশের ক্ষেত্রে তাঁর ভাষা হয়েছে কবিতার মতো। যদিও তা উপন্যাসের মূল লক্ষ্যকে কেন্দ্রচ্যুত করে নি।

মানুষের জীবনের যে আর্থিক ও মানসিক সংকটের ছবি 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের মূলকথা, তাতে প্রচলিত রোমান্টিক পরিবেশ সৃষ্টির সুযোগ না থাকলেও লেখক অত্যন্ত দক্ষতার সাথে স্থানবিশেষে রোমান্টিকতাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। রোমান্টিকতার বিলাসের প্রতি তেমন সোচ্চার বীতরাগ তাঁর এই উপন্যাস রচনাকালে তেমনভাবে গড়ে ওঠেনি, তাই সূক্ষ্ম অন্বেষণে কোথাও কোথাও রোমান্টিকতার স্পর্শ ধরা পড়েছে। সবমিলিয়ে বলা যায়, লেখক উপন্যাসটিতে একদিকে যেমন বাস্তবতার চিত্র তুলে ধরেছেন, তেমনি অন্যদিকে স্থানবিশেষে রোমান্টিকতাকেও এনেছেন। বাস্তবতা, কল্পনা ও রোমান্টিকতার সুষ্ঠু সামঞ্জস্য বিধান করে তিনি উপন্যাসটিকে শিল্প-সার্থক করে তুলেছেন।

১৪.৫ সারাংশ

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনদৃষ্টির পটভূমিতে ধীবর সম্প্রদায়ের জীবনের বঞ্চনা ও দারিদ্র্যের চিত্র 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে উপস্থাপিত হয়েছে। পদ্মার এই মাঝিরা দীন-দরিদ্র, শিক্ষা-সংস্কৃতির সঙ্গে অপরিচিত। কোনক্রমে

দিন যাপনের গ্লানিতে নির্বাহ হয় তাদের শ্রম ও কষ্টের সময়। জন্মগ্রহণ, পদ্মার পাড়ে পালিত হওয়া, অবর্ণনীয় দুঃখ ও বঞ্চনার মধ্য দিয়ে কাল কাটানো এইভাবেই তাদের জীবন অতিবাহিত হয়। তাদের অর্থনৈতিক অসহায়তা, স্বার্থপরতা এবং স্বীয় ক্ষমতা বিষয়ে অজ্ঞতাজনিত এক অদ্ভুত হীনমন্যতা ইত্যাদি দিকগুলি তাদের ভদ্রেতর জীবনযাপনের মূল কারণ, এই চিত্রই লেখক আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন। এই উপন্যাসে ধীবর সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রায় শিক্ষিত আভিজাত্যের মার্জিত রুচি ও উচ্চ আদর্শবাদের কোনো ছায়াপাত ঘটেনি। রুচি ও আদর্শবোধের বিষয়টি তাদের কাছে নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক ব্যাপার। কাহিনির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা দেখতে পাই অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষদের জীবন-বঞ্চনা, দারিদ্র্য জর্জরিত অবস্থা ও অনিশ্চিত নিয়তির হাতে আত্মসমর্পণের এক বাস্তব তথ্যনিষ্ঠ বিবরণ।

'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসটি প্রসঙ্গে আঞ্চলিকতার প্রসঙ্গ বার বার ওঠে। পূর্ববঙ্গের পদ্মাতীরবর্তী অঞ্চলের জীবন-চর্যার বেশ কিছু লক্ষণ উপন্যাসটিতে আছে বলে এর সম্পর্কে আঞ্চলিকতার প্রসঙ্গটি বার বার আসে। তবে আঞ্চলিক উপন্যাস সংজ্ঞার্থের কিছু শর্ত উপন্যাসটিতে আছে বলেই একে 'আঞ্চলিক উপন্যাস' হিসেবে বিবেচনা করা ঠিক নয়। পদ্মা ও তার তীরবর্তী এমন নদীনির্ভর, পূর্ণাঙ্গ জীবনালেখ্য এর আগে বাংলা সাহিত্যে পাওয়া যায়নি একথা যেমন ঠিক, তেমনি এই অঞ্চলের যে বিপুল চিত্রময় জীবন এখানে প্রকাশিত হয়েছে তা থেকেও আঞ্চলিকতার প্রতিভাস গড়ে ওঠার যথেষ্ট সম্ভাবনা তৈরি হয় একথাও সত্য। প্রকৃতপক্ষে উপন্যাসটি গোষ্ঠীজীবন ও ব্যক্তিচরিত্রকে আশ্রয় করে একটি বিশেষ আঞ্চলিক বলয়ে শুরু হলেও কিন্তু শেষ পর্যন্ত আঞ্চলিকতার সংকীর্ণ, সুনির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করে একক ব্যক্তিত্বের আধারে জীবনের বিস্তৃততর প্রেক্ষাপটকে আভাসিত করে তুলেছে।

'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসটির জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ হল এর বিষয়গত অভিনবত্ব, পদ্মার মাঝি ও জেলেদের দুঃসাহসিক কিছুটা পরিমাণে অসাধারণ জীবনযাত্রার আকর্ষণী শক্তিও। খেয়ালি পদ্মার কৃপা ও রুষ্টতার উপর তাদের জীবন ও মৃত্যু নির্ভর করে। তাছাড়া এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সমুদ্রবক্ষের ময়নাদ্বীপ; যা সমগ্র কেতুপুরবাসীর জীবনে প্রত্যাশা ভীতির স্বর্গ-নরকের পরিণতি নির্ধারিত করে তোলে। সেই অজানা রহস্যময় দ্বীপ, তার অভ্যস্ত সমাজ-বহির্ভূত জীবনযাত্রা এবং এর অধিকারী তথা স্রষ্টা হোসেন মিয়া কেতুপুরবাসীদের কাছে নিয়তির প্রতিমূর্তি, স্বপ্ন-পূরণ এবং নরকের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ হয়ে দেখা দিয়েছে। সবমিলিয়ে বলা যায়, নদীনির্ভর মানুষদের এমন পূর্ণাঙ্গ বিচিত্র জীবনালেখ্য বাংলা সাহিত্যে ইতিপূর্বে রচিত হয়নি।

১৪.৬ অনুশীলনী

ক) নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন।

১) "পদ্মা ও পদ্মার খালগুলি ইহাদের অধিকাংশের উপজীবিকা।" একথা কাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে? উপজীবিকার কী পরিচয় এই উপন্যাসে ফুটে উঠেছে তা ব্যক্ত করুন।

২) "এই ঢেঁকির কাঠটির ইতিহাস স্বতন্ত্র।"এই ইতিহাসটির পরিচয় দিন।

৩) "সে যাহাকে ভয় করে, এতলোকের সামনে তাহার মাথা হেঁট হইয়া যাওয়ায় মনে মনে সে শুধু ব্যথা পাইতেছিল।" কার প্রসঙ্গে এই কথা বলা হয়েছে ? সে কাকে ভয় করে ? মাথা হেঁট হওয়ার ঘটনাসূত্রটিই বা কী তার পরিচয় দিন।

৪) ''আর শোন বাই; কী দেখলা কী শুনলা আঁধার রাতে মনে মনে থুইও, কইয়া কাম নাই।'' এই কথা কে কাকে কোন্ প্রসঙ্গে বলেছে?

খ) নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির বিশদ আলোচনাপূর্বক উত্তর দিন।

১) 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে বাংলার নিম্নবিত্ত মানুষের দারিদ্রের যে মর্মান্তিক ফুটে উঠেছে তা কতখানি বাস্তবানুগ তা বিচার করুন।

২) 'পদ্মানদীর মাঝি' আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবে আলোচিত হতে পারে কি না তা বিচার করুন।

৩) 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের আলোচনায় কোনো কোনো সমালোচক লক্ষ করেছেন যে রোমান্টিকতার বিরুদ্ধে সচেতন বিদ্রোহ ঘোষণা করেও লেখক মাঝে মাঝেই তার কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছেন। সমালোচকগণের এই উপলব্ধির সঙ্গে আপনি সহমত কি না তা বিচার করে দেখান।

১৪.৭ গ্রন্থপঞ্জি

ক. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *পদ্মানদীর মাঝি*, বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, ফাল্গুন ১৩৯৯।

খ. নিতাই বসু, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : সমাজ জিজ্ঞাসা*, সঞ্জয় প্রকাশন, কলকাতা।

গ. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : জীবনদৃষ্টি ও শিল্পরীতি*, জি.ই.এ পাবলিশার্স, কলকাতা।

ঘ. নারায়ণ চৌধুরী, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য মূল্যায়ন*, বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা।

ঙ. নারায়ণ চৌধুরী, *মানিক সাহিত্য সমীক্ষা*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

একক-১৫ ❑ পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসে চরিত্রায়ণ

গঠন

১৫.১. প্রস্তাবনা
১৫.২. কুবের : কেন্দ্রীয় চরিত্র
১৫.৩. মালার চরিত্র : কুবেরের জীবনে তার ভূমিকা
১৫.৪. কপিলার চরিত্র : কুবেরের জীবনের নিয়ন্তা
১৫.৫. হোসেন মিয়া : কেতুপুরের নিয়ন্তা
১৫.৬. অপ্রধান চরিত্র : গণেশ
১৫.৭. অপ্রধান চরিত্র : যুগল
১৫.৮. উপন্যাসে বিধৃত নিয়তিবাদ
১৫.৯. সারাংশ
১৫.১০. অনুশীলনী
১৫.১১. গ্রন্থপঞ্জি

১৫.১ প্রস্তাবনা

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি নদীকেন্দ্রিক উপন্যাস হল 'পদ্মানদীর মাঝি'। সমগ্র উপন্যাসটি আকারে ছোট হলেও পূর্ববঙ্গের একটি ধীবরশ্রেণির জীবনালেখ্য তুলে ধরতে গিয়ে লেখক যতজন চরিত্রকে স্থান দিয়েছেন তার সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য নয়। জন্মগ্রহণ, পদ্মার পাড়ে লালিত হওয়া, অবর্ণনীয় দুঃখ ও বঞ্চনার মধ্য দিয়ে কাল কাটানো, হোসেন মিয়ার কূটকৌশল যাদের কুয়াশার মতো ঘিরে রাখে তাদের প্রতিমূর্তি হয়ে দেখা দেয় কুবের, গণেশ, ধনঞ্জয়, পীতম, নকুল, রাসু, সিধু, জহর, রসুল, আমিনুদ্দি। এদের ভাগ্যহত অবস্থার সমভাগী হয়ে আসে মালা, লখা, চণ্ডী, গোপী, ধনঞ্জয়ের স্ত্রী, গণেশের স্ত্রী উলুপী, আমিনুদ্দির মেয়ে, জহরের ছেলে আরও কত জন। এছাড়াও কাহিনিবৃত্তের নানান জায়গায় ছড়িয়ে থাকে ধীবরশ্রেণির অনিশ্চিত দারিদ্র্যক্লিষ্ট জীবনের দায়ভাগী মানুষজন জমিদার অনন্ত তালুকদার, চালানবাবু, শীতল, পুলিশ তথা শাসনতন্ত্রের প্রতিনিধি। এবং সর্বোপরি তার অনিবার্য উপস্থিতি নিয়ে দেখা দেয় হোসেন মিয়া। উপন্যাসটির সবচেয়ে জোরালো ও নাটকীয় চরিত্র হোসেন মিয়া। তার কার্যকলাপ, স্বপ্নের ময়নাদ্বীপ, তার ভয়ংকর বাণিজ্য প্রক্রিয়ার সূত্রেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে লেখক কাহিনিতে স্থান দিয়েছেন শম্ভু ও বগা, নহিবন ও তার সহযাত্রীরা, রাসুর বিগত পরিবার। হোসেন মিয়ার কার্যকলাপে কোনভাবে প্রভাবিত নয়, এমন চরিত্রও কাহিনিতে স্থান পেয়েছে। যেমন গণেশের শ্যালক যুগল, কপিলা ও চরডাঙায় মালার পিত্রালয়ের আত্মীয়স্বজন, আকুরটাকুরের শ্যামা দাস, কেতুপুরের যুগী। এরা নিজেদের স্বচ্ছলতা ও স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার অধিকার নিয়ে উপন্যাসে ঠাঁই পেয়েছে। 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসটির কাহিনি পূর্ণতা পেয়েছে এতগুলি চরিত্রের সহাবস্থানে। পদ্মার স্রোত বেয়ে মানুষের যে জীবনধারা বয়ে চলেছে সেখানে সরলতা ও

স্বার্থসিদ্ধি, দারিদ্র্য ও দুর্নীতি, ক্ষুধা ও কামনার নানা ঘূর্ণাবর্ত কীভাবে তৈরি হয়; এই চরিত্রগুলি তারই গোপন রহস্য পাঠকের কাছে উদ্‌ঘাটিত করেছে। প্রত্যেকটি চরিত্রের সত্তা, বৈশিষ্ট্য একে অপরের থেকে পৃথক করে রেখেছে। কাহিনিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এদের প্রত্যেকের ভূমিকা কম-বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তবে একটি ক্ষেত্রে এদের সকলেরই মিল পাওয়া যায়। এরা প্রত্যেকেই পদ্মার উপর নির্ভরশীল। কখনও পদ্মার প্লাবন, কখনও কালবৈশাখীর ঝড়, কখনও আবার হোসেন মিয়ার চক্রান্ত এলোমেলো করে এদের জীবনকে। এদের প্রত্যেকের জীবনতরঙ্গ প্রশমিত হয়ে যায় এদেরই অসহায় সহিষ্ণুতায়, প্রতিবাদহীন অভ্যস্ততায়। উপন্যাসটিতে বারবার নিয়তিবাদ কিংবা এক অদৃষ্টের প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়। এখানে উপস্থিত নর-নারী সকলেই সেই প্রকৃতি ও পদ্মারূপী নিয়তি এবং দারিদ্র্যের অদৃষ্টরূপী মূর্তির কাছে নতজানু। তাদের এই শোচণীয় অবস্থা প্রকৃতপক্ষে সমাজবাস্তবতারই নির্মোহ রূপায়ণ। যা উপন্যাসটিতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত নিখুঁতভাবে তুলে ধরে সক্ষম হয়েছেন।

১৫.২ কুবের : কেন্দ্রীয় চরিত্র

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের মধ্যে কুবের চরিত্রটিই সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। কুবেরকে কেন্দ্রে রেখে উপন্যাসের সমগ্র ঘটনাধারা আবর্তিত হয়েছে। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা দেখতে পাই কুবেরই উপন্যাসের মূল লক্ষ্য। তাই আমরা কুবেরকে উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্রের শিরোপা দিতে পারি। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র বলতে আমরা বুঝি যে, যাকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের কাহিনি ও অন্যান্য ঘটনা এবং চরিত্রেরা পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়। অর্থাৎ নায়ক বা প্রধান চরিত্রই হলেন আখ্যানের সমগ্র ঘটনাধারার নিয়ন্ত্রক। প্রধান চরিত্র মাধ্যমেই লেখকের জীবনদর্শন প্রকাশিত হয়। এই চরিত্রের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব কিংবা তার ক্রিয়াকলাপ উপন্যাস জুড়ে চলে এবং পরিণতিতেও তার ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। এসব দিক দিয়ে বিচার করে কুবেরকে এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র কিংবা নায়ক চরিত্রের মর্যাদা দিতেই পারি।

উপন্যাসটি পাঠ করলে আমরা দেখতে পাই দুটি পুরুষ চরিত্র প্রায় সমান শক্তি ও সামর্থ্য নিয়ে হাজির হয়েছে। একদিকে কেতুপুরের জেলেপাড়ার দরিদ্র মাঝি কুবের এবং অন্যদিকে ময়নাদ্বীপের সর্বশক্তিমান ধূর্ত হোসেন মিয়া। হোসেন মিয়ার থেকে অনেক ক্ষেত্রে কুবেরকে আমাদের ক্ষীণ, দুর্বল ও অসহায় মনে হয় এবং কার্যত শেষ পর্যন্ত হোসেন মিয়ার ধূর্ততা, ইচ্ছা ও ব্যবস্থাতন্ত্রের কাছে কুবেরকে পরাজয় স্বীকার করতে দেখি। তখন আমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে উপন্যাসের নায়ক হোসেন মিয়া? কিন্তু সমগ্র উপন্যাসটি নিবিড়ভাবে পাঠ করলে আমরা দেখতে পাই, লেখকের প্রকৃত লক্ষ্য ছিল কুবের চরিত্রের গভীরতা ও বিস্তৃতি দান করা। প্রথম শেষ পর্যন্ত কুবের চরিত্রেরই দুঃখ-দুর্দশা, আত্মবিশ্লেষণ, আত্মউন্মোচন, প্রেম-কামনার বিবরণ লক্ষিত হয়। উপন্যাসের সাতটি পরিচ্ছেদ জুড়ে কুবের চরিত্রের সর্বাধিক উপস্থিতি আমরা লক্ষ্য করি। কুবেরের স্ত্রী মালা ও মালার বোন কপিলার প্রতি কুবেরের আকর্ষণ-বিকর্ষণ, হোসেন মিয়া ও ময়নাদ্বীপ আখ্যানেও তার উপস্থিতি, জেলেপাড়ার গোষ্ঠীজীবনে কুবেরের জীবন-যাপনের বর্ণনা অন্যদিকে হোসেন মিয়া ও কপিলার সংস্পর্শে ধীরে ধীরে কুবেরের ব্যক্তিচেতনা প্রকাশিত। হোসেন মিয়া ও ময়নাদ্বীপ উপাখ্যানের সঙ্গে কুবের-কপিলা-মালার মূল কাহিনিতে যোগসূত্র কুবেরই স্থাপন করেছে। কুবেরকে কেন্দ্র করেই উপন্যাসের নানান ঘটনা আবর্তিত হয়েছে। অর্থাৎ আমরা কুবেরকেই উপন্যাসের নায়ক কিংবা কেন্দ্রীয় চরিত্রের শিরোপা দিতে পারি।

কুবের চরিত্রটি বাংলা সাহিত্যে অভিনব। শ্রমজীবী দরিদ্র মানুষদের কথা অনেক লেখকই তাদের সাহিত্যে

তুলে ধরেছেন। কিন্তু মাছমারা জেলে সম্প্রদায়ের মানুষের জীবনালেখ্য এইভাবে নিপুণ পর্যবেক্ষণে মানিকের পূর্বে কেউ দেখাননি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এর পথপ্রদর্শক। উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্ত জীবন নয়, কুবের ও তার পরিবার এবং পারিপার্শিক সমাজের একেবারে নিম্নবিত্ত শ্রেণির এদিক থেকে উপন্যাসের উপজীব্য সমস্ত চরিত্রেরা আমাদের কাছে সত্যিই অভিনব ও খাঁটি বাস্তব জগতের।

উপন্যাসের সূচনায় আমরা দেখতে পাই বর্ষার মরশুমে ইলিশ মাছ ধরার বর্ণনা। কুবের ও তার সঙ্গীরা একসঙ্গে মাছ ধরছিল। কুবের কেতুপুরের বাসিন্দা। কুবের আর পাঁচজন জেলে-মাঝির মতোই অতি দরিদ্র, সাধারণ একজন মানুষ। পদ্মার উপরই তার জীবন-জীবিকা নির্ভর করে। কুবের চরিত্রের উত্থান-পতনের ভাঙাচোরা বুঝতে হলে আমাদেরকে প্রথমে তার পারিপার্শিক অবস্থাটি বুঝে নিতে হবে। কেতুপুরের যে জেলেপাড়া বর্ণনা লেখক উপন্যাসে ব্যক্ত করেছেন তার মধ্যে কুবের বেড়ে উঠেছে। বাসস্থানের সংকীর্ণতা, রোদহীন আলোহীন ঘরে কুবেরের জীবন অতিবাহিত হয়েছে। পরস্পর পরস্পরকে ঠকিয়ে বেঁচে থাকা, ঈর্ষা-সন্দেহ-বিদ্বেষ। উচ্চশ্রেণির মানুষদের ধীবরশ্রেণির প্রতি অন্যায়, অবিচার, শোষণ। এসব তারা সহ্য করে প্রান্তিক জীবনকে মেনে নিয়েছে। এইরকম একটি পরিবেশে কুবেরও বড় হয়েছে। তবে তার মধ্যে এই চরিত্রের রদবদল ঘটেছে। উপন্যাসে তার ব্যক্তিচরিত্রকে লেখক পরিস্ফুট করেছেন। ব্যক্তিচেতনা ও ব্যক্তিস্বরূপের উন্মোচনে কুবের হয়ে উঠেছে অন্য পাঁচজন মাঝির থেকে স্বতন্ত্র।

কুবের মাঝি সারারাত পরিশ্রম করে মাছ ধরে। তবু সে পরিবারের অভাব মেটাতে অক্ষম। পরিবারের নানান অভাব-অভিযোগ কুবেরের প্রতি। মালার আঁতুড় ঘরে বর্ষায় জল ঢোকে। ছেলে-মেয়েরা অর্ধ-উলঙ্গ। ঘরে খাদ্যাভাব। চালায় খড় নেই। কুবেরের স্ত্রী মালা পঙ্গু বলে কুবেরের মনে কখনো সে ধরণের অভাববোধ জাগেনি। কুবেরের চোখ দিয়েই দেখা মালা জেলেপাড়ার অন্যান্য রমণীদের থেকে স্বতন্ত্র। রূপকথার গল্প বলা মালা সত্যি রাজরাণীর মতো। কিন্তু অবচেতনে মালার প্রতি কুবেরের একটা ঘৃণা-ক্রোধ ছিল। মালার সঙ্গে কুবেরের সম্পর্কের টানাপোড়েন শুরু হয়েছে কপিলার আগমনের পর থেকেই।

কপিলা যখন বন্যাপীড়িত হয়ে কুবেরের সংসারে এসেছে, তখন দরিদ্র কুবের অনাবশ্যক পরিবার বৃদ্ধিতে খুশি হয়নি। কেননা, তাদের অন্নের জোগাড় কুবেরকেই করতে হবে। কিন্তু ধীরে ধীরে কপিলার সেবা-যত্ন-প্রেম পেতে পেতে কুবেরের মনে মালা ও কপিলার একটি তুলনা জেগেছে এবং এতে কপিলাকেই তার শ্রেয় মনে হয়েছে। ধীরে ধীরে অত্যন্ত মনস্তাত্ত্বিক উপায়েই কুবের কপিলার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। কপিলার আগমনের পর থেকেই কুবের চরিত্রের গোষ্ঠীচেতনা কমে এসেছে। ব্যক্তিচরিত্রের চাওয়া-পাওয়া, চেতন-অবচেতন মনের আকর্ষণ-বিকর্ষণ, রোমান্টিকতা আমরা লক্ষ্য করি। কপিলার রহস্যময়তা ও লীলাচাপল্য তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে নদীর মতো। এই প্রেমের দুর্নিবার আকর্ষণে সে ছুটে গেছে কপিলার কাছে। প্রেম কুবের চরিত্রের অন্যতম একটি দিক, আর এর থেকেই তার আত্মবিশ্লেষণ-রোমান্টিকতার প্রকাশ।

উপন্যাস মধ্যে যা কিছু ঘটেছে তা কুবের ও তার পরিবারকে কেন্দ্র করেই। মালা ও কপিলার প্রতি কুবেরের আকর্ষণ-বিকর্ষণ, গোপীর বিবাহপ্রসঙ্গ, গোপীর পা ভাঙার দুর্ঘটনা, আমিনবাড়ি যাওয়া, কুবেরের হোসেন মিয়ার নৌকায় কাজ নেওয়া, কুবের-কপিলা প্রসঙ্গ ইত্যাদি সমস্ত কিছুতে কুবেরের ব্যক্তিপরিচয়-সংকট মুখ্য হয়ে উঠেছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কুবেরের দৃষ্টিকোণ। প্রতিটি চরিত্র ও ঘটনা কুবেরের দৃষ্টিকোণ থেকেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অন্যদিকে তার সঙ্গে সামাজিক সম্পর্কের নানা বিন্যাস ফুটে উঠেছে। ফলে ব্যক্তি কুবেরের সঙ্গে সমাজের অন্য শ্রেণির মানুষদের সম্পর্কও আমরা জানতে পারি। লেখক কুবের চরিত্র সম্পর্কে এবং অন্যান্য চরিত্রগুলি সম্পর্কে

সেই সমাজ-ব্যক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াও উপন্যাসটিতে তুলে ধরেছেন।

কুবের চরিত্রের নিস্তরঙ্গ-অসহায়-গতানুগতিক জীবনের পরিচয় আছে উপন্যাসের প্রথমদিকে। কিন্তু পরবর্তীকালে তার ব্যক্তিসত্তার জাগরণ ঘটেছে প্রধানত দুটি চরিত্রের সংস্পর্শে এসে। কপিলা এবং হোসেন মিয়ার সাহচর্যে কুবের স্বপ্ন দেখতে শিখেছে। কপিলার রহস্যময়তা, গতিময়তা, চাপল্য তাকে নিস্তরঙ্গ দাম্পত্য জীবন থেকে নিয়ে এসেছে পদ্মানদীর প্রবাহ হয়ে এক সামুদ্রিক বিশালতায়। অন্যদিকে আপাত নিরীহ স্বভাব, ভীরু-অসহায় কুবের হোসেন মিয়ার কাছ থেকে জেনেছে মানুষ চেষ্টা করলে সমস্ত প্রতিকূলতা জয় করতে পারে, প্রকৃতিকে বাধ্য করতে পারে। সাহস ও শক্তিতে সে ময়নাদ্বীপের অভিমুখে যাত্রা করেছে। পেয়েছে এক অন্যতর জীবনের সন্ধান, যেখানে সমাজনির্দিষ্ট নিয়ম-নীতি নেই। কুবের পদ্মানদীর মাঝি। নদীকে সে ভালোবাসে নদীতে ভেসে চলার স্বাচ্ছন্দ্য অন্য কোনো কিছু থেকে সে পায়নি। কপিলার মধ্যে সে নদীকে এবং পদ্মানদীর মধ্যে সে কপিলাকে খুঁজে পেয়েছে। কপিলার প্রতি অবচেতন আকর্ষণ ও তার স্বপ্ন-দৃশ্য শেষ পর্যন্ত ময়নাদ্বীপ যাত্রার মাধ্যমে সত্যি হয়ে উঠেছে। ময়নাদ্বীপ না গেলে কুবের ও কপিলার মিলন জেলেপাড়ায় সম্ভব হত না। কাহিনির দিক থেকেও তার অন্য কোনো সমাপ্তি হতে পারত না সেই দিক থেকে কুবের চরিত্রের এই পরিণতিও অনেকটাই আশানুরূপ হতে পেরেছে।

কপিলা তার রহস্য-রোমাঞ্চ-অবাধ্যতা এবং জেদী স্বভাব নিয়ে কুবেরের প্রিয় নারী হয়ে উঠেছে। উপন্যাসটি গভীরভাবে পাঠ করে আমরা বুঝতে পারি যে কুবের চরিত্র নির্মাণে একদিকে পদ্মানদী অন্যদিকে মালা ও কপিলার মতো নারী চরিত্র গভীরভাবে কাজ করেছে। এছাড়া প্রকৃতি-লালিত, প্রকৃতি-নিয়ন্ত্রিত জেলেজীবন ও তার ভাঙাগড়া নিয়তি আর অন্যদিকে হোসেন মিয়া ও মেজোবাবুর মতো সুবিধাভোগী ও সুযোগসন্ধানী চরিত্রগুলিরও প্রভাব পড়েছে তার চরিত্রের পরিণতিতে।

উপন্যাসের শেষে আমরা দেখতে পাই হোসেন মিয়ার জালে ফেঁসে কুবের সারাজীবনের জন্য ময়নাদ্বীপে নির্বাসিত হয়। তবে এই নির্বাসন কুবেরের কাছে আনন্দপ্রিয় ছিল। কেননা সে কপিলাকে নিয়ে ময়নাদ্বীপে যাত্রা করেছে। তার অবচেতন মনের কামনা বাস্তবায়িত হতে চলেছে ময়নাদ্বীপে গিয়ে। ব্যক্তিমানুষ হিসেবে কুবেরের কপিলাকে জীবনসঙ্গিনী হিসেবে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হতে পারবে একমাত্র ময়নাদ্বীপ অভিমুখে যাত্রা করেই। এইভাবে উপন্যাসের প্রথমাংশে গোষ্ঠীচেতনা সরে গিয়ে ধীরে ধীরে কুবেরের মধ্যে ব্যক্তিচেতনার প্রকাশ ঘটতে যায়। এর অন্যতম কারণ কুবেরের দৃষ্টিকোণের প্রয়োগ। লেখকও গোষ্ঠীজীবনের বর্ণনা কমিয়ে দিয়ে কুবেরের ব্যক্তিসংকট ও আত্মজিজ্ঞাসার উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং কুবের চরিত্রের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটিয়েছেন। তথাকথিত ভদ্রলোকীয় সংকীর্ণতা নয়, তার মধ্যে আমরা এক 'বিরাট বিস্তারিত সংমিশ্রণ'কে লক্ষ্য করি। ভালো-মন্দ, রাগ-বিদ্বেষ, ভীরুতা-আত্মজিজ্ঞাসা এবং অবৈধ প্রেমসম্পর্ক সবকিছু মিলিয়ে কুবের 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসটির সার্থক কেন্দ্রীয় বা নায়ক চরিত্র হয়ে উঠতে পেরেছে।

১৫.৩ মালার চরিত্র : কুবেরের জীবনে তার ভূমিকা

'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের মধ্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কুবেরের গোষ্ঠীবদ্ধতা থেকে ক্রমশ উত্তরণের ছবি দেখিয়েছেন। উপন্যাসের মধ্যে কুবের ও কপিলার কাহিনি এবং তার সঙ্গে আছে হোসেন মিয়া ও ময়নাদ্বীপের আখ্যান। কপিলার প্রতি কুবেরের আকর্ষণ এবং পরিশেষে কপিলাকে নিয়ে কুবেরের সমুদ্রযাত্রা দেখিয়ে কাহিনির

পরিসমাপ্তি ঘটানো হয়েছে। সমগ্র উপন্যাসটিতে কেন্দ্রীয় নারী চরিত্র হিসেবে কপিলাকেই আমরা দেখতে পাই। কিন্তু কপিলার পাশে আরও একটি নারী চরিত্র রয়েছে। আলোচ্য উপন্যাসে সে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। চরিত্রটি হল মালা। কুবেরের স্ত্রী মালা। কপিলার দিদি মালা। গোপী-লখা-চণ্ডীর জননী মালা। মালা পঙ্গু ও অলস। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৃষ্ট মালা চরিত্র বাংলা সাহিত্যে প্রতিবন্ধী চরিত্রদের মধ্যে অন্যতম। মানিকের কথাসাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল মানব-তন্ময়তা। মানুষের জীবনের নানা বিচিত্র মাত্রা দেখি। জীবনের সর্পিলতা থেকে আরম্ভ করে সরলতা ও বলিষ্ঠ প্রত্যয়ে ঋদ্ধ জীবনকেও পাই। প্রতিবন্ধী মানুষও মানিকের লেখনীতে অনুপম-চিত্রিত।

আলোচ্য উপন্যাসে মালা শুধুমাত্র শারীরিক পঙ্গুতার কারণেই জীবনের আংশিক রূপের সঙ্গে পরিচিত। কিন্তু সংসারে তার অস্তিত্ব কোনো অর্থেই খণ্ডিত নয়। কেতুপুরের দশমাইল উত্তরে চরডাঙা গ্রামের বৈকুণ্ঠের কন্যা মালা। তার গৌরবর্ণ এবং জেলেপাড়ার পক্ষে বিরল সৌন্দর্যের কারণে তার কুবেরের চেয়ে হয়তো ভালো পাত্র জুটতো। কিন্তু একটা পা বেঁকে থাকায় সে উত্থানশক্তিরহিত, চলৎক্ষমতাহীন। তাই মালার জীবনে বরাদ্দ হয় কুবেরের মতো হতদরিদ্র স্বামী, ভাঙা ঘর, উপবাসী রাত্রি আর অসহায় জড়ত্ব। ঘরের এক কোণায় সে পড়ে থাকে সারাদিন। বাইরের জগতে তার গতিবিধি বন্ধ হলেও বেড়ার ফাঁক দিয়ে চোখ পেতে সেই জগতকে সমস্ত অন্তরাত্মা দিয়ে অনুভব করতে পারত।

উপন্যাসের প্রথম দিকে রয়েছে কুবের ও মালার দরিদ্র জেলে পরিবারের চিত্র। কুবের অতি যত্নে তার আঁতুড় ঘরে খড় দিয়ে বৃষ্টি আটকায়। পিসির লুকিয়ে রাখা চিঁড়ে এনে দেয়। আবার মাঝে মাঝে শাসন করে স্ত্রীকে। ক্লান্ত কুবের ঝিমোতে ঝিমোতে আবিষ্কার করে শিশুকোলে তার বউকে রাজরাণীর মতো দেখায়। কুবেরের কন্যা গোপী বিবাহযোগ্যা। বয়স ভাঁড়িয়ে বেশিদিন রাখা যাবে না। যুগল নামের পাত্রটি কুবেরে বেশ পছন্দের। কিন্তু যুগল গোপীকে বিয়ে করতে রাজী হয় না। যুগলের ধারণা মায়ের মতো মেয়েও যদি খোঁড়া হয়। কুবের এর প্রতিবাদ করে যুগলের কাছে। লেখক এখানে অন্ধবিশ্বাসের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করতে চেয়েছেন এবং প্রতিবন্ধকতার কারণে মানুষ যে অবহেলিত হয় তাও দেখাতে চেয়েছেন।

মালার বাল্যজীবনের যে পরিচয় লেখক উপন্যাসে ব্যক্ত করেছেন সেই বর্ণনা থেকে বোঝা যায় বাল্যকালে ভাইয়ের দুরন্তপনার শাস্তি মালাই পেত। তাকে সবাই মিলে গোবরগাদায় ফেলে দিত। দৈহিক অপূর্ণতার জন্যই উপহাস। তাকে নিয়ে সবাই মজা করত। সমাজে এই ধরণের চিত্র কিন্তু দুর্লভ নয়। মালার কৈশোরের স্মৃতি তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াতে থাকে পাছে তার দুরন্ত ছেলে লখা ও চণ্ডী মারামারি করে বসে, তাই সে সদা সতর্ক থাকে।

প্রতিবন্ধী মালার প্রতি মানিক সহানুভূতিশীল। তার পঙ্গুত্বের বিপ্রতীপে তিনি পরিস্ফুট করেন অসাধারণ নারী মহিমাটি। তার রাগ, দুঃখ, আনন্দ, বেদনা মিশ্রিত দাম্পত্যের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে মালা পাঠকের দরদী মনে স্থান করে নেয়। মালা প্রসঙ্গে লেখক 'পঙ্গু' ও 'অলস' কথাটি ব্যবহার করেছেন। এটিই যে তার একমাত্র পরিচয় তা নয়, লেখক ধীরে ধীরে এই রমণী চরিত্রের মধ্যে নানা মাত্রা সংযোজন করেছেন। মালা পঙ্গু এবং সেই কারণেই আর পাঁচজন স্বাভাবিক নারীর মতো নয়, সে অলস। সন্তান-স্নেহের দিক থেকেও মালার মৌলিকতা ছিল। অন্য জননীরা নবজাত সন্তানকে যেমন তীব্র স্নেহ করে তেমনি বয়স্ক সন্তানের প্রতি তাদের উদাসীনতা দেখা যায়। কিন্তু মালার মাতৃত্ব পৃথকপথগামী। তার যাবতীয় পঙ্গুত্ব ও আলস্যের বিপ্রতীপে একটি একটি পূর্ণাঙ্গ অনলস মাতৃত্বের চিত্র আমরা দেখতে পাই। মানিক এই প্রতিবন্ধী মাতৃহৃদয়ের প্রতিবন্ধকতাহীন মমতা-স্রোতের পরিচয় দানে দৃঢ় সংকল্প ছিলেন।

উপন্যাসের মধ্যে ফুটে উঠেছে একদিকে মালার প্রতি কুবেরের স্নেহপ্রেম অন্যদিকে মাঝে মধ্যে বিতৃষ্ণাও। কুবেরের অবচেতন মনে রয়েছে মালার বোন কপিলার প্রতি দুর্নিবার এক আকর্ষণ। মালার প্রতিবন্ধকতা ও পঙ্গুত্বের বিপরীতে রয়েছে কপিলার চঞ্চলতা ও দুরন্তপনার চিত্র। কাহিনির পরিণতিতে রয়েছে কুবেরের অভাববোধ এবং কপিলাকে নিয়ে তার সমুদ্রযাত্রা। স্বামী পরিত্যক্তা কপিলা হঠাৎ কুবের-মালার সংসারে এসে তাদের শান্তির নীড় নষ্ট করে। এখান থেকে গড়ে ওঠে তাদের ত্রিকোণ প্রেম। পঙ্গু মালার বিপ্রতীপে লীলাময়ী কপিলার প্রতি কুবেরের আকর্ষণ ক্রমবর্ধমান। কুবের চঞ্চলা পদ্মানদীর বুকে সাঁতরে আনন্দ পায়, সে গতিময়ী নদীর মাঝি এরই সমান্তরালে কপিলার নদীবৈশিষ্ট্যটি লেখক এনেছেন। এই কেতুপুরে থাকার সময়েই কুবেরকে ঘিরে কপিলার নিজের মনে একটি স্বপ্নের জাল বুনে তোলার ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। কপিলার সেবা, উদ্দামতা, শারীরিক ভঙ্গি, খুনসুটিসবকিছুই কুবেরের কাছে গ্রহণযোগ্য, সহনীয়। বর্ষার উথলে ওঠা পদ্মার মতো কপিলা 'ঘুম আসিবার আগে তাহাকে স্বপ্নও আনিয়া দেয়'।

উপন্যাসের মধ্যে আমরা দেখতে পাই কালবৈশাখীর ঝড়ে কুবেরের মেয়ে গোপীর পা ভেঙে যায়। গোপির ভাঙা পা সেরে ওঠার ছবি দেখতে পাই উপন্যাসের সপ্তম পরিচ্ছেদে। গোপির আমিনবাড়ি গিয়ে সুস্থ হওয়ার ঘটনা মালার মনে এক তীব্র বাসনা তৈরি করে। মালাও আমিনবাড়ি গিয়ে নিজের পঙ্গুত্বকে সারাতে চেয়েছে। কুবের মালাকে বোঝায় তার পা ভালো হওয়ার নয়। তবুও মালা জেদ করে। এখানে মালার অদম্য জীবনাসক্তির, সুন্দর অখণ্ড পূর্ণাঙ্গ জীবনযাপনের ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে। এই অংশে দেখি মালার জীবনসংগ্রামের ছবি। অন্তত একবার সে নিজে তার সারাজীবনের দুঃখ ও পরিজনদের পরিহাস-উপহাস মুছে দেওয়ার জন্য, পঙ্গুত্বকে জয় করার জন্য সে পথ হেঁটেছে। কিন্তু সে ব্যর্থ। এই ব্যর্থতার জন্যই চরিত্রটি আরও ট্র্যাজিক হয়ে উঠেছে। কুবের-মালার দাম্পত্য সম্পর্কের বন্ধন শিথিল হয়ে এসেছে তা হোসেন মিয়া আগে থেকেই টের পেয়েছে। কুবের-কপিলার সম্পর্কও সুচতুর হোসেন মিয়ার নজর এড়ায়নি। শেষপর্যন্ত তাদের সম্মিলিত চক্রান্তেই মালাকে কেতুপুরে ফেলে রেখে যায় অসহায়, নিঃসম্বল তিন সন্তানের রক্ষায়। কুবের সংসার থেকে দায়মুক্ত হয়ে কপিলাকে সাথে নিয়ে যেতে চায় সুদূর ময়নাদ্বীপে। উপন্যাসের শেষে কুবেরের সমুদ্রযাত্রা মাঝি জীবনের বিস্তৃতি লাভ করে। তার যাত্রার সঙ্গিনী হয় কপিলা। কিন্তু এর বিপরীতে মালা পড়ে রইল সেই জেলেপাড়ার নিশ্ছিদ্র অন্ধকার জগতেই। কিন্তু পঙ্গুত্ব, আলস্য আর অনন্ত মাতৃস্নেহ নিয়ে মালা এক জীবন্ত চরিত্র। শেষ অবধি তার ঠাঁই হল নৌকার মতো, মরা গাঙে। পিছনে পড়ে থাকে অসম্পূর্ণ, অবহেলিত, অক্ষম মালা। চরম উপেক্ষার অন্ধকারে হারিয়ে যায় তার অস্তিত্ব।

১৫.৪ কপিলার চরিত্র : কুবেরের জীবনের নিয়ন্তা

'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় নারী চরিত্র হল কপিলা। কুবেরের স্ত্রী মালা এবং মালার বোন কপিলাকে কেন্দ্র করে একটি ত্রিকোণ প্রেম রচিত হয়েছে। মালা চরিত্র অপেক্ষা কপিলা চরিত্রটি সবদিক থেকেই আকর্ষণীয়। নারীর যে শাশ্বত রহস্যময়তা, দুর্বোধ্যতা ও প্রেমের বিচিত্র রূপ, ধরা দিয়েও ধরা না দেওয়া, কাছে আসা আবার দূরে যাওয়া ইত্যাদি বিচিত্ররূপিণী ক্রিয়া কপিলার মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়। সংসারের নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকর্ম আবার অন্যদিকে বাইরের অজানা অপরিচয়ের দিকে পুরুষকে টেনে নিয়ে যাওয়ার রোমান্টিক ক্ষমতা আমরা তার মধ্যে সহজেই প্রত্যক্ষ করি। কপিলা চরিত্রটি সবদিক থেকেই স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত। কপিলা শুধু মানিক সাহিত্যেই নয়, সমগ্র বাংলা সাহিত্যে এক অসাধারণ নারী চরিত্র।

নদীকেন্দ্রিক উপন্যাসগুলিতে নদীর সমধর্মী বা নদীর কোনো একটি বৈশিষ্ট্য সমন্বিত নারীদের দেখতে পাই। যারা উপন্যাসের পুরুষদের জীবনে এসে উদ্দামতায়-প্রেমে-রহস্যে-চাঞ্চল্যে ভরিয়ে তুলেছে। কপিলাও আলোচ্য উপন্যাসে নায়ক কুবেরের জীবনে এসে তার জীবনকে বিচলিত, বিপর্যস্ত আবার সম্পূর্ণ করে তুলেছে। কপিলা কাহিনির বেশি পরিসর লাভ করেছে মালার তুলনায়, কুবেরের পরিণতি নির্ধারণে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে এবং তাকে কেন্দ্র করে কুবের বদ্ধ জীবন থেকে মুক্ত হয়ে বেরিয়ে এসেছে বাইরের বিশালতায়।

কপিলা চরিত্রের আবির্ভাব উপন্যাসের চতুর্থ পরিচ্ছেদে। মালার অনুরোধে কুবের মালার বাপের বাড়ি চরডাঙায় বন্যাপীড়িত আত্মীয়দের খবর নিতে গেছে। বন্যায় মালার ভাই-বোনদের অবস্থার বর্ণনা প্রসঙ্গে এসেছে কপিলার কথা। কপিলার বিয়ে হয়েছিল আকুরটাকুরের নিবাসী শ্যামাদাসের সঙ্গে। দুই বছর আগে কপিলার একটি মেয়ে হয়ে আঁতুড়েই মারা যায়। উপন্যাসের আখ্যান থেকে আমরা জানতে পারি ফাল্গুন মাসে কপিলাকে স্বামীর কাছে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু তার স্বামী তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। আমরা কপিলার স্বামী-সংসার-ভাগ্য যে নিতান্ত মন্দ তা জানতে পারি। আত্ম-অতৃপ্তি তার ভেতরে ধিকি ধিকি করে জ্বলেছে, অথচ তার রঙ্গ-রসিকতা-উচ্ছৃলতা-চাপল্যের কোনো সীমা নেই। কপিলা সাজতে ভালোবাসে এবং নিজের দেহ ও রূপ সম্পর্কে আলাদা একটা সচেতনতা তার ছিল।

কপিলার আগমনের পর থেকে উপন্যাসের মধ্যে আমরা একটি বাঁকবদল ও রূপান্তর দেখতে পাই। কপিলা আসার পর কুবের-মালা-কপিলা সম্পর্কের ত্রিকোণ রচিত হয়েছে। শান্ত-নিস্তরঙ্গ নিরীহ দরিদ্র মাঝি কুবেরের জীবনে আমরা পরিবর্তন লক্ষ্য করি। তার মনে এসেছে মালা ও কপিলার তুলনা, এই তুলনায় কপিলাকেই সে শ্রেয় মনে করেছে। সাধারণ এক মাঝি চরিত্রের মধ্যে রোমান্টিকতার প্রকাশও আমরা দেখতে পাই, যা কপিলার সংস্রবেই ঘটেছে। কুবের চরিত্রের বিকাশ-বিবর্তন ও পূর্ণায়ত রূপটি অর্থাৎ 'হয়ে ওঠা'য় কপিলার প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে। শুধু তাই নয়, কুবের-কপিলার সমাজ বহির্ভূত সম্পর্ক ও ময়নাদ্বীপে নর-নারীর যৌনজীবনের উদারতা-শৃঙ্খলহীনতা কুবেরকে ময়নাদ্বীপের যাত্রায় অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে।

কুবেরের দৃষ্টিকোণে আমরা দেখতে পাই কপিলা পুরুষ-হৃদয়কে জয় করেছে শুধু তার লীলা-ছলা-কলার মধ্য দিয়ে নয়, সে সেবা-যত্নের মধ্য দিয়েও কুবেরের মনে নিজের জায়গা করে নিয়েছে। যে সেবার পরিচয় কুবের তার দাম্পত্য জীবনে মালার পঙ্গুত্বের জন্য পায়নি, তা কপিলার থেকে পেয়েছে। কুবের-কপিলার ঘনিষ্ঠতা যে মালা বুঝতে পারে নি তা নয়। কপিলা চরডাঙায় যায়নি বলে মালার মনেও পত্নীসুলভ ঈর্ষা দেখা দিয়েছে। সে এক জায়গায় বসে থাকলেও তার দৃষ্টি সর্বত্র ছিল। কপিলা চরিত্রের একটি বড় গুণ সে কর্মপটু, তৎপর এবং পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে সক্ষম ছিল। কুবেরের সংসারে ভালোমন্দে সে সমানভাবে অংশগ্রহণ করে। বিপদের সময় সে কুবেরকে ত্যাগ করেনি।

উপন্যাসের মধ্যে আমরা দেখতে পাই একসময় শ্যামাদাস কপিলাকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এলে সে তার সাথে চলে যায়। কপিলার সঙ্গে কুবেরের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই ব্যবধান ও দূরত্বটি প্রয়োজন ছিল। কপিলা চলে যাওয়ার ফলে কুবের কপিলার প্রতি আরও বেশি আকর্ষণ অনুভব করেছে। কপিলা চলে যাওয়ার পর হোসেন মিয়ার ময়নাদ্বীপে কুবের যাত্রা করেছে। স্বচক্ষে সে ময়নাদ্বীপ দেখে এসেছে, সেখানে পেয়েছে অশৃঙ্খলিত যৌনজীবনের আহ্বান। কপিলাকে সে ভুলতে পারে না। আর এদিকে কপিলাও শেষ পর্যন্ত কুবেরের কাছে ফিরে এসেছে। গৃহের পরিধিতে বাঁধা যায় কপিলার মধ্যে এমন নারীত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না। তাই নানা ছুতোয় শ্যামাদাসের সংসার ফেলে সে কখনও চলে আসে চরডাঙ্গায় কখনও আবার কেতুপুরে। কপিলার একমাত্র সন্তান

মারা যাওয়ার পর নতুন কোনো বাৎসল্যবন্ধন তাকে শ্যামাদাসের সংসারে সম্পৃক্ত করে রাখে নি। নিজের প্রার্থিত স্থানটি সে ক্রমশ খুঁজে পেয়েছে কুবেরের কাছে। কুবেরের অকপট স্বীকারোক্তিতে সে বোঝে কুবেরের জীবনের কেন্দ্রভূমিটি স্থানান্তরিত হয়েছে কপিলার মধ্যে। কুবের চরিত্রের যে আত্ম-প্রসারণশীলতা, গোষ্ঠী থেকে ব্যক্তি, কেতুপুরের জেলেজীবনের বদ্ধতা থেকে সামুদ্রিক বিশালতার ব্যাপ্তি তাতে কপিলার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব রয়েছে। কপিলাকে পাওয়ার দুর্নিবার প্রেরণা ও আকর্ষণ না থাকলে কুবের নিজের জীবনে এতবড় ঝুঁকি বোধ হয় নিত না। নৌকায় কপিলা সঙ্গী না হলে কুবের এতটা পথের যাত্রাই হয়তো করত না। কুবেরের কাছে পদ্মার মতোই কপিলা দুর্বোধ্য অথচ আকর্ষণীয়। কুবেরের কাছে কপিলা এতটাই প্রিয় ও শ্রেয় যে শেষ পর্যন্ত স্ত্রী-সন্তানদের ছেড়ে কপিলাকে নিয়ে চিরতরে দূর ময়নাদ্বীপে পাড়ি দিল।

কপিলার মালার প্রতি মমতা, কুবের-মালার সন্তানদের প্রতি ভালোবাসা থাকা সত্ত্বেও নিজের স্থান খুঁজে নিয়ে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য সে তার যাবতীয় ছলা-কলা দিয়ে কুবেরকে গ্রাস করেছে। কুবেরের যাবতীয় অভাববোধ, অনাস্বাদিত অভীপ্সার শূন্যতাকে সে সুকৌশলে পূর্ণ করে তুলেছে নিজের অস্তিত্ব দিয়ে। জীবনসঙ্গিনী হিসেবে মালা কুবেরের কাছে যতটাই সঙ্গতিহীন, কপিলা ততটাই সক্ষমতার পরিচয় রেখেছে। তাই নারী-পুরুষের যে প্রকৃতি নির্ধারিত সম্পর্ক পারস্পরিক সমগ্রতা সৃষ্টি, সেদিক থেকেও কপিলাই যোগ্যতরা হয়ে উঠেছে। এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় নারী চরিত্র হিসেবে এবং কুবেরের জীবনের নিয়ন্তা হিসেবে কপিলা তার অস্তিত্বকে অনস্বীকার্য করে তুলেছে।

১৫.৫ হোসেন মিয়া : কেতুপুরের নিয়ন্তা

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের হোসেন মিয়া চরিত্রটি স্বতন্ত্র সম্ভাবনাময়। চরিত্রটি এমনই এক পরস্পরগুণের সমন্বয় যে সব সমালোচকই তাকে একবাক্যে জটিল বলে স্বীকার করে নেন। সমগ্র মানিক সাহিত্যে এমনকি বাংলা সাহিত্যে হোসেন মিয়া ব্যতিক্রমী, অসমান্তরাল এবং দ্বিতীয়রহিত চরিত্র। তার মধ্যে নায়ক হওয়ার যাবতীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যদিও এই উপন্যাসের মূল লক্ষ্য কুবের, তবুও হোসেন মিয়া ও তার ময়নাদ্বীপ প্রসঙ্গ কুবেরের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। নদীতীরবর্তী ধীবরশ্রেণির মানুষদের জীবনে পদ্মা এবং প্রকৃতির মতোই হোসেন মিয়া অলঙ্ঘ্য অনিবার্য। নিয়তির মতোই সে অমোঘ ও দুর্দম।

উপন্যাসের মধ্যে হোসেন মিয়ার আবির্ভাব ঘটে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে। মালার সঙ্গে কুবেরের কথোপকথনে তার প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। হোসেন মিয়া রহস্যময় প্রকৃতির মানুষ। প্রথম ক্ষেত্রে তার রহস্যময়তা ঘনীভূত প্রধানত তার পূর্বজীবন ও বর্তমান কর্মজীবনকে কেন্দ্র করে। কেতুপুরে নোয়াখালি থেকে এসে কয়েক বছর বাস করছে। প্রথম জীবনে সে খুব দরিদ্র ছিল। তবে বর্তমানে তার চেহারা ও অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে। ঘরবাড়ি, জমি-জায়গার সঙ্গে তার দুটি স্ত্রী আছে। এই সুখ ও স্বচ্ছলতা অর্জনের পথটিই তার রহস্যময়তার দ্বিতীয় কারণ। তার ব্যবসায়িক কীর্তিকলাপের কোনো সুস্পষ্ট হদিশ কেতুপুরবাসী খুঁজে পায় না। তার কর্মকুশলতা যেমন তাদের চমৎকৃত করে, তেমনি কোনো অজানা আশঙ্কায় তার থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতেও তারা সচেষ্ট হয়।

হোসেন মিয়া জেলেপাড়ার প্রত্যেকটা ঘরে অবাধে যাতায়াত করে। মানুষজন তাকে ঘিরে বসলে তার মুখ আনন্দে ভরে ওঠে। কেতুপুরের মানুষ না হয়েও এক অর্থে কেতুপুরের সর্বেসর্বা হয়ে উঠেছে সে। তার এই উত্থানের পেছনে একদিকে তার অর্থনৈতিক উন্নতি সক্রিয় হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি সকলের সঙ্গে সহজ সম্পর্কসূত্র,

নৈকট্যসৃষ্টির বিশেষ ক্ষমতাটিও দায়ী বলা যায়। তবে হোসেন মিয়ার এই অপরিহার্যতা জেলেপাড়ার উপর অনেকটাই স্ব-আরোপিত। তার উপর সব বিষয়ে নির্ভর করেও মনে মনে কেউই তাকে বিশ্বাস করে না, অসংকোচ আপনত্বে বরণ করে না। নিজেদের জীবনের দারিদ্র্য তাদের সমস্ত জগতের প্রতি অবিশ্বাসী করে তুলেছে। তাই হোসেন মিয়ার অন্তরঙ্গতা স্থাপন আসলে তার আশু কোনো উদ্দেশ্যসিদ্ধির আয়োজন হতে পারে এই আশঙ্কায় তারা তাকে শুধু নীরবে সহ্য করে।

হোসেন মিয়া নোয়াখালির দিকে সমুদ্রের মধ্যে একটি দ্বীপে জমিদারি স্থাপন করেছেন। দ্বীপটির নাম ময়নাদ্বীপ। একটি রহস্যময় দ্বীপ। এই ময়নাদ্বীপের বিস্তৃত পরিচয় পেয়েছে কুবের। দ্বীপটিকে নিজের চোখে দেখার সুযোগ তার হয়েছে। হোসেন মিয়া তার দ্বীপকে কেন্দ্র করে যে কঠিন কাজে আত্মনিয়োগ করেছে, তা কুবেরকে বিস্মিত করে তোলে। হোসেন মিয়া এবং প্রচলিত ধর্মাচার ও সমাজনীতির থেকে বিচ্ছিন্ন ময়নাদ্বীপ উপন্যাসের মধ্যে বারবার ফিরে এসেছে রহস্যের মধ্যে শঙ্কা, অনির্দিষ্টতার সঙ্গে আকাঙ্ক্ষা পূরণের প্রতীক হিসেবে। হোসেন মিয়া ও তার ময়নাদ্বীপের এরূপ রহস্যময় উপস্থিতি আমাদের কাছে বিস্ময় ও কৌতূহলের বিষয় হয়ে ওঠে।

লেখক হোসেন মিয়া চরিত্রটির মধ্যে বেশ কিছু গুণের আরোপ করেছেন। একদিকে সে বিষয় কর্মে পটু, সম্পত্তি ও প্রতিপত্তির পরিধি সে সুকৌশলে বাড়িয়ে চলেছে। অন্যদিকে তার মধ্যে একটি রোমান্টিক গীতিকবির সত্তা বর্তমান। বাইরে সে বেশ অমায়িক ভালোমানুষ। কিন্তু অন্তরে তার প্রতিশোধ নেওয়ার কৌশলটিও শান্ত অথচ ভয়ানক। জেলেপাড়ায় সে যেভাবে তার প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে তাতে অনন্ত তালুকদারও তার সাথে পেরে ওঠে না। কুবেরকে সে ময়নাদ্বীপে নিয়ে যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কুবের-মালার সম্পর্ক যে শিথিলতা এসে গেছে এবং কুবের-কপিলার অবৈধ সম্পর্ক বিষয়ে জানতেও তার সময় লাগেনি। ক্রমে ক্রমে সে কুবেরকে মিথ্যা চুরির অভিযোগে ফাঁসিয়ে ময়নাদ্বীপে যেতে বাধ্য করায়।

হোসেন মিয়া চরিত্রটির পরিচয় তার ময়নাদ্বীপ পরিকল্পনার মধ্যে অনেকটা নিহিত আছে। সে যে কঠিন ব্যাপৃত সেই দ্বীপের জনবসতি গড়ে ওঠার পেছনে তার একটি বিকল্প সমাজভাবনা ক্রিয়াশীল। যেখানে জমির কোনো সীমা নেই, বসতি গড়তে হবে। আর নারীর গর্ভে সন্তান আনতে হবে, যারা হবে ময়নাদ্বীপের প্রজা। নর-নারীর অবাধ মেলামেশায় তার আপত্তি নেই। সুস্থ সবল নারীর জন্য চায় সুস্থ শক্ত সমর্থ এবং সন্তান উৎপাদনে সক্ষম পুরুষ। পরবর্তীকালে কুবেরও কপিলাকে নিয়ে অসামাজিক প্রেমে মত্ত হতে পারবে বলে সে ময়নাদ্বীপে যাত্রা করেছে। হোসেন মিয়ার মধ্যে মানুষকে বশ করার, তাদের উপর কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা ও প্রতিভা দুই-ই আছে। অন্যদিকে জেলেপাড়ার মানুষদের বিপদের দিনে সাহায্য করে সে। তার উদ্দেশ্য একটিই মানুষগুলোকে এক এক করে ময়নাদ্বীপে নিয়ে যাওয়া।

হোসেন মিয়া সম্পর্কে অনেক সমালোচকই বিরূপ মন্তব্য করেন। তার ময়নাদ্বীপ সম্পর্কে অনেক সমালোচক বলেছেন এটি একটি অবাস্তব বা একটি Utopian Concept. অনেকেই এই বিষয়টিকে লেখকের মার্কসীয় আদর্শে বিশ্বাসের ফল ভেবেছেন। এপ্রসঙ্গে একালের অধ্যাপক গোপিকানাথ রায়চৌধুরী যে মন্তব্যটি করেছেন তা যথাযথ ও সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য। তিনি বলেছেন

আপাতদৃষ্টিতে অনেকের কাছে ময়নাদ্বীপকে হোসেন মিয়ার 'উপনিবেশ' বা 'জমিদারী' বলে মনে হলেও আসলে কিন্তু তা নয়। বরং এর মধ্য দিয়ে আগে পর্যন্ত মার্কসীয় আদর্শে আনুষ্ঠানিকভাবে অদীক্ষিত মানিকের সমাজবাদী মনের এক অস্ফুট স্বপ্ন-কল্পনা রূপ পেতে চেয়েছে।'

(গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়: জীবনদৃষ্টি ও শিল্পরীতি, জি.ই.এ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ: ৮৭।)

হোসেন মিয়া চরিত্রটি কোনোভাবে অবান্তর নয়, অলীক নয়। এই চরিত্রটি নির্মাণে মানিকের অস্থিরতা প্রকাশ পায় নি। হোসেন মিয়া একজন সক্রিয় চরিত্র। তার সংগ্রাম ও ক্রিয়াশীলতা লক্ষণীয়। সে শুধু স্বপ্ন দেখে নি, স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতেও সমর্থ হয়েছে। তার কাজকর্ম, আচার-আচরণে ধূর্ততা আছে ঠিকই। আবার বেশ কিছু সৎ গুণও রয়েছে। ভালো-মন্দ মেশানো উপন্যাসের এক আদর্শ চরিত্র হয়ে উঠেছে।

লেখকের হোসেন মিয়া চরিত্র পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য কিন্তু কুবের চরিত্র পরিকল্পনার সঙ্গে, কুবেরের চরিত্র বিকাশ ও বিবর্তনের প্রয়োজনের সঙ্গে বিজড়িত হয়ে আছে। হোসেন মিয়া ও ময়নাদ্বীপ প্রসঙ্গ কুবের-কপিলা-মালার আখ্যানের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। হোসেন মিয়া না থাকলে কুবের ও কপিলা আখ্যানের এমন শিল্পসম্মত পরিসমাপ্তি হওয়া সম্ভব ছিল না। হোসেন মিয়া উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র কুবের এবং মূল কাহিনি কুবের-কপিলা-মালা বৃত্তের মধ্যে সেতু তৈরি করেছে। বিশেষ করে উপন্যাসটি গোষ্ঠীজীবন ও আঞ্চলিকতার সীমা ছাড়িয়ে কুবেরের ব্যক্তিজীবনের চিন্তা-চেতনা প্রেম-অপ্রেমের মধ্যে ধাবিত হয়েছে। এর পেছনেও হোসেন মিয়ার যথেষ্ট ভূমিকা আছে।

পরিশেষে বলা যায়, মানুষের বেঁচে থাকতে গেলে বৃত্তিগত রূপান্তর, গত্যন্তর, উপায়ান্তর অন্বেষণ এ তো মানুষের সহজাত ধর্ম, জীবনপ্রীতির অন্যতম বহিঃপ্রকাশ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বে এদেশে যে অর্থনৈতিক মন্দা, মানুষের মূল্যবোধের অবক্ষয় ইত্যাদি বহুমুখী নৈরাজ্য ও নৈরাশ্যের জন্ম দিয়েছিল। মধ্যবিত্ত শ্রেণি তা থেকে বেরিয়ে এসে নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল। আকাঙ্ক্ষিত এই জীবন বাস্তবে ছিল না বলেই তা মায়ার ও কল্পনার জগৎ হয়ে দেখা দিয়েছিল। হোসেন মিয়া ও তার ময়নাদ্বীপও কেতুপুরবাসীর কাছেও এইরূপ এক কুহক। হিংস্র জন্তু, কঠোর পরিশ্রমের মধ্যেও সেখানে জেগে আছে প্রত্যাশার নীড়। উপনিবেশ হলেও সেখানেই আছে অভাববোধ, হতাশার সমাপ্তি এবং ভোগের সূচনা। এইভাবেই ময়নাদ্বীপ ও হোসেন মিয়া একাত্ম হয়ে একজাতীয় স্বপ্নপূরণের প্রতীক রূপে দেখা দিয়েছে।

১৫.৬ অপ্রধান চরিত্র : গনেশ

'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র কুবের। এই কুবেরের সর্বক্ষণের সঙ্গী হল গণেশ। গণেশ অপ্রধান চরিত্র হলেও তার ভূমিকা উপন্যাসের মধ্যে কম নয়। উপন্যাসের প্রথমে তাকে দেখা যায় কুবেরের সঙ্গে মাছ ধরার সাথী হিসেবে। সে কেতুপুরের জেলে। ধনঞ্জয়ের নৌকায় অর্ধেক মাছের ভাগে কুবের ও গণেশ একত্রে কাজ করে। গণেশ সাধাসিধে মানুষ। সে শীতে কাবু, তবু মাছ ধরার সময় সে কুবেরকে ছেড়ে যায় না। মাঝে মধ্যে কুবের তাকে ধমক দিলেও সে কুবেরকে ভালোবাসে। লেখকের ভাষায় গণেশের বর্ণনা

কুবেরের সে অত্যন্ত অনুগত। জীবনের ছোটবড় সকল ব্যাপারে সে কুবেরের পরামর্শ লইয়া চলে। বিপদে আপদে ছুটিয়া আসে তাহারই কাছে। দাবি আছে, প্রত্যাশা আছে, সুখ-দুঃখের ভাগাভাগি আছে, কলহ এবং পুনর্মিলনও আছে। কিন্তু গণেশ অত্যন্ত নিরীহ প্রকৃতির বলিয়া ঝগড়া তাহাদের হয় খুব কম।

গণেশ গীতিপ্রিয় মানুষ। কুবেরকে সে গান গাইতে বললে ধমক খায়, তবু সে দমে না। নিজেই খেয়ালখুশি মতো গেয়ে ওঠে। তার গানের মধ্যে 'সে যাহারে ভালোবাসে সে তাহারে পায় না কেন' এই অগভীর সমস্যার

কথা শোনা যায়। লেখক উপন্যাসে গানের সংযোজন ঘটিয়ে রোমান্টিক পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা করেছেন। কাব্যভাষামণ্ডিত এই গানগুলি কাহিনির চরিত্রদের এবং তার সঙ্গে পাঠকের মধ্যে এনেছে একটি বিরাম ও স্বস্তি।

উপন্যাস মধ্যে কুবের জ্বরে ক্লান্ত বোধ করলে গণেশ তাকে সেদিন না আসার কথা বলেছে। শুধু তাই নয় গণেশ কুবেরের মাথা টিপে দিয়ে তার ক্লান্তি দূর করতে চেয়েছে। জেলেপাড়া ঢোকার মুখে নকুল কুবেরের ছেলে হয়েছে এই সংবাদ দিয়ে মেজোবাবুকে নিয়ে অশ্লীল ইঙ্গিত করে। তখন গণেশ প্রতিবাদ করে বলে 'বউ গোরা না নকুলদা?' কুবেরের ছেলে হওয়ার সংবাদে গণেশ খুব খুশি হয়েছে। কিন্তু পরিবারের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধিতে কুবের ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হয়। কুবের রেগে গেলে দুঃখিত হয়েছে গণেশ, তবু তার প্রতি কটুবাক্য সে কখনও বলে নি। গণেশ কুবেরের ঘরের ছেলের মতোই। পিসির কাছে মুড়ি-চিড়া খেয়েছে কুবের ও গণেশ। চাল ধার করতে চেয়েও গণেশ কুবেরকে বলতে পারেনি। গণেশ কুবেরের সঙ্গে রথের মেলায় গেছে। গণেশের স্ত্রী উলুপী, তার ভাই যুগল। যুগলের সঙ্গে গোপীর বিয়ের ব্যাপারে কুবের ও মালা চিন্তা করে। তবু গণেশ একদিন জানায় যে, যুগল বলেছে মালা খোঁড়া তাই গোপীও যদি খোঁড়া হয়। কুবের তখন গণেশকে বলে এটা কোনও ব্যারাম নয় যে মায়ের হলে মেয়েরও হবে।

মালার বাপের বাড়িতে বন্যার সময় খবর আনতে যাওয়ার সময় কুবেরের সঙ্গী ছিল গণেশ। গোপিকে আমিনবাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কথা উঠলে গণেশ বলেছে "যুগইলার নাওখান মিলব আইজ, নাও নিয়া আইছে যুগইলা। নাওখান দিবি না যুগইলা তর?" যুগল শেষে রাজি হয়েছে। গণেশ আমিনবাড়ি হাসপাতালে থেকে যেতে চেয়েছিল কিন্তু কুবের তাকে ফিরে যেতে বলেছে।

গণেশ শক্তিশালী ও পাকা মাঝি ছিল। সে একটু বোকা হলেও জেলেপাড়ায় তার মতো দাঁড় আর অন্য কেউ টানতে পারত না। 'পিরিত কইরা জ্বইলা মলাম সই' এই গানটি নৌকায় বসে যখন সে গাইতে থাকে, তখন কুবের তাকে 'কুচরিত্র' বলে। গণেশ প্রত্যুত্তরে বলে গান শোনাতে কোনো দোষ নেই। হোসেন মিয়ার নৌকায় কাজ করে সে টাকার মুখ দেখেছে। গণেশ তার স্ত্রী উলুপীকে রূপোর পৈছা কিনে দিতে চেয়েছে। এইভাবে আমরা দেখি গণেশ অপ্রধান চরিত্র হলেও উপন্যাসে তার একটি ভূমিকা আছে। সে সরল, শান্ত, নিরীহ জেলে মাঝি। কুবেরের খুব ভালো বন্ধু সে। বন্ধুর প্রতি সমস্ত দায়িত্বপূরণে সে পিছপা হয়নি। কুবেরের প্রতি কখনও তাকে রাগ করতে কিংবা বিরক্ত হতে দেখি না। কুবেরের সুখ-দুঃখে সর্বদা প্রকৃত বন্ধুর মতো সে সাথে থেকেছে।

১৫.৭ অপ্রধান চরিত্র : যুগল

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে যুগল চরিত্রটিকে খুব সীমিত পরিসরে চিত্রিত করেছেন। তবে চরিত্রটির ভূমিকা নিতান্ত নগণ্য নয়। গণেশের শ্যালক হল যুগল। যুগল পাশের গ্রাম থেকে কেতুপুরে যাতায়াত করে। কুবেরের মেয়েরা গোপী। যুগল সোজাভাবে নয়, ঘুরিয়ে গোপীর দরদাম জেনেছে বিয়ের জন্য। যুগলের অবস্থা অতীতে খারাপ ছিল। দারিদ্রের জন্য সে বত্রিশ বছর পর্যন্ত বিয়ে করতে পারে নি। নিজের পরিশ্রমে এখন তার অবস্থা অতীতের চেয়ে ভালো হয়েছে।

যুগল বহুদিন ধরে তার টাকা জমিয়ে একটি বড় নৌকা কিনেছে। তার থেকেই তার অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হতে থাকে। আকুরটাকুর গ্রামের মাঝিদের একজন মাতব্বর হল যুগল। কুবেরের স্ত্রী মালা গোপীর সাথে যুগলের বিয়ে দিতে চেয়েছিল। যুগলও প্রথম দিকে গোপীকে বিয়ে করতে রাজি ছিল তা আমরা উপন্যাস মধ্যে দেখতে

পাই। কিন্তু মালা পঙ্গু থাকায় যুগলের মনে একটি ভাবনা জেগেছিল "খোঁড়ার মাইয়া নি খোঁড়া হয়।" অর্থাৎ যুগলের ধারণা ছিল ভবিষ্যতে গোপীও মায়ের মতো খোঁড়া হয়ে যেতে পারে। যুগলের একথায় কুবের প্রতিবাদ করে। আবার নকুল বিয়ের জন্য যুগলকে অন্য অনেক মেয়ের খবর দেয়। দশটা মেয়ে না দেখে যুগল যে গোপীকে বিয়ে করবে না কুবেরের তা মনে হয়েছে। আসলে যুগল পরিণত ও বিচক্ষণ মানুষ। সে সবকিছু যাচাই করে বিয়ে করতে চেয়েছে। তবে যুগলকে গোপীর বিপদের সময় পাশে থাকতে দেখা যায়। গোপীর যখন পা ভেঙে যায় যুগলও কুবেরের সাথে গোপীকে আমিনবাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যায়। তার নিজের নৌকায় করে গোপীকে নিয়ে যায় সে। আবার ফেরার সময় যুগল দেবীগঞ্জের দিকে রাসুদের নিয়ে পাড়ি দিয়েছে। গোপীর পা সারবে না বলে যুগলের মনে সন্দেহ দানা বাঁধতে দেখা যায়। তাই যুগল আর গোপীর সুস্থ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করেনি। সপ্তম পরিচ্ছেদে উলুপীর মুখে যুগলের বিয়ের কথা আমরা জানতে পারি।

গোপীর বিয়েকে কেন্দ্র করে লেখক উপন্যাসে দুজন পাত্রকে এনেছেন। যুগল ও রাসু। গোপীর পা ভাঙার দুর্ঘটনাটি ঘটার পর থেকে পাত্রদের মানসিক দোলাচলতাকে লেখক তুলে ধরেছেন। যুগল অর্থবান হওয়ায় সে বেশি টাকা পণ দিয়ে গোপীর থেকে সুন্দরী স্ত্রী বাড়িতে এনেছে। অন্যদিকে স্ত্রী হারানো কমবয়সী রাসুকে গোপীর প্রেমে পড়তে দেখানো হলেও শেষে কুবেরকে বেশি টাকা দিয়ে গোপীকে পেতে চেয়েও পায়নি। গোপীর প্রতি প্রেমের আকর্ষণকে কেবল রাসুর মধ্যেই লেখক দেখিয়েছেন। যুগলের মধ্যে তা দেখানো হয়নি। যুগল প্রেম নয়, সে একটি সুন্দরী পাত্রী পেতে চেয়েছে এই ভাবনাই উপন্যাসে প্রকাশিত হয়েছে।

১৫.৮ উপন্যাসে বিধৃত নিয়তিবাদ

'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে নিয়তির অমোঘত্ব বারংবার নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করেছে। উপন্যাসের চরিত্রগুলিকে নিয়তির হাতের পুতুল রূপে লেখক দেখিয়েছেন। নিয়তির বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর শক্তি, স্পর্ধা তাদের নেই। পদ্মাকে কেন্দ্র করেই তাদের জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না সমস্তকিছুই আবর্তিত হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পদ্মা তাদের নিয়তি হয়ে দেখা দিয়েছে। কখনো আবার পদ্মার সঙ্গে সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে মানুষীশক্তি সে হোসেন মিয়া। কিংবা কখনো প্রকৃতির রুষ্টতা যা কালবৈশাখীর ঝড় রূপে দেখা দিয়েছে।

আবার এই প্রাকৃতিক নিয়তির ছায়া দেখা দিয়েছে হোসেন মিয়া ও কপিলার মধ্যেও। অর্থাৎ নিয়তি সম্পর্কিত ধারণা প্রাকৃতিক শক্তি ও মনুষ্যশক্তির মেলবন্ধনে উপন্যাসে এক জটিল মূর্তি ধারণ করেছে। তার নিষ্ঠুরতা ও দুর্জয়েতায় পদ্মার মাঝি ও জেলেদের কাছে একমাত্র পরিচয়। তার প্রভাবও সব চরিত্রের ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক। পদ্মানদী, কালবৈশাখীর ঝড় কিংবা হোসেন মিয়া এসেছে কেতুপুরের সমগ্র সমাজের শ্রেণি-নিয়তি হিসেবে; আর অন্যদিকে কপিলা কেবলমাত্র কুবেরের জীবনের ব্যক্তি-নিয়তি হিসেবে এসেছে। উভয়পক্ষের প্রভাব অনিবার্য, এরাই তাদের নিয়ন্ত্রণ শক্তি, এদের খেয়ালের ওপর তাদের বাঁচা-মরা, সুখ-দুঃখ সবই নির্ভরশীল। ব্যক্তিত্বের কোন মূল্য নেই সেখানে। নিয়তির চেতনার মূলে আছে এক অধরা, অলক্ষ্য উপস্থিতি; যা মানুষের সমগ্র জীবনের নিয়ামক। এর প্রভাবেই মানুষের জীবনে ঘনিয়ে আসে অপ্রত্যাশিত বিপর্যয়। তার নিশ্চিত পরিণতির হাত থেকে কোনও মানুষের রেহাই নেই। তাই নিয়তি সম্পর্কে মানুষ চিরকালই শঙ্কাতুর। তাকে পূর্বনির্ধারণের সুযোগ থাকে না। তাকে অতিক্রম করার ক্ষমতা সাধারণ মানুষের থাকে না বলেই তার স্বরূপ মানুষের কাছে ভয়ানক ও রহস্যাবৃত। পদ্মানদীর মাঝিদের জীবনেও দুরন্ত পদ্মা, কালবৈশাখী ঝড় ও চক্রান্তকারী হোসেন মিয়া এমনই অনিবার্য শক্তি, যারা সমগ্র কেতুপুরের মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রক।

'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে বস্তুধর্মিতা ও নিয়তির সমন্বয় সাধনে লেখক যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তা এক অর্থে অভিনব। তাছাড়া পদ্মাকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যে প্রথম রচিত উপন্যাস হিসেবেও 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসটি স্মরণীয়। গ্রীক-নিয়তিবাদ হয়তো এর উৎস। গ্রীক নিয়তিবাদের মতোই মানিক প্রথমাবধিই মানবতাবাদকে নিয়তিবাদের সঙ্গে যুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। যে নিয়তির অমোঘ প্রভাব কাটিয়ে উঠতে না পেরে তাঁর আলোচ্য উপন্যাসের চরিত্রেরা এক অর্থে স্থানু, সংগ্রাম বিমুখ। পরবর্তীকালে পরিবর্তিত এইসব মানুষের জয়গানে মুখর হয়ে উঠেছে মানিক-সাহিত্য। গ্রীক নিয়তিবাদ সত্ত্বেও মানবিকতা লেখকের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছে। মানবতাই যে কোনো শ্রেষ্ঠ লেখকের সবচেয়ে বড় উপাদান, মহৎ লেখকের এই গুণ মানিকের মধ্যেও আমরা দেখতে পাই। পদ্মার রূপ দেখে, পারিবারিক সূত্রে পদ্মা সম্পর্কে অবহিত থেকে, জেলেদের জীবনকে খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করার পর তাদের জীবনে নিয়তিবাদের অনিবার্যতা উপলব্ধি করেছেন তিনি। পদ্মার রোমান্টিকতা অপেক্ষা ক্রূর, অমোঘ নিয়তিস্বরূপ পদ্মার চিত্রই তিনি উপস্থাপিত করেছেন আলোচ্য উপন্যাসে।

নিয়তি 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে জড়িয়ে রয়েছে। উপন্যাস শুরু হয়েছে পদ্মার মাঝিদের চোখে পদ্মার অনিবার্যতা দেখানোর মধ্য দিয়ে। সেই পদ্মা তাদের উপজীবিকা থেকে সরে এসেছে বিপর্যয়ের রূপ নিয়ে। রাসু প্রতীক হয়ে উঠেছে ময়নাদ্বীপের যা নিয়তি-নির্দেশিত ভবিতব্য। নিয়তির হাতেই পদ্মার মাঝি কুবের দূরতর দ্বীপের মাঝিতে পরিণত হয়েছে। মালার প্রতিবন্ধতা কুবেরকে বারবার কপিলার চাঞ্চল্যের প্রতি আকর্ষিত করে। আলোচ্য উপন্যাসটিতে একমাত্র হোসেন মিয়া নামক চরিত্রটিই নিজেই নিজের ভাগ্য নিয়ন্ত্রকে পরিণত হয়েছে। হোসেন মিয়া শুধু কুবের নয়, সমস্ত কেতুপুরেরই শ্রেণি-নিয়তি। লেখক তার রহস্যঘন জীবন, পরিবর্তিত সৌভাগ্য, প্রবল ব্যক্তিত্ব, প্রভুত্বকামিতা, দারিদ্রপীড়িত মাঝিদের নিজের অধীনে করার কৌশল, পরোপকারের ছদ্মবেশে স্বার্থসিদ্ধি, তার বিচিত্র ব্যবসা ও ময়নাদ্বীপে উপনিবেশ স্থাপনের বিবরণ কেতুপুরবাসী মাঝিদের ক্ষীণ প্রতিক্রিয়ার সূত্রেই উত্থাপিত করেছেন। এই হোসেন মিয়াই কুবেরের প্রতি অহেতুক মনোযোগ ও করুণা প্রদর্শনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে তার সর্বগ্রাসী প্রভাব বিস্তার করে চলে, কুবেরকে কেতুপুর থেকে বার করে ময়নাদ্বীপে নির্বাসিত করতে।

কুবেরের জীবনের দ্বিতীয় ব্যক্তি-নিয়তি হল কপিলা। কপিলার সান্নিধ্য কুবেরের কাছে একই সাথে রোমাঞ্চ ও আশঙ্কার বাহক হয়ে উঠেছে। কপিলার রহস্যময় শরীরী-ভঙ্গি, ভাষা-ব্যবহার, নানান ইঙ্গিত কুবেরকে শঙ্কিত করে তোলে কী আছে কপিলার মনে? কপিলা কুবেরের সংকুচিত অবস্থা দেখে টিটকিরি দেয়, একই সঙ্গে আকর্ষণ ও প্রত্যাখানের টানাপোড়েনে তাকে উত্তেজিত করতে চায়। সমাজভয়, লোকলজ্জা ও সংকোচের ঘেরাটোপে আবদ্ধ কুবেরকে কপিলা ক্রমশ অসহিষ্ণু, বিভ্রান্ত ও হঠকারী করে তোলে। কুবের অবচেতন মনে স্বপ্ন দেখতে শুরু করে কপিলাকে নিয়ে। কেতুপুরের সমাজ থেকে বেরিয়ে অন্যত্র তাকে পাওয়ার স্বপ্ন দেখে। কুবেরের একসময় অবচেতন মনে দেখা কপিলাকে নিয়ে ময়নাদ্বীপে যাওয়ার কথা, উপন্যাসের শেষে সত্যি হয়। কপিলাসহ কুবের চিরতরে পাড়ি দিয়েছে হোসেন মিয়ার ময়নাদ্বীপে।

এইভাবে উপন্যাসের পরিণতিতে হোসেন মিয়ার স্বার্থ, কপিলার রহস্য-চপলতা, কুবেরের স্বপ্ন বাস্তবায়নের ক্ষেত্র হিসেবে ময়নাদ্বীপের অনিবার্যতা আবশ্যক হয়ে ওঠে। নিয়তির অদৃশ্য হাতের টানে পদ্মার জেলে সমুদ্রের দূরতর কোনো এক দ্বীপের মাঝিতে পরিণত হয়। মানুষ যে তার বিশেষ কোনও আর্থ-সামাজিক পরিবেশে নিয়তির নিরুপায় পুতুল মাত্র, সেই নিয়তির দ্বীপেই কুবেরের যাত্রা দেখিয়েছেন লেখক। নদীর যেমন ভাঙা-গড়া, জোয়ার-ভাটা আছে তেমনি মানুষের জীবন ভাঙা-গড়া, উত্থান-পতন নিয়ে গড়ে উঠেছে। নদী-প্রকৃতির অমোঘতা থাকা মাঝি জীবন শেষ পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়েছে অনুর্বর জমির কৃষি-প্রজাতে। তবু সেই জীবনে যাওয়ার জন্যও নদীই প্রধান

সহায়। বদ্ধতা, স্রোতহীনতা নিয়ে মালা পড়ে রইল তার সীমিত আঞ্চলিক রূপকথা মাখা জগতে আর কুবেরের পানসি কৌতুকময়ী প্রবাহিনী কপিলাকে নিয়ে যাত্রা করেছে সুদূর ময়নাদ্বীপে। পদ্মারূপ নিয়তি, কালবৈশাখীরূপ প্রকৃতি, হোসেন মিয়ার কূট-কৌশল এবং কপিলার রহস্যময় ছলাকলা আলোচ্য উপন্যাসের পরিণতিতে সর্বাধিক ভূমিকা পালন করেছে। সমগ্র কেতুপুরবাসীর উপর বিশেষত কুবেরের মতো এক নগণ্য মানুষের দৈনন্দিন সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষাময় জীবনের উপর ছায়া বিস্তার করেই এই অমোঘ শক্তির আত্মপ্রকাশ বর্ণিত।

১৫.৯ সারাংশ

'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বহু চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। প্রতেকটি চরিত্রের ব্যক্তিসত্তা সম্পূর্ণ পৃথক। নদীর জলরাশি যেমনভাবে সমুদ্রে মিশে যায়, এই চরিত্রগুলিও ঠিক তেমনভাবেই ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার ক্ষুদ্র বলয় থেকে মুক্ত হয়ে অনন্ত জীবনসমুদ্র অভিমুখে ধাবিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি চরিত্র ও তাদের কাহিনি উপন্যাসের পরিণতির ক্ষেত্রে বিশেষ আবর্ত তৈরি করে। যেমন কুবের, কপিলা, মালা ও হোসেন মিয়া। মুখ্যত এই চারটি চরিত্রই কাহিনির সাফল্যে সহায়ক হয়েছে। পদ্মার তীরবাসী মানুষদের সঙ্গে চরিত্রধর্মে তারা এক হয়েও বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র ব্যক্তিগত প্রবণতার কারণে এরা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

উপন্যাসের কেন্দ্রে রয়েছে কুবের চরিত্র। লেখক কুবেরের গোষ্ঠীস্বভাব থেকে ব্যক্তিস্বভাবে উত্তরণ দেখিয়েছেন। কাহিনির প্রথমদিকে লেখক তাকে পদ্মা-নির্ভর, দারিদ্রপীড়িত ধীবরশ্রেণির প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু কপিলার আগমনের পর থেকেই ক্রমশ কুবেরের ব্যক্তিগত জীবনের আশা-নিরাশা ও সুপ্ত কামনার দ্বন্দ্ব সংঘাতকেই বড় করে দেখিয়েছেন। তথাকথিত এই নিম্নশ্রেণির মাঝির অমার্জিত, ভদ্রেতর জীবনবৃত্তে নানা ওঠাপড়া, নানা তরঙ্গাভিঘাত কাহিনিতেও জটিলতার সঞ্চার করেছে। যার পরিণতিতে কুবেরকে তার স্বাধীন জেলেজীবনের মুক্তির চাবিকাঠি হারিয়ে, তার বদলে স্বেচ্ছায় মেনে নিতে হয় হোসেন মিয়ার দাসত্বশৃঙ্খল।

কুবেরকে ঘিরে দুটি নারীচরিত্র উপন্যাসে আবর্তিত হতে দেখা যায়। চরিত্র দুটি হল মালা ও কপিলা। মালা কুবেরের স্ত্রী এবং মালার বোন কপিলা। এই দুই নারী চরিত্রই ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যের অনন্যতায় শুধুই ধীবরনারীর বলয় থেকে বেরিয়ে এসেছে তা নয়, বাংলা উপন্যাসধারায় দুটি মৌলিক অভিনব নারীচরিত্র হিসেবেও সংযোজিত হয়েছে। মালা ও কপিলা সহোদরা হয়েও তারা ভিন্নপ্রকৃতির। মালা পঙ্গু, অলস, নিরানন্দ। সংসারের এক কোণে সে পড়ে থাকলেও জগতের সব খুঁটিনাটি সে তার দৃষ্টি ও অনুভবের পথে তীব্রভাবে শোষণ করতে সক্ষম। অন্যদিকে কপিলার দুরন্ত চঞ্চলতায় আদিম অসংস্কৃত মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। কুবের নারীপ্রকৃতির সনাতন রহস্য কপিলার মধ্যে খুঁজে পেয়ে কামনায় উদ্বেল হয়ে উঠেছে। তারই ছলা-কলায় বশীভূত হয়ে কুবের স্ত্রী, সন্তান, পরিবার, কেতুপুর সবকিছু থেকে ক্রমশ উধাও হয়ে যায়। কাহিনির শেষে আমরা দেখতে পাই কুবের কপিলাকে সঙ্গে নিয়ে হোসেন মিয়ার ময়নাদ্বীপে যাত্রা করেছে।

কুবেরের এই উৎকেন্দ্রিকতার সুযোগ নেয় হোসেন মিয়া। হোসেন মিয়া নিজের স্বার্থসিদ্ধির জালে চিরতরে বেঁধে কপিলাসহ কুবেরকে ময়নাদ্বীপে পাঠিয়ে দেয়। হোসেন মিয়ার ব্যক্তিচরিত্র কর্মোদ্যম ও স্বার্থপরতা, ক্রূরতা ও কবিত্বের সংমিশ্রণে এক অদ্ভুত জটিল মূর্তি নিয়ে এখানে উপস্থিত হয়েছে। সমগ্র কেতুপুরবাসী তার কাছে আনুগত্য স্বীকার করতে বাধ্য হয়। কেননা, তাদের বিপদের সময়ে একমাত্র হোসেন মিয়াই পাশে এসে দাঁড়ায়। আবার যে কোনো মুহূর্তে এই হোসেন মিয়াই তাদের জীবনের যে কোনো বিপর্যয়ের মূল কারণ হয়েও উঠতে

পারে। লেখক রাসু কিংবা কুবেরের জীবনের অনিবার্য পরিণামের কারণ হিসেবে হোসেন মিয়াকেই দেখিয়েছেন।

হোসেন মিয়ার রহস্যময় উপস্থিতি, কপিলার রহস্যময় ছলাকলা এবং পদ্মানদীর রোষানল উপন্যাসটিতে এক অদৃশ্য চরিত্র সৃষ্টি করেছে, যাকে নিয়তিবাদ বলে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। মানব বা প্রকৃতি তাদের যা কিছু গভীর, গোপন, অশিক্ষিত এই ধীবরশ্রেণির কাছে দুর্জয়ে; তাই-ই তাদের কাছে অজানা কোনো ভীতিপ্রদ শক্তি, নিয়তি হয়ে উঠেছে। পদ্মার বন্যাকে, কালবৈশাখীর ঝড়কে কিংবা হোসেন মিয়ার চক্রান্তকে তারা রোধ করতে পারে না। আবার কেন্দ্রীয় চরিত্র কুবের কপিলার প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণে নিজেকে আটকে রাখতে পারে না। এই ত্রিমুখী শক্তি একযোগে সক্রিয় হয়ে শেষপর্যন্ত কুবেরকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় কেতুপুর থেকে হোসেন মিয়ার ময়নাদ্বীপ অভিমুখে। নিয়তির অদৃশ্য হাতের টানে পদ্মার জেলে সমুদ্রের দূরতর দ্বীপের মাঝিতে পরিণত হয়। মানুষ যে তার বিশেষ কোনও আর্থ-সামাজিক পরিবেশে নিয়তির নিরুপায় ক্রীড়নক, সেই নিয়তির দ্বীপেই অবশেষে কুবেরের যাত্রা।

১৫.১০ অনুশীলনী

ক. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন।

১) ''কুবেরের সে অত্যন্ত অনুগত। জীবনের ছোট বড় সকল ব্যাপারে সে কুবেরের পরামর্শ লইয়া চলে।'' একথা কার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে? এই মন্তব্যের সূত্রে চরিত্রটির স্বভাবৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিন।

২) ''এই ব্যবস্থা ও কোলাহলের মধ্যে আসিয়া পড়িয়া সমস্ত রাত্রিব্যাপী পরিশ্রমের ক্লান্তি ভুলিয়া কুবের প্রতিদিন খুশী হইয়া ওঠে।'' কোন্ প্রসঙ্গে একথা বলা হয়েছে? কুবেরের এই ব্যবস্থায় খুশী হবার কারণ কী?

৩) ''রোজ আমাদের মাছ দেওনের কথা না তর?'' এই উক্তিটি কার? কাকে উদ্দেশ্য করে সে এই কথা বলেছে? এই উক্তির সূত্রে বক্তা ও শ্রোতার সম্পর্কটিকে ব্যক্ত করুন।

৪) ''শিক্ষা হোক। নিজের নিজের ভাগ বুঝিয়া লইতে শিখুক।'' এই উদ্দেশ্য কার? কোন্ প্রসঙ্গে তার এই চিন্তাধারার প্রকাশ?

৫) ''জেলেপাড়ায় যাহারা দু-এক বিঘা জমি রাখে, মেজকর্তাকেই তাহারা খাজনা দিয়া থাকে।'' মেজকর্তার যে পরিচয় উপন্যাসে বিধৃত হয়েছে তা সংক্ষেপে বিবৃত করুন।

৬) ''হোসেন এখন লাজুক।'' কোন্ প্রসঙ্গে এই কথা বলা হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

৭) ''সন্তানস্নেহের হিসাবে জেলেপাড়ার জননীদের মধ্যে মালার মৌলিকতা আছে।'' এই মৌলিকতার প্রকাশ মালার মধ্যে কীভাবে ঘটেছে তার পরিচয় দিন।

৮) ''অলক্ষ্মীর মরণ নাই!'' এই উক্তিটি কার? কাকে 'অলক্ষ্মী' বলে অভিহিত করা হয়েছে? কেনই বা একথা তার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে?

৯) ''এত দয়া-মায়া এমন কোমলতা জেলেপাড়ার আর কোন মেয়ের নাই।'' একথা কার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে? তার চরিত্রের কোন্ বৈশিষ্ট্য এই উপন্যাসে উপস্থাপিত হয়েছে?

খ. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির বিশদ আলোচনাপূর্বক উত্তর দিন

১) ''বাংলা উপন্যাসের নারীচরিত্র সৃষ্টির ধারাবাহিকতায় 'কপিলা' চরিত্র মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর এক অভিনব সংযোজন।'' এ সম্পর্কে আপনার মতামত ব্যক্ত করুন।

২) এই উপন্যাসে কপিলার পরিণতি আকস্মিক কি না তা চরিত্রটির আনুপূর্বিক বিশ্লেষণে বুঝিয়ে দিন।

৩) "হ, কপিলা চলুক সঙ্গে। একা অতদুরে কুবের পাড়ি দিতে পারিবে না।" এই বিধান কার, উপন্যাসে অস্পষ্ট। কুবেরের জীবন নিয়ন্ত্রণে কপিলার এই অপরিহার্যতা সম্পর্কে আপনার মতামত ব্যক্ত করুন।

৪) কুবেরের জীবনবৃত্তে তার স্ত্রী মালার ভূমিকাটিকে নির্ধারণ করুন। মালাকে কি এই কাহিনির 'কাব্যে উপেক্ষিতা' হিসাবে চিহ্নিত করা যায়?

৫) "কপিলা ও মালা এই দুই সহোদরা চরিত্র বৈশিষ্ট্যে পরস্পরের বিপরীত। কিন্তু ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যের অনন্যতায় তারা দুজনেই ধীবর জীবনের অভ্যস্ত গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছে।" এই মন্তব্যের যৌক্তিকতা বিচার করুন।

৬) উপন্যাসের ঘটনাক্রম এবং চরিত্রগত পরিকল্পনায় পদ্মানদীর ভূমিকা কতখানি তা 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাস অবলম্বনে বিশ্লেষণ করুন।

৭) হোসেন মিয়ার ময়নাদ্বীপ পদ্মানদীর মাঝিদের জীবনে যে ভূমিকা গ্রহণ করেছে তা বিশ্লেষণ করুন।

৮) এই উপন্যাসে জেলেদের জীবনচিত্রণে ঔপন্যাসিকের কী জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি পরিস্ফুট হয়েছে তা আলোচনার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করুন।

৯) "পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসের কেন্দ্রে রয়েছে কুবের চরিত্রের গোষ্ঠীস্বভাব থেকে ব্যক্তিস্বভাবের নিষ্ক্রমণ তথা মুক্তি।" এই মন্তব্যের আলোকে কুবের চরিত্রটি বিশ্লেষণ করুন।

১০) "মালার সঙ্গে সম্পর্কসূত্রে কুবের কেতুপুরে আবদ্ধ, কপিলার সঙ্গে কুবের নিরুদ্দেশের যাত্রী।" মালা ও কপিলার টানাপোড়েনে কুবের চরিত্রের যে ক্রমপরিণতি তা কতখানি বাস্তবসম্মত তা যুক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করুন।

১১) "হোসেন মিয়া চরিত্রটি মহত্ত্ব ও শয়তানির সহাবস্থানে এই উপন্যাসের সর্বাপেক্ষা জটিল চরিত্র হয়ে উঠেছে।" এই মন্তব্য অনুযায়ী হোসেন মিয়া চরিত্রটিকে বিশ্লেষণ করুন।

১২) হোসেন মিয়ার রহস্যময়তা উপন্যাসের ক্ষেত্রে কোন্ বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে লেখক অবতারণা করেছেন তা নির্ধারণ করুন।

১৫.১১ গ্রন্থপঞ্জি

১. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *পদ্মানদীর মাঝি*, বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, ফাল্গুন ১৩৯৯।

২. নিতাই বসু, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : সমাজ জিজ্ঞাসা*, সঞ্জয় প্রকাশন, কলকাতা।

৩. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : জীবনদৃষ্টি ও শিল্পরীতি*, জি.ই.এ পাবলিশার্স, কলকাতা।

৪. নারায়ণ চৌধুরী, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য-মূল্যায়ন*, বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা।

৫. নারায়ণ চৌধুরী, *মানিক সাহিত্য সমীক্ষা*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

৬. সরোজমোহন মিত্র, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য*, গ্রন্থালয়, কলকাতা।

একক-১৬ □ উপন্যাসের গঠন-কৌশল

গঠন

১৬.১. প্রস্তাবনা
১৬.২. কাহিনির নির্মাণশিল্প
১৬.৩. কাহিনির বিন্যাসরীতি
১৬.৪. ভাষাগত বৈশিষ্ট্য
১৬.৫. উপন্যাসে গানের প্রাসঙ্গিকতা
১৬.৬. সারাংশ
১৬.৭. অনুশীলনী
১৬.৮. গ্রন্থপঞ্জি

১৬.১ প্রস্তাবনা

যে কোনো রচনার ক্ষেত্রেই তার নির্মাণরীতি একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আঙ্গিকগত নিপুণতায় কাহিনির পরতে পরতে ফুটে ওঠে ঘটনার পারম্পর্য্য, চরিত্রের নানা গভীর মনস্তত্ত্ব-জটিলতা এবং জীবন সম্পর্কে লেখকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি। পদ্মা নদীর মাঝিদের জীবনালেখ্য সম্বলিত উপন্যাসেও লেখক কাহিনিবৃত্তে ধরে দিতে চেয়েছেন জেলে-মাঝিদের দারিদ্র্য-পীড়িত, শোষিত, একঘেয়ে, প্রায় মনুষ্যেতর জীবনযাপনের কথা। তাদের মাধ্যমেই লেখক সামাজিক-অর্থনৈতিক বন্টনের বৈষম্যের কথা আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন। তথাকথিত 'ছোটলোক' সম্প্রদায়ের টিকে থাকার এই প্রাণপণ সংগ্রামের কাহিনি তথ্যবহুল, সাংবাদিকসুলভ নিরাবেগ নির্লিপ্তিতে পরিবেশিত হয়েছে। উপন্যাসের সূচনায় নানা চরিত্রের সমাবেশে, নানা স্থানিক পরিমণ্ডলে ঘটনাকে ছড়িয়ে দিয়ে বিশদভাবে সেই শোষণ ও বিপর্যস্ত জীবনযাত্রার সঙ্গে লেখক আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। সেখানে গল্পের গতিও শ্লথ। কিন্তু ক্রমশ সময়ের গ্রন্থিতে নানা টুকরো ঘটনার জটিলতায় ব্যক্তিমানুষের জীবন কীভাবে অপ্রত্যাশিত বাঁক নিয়ে চলা শুরু করে, উপন্যাসের শেষাংশে সেই কথাই উপন্যাসটিতে ফুটে উঠেছে। এবং সেখানে গল্পের গতিও দ্রুততা লাভ করেছে।

১৬.২ কাহিনি নির্মাণের বিবিধ মাত্রা

কাহিনির নির্মাণশিল্পের ক্ষেত্রে 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক সাফল্যমণ্ডিত সাহিত্য-শিল্পে পরিণত হয়েছে। স্বল্পকথনের এক বিস্ময়কর সংযমে গঠিত আয়তনে ক্ষুদ্র উপন্যাস হল 'পদ্মানদীর মাঝি'। উপন্যাসটির পরিচ্ছেদ সংখ্যা মাত্র সাতটি। ঘটনার পটভূমি কেতুপুর, চরডাঙ্গা, আমিনবাড়ি, আকুরটাকুর এবং ময়নাদ্বীপ। তবে প্রধানত কেতুপুর ও ময়নাদ্বীপকে ঘিরেই উপন্যাসের কাহিনি আবর্তিত হয়েছে। ঘটনার সময়কাল এক বছরেরও কম। এর মধ্যে বিধৃত হয়েছে পদ্মার মাঝি ও জেলেদের জীবনালেখ্য। উপন্যাসটি পাঠ

করলে আমরা অনুভব করতে পারি উপন্যাসটি লেখার সময়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনে একটি মহৎ সাহিত্যিক ভাবনা জন্ম নিতে শুরু করেছিল। মাঝিদের জীবনালেখ্য লেখার সময় লেখকের বিকারহীন ও সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি এবং নিরাবেগ ও নির্লিপ্ত বাচনভঙ্গির পরিচয় আমরা পাই।

'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসটি সম্পূর্ণ হয়েছে সাতটি পরিচ্ছেদে। প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদের দৈর্ঘ্য সমান নয়। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদটি দীর্ঘ এবং সপ্তম পরিচ্ছেদটি দীর্ঘতম। প্রথম পরিচ্ছেদে বিধৃত হয়েছে উপন্যাসের পটভূমি, ধীবরকুল ও কেতুপুরের কথা। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আমরা দেখতে পাই গ্রামকেন্দ্রিক লোকজীবন ও পূজা-পার্বনের কথা এবং তার সাথেই কুবেরের পারিবারিক জীবনকথা। তৃতীয় পরিচ্ছেদে কুবের-মালার দাম্পত্য সম্পর্কের রেখাচিত্র, চতুর্থ পরিচ্ছেদে রাসুর কেতুপুরে আগমনে কেতুপুরবাসীর জীবনে চাঞ্চল্য ও কপিলার আগমনে কুবেরের মনোজগতে বিশেষ আলোড়ন। পঞ্চম পরিচ্ছেদে প্রকৃতির বিরূপতায় দুর্যোগ, ঝঞ্ঝা সমগ্র কেতুপুরকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে, যে সুযোগকে পূর্ণ মাত্রায় ব্যবহার করেছেন হোসেন মিয়া। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে কুবের-কপিলা সম্পর্ক আমিনবাড়ি যাত্রা উপলক্ষ্যে আরও অন্তরঙ্গ উত্তেজনায় জটিল হয়ে উঠে এবং শেষপর্যন্ত কপিলার শ্যামদাসের সঙ্গে প্রত্যাবর্তনে কুবেরের উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ওঠার দৃশ্য দেখতে পাই। সপ্তম পরিচ্ছেদে হোসেন মিয়া পীতমের ঘটি চুরির মিথ্যা জালে কুবেরকে ফাঁসিয়ে কপিলাসহ কুবেরের ময়নাদ্বীপে নির্বাসন এখানেই কাহিনির পরিসমাপ্তি ঘটে। বহু চরিত্র ও বহু ঘটনার বিক্ষিপ্ত কাহিনিসূত্রকে কার্য-কারণ সম্পর্কে বেঁধে লেখক কাহিনিকে গুটিয়ে আনতে চেয়েছেন। অনেকগুলি ঘটনাকে মাত্র একটি পরিচ্ছেদে নিয়ে আসাতে সমালোচকের চোখে আখ্যানভাগ কিছুটা ব্যাহত বলে মনে হতে পারে। নানা পরস্পর বিরোধী ঘটনার জটিলতা এবং আকস্মিকতা সরল কুবেরকে বিমূঢ় ও বিভ্রান্ত এবং আরও সহজ করে তুলতে পারে, ফলে তার পরিণতি পাঠকের কাছে আরও বিশ্বাসযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবে এমনটি পরিকল্পনা করেই লেখক এইভাবে শেষ পরিচ্ছেদের ঘটনাবিন্যাস করেছেন।

উপন্যাসের মধ্যে স্থানিক পরিমণ্ডল হিসেবে পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে কাহিনি ও তার চরিত্ররা বিচরণ করেছে। এর মধ্যে কোনো কোনো সমালোচক স্থানিক ঐক্য ক্ষুণ্ণ হওয়া ও কাহিনিসূত্র ছিঁড়ে যাওয়ার আভাস পেয়েছেন। কিন্তু একটু মনোনিবেশের সাথে দেখলে বোঝা যায়, প্রত্যেকটি জায়গাই কোনো না কোনো সময় কুবের-কপিলার বিচরণভূমি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার সঙ্গে সঙ্গে কেতুপুর, আমিনবাড়ি ও ময়নাদ্বীপে হোসেন মিয়ার যথেষ্ট যাতায়াত রয়েছে। সেক্ষেত্রে কুবেরকে নিজ নিজ উদ্দেশ্য পূরণে কপিলা ও হোসেন মিয়া যেভাবে ব্যবহার করেছে, তাদের কক্ষপথে যে তারা কুবেরকে টেনে নেবেই এই ব্যাপারটি অতি স্বাভাবিক। কুবেরের দোলাচলতা, মানসিক অস্থিরতা ও বুদ্ধিবিভ্রম, আশঙ্কা যা কিছু এই দুটি মানুষকে ঘিরে উৎসারিত; তার কারণেই স্ববশে থাকার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে সে বারবার তাদের বলয়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

সময়পর্ব হিসেবে উপন্যাসের ঘটনাবলী আবর্তিত হয়েছে বর্ষা থেকে বসন্তের মধ্যে। প্রত্যেকটি ঋতুর বৈশিষ্ট্য উপন্যাসের চরিত্রগুলির মানসিক অবস্থা ও জীবনযাপন প্রণালীতে এক বিশেষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। যে বর্ষা ইলিশের মরসুম, মাঝি ও জেলেদের উপার্জনের সবচেয়ে উত্তম সময়; সেই বর্ষারই অবধারিত পরিণতি হল পদ্মা-সংলগ্ন নীচু বসতি অঞ্চল বন্যাগ্রস্ত। এই বন্যাই কুবেরের জীবনে ও গৃহে কপিলাকে দুরন্তগতিতে ভাসিয়ে নিয়ে আসে। শরতে আসে ঝড় যে ঝড়ে জেলেদের ঘর-পরিবার ভাঙে, গোপীর পা ভাঙে। হেমন্ত ও শীতের অভাবের পর্বে জেলেদের জীবনে দারিদ্র্য আরও বিকট মূর্তি নিয়ে আসে। ধীবরকুলের এই বিপর্যস্ত জীবনের পূর্ণ সুযোগ নিতে দেখা যায় হোসেন মিয়াকে। হোসেন মিয়ার কৃপা ও সাহায্যের ফাঁদে পা দিয়ে জেলেদের অমোঘ বিধিলিপি হয় ময়নাদীপে নির্বাসন। কুবেরের অনুভবের জগতেও কপিলার রহস্যময় হাতছানি, তাকে পাওয়ার

প্রলোভন অনিবার্য হয়ে ওঠে একই সঙ্গে। বসন্তের আগমনে কুবেরের মন কপিলার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। ঘটনাচক্রে উপন্যাসের অন্তিম পর্বে পীতম মাঝির ঘটি চুরির ব্যাপারটিও একই সময়পর্বে ঘটে। হোসেন মিয়া এই সুযোগেই কুবেরকে মিথ্যা চুরির জালে বেঁধে কপিলাসহ কুবেরকে সারাজীবনের জন্য ময়নাদ্বীপে নির্বাসিত করে।

পদ্মানদীর মাঝিদের এই জীবনকাহিনিকে আঙ্গিকগত নিপুণতায় সংবদ্ধ করার কোনো তাগিদ লেখকের মধ্যে আমরা দেখতে পাই না। মাঝিদের জীবনযাত্রা যেমন অগোছালো, আলুথালু প্রকৃতির হয় তাদের কাহিনি বিন্যাসও তেমনই শিথিল। পদ্মার ইলিশের মরশুমে বর্ষায় যে কাহিনির সূচনা ঘটেছে, বসন্তে হোলিখেলার রঙিন পর্বে ময়নাদ্বীপ যাত্রায় তার পরিসমাপ্তি। আর মধ্যপর্বে ছড়িয়ে রয়েছে শারীরিক পরিশ্রমের কষ্ট ও মানসিক উত্তেজনাজাত যন্ত্রণা। উভয়ের মধ্যেই আছে স্বপ্ন, আছে আশা যা বাস্তবায়নের অপেক্ষায় দিন গোনে। মাছ ধরায় প্রাপ্তির সম্ভাবনা যা আর্থিক স্বাচ্ছন্দের আশা জুগিয়েছে। আর কপিলার মতো নারী কুবেরের মনে কামনা জাগিয়ে জীবন-উপভোগের আনন্দ ও তৃপ্তির আস্বাদন নিয়ে আসে। এই তাড়নায় তাড়িত হয়ে কুবেরের মধ্যে গোষ্ঠীচেতনা থেকে ধীরে ধীরে ব্যক্তিচেতনায় উত্তরণ ঘটেছে। নানা চরিত্র ও কাহিনি এই আখ্যানের মধ্যে নানা সূত্রে জড়িয়ে রয়েছে রাসুর কাহিনি, আমিনুদ্দির কাহিনি, যুগী-শীতল বা এনায়েত-বসীর পত্নীর অবৈধ সম্পর্কের কাহিনি। এসবের সঙ্গে প্রধান চরিত্র কুবেরের কোনো যোগ নেই। প্রকৃতপক্ষে পদ্মার তীরবর্তী কেতুপুরের গোষ্ঠীবদ্ধ জেলে-মাঝিদের জীবনের পরিপূর্ণ ছবি উপস্থাপনের জন্যই লেখক আখ্যানে এইসব পার্শ্বকাহিনির সংযোজন ঘটিয়েছেন। শেষপর্যন্ত কাহিনি পূর্ণতা লাভ করেছে সেই কুবেরকেই আশ্রয় করেই, যাকে অবলম্বন করে এই কাহিনির সূত্রপাত ঘটেছিল। উপন্যাসের প্রথমাংশে গোষ্ঠীচেতনা সরে গিয়ে ধীরে ধীরে কুবেরের মধ্যে ব্যক্তিচেতনার প্রকাশ ঘটানোই ছিল আখ্যানের মূল অভিপ্রায়।

১৬.৩ উপন্যাসের গঠন প্রকরণ

'পদ্মানদীর মাঝি'ই হল প্রথম উপন্যাস যেখানে পদ্মাবিধৌত পূর্ববাংলার ধীবরশ্রেণির জীবনালেখ্য প্রকাশিত হয়েছে। এই অঞ্চলের মাঝি-জেলে শ্রেণির জীবিকা, সংস্কৃতি, আবেগ, অনুভব ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণে পদ্মা-প্রকৃতির অমোঘ প্রভাবের রহস্যময় এক আশ্চর্য শিল্পদক্ষতা উপন্যাসটির মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। উপন্যাসটির নামকরণ থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে, পদ্মার তীরে থাকা মাঝি-জেলেদের জীবন-বৃত্তান্ত বলা হয়েছে। পদ্মানদীর উপস্থিতিতে একটি নির্দিষ্ট আঞ্চলিক সীমা আভাসিত হয়েছে। অন্যদিকে 'মাঝি' শব্দটি একটি বিশেষ শ্রেণিচরিত্রকে পরিস্ফুট করেছে। পদ্মার মতো দুরন্ত, ভয়াল, বিধ্বংসী নদী যাদের জীবিকার উৎস, তাদের কঠিন সংগ্রামের কথাও ব্যঞ্জনা লাভ করে 'পদ্মানদীর মাঝি' এই নামকরণের মধ্য দিয়ে। তবে উপন্যাসের শুরুতে পাওয়া গোষ্ঠীজীবন ধীরে ধীরে ব্যক্তিচরিত্রের প্রাধান্যে পর্যবসিত হয়েছে।

উপন্যাসের সূচনাপর্ব থেকেই কুবেরের দৃষ্টিকোণ থেকে কাহিনিগ্রন্থন করেছেন লেখক। যদিও উপস্থাপনরীতি উত্তমপুরুষে নয়, লেখকের প্রত্যাশিত সর্বজ্ঞতার ঢঙেই। এই ধরণের দৃষ্টিকোণের প্রয়োগেই বহির্মুখী গোষ্ঠীজীবন এবং অন্তর্মুখী ব্যক্তি-চৈতন্যের মধ্যে একটি বিভ্রম দেখা দেয়। প্রকৃতপক্ষে আমরা কুবেরের মধ্যে এই দুই রূপেরই প্রকাশ দেখতে পাই। কাহিনির শুরুতে সে গোষ্ঠীজীবনের একজন, মধ্যপর্বে এসে তার উপস্থিতি পারিবারিক বলয়ে, একই সঙ্গে অবৈধ প্রেম-সম্পর্কের দ্বন্দ্বে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে দোলায়িত এবং তারপর উপন্যাসের পরিণতিতে আবার সে হোসেন মিয়ার ময়নাদ্বীপের ভাবী প্রজাতে রূপান্তরিত।

'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের কাহিনি শুরু হয়েছে বিশাল পদ্মার বুকে পদ্মার মাঝিদের নৌকা চালনা ও পদ্মার বিস্তৃতি প্রদর্শনের মধ্যে দিয়ে। আর শেষ হয়েছে কপিলাসহ কুবেরের ময়নাদ্বীপে যাওয়ার উদ্যোগপর্বের মধ্যে দিয়ে। এর মাঝখানে নানান সময়ে নানান ঘটনায় পদ্মানদীর মাঝিদের জীবন-বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে। কেতুপুর, চরডাঙা, ময়নাদ্বীপ মুখ্যত এই তিনটি স্থানে কাহিনি পল্লবিত হয়েছে। উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদেই আছে পদ্মার তীরবর্তী কেতুপুর অঞ্চলের ধীবরশ্রেণির মানুষদের সামাজিক বঞ্চনা ও শোষণে দারিদ্র্যের নিম্নতম সীমায় অবস্থানের চিত্র। সমগ্র কেতুপুরের সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটটিকে লেখক উপন্যাসের মধ্যে তুলে ধরেছেন, যার একটি অঙ্গ কুবের ও তার পরিবার। কুবেরের পারিবারিক জীবন, তার গোষ্ঠীবদ্ধ সামাজিক জীবন থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন নয়। কুবেরের জীবনকথার সঙ্গে গণেশ, রাসু, পীতম মাঝির কথাও তাই সমানভাবে প্রযোজ্য। তাদের প্রত্যেকের অবস্থাই প্রায় সমান। আর তাই লেখক কুবেরের পারিবারিক জীবন আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে রথের মেলা, আশ্বিনের ঝড়, হোসেন মিয়ার বিচারসভা ইত্যাদি উল্লেখের মধ্য দিয়ে ধীবরশ্রেণির গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের বিবরণ দিয়েছেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিচ্ছেদে কুবেরের পারিবারিক জীবনপটের একটি স্পষ্ট ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। এই পর্বে পরিবারের নানা খুঁটিনাটি বর্ণনায় একটি নিস্তেজ, নিরুত্তাপ ও গতানুগতিক জীবনের মধ্যে কুবেরের বিচরণক্ষেত্র সীমায়িত।

উপন্যাসের চতুর্থ পরিচ্ছেদে কপিলার আগমন ঘটে এবং কুবেরের জীবনেও কপিলার উদ্দাম অবির্ভাব। তৃতীয় পরিচ্ছদ পর্যন্ত কুবেরের সুস্থিত পারিবারিক জীবন-কাহিনি আমরা দেখতে পেয়েছি। এরপরই স্ত্রী মালার বোনের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণের মধ্য দিয়েই কুবেরের চরিত্রের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের সূচনা দেখা দিল। ক্রমশ আমরা দেখতে পাই কুবের-কপিলার অবৈধ, অসামাজিক এবং বিবাহ-বহির্ভূত প্রেমসম্পর্কের লীলা। এখান থেকেই কুবের চরিত্রের বহুমাত্রিক, বাস্তব ও দ্বন্দ্ববিক্ষুব্ধ ব্যক্তিত্বের রূপটি স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। এর ফলে তার গোষ্ঠীজীবনাশ্রিত রূপটি অস্পষ্ট হয়ে যায়। কুবেরের ব্যক্তিসত্তার জাগরণের পেছনে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে কুবের-কপিলার পারস্পরিক প্রেম-সম্পর্কের প্রগাঢ়তা। পরস্ত্রীর প্রতি কুবেরের দুর্নিবার আকর্ষণ, প্রবল প্রণয়বাসনা এবং তদ্‌জনিত অপরাধবোধের অন্তঃসংঘাতকে অবলম্বন করেই জেগে উঠেছে উপন্যাসের ব্যক্তিত্ব-চিহ্নিত নায়ক। সে ভুলতে পারে না কেতুপুরকে, নিজের পরিবারকে। তাই কপিলাকে কেন্দ্র করে তার যে অস্থিরতা ও আদিম প্রবৃত্তি তা তাকে পুরোপুরি ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে না। ফলে তার অবরুদ্ধ কামনা-বাসনা মাঝে মধ্যেই স্বপ্ন ও কল্পনার জগতে আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজেছে।

উপন্যাসে কুবের-কপিলার প্রেম-সম্পর্ক মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করলেও কুবেরের পরিণতি নির্ধারণে কপিলাই একমাত্র প্রভাবসৃষ্টিকারী উপাদান ছিল না। এক্ষেত্রে হোসেন মিয়া ও তার ময়নাদ্বীপ কাহিনিও কুবেরের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বের দাবি রাখে। উপন্যাসের চতুর্থ পরিচ্ছেদ থেকে শেষ পর্যন্ত কপিলা-প্রসঙ্গ থাকলেও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ থেকে একেবারে শেষ পর্যন্ত কুবেরের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে হোসেন মিয়া ও তার ময়নাদ্বীপ প্রসঙ্গ। গোটা উপন্যাস জুড়ে কেতুপুরের ধীবরশ্রেণির উপর বিশেষত কুবেরের দারিদ্র্যগ্রস্ত জীবনে হোসেন মিয়ার প্রভাব বিস্তারের ছবি আমরা দেখতে পাই। জীবনসংগ্রামে বিপর্যস্ত জেলেমাঝি-দের কাছে হোসেন মিয়া যেন এক জীবন্ত বিস্ময়। এই বিস্ময়ের সঙ্গে মিশে রয়েছে হোসেন মিয়া সম্পর্কে অপরিচয়জনিত একধরণের ভীতিবোধ। হোসেন মিয়া সম্পর্কে সমগ্র ধীবরশ্রেণির ভয়মিশ্রিত বিস্ময়চেতনা এবং নির্ভরতা কেন্দ্রীভূত হয়েছে, একটি বিশেষ ব্যক্তিচরিত্রের মধ্যেই সে হল কুবের।

এইভাবে কখনো গোষ্ঠী প্রতিনিধি হিসেবে হোসেন মিয়ার জালে আটকে পড়েছে কখনো আবার একক ব্যক্তিত্বের

সংকটে কুবের ভেসে গেছে কপিলার প্রেমের স্রোতে। শেষ পরিচ্ছেদে নানা ঘটনার দ্রুততায় এবং আকস্মিকতায় বিমূঢ় কুবের, হোসেন মিয়া ও কপিলার দ্বারা ছায়াগ্রস্ত হয়ে পড়ে। উপন্যাসের শুরুতে তাকে দেখতে পাই মাছধরা জেলে রূপে, আর হোসেন মিয়ার কৃপা ও কৌশলে ক্রমশ নৌকার মাঝি এবং পরিশেষে ময়নাদ্বীপে নির্বাসিত এক বাসিন্দা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ময়নাদ্বীপে নির্বাসিত আমিনুদ্দি, রাসু, এনায়েত বা বসিরের মতো কুবেরও ময়নাদ্বীপের ভাবী বাসিন্দা। কিন্তু তারা কেউই কুবেরের মতো কোনও অসামাজিক প্রণয়-লীলায় বিভোর হয়ে ময়নাদ্বীপকে স্বপ্নপূরণের উপযুক্ত স্থান বলে ধরে নিয়ে পরিতৃপ্ত হয়নি। তাই আমরা বলতে পারি, গোষ্ঠীজীবন ও ব্যক্তিজীবনের নানান সমস্যার সমাধান সহজ-সরল-নিরীহ কুবেরের খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়নি বলেই, সে মুক্তির আশায় শেষ পর্যন্ত ময়নাদ্বীপে পাড়ি দিয়েছে। সমগ্র উপন্যাস তথা কুবেরের পরিণতি এইভাবেই গোষ্ঠীজীবন ও ব্যক্তিজীবনের যুগ্ম-স্রোতে ভেসে গেছে অনিশ্চিত পরিণতির এক সামুদ্রিক-বিশালতায়।

১৬.৪ উপন্যাসের ভাষা

একটি উপন্যাসের ক্ষেত্রে ভাষা-প্রসঙ্গটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভাষার তরণী ধরেই উপলব্ধির-মোহনায় পৌঁছানো যায়। ভাষা সাযুজ্যের মধ্য দিয়ে লেখকের উদ্দেশ্য পরিপূর্ণতা পায়। শুধু বর্ণনার সৌন্দর্য নয় ব্যক্তিত্ব আরোপণের মাধ্যম হল ভাষা, তার সঙ্গে আঞ্চলিকতা কিংবা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চরিত্র সৃষ্টি হলে তো কথাই নেই। উপন্যাসে ঔপন্যাসিক যে জীবনভাষ্য গড়ে তোলেন এবং জীবনের সামগ্রিকতাকে তুলে ধরার জন্য ভাষার একটি ভূমিকা রয়েছে। ভাষার সাহায্যে বর্ণনা ও চরিত্রের সংলাপ রচনা করে তিনি জীবনের নানাদিককে প্রকাশ করেন। উপন্যাসের ভাষার ক্ষেত্র ব্যাপকভাবে বিস্তৃত। তার প্রবণতাও সর্বগ্রাসী ও মর্মস্পর্শী। জীবনের নানা ক্ষেত্রকে সেই ভাষা গ্রাস করতে পারে, সমস্ত কিছুকেই স্পর্শ করতে পারে সেই ভাষা। তাই উপন্যাস তথা যে কোনো সাহিত্যসৃষ্টিতে ভাষার গুরুত্ব অত্যন্ত মূল্যবান।

'পদ্মানদীর মাঝি' পূর্ববঙ্গের লোকজীবনের এক অংশের ক্ষুদ্র প্রতিরূপ। জেলে-মাঝিদের জীবনালেখ্যকে একজন সমাজ-সচেতন ঔপন্যাসিক হিসেবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মূর্ত করে তুলতে চেয়েছেন উক্ত উপন্যাসটিতে। এই প্রসঙ্গে মানিকের উপন্যাস রচনায় নিজস্ব ভাষারীতির দিকটিকে আমরা লক্ষ্য করতে পারি। উপন্যাসে লেখক-পাঠক যোগসূত্র রচনার জন্য একটি বিশিষ্ট ভাষারূপ তিনি গড়েছিলেন, যা তাঁর শিল্পী-স্বভাবেরই অনুরূপ। সাধুভাষা বা চলিত ভাষা যে ভাষাই তিনি ব্যবহার করুন না কেন, তার মধ্যে আগাগোড়া একধরণের নির্মম নিরাসক্তি ও নির্লিপ্তি রয়েছে। ভাবালুতাকে কোনোরকম প্রশ্রয় না দিয়ে, যে ভাষায় তিনি বিষয়ের খুঁটিনাটি বর্ণনা দেন, সেই ভাষাতেই মানবচরিত্র বা সমাজের নিহিত সত্যেরও পরিচয় লুকিয়ে থাকে। শব্দ-ভাষা উপমা প্রয়োগের ব্যঞ্জনায় তাঁর সেই অত্যাশ্চর্য ভাষারীতি 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসেরও প্রাণবস্তু হয়ে উঠেছে।

এই উপন্যাস রচনায় লেখকের ভূমিকা কখনো বিবৃতিকারের, কখনো আবার ভাষাকার, টিপন্নীকারের। তাই কখনো তিনি মিশে গেছেন চরিত্রের সঙ্গে, কখনো আবার চরিত্রের সংলাপকেই অনুদিত করেছেন নিজস্ব মন্তব্য হিসেবে। উপন্যাসে একদিকে থাকে বিবৃতি যা লেখকের অংশ লেখকের হয়ে কখনো কথক বলে থাকেন, যেটি এই উপন্যাসে সাধু ক্রিয়াপদের ব্যবহারে এসেছে। আর সংলাপ অংশটি চরিত্রের। উপন্যাসটির চিহ্নিত অঞ্চল পদ্মানদী তীরবর্তী কেতুপুর, চরডাঙা, আকুরটাকুর, ময়নাদ্বীপ সেই জন্য এই অঞ্চলের অধিবাসীদের বিশেষ কথ্যভাষাকে তিনি তুলে ধরেছেন। চরিত্র অনুযায়ী ভাষা প্রয়োগের কারণে উপন্যাসটির বিষয় ও পাত্র-পাত্রীদের

জীবনচর্যা আমাদের কাছে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।

উপন্যাসটির প্রারম্ভে ইলিশ মাছ ধরার মরশুম এবং নদীমাতৃক মাঝিদের মাছ ধরা ও মাছের নৌকা থেকে কলকাতায় ইলিশ চালানের বিস্তৃত বর্ণনাটি যা লেখকের অংশ, তাতে সাধুরীতির প্রয়োগ দেখতে পাই। জেলেপাড়ার বাস্তব বর্ণনাতেও কোথাও অতিরেক আবেগ আতিশয্য দেখতে পাই না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাস্তবতা-প্রিয় লেখক হয়েও সাংবাদিকতার ভাষা ব্যবহার করেন নি। কেননা, সাংবাদিকগণ যা ঘটে শুধুমাত্র তার বর্ণনা দিয়ে থাকেন, কিন্তু ঔপন্যাসিক জীবনরসিক জীবনের ব্যাখ্যাতা। বিবৃতি ও বর্ণনায় তিনি অহেতুক বাহুল্য বর্জন করেছেন। উপন্যাসটি অন্যান্য উপন্যাসের থেকে আয়তনে ছোট। তাই বর্ণনার সংযম ও সংহতি লক্ষ্য করার মতো।

উপন্যাসের ভাষায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিদিনের গদ্যময়তার সঙ্গে এনেছেন সূক্ষ্ম কবিতার পেলবতাকে। কাব্যিকতাও উপন্যাসের ভাষার একটি গুণ, যদিও এখানে ঠুনকো পেলবতা নেই, রয়েছে সংহতি সুষমা। আলোচ্য উপন্যাসটিতে লেখক জেলেপাড়ার যে বর্ণনা লেখক দিয়েছেন তাতে তাঁর বিজ্ঞানমনস্ক নির্মোহ নিরাসক্তি লক্ষ করি। নির্মোহ বিজ্ঞানীর দৃষ্টির সঙ্গে এসেছে সমাজসচেতন শিল্পীর দৃষ্টিও। বাস্তব জীবন-কাহিনির বর্ণনায় ভাষায় একটি 'documentation' লক্ষ্য করা যায়। এর পাশাপাশি উপন্যাসের দৃষ্টিকোণ প্রয়োগের বিষয়টিও জড়িত। 'সীমিত সর্বজ্ঞতা'র পাশাপাশি কুবের চরিত্রের দৃষ্টিকোণ প্রযুক্ত হওয়ায় ব্যক্তিচেতনার প্রকাশ ঘটেছে, চরিত্রের দেখাটিই প্রধান হয়েছে। সে কারণে উপযুক্ত ভাষাভঙ্গিও তিনি প্রয়োগ করেছেন। চরিত্রের চোখ দিয়ে অন্যান্য চরিত্ররা নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে উঠে এসেছে। উপন্যাসে বিভিন্ন শ্রেণির চরিত্র বর্ণনায় ভিন্ন ভিন্ন ভাষারীতির প্রয়োগ আমরা দেখতে পাই। ভাষায় অহেতুক জটিল শব্দবন্ধ তিনি ব্যবহার করেননি। শুধু সাধুরীতির গদ্যভঙ্গি তিনি নিয়েছেন, কিন্তু তা তৎসম শব্দভারে জর্জরিত হয়ে পড়েনি। প্রতিদিনের ব্যবহৃত শব্দরাজি এখানে প্রযুক্ত হয়েছে। ঔপন্যাসিক চরিত্রের বহিরঙ্গের বর্ণনার পাশাপাশি অন্তর্লোককেও প্রকাশ করেছেন। চরিত্রের 'আঁতের কথা'কে তুলে ধরা আধুনিক ঔপন্যাসিকের অন্যতম কাজ। কুবের চরিত্রের নানা পরিস্থিতিতে মনোবিশ্লেষণ, কপিলার রহস্যময় প্রেম সবকিছুই উপযুক্ত ভাষার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাংকেতিক মন্তব্য প্রায় তীরের মতো নিক্ষিপ্ত হয়েছে তথাকথিত ভদ্রমানুষদের উদ্দেশ্যে, ভদ্রেতর দরিদ্র, শোষিত জেলে-মাঝিদের প্রতি সহানুভূতিতে। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়

ক) 'জোর বাতাসেও নৌকার চিরস্থায়ী গাঢ় আঁশটে গন্ধ উড়াইয়া লইয়া যাইতে পারেনা।'

খ) 'জেলেপাড়ার ঘরে শিশুর ক্রন্দন কোনদিন বন্ধ হয় না। ক্ষুধাতুর দেবতা, হাসিকান্নার দেবতা, অন্ধকার আত্মার দেবতা, ইহাদের পূজা কোনদিন সাঙ্গ হয় না।'

এইসকল মর্মভেদী মন্তব্যের সংক্ষিপ্ত উচ্চারণে সমাজের সুসভ্য মানুষের নির্লজ্জ ঔদাসীন্য, দারিদ্র্যের অভিশাপে একশ্রেণির মানুষের অভদ্র, অমানুষ হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার অসহায়তা বিধৃত হয়েছে। লেখকের ভাষা নির্লিপ্ত থেকেও কীভাবে চরিত্রের ভাষা উঠেছে, তারও বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়

ক) 'কুবের ঝিমাইতে ঝিমাইতে নিদ্রাকাতর চোখে স্ত্রীর দিকে তাকায়। হ, ছেলে কোলে রোগা বউটিকে তাহার রাজরাণীর মতো দেখাইতেছে বটে।'

খ) 'তা বৈকি! কলঙ্ক কিনিবার সাধ যে কপিলার ষোল আনা দেখা যায়?'

নাগরিক লেখক মানিক কুবেরের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়ে বর্ণনার ভাষাতেও কুবেরের মুখের পূর্ববঙ্গীয় উপভাষার রূপকে অবলীলায় স্থান দিয়েছেন। লেখকের নিজস্ব বিবৃতি এবং চরিত্রের সংলাপের এই বিকল্প ব্যবহার ভাষা

ব্যবহারের এক চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে। উপন্যাসটির অন্যতম প্রধান চরিত্র হোসেন মিয়া। ধূর্ত, প্রতিষ্ঠাকামী ব্যবসায়ী হোসেন মিয়া স্বভাবে ক্ষিপ্র প্রকৃতির। সে এক মুহূর্ত সময়ও আলস্য ও অবসরে অপচয় করে না। তার কর্মোদ্যম এবং কূটকৌশল তাকে অত্যন্ত মিতবাক্ করে তুলেছে। সমগ্র উপন্যাসে হোসেন মিয়ার কথায় আপাতবিনয় ও মিষ্টতার আড়ালে ইস্পাততুল্য কাঠিন্য ও দৃঢ়তা লক্ষ্য করা যায়। যেমন

ক) 'মুসলমান মসজিদ দিলি, হিঁদু দিব রাহুর ঘর না মিয়া, আমার দ্বীপের মদ্যি ও কাম চলব না।'

খ) 'ময়নাদ্বীপি যাবা কুবির? চুরি আমি সামাল দিমু।'

গ) 'ঘুমাও গা কুবির। আর শোন বাই, কী দেখলা কী শুনলা আঁধার রাতে মনে মনে থুইও, কইয়া কাম নাই।'

এই উপন্যাসে পূর্ববঙ্গীয় উপভাষার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। চরিত্র ও কাহিনির বাস্তবতা রক্ষার জন্য অবধারিভাবেই এই উপভাষার ব্যবহারিক প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। উচ্চারণের নিজস্ব রীতি, ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য, বিশেষ বিশেষ শব্দের ব্যবহার সবকিছুই ফুটে উঠেছে প্রতিটি চরিত্রের ভাষায়। যদিও সাধুভাষাই লেখকের আখ্যানকথনের মুল মাধ্যম, তবুও তার মধ্যেই উপভাষার শব্দাবলীকে সুকৌশলে গ্রথিত করে দেওয়া নিঃসন্দেহে মানিকের নিজস্ব স্টাইল বা রীতি। বিভিন্ন চরিত্রের উপযুক্ত সংলাপ তৈরি করতে নানান আঞ্চলিক ভাষারূপকে তিনি প্রয়োগ করেছেন। বঙ্গালী উপভাষার নানা রূপবৈচিত্র্যকে তিনি বিভিন্ন চরিত্রের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন। বঙ্গালী উপভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য অপিনিহিতির ব্যাপক ব্যবহার। আলোচ্য উপন্যাসের মধ্যে অপিনিহিতির ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়। বঙ্গালীর উপভাষার আঞ্চলিক সুর ও স্বাদ উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীকে জীবন্ত করে তুলেছে। মুখের ভাষাকে অবিকলভাবে সাহিত্যে প্রয়োগ করাও সহজ কথা নয়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাতে সফল হয়েছেন। এই ভাষা 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের জীবনকাহিনির সঙ্গে সর্বতোভাবেই সংগতিপূর্ণ।

১৬.৫ উপন্যাসে গানের প্রাসঙ্গিকতা

সাহিত্যের সঙ্গে গানের সম্পর্ক বহু পুরোনো। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যগুলো প্রায় ক্ষেত্রেই ছিল গীতিমূলক। গীতিমাধ্যমে বহু আখ্যন ও উপাখ্যানমালা আমরা পেয়েছি। অন্যান্য উপাদানের মতো গানও নাটক বা উপন্যাসের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। চরিত্রের বিশ্বাসযোগ্যতা নির্ভর করে সংলাপ ও ক্রিয়ার উপর। সংলাপ যদি আড়ষ্ট কিংবা কৃত্রিম হয় তাহলে চরিত্রটি বাস্তবতা পায় না। তাকে জীবন্ত করে তুলতে তার উপযোগী ভাষা ও সংলাপের প্রয়োজন হয়। অনেক সময় চরিত্র তার মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-প্রেম-দুঃখ ইত্যাদি সংলাপের দ্বারা প্রকাশ করতে পারে না, তখন লেখকও তার জন্য উপযুক্ত সংলাপ খুঁজে পান না। ঠিক সেই সময়ে একটি উপযুক্ত গান বা সংগীত তার মনের ভাবকে যথাযথভাবে ফুটিয়ে তুলতে সহায়ক হয়।

পূর্ববাংলার জনজীবন ও সংস্কৃতিতে গান একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে রয়েছে। উৎসব-অনুষ্ঠানে, শ্রমদানে গান একটি আবশ্যিক অঙ্গ হিসেবে এই অঞ্চলে গৃহীত হয়ে থাকে। 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাস আমাদের আরেকবার স্মরণ করিয়ে দেয় সেই সাঙ্গীতিক পরিমণ্ডলের কথা। আলোচ্য উপন্যাসের মধ্যে সংগীতের একটি সজীব ভূমিকা রয়েছে। পদ্মার তীরে বাস করা জেলে-মাঝিদের জীবনে জড়িয়ে আছে নদীজ ফসল নানা গান। লোকজীবনের উপযোগী এইসব গান। পূর্ববঙ্গের মানুষজনের মধ্যে ভাটিয়ালি, জারি, সারি, মুর্শিদির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। পদ্মার জেলে-মাঝিরা তাদের উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতার জগতকে প্রকাশ করেছে তাদের স্বভাব কবিত্বে, গানের সুরে। নদীর স্রোত ধরা দেয় সেইসব লোকগীতের বহমান সুরে। নদী, নদীর তীরবর্তী প্রকৃতি এবং পল্লীবাসী

দরিদ্র মানুষ সেইসব গানে ধরা পড়ে। তাই লেখক তাদের জীবনকথা বলতে বসে অবধারিতভাবেই উপন্যাসের মধ্যে গানের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন।

'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে গান মূলত একটি, যা হোসেন মিয়ার মুখে গীত এবং তার দ্বারাই রচিত। আরেকটি গান আছে, যা রসের গীত গণেশের মুখ-নিঃসৃত। যুগল গীত রচনা করতে পারে বলে হোসেন মিয়াকে জানিয়েছিল কুবের। তবে পাঠকের সেই গান শোনাবার সুযোগ উপন্যাসে ঘটেনি। উক্ত দুটি গান ছাড়া আর কোনো গান নেই, তবু অ-শিক্ষিত পটুত্ব গ্রামবাসীর মধ্যে সহজাত কাব্য-প্রতিভা আছে। তারা এমন ভাষায় কথা বলে তা অনেক সময় কাব্যের শব্দরাজিতে ভরপুর।

উপন্যাসের তৃতীয় পরিচ্ছেদে হোসেন মিয়ার মুখে একটি গান গীত হয়েছে। উপন্যাসের সর্বাধিক আলোচিত হল হোসেন মিয়ার গাওয়া এই গানটিই। গানটি হল ''আঁধার রাইতে আশমান জমিন ফারাক কইরা থোও, বোনধু, কত ঘুমাইবা" বলা যায়, এই গানটিই এই উপন্যাসের উদ্দিষ্ট সংগীত। হোসেন মিয়ার চরিত্র ও কার্যকলাপের বিশ্লেষণে উক্ত গানটির প্রসঙ্গ বারবার ফিরে এসেছে। নানা দিক থেকে গানটি ব্যাখ্যাত হয়েছে। এই গানটি যেমন কুবেরকে অভিভূত করেছে, তেমনি পাঠকদেরকেও অভিভূত করে রেখেছে। হোসেন মিয়ার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি হল সে স্বভাব-কবি। এটি বাস্তব, কেননা অগণিত পল্লীগীতি বা গীতিকা হোসেন মিয়ার মতো মানুষেরা যারা তথাকথিত শিক্ষিত নয় তাদের স্বভাব কবিত্বের শক্তিই সেইসব গীতি সম্পদের সৃষ্টি করেছে। গানটির সাথে পূর্ববঙ্গগীতিকারে সংগীতধর্মের অনেকটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। গানটি উপন্যাসের উদ্দিষ্ট অঞ্চলের নর-নারীর প্রাণের সম্পদ হয়ে উঠেছে। তাছাড়া গানটি উপন্যাসের পটভূমি সৃজনে, আখ্যানের নির্মিতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

হোসেন মিয়ার গাওয়া এই গানটির মধ্যে 'বোনধু', 'মিয়া' ও 'মাঝি' সম্বোধন করে হোসেন যেন নিজেকেই এই কথাগুলি বলেছে। এটি আত্ম-উদ্বোধনের গান হয়ে উঠেছে। কারণ তার আগেই হোসেন মিয়ার স্মৃতিচারণার কথা রয়েছে। বর্তমানের হোসেন মিয়া যেন অতীতের হোসেনকে খুঁজে পেতে চেয়েছে। আর গানে গানে সে নিজেকে খুঁজেও পেয়েছে। নিজের মাঝি সত্তাকে জাগিয়ে রাখতে চায় বলে এই গানটি যেন তার বিবেকের দর্পণ হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয়ত, এই গানের ব্যঞ্জনার অভিমুখ আসলে কুবেরের দিকে ছিল। হোসেন মিয়া কেতুপুরের জেলেদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কুবেরকে ভালোবাসত। তার উদ্দেশ্যই ছিল কুবেরকে চিরতরে ময়নাদ্বীপে নিয়ে যাওয়া। প্রকৃতপক্ষে আত্মীয়-পরিজনদের মধ্যে সীমিত, একটি ছোট জেলেপাড়ার গণ্ডিতে আবদ্ধ কুবেরকে সামুদ্রিক বিশালতার মধ্যে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টায় এই গান যেন হোসেন মিয়ার কণ্ঠে গীত হয়েছে। 'কত ঘুমাইবা' এই ধ্রুবপদটির মাধ্যমে হোসেন মিয়া কুবেরের ভেতরের অনন্ত শক্তিধর মাঝিসত্তাকে জাগাতে চেয়েছে।

হোসেন মিয়ার গানটিতে নদীতে পাড়ি দেওয়ার প্রসঙ্গ রয়েছে। 'মাঝি' শব্দটি শেষের সম্বোধনে রয়েছে। সার্থকভাবেই নদীমাতৃক বঙ্গজীবনের সংগীত হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে আমরা এই গানের মধ্যে প্রাত্যহিক লোকজীবনের উপাদানগুলি উপমা ও চিত্রকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হতে দেখেছি। ভাষায় রয়েছে বঙ্গালী ঔপভাষিক সুর ও মেজাজ। ক্রিয়াপদের ব্যবহারেও বঙ্গালী ভাষা প্রাধান্য পেয়েছে। গানে ব্যবহৃত বিভিন্ন আরবি শব্দের পাশে বঙ্গালী ভাষার প্রয়োগ করে 'স্থানিক বর্ণ' প্রকাশিত হয়েছে। সবমিলিয়ে গানটি আঞ্চলিক স্বভাবকে ফুটিয়ে তুলেছে। এছাড়া গানটি উপন্যাসের জনগোষ্ঠীর বাস্তবতা সৃষ্টিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সহায়ক হয়েছে।

হোসেন মিয়া তার গানের মাধ্যমে কুবের এবং জেলে সম্প্রদায়কে জেগে উঠতে বলেছে। হোসেন মিয়ার চরিত্র পরিস্ফুটনে ও কুবেরের চরিত্রের বিকাশে গানটির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। হোসেন মিয়াই একমাত্র চরিত্র

যে প্রকৃতি তথা পদ্মার বিপরীতে দাঁড়িয়েছে। তার মধ্যে প্রকৃতিকে প্রতিকূলতাকে জয় করার দৃঢ়তা, ইচ্ছা ও সাধনা আছে। অকূল নদী অথবা সমুদ্র থেকে নিশ্চেষ্টভাবে বসে থাকার মানুষ সে নয়, তাই 'পাড়ি দিবার সময় গেল, মাঝি তবু থির' এই ধরণের ভাবনা তার গানে প্রকাশিত হয়েছে। হোসেন মিয়ার এই গানটিতে পাড়ি দেওয়ার যে আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে তা উপন্যাসের পরিণতির দ্যোতক। কুবের ও কপিলা অকূল সমুদ্রে যাত্রা করবে তার ইঙ্গিতও গানটিতে পাওয়া যায়।

'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে আরও একটি গানের উল্লেখ রয়েছে। সেই গানটি সপ্তম পরিচ্ছেদে কুবেরের বন্ধু গণেশের মুখে ধ্বনিত হয়েছে। ইলিশের মরশুম শেষ হওয়ার পর প্রায় কর্মহীন কুবেরকে হোসেন মিয়া তার নৌকায় কাজ দিয়েছিল। মাল খালাসের দায়িত্ব ছিল কুবেরের। কুবের ও গণেশ আমিনবাড়ি থেকে এসে কুবেরের ঘরে কথা বলে। কুবের গণেশকে গতরাত্রে কোথায় ছিল জিজ্ঞেস করে এবং এই প্রসঙ্গেই গণেশ গান করে

পিরিত কইরা জ্বইলা মলাম সই, আ লো সই!

আওন যাওন সমান সোনার, জউলা চুকা দৈ!

আ লো সই

কুবের গণেশকে 'কুচরিত্র' হয়েছে বলে গালিগালাজ করে। এর প্রত্যুত্তরে গণেশ বলে গান শোনায় কোনো দোষ নেই। এই গানটিতে চপল ভঙ্গিতে প্রেম-চেতনার পাশাপাশি পিরিতের আগুনে পোড়ার যন্ত্রণাও প্রকাশিত হয়েছে। এই গানটিকে কেন্দ্র করে বেশ কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে

প্রথমত : মাঝিদের মনোরঞ্জনের জন্য জনপদগুলিতে বাঈজী সংগীতের আসরের প্রচলন ছিল। কুবের এদের সংসর্গকে কুচরিত্রের লক্ষ্মণ বলেই মনে করেছে। যদিও আমরা গণেশকে গান শুনেই খুশি হতে দেখতে পাই। বাজারী মেয়েদের গানের চটুলতাকে গণেশ কুবেরের কাছে গানের মাধ্যমে তুলে ধরেছে।

দ্বিতীয়ত : আড়াল থেকে মালা এই গানটি শুনতে পেয়েছে এবং পুনরায় গানটি শোনার জন্য কুবেরের কাছে ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছে।

তৃতীয়ত : এই গানের অন্তর্নিহিত অর্থ কুবেরের জীবনে সত্য হয়ে উঠেছে সপ্তম পরিচ্ছেদের শেষের দিকেই। কপিলার অনুপস্থিতি বিরহ কুবেরকে পীড়িত করে তুলেছে। কুবের যতবার কপিলাকে ভোলার চেষ্টা করেছে সে আরও বেশি বিরহ-যন্ত্রণায় পীড়িত হয়েছে। গণেশের এই গান কুবেরের মনোবিশ্লেষণের সহায়ক হয়ে উঠেছে। গণেশ সহজ-সরল মানুষ হলেও কুবেরের অবৈধ প্রণয়লীলায় নিজেকে যুক্ত করেনি। তার শুভার্থী হিসেবেই যেন এই গানটি গণেশ শুনিয়েছে নিজেকে বেঁধে রাখার সতর্কবার্তা হিসেবে। কুবেরের মনোজগতকে তার নিজের কাছে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই গণেশের এই গান। কুবের-কপিলা প্রণয়কাহিনির মধ্যপর্বে তাদের আত্মিক সংকটের কথাই গণেশের গানে ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। লেখকও এই সূত্রেই গণেশকে দিয়ে পাঠকের সামনে কুবের ও কপিলার চিরন্তন প্রণয়ীসুলভ আবেগ-অনুরাগের চিত্রটি ধরিয়ে দিতে পেরেছেন।

'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের গান দুটি উপন্যাসটিতে সার্থকভাবেই প্রযুক্ত হয়ে ঔপন্যাসিকের উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করতে সফল হয়েছে। গানগুলির ভাব বা বিষয়বস্তু, সময় ও পরিবেশ থেকে স্বতোৎসারিত অভিজ্ঞতাসঞ্জাত। তা কখনো প্রকৃতি, আবার কখনো নারীপ্রকৃতি বা কখনো মনুষ্যপ্রকৃতি সম্পর্কে কিছু পরিচিত গানগুলির মধ্য দিয়ে আভাসিত হয়েছে। পল্লীগীতির এ এক অনন্য স্বভাবধর্ম। পটভূমি, বিষয়বস্তু, লোকায়ত জীবন, প্রকৃতি ও নিয়তি অনিবার্যভাবে এই সঙ্গীতময়তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়েছে। তাই সব মিলিয়ে বলা যায়, উপন্যাসের মধ্যে গানের

যথাস্থানে প্রয়োগে লেখকের উদ্দেশ্য পূর্ণ মাত্রায় সফল হয়েছে।

১৬.৬ সারাংশ

সমগ্র উপন্যাসের কাহিনিকে লেখক সাতটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করেছেন, যার মধ্যে দীর্ঘতম পরিচ্ছেদ হল সপ্তম। স্থানগতভাবে পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে কাহিনি ও চরিত্রাবলি বিচরণ করেছে। উপন্যাসটির সময়পর্ব এক বছরেরও কম সময়। পাঁচটি ঋতুকাল বর্ষা থেকে বসন্ত। স্থান-কাল-পাত্রের এই বিন্যাস উপন্যাসের সূচনায় যতটা শিথিল এবং কাহিনির গতি সেখানে যত মন্থর, উপন্যাসের শেষাংশে এসে সেটি ততই দৃঢ়গ্রন্থিতে আবদ্ধ হয়েছে, গল্পের গতিও সেখানে দ্রুত। ফলে কাহিনির এই অংশে নাটকীয়তা লক্ষ্য করা যায়।

সাধারণভাবে উপন্যাসের উপস্থাপন রীতিতে লেখক বিবৃতিকারের ভূমিকা নিয়ে থাকেন। এখানেও লেখক সেই ভূমিকাই নিয়েছেন। কিন্তু দেখেছেন কুবেরের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে। তেমনি উদাসীন, নির্লিপ্ত দৃষ্টিকোণ প্রয়োগ করে লেখক কাহিনির চরিত্র ও তাদের জীবনালেখ্য সম্পর্কে সামাজিক ঔদাসীন্যের দিকটিকে পরিস্ফুট করে তুলতে চেয়েছেন।

উপন্যাসটির মধ্যে আরও একটি বিশিষ্টতা লক্ষ্য করা যায়, তা হল ভাষাগত মৌলিকতা। সংলাপে বাস্তবতা রক্ষার উদ্দেশ্যে পূর্ববঙ্গের উপভাষার প্রয়োগে কৌশলগত নতুনত্ব কিছু দেখা যায় না একথা ঠিক। কিন্তু বিবৃতির ভাষায় যে আবেগহীন, নিরাসক্ত দূরত্ব সৃষ্টি করেছেন, তা এই উপন্যাসটির ক্ষেত্রে একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে। শব্দ-ভাষা-উপমা প্রয়োগে বিলাসশূন্য, আটপৌরে, নিরুত্তাপ এক বাচনভঙ্গি লক্ষ্য করা যায় যা লেখকের একান্ত নিজস্ব ভাবনার ফসল।

উপন্যাসটির আরও একটি আকর্ষণীয় বিষয় হল সঙ্গীতের ব্যবহার। পূর্ববঙ্গীয় জনজীবনে উৎসব অনুষ্ঠান ইত্যাদি ব্যাপারে সঙ্গীত একটি আবশ্যিক অঙ্গ। তাই সেখানকার মানুষজনের কথা বলতে গেলে অবধারিতভাবেই তাদের গান, কথা ও সুরের সহাবস্থান এই সমস্ত বিষয়গুলি এসে যায়। সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে শুধু তাদের সাংস্কৃতিক জীবনের পরিমণ্ডল প্রকাশিত হয়নি, তার সাথে উপন্যাসের চরিত্রগুলির মনস্তত্ত্ব উদ্‌ঘাটনেও তা অনেক বেশি সহায়ক হয়ে উঠেছে। হোসেন মিয়ার গানে তার এই স্বভাবের অনুরূপ কর্মোদ্যোগের আহ্বান, কুবেরের বন্ধু গণেশের গানে কুবেরের প্রণয়-যন্ত্রণার প্রতিফলন ঘটেছে। পটভূমি, বিষয়বস্তু, লোকায়ত জীবন, ঋতুবৈচিত্র্য, সঙ্গীতময়তা এইসব কিছু মাঝিদের জীবনের দারিদ্র্য-হতাশা-বিপর্যয়ের সঙ্গে একাত্ম হয়ে দেখা দিয়েছে।

১৬.৭ অনুশীলনী

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দিন

১) পদ্মানদীর মাঝি-র জীবনে এবং এই উপন্যাসে গান এক বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছে। আপনি এই মন্তব্যের সঙ্গে সহমত কিনা তা বিচার করে দেখান।

২) ''পদ্মানদীর মাঝি' বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে এক অভিনবত্বের সূচক।'' সমালোচকের এই মন্তব্য উপন্যাসটির পটভূমি, কাহিনি নির্মাণ এবং চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে কতখানি গ্রহণযোগ্য তা বিচার করুন।

৩) 'পদ্মানদীর মাঝি'-দের ভাষা এই উপন্যাসে কতখানি বাস্তবানুগ হয়েছে তা দৃষ্টান্ত দিয়ে আলোচনা করুন।

১৬.৮ গ্রন্থপঞ্জি

১) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *পদ্মানদীর মাঝি*, বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৯৯ বঙ্গাব্দ।

২) সরোজমোহন মিত্র, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য*, গ্রন্থালয়, কলকাতা।

৩) নিতাই বসু, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজ জিজ্ঞাসা*, সঞ্জয় প্রকাশন, কলকাতা।

৪) গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : জীবনদৃষ্টি ও শিল্পরীতি*, জি.ই.এ পাবলিশার্স, কলকাতা।

৫) নারায়ণ চৌধুরী, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য-মূল্যায়ন*, বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা।

৬) নারায়ণ চৌধুরী (সম্পা.), *মানিক সাহিত্য সমীক্ষা*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

৭) যুগান্তর চক্রবর্তী, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : দ্বন্দ্বের দুই মুখ*।

৮) সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

মডিউল — ৩
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্প

একক-১৭ □ কাবুলিওয়ালা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গঠন

১৭.১ উদ্দেশ্য

১৭.২ প্রস্তাবনা

১৭.৩ ছোটগল্পকার রবীন্দ্রনাথ : সংক্ষিপ্ত আলোচনা

১৭.৪ গল্পের উৎসের সন্ধানে

১৭.৫ গল্প বিশ্লেষণ

১৭.৬ প্রাসঙ্গিক আলোচনা

১৭.৭ সারাংশ

১৭.৮ অনুশীলনী

১৭.৯ সহায়ক গ্রন্থ

১৭.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে

- ছোটগল্পকার রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে পারবে।
- বিশেষ একটি অসামান্য যুগাতিক্রমী রবীন্দ্র গল্পের সঙ্গে পরিচয় ঘটবে।
- দেশ-কালের গণ্ডীর ঊর্ধ্বে শাশ্বত মানব পরিচয়ের নিগূঢ় সত্যের সঙ্গে শিক্ষার্থীরা পরিচিত হবে।
- উপলব্ধি করতে পারবে গল্পকারের নিজস্ব জীবনবোধ।
- স্নেহ-প্রেম-ভালোবাসার পারস্পরিক বন্ধনের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের মুক্তি চেতনা সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবে।
- সন্তানের প্রতি পিতার স্নেহের স্বরূপ অনুধাবন করতে পারবে।

১৭.২ প্রস্তাবনা

একটি গল্পকে বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গিতে পাঠ করতে গেলে কয়েকটি বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজন— কাহিনি অংশ, চরিত্রনির্মাণ, শিল্পরীতি ও লেখকের নিজস্বতা। এই চারটি বিষয়কে অবলম্বন করে গল্পের অন্দরে প্রবেশ করা হবে। প্রসঙ্গক্রমে চরিত্রের অন্তর্লোকে অবগাহনের মধ্য দিয়ে পিতৃহৃদয়ের বাৎসল্য রস সঞ্জাত পিতা-কন্যার মধুর সম্পর্ক, পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতার জগৎ ও বোধের জগতের সঙ্গে বাস্তবতার সংযোগ অনুসন্ধান করা যাবে।

১৭.৩ ছোটগল্পকার রবীন্দ্রনাথ : সংক্ষিপ্ত আলোচনা

ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য রেনেসাঁসের প্রেরণায় বাংলায় সংঘটিত নবজাগরণের ফলে শিল্প-সাহিত্য-ধর্ম-সমাজ সর্বত্রই ছোঁয়া লাগে পরিবর্তনের, নতুনত্বের। শিল্পের নতুন ধারণায়, আঙ্গিকে বাংলা সাহিত্যে বহুমাত্রিক বৈচিত্র্যের সমাবেশ ঘটে। নাটক-প্রহসন-গীতিকবিতা-উপন্যাস এই শতকের পঞ্চাশ-ষাটের দশক থেকে রচিত হলেও ছোটগল্পের পথ চলা শুরু হয় কিছুটা বিলম্বে। প্রয়াস শুরু হলেও সে যাত্রার প্রকৃত পথিকৃৎ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর লেখনীতেই বাংলা ছোটগল্পের প্রাণ প্রতিষ্ঠা। উনিশ শতকের পৃথিবীর চারজন শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পকারের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অন্যতম। বাকিরা হলেন দ্য মোপাসাঁ, আন্তন চেখভ ও এডগার এ্যালান পো।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প বিষয় ও আঙ্গিক উভয়তই বৈচিত্র্যভাস্বর। তার সঙ্গে মিশেছে প্রচ্ছন্ন কবিসত্তা। গল্পের দেহাবয়বে কখনো 'সাসপেন্স' চিহ্নিত নাট্যধর্মিতা, কোথাও ঘটনা হয়েছে গৌণ, কোথাওবা কাব্য-ব্যঞ্জনার অনুরণনের সংবেদন পাঠক হৃদয়ে তরঙ্গায়িত হতে থাকে নিরন্তর। বিষয় ও শিল্পরূপের সফল সংযোগের মধ্য দিয়ে "নিত্যরূপান্তরশীল জীবন-অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথের চেতনায় বিচ্ছুরিত করেছিল জীবনের গূঢ় তাৎপর্যের বিচিত্র বর্ণালী' "Wonderful mosaics of incident and impression", জীবনবোধের নবীনতা ও গভীরতার রসোত্তীর্ণ প্রকাশে রবীন্দ্র ছোটগল্পের স্ফুটন। 'সংহতি, নিবিড়তা আর গভীরতা তার মৌল স্বভাব।' কবি-নাট্যকার-প্রাবন্ধিক-ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের সার্থক ছোটগল্পকার রূপে আত্মপ্রকাশ "হিতবাদী" পত্রিকায়।

১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতী পত্রিকায় "ভিখারিনী" গল্পটি প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের নিজের ভাষায় এ হল "বকুনির বিনুনি"। এরপর প্রায় দীর্ঘ তেতাল্লিশ বছরে (১৮৯১-১৯৩৩) প্রায় নব্বইটি গল্প রচনা করেছেন। এরও পরে ১৯৪১ পর্যন্ত তাঁর ছোটগল্প লেখার চর্চা চলেছিল। চারখণ্ডের 'গল্পগুচ্ছ', 'সে', 'গল্পস্বল্প', 'তিনসঙ্গী' মিলিয়ে তাঁর গল্প সংখ্যা শতাধিক। 'হিতবাদী', 'সাধনা', 'ভারতী', 'সবুজপত্র' প্রভৃতি পত্রিকার দাবি মেটাতে গিয়ে বাংলার পল্লীজীবন, প্রকৃতির অন্তরঙ্গতা নিরাসক্ত দৃষ্টিতে অভিষিক্ত করে উপস্থাপন করেছেন ছোটগল্পে।

'হিতবাদী' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের লেখা ছয়টি গল্প প্রকাশিত হয়। 'দেনাপাওনা', 'পোস্টমাস্টার', 'গিন্নি', 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা', 'ব্যবধান', 'তারাপ্রসন্নের কীর্তি'। পদ্মালালিত প্রকৃতি ও তীরভূমির মানবজীবন, তাদের সমস্যা, সংকট, দ্বন্দ্ব, নিসর্গের পটভূমিতে একাত্ম হয়ে এসময়ের গল্প দেহ নির্মাণ করেছে। মানুষের আবেগঘন অন্তর্জীবনের রহস্য উন্মোচনে গল্পগুলি অনন্য।

'সাধনা' পত্রিকায় (১২৯৮-১৩০২ বঙ্গাব্দ) প্রকাশিত প্রথম গল্প 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' (১২৯৮ অগ্রহায়ণ)। 'সাধনা-ভারতী' পর্বকে রবীন্দ্র ছোটগল্পের 'স্বর্ণযুগ' বলা যায়। গল্পগুলির বিষয় যেমন বিচিত্র, ভাবও তেমনি বহুধা গতিতে প্রবাহিত। 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন'-এ বাৎসল্যের হৃদয়স্পর্শী করুণচিত্র। 'কঙ্কাল', 'নিশীথে', 'জীবিত ও মৃত' প্রভৃতি গল্পে মনস্তত্ত্বের সুনিপুণ প্রয়োগ। 'কাবুলিওয়ালা'য় বিশ্বজনীন পিতৃহৃদয়ের প্রকাশ। 'স্বর্ণমৃগ', 'ছুটি', 'বিচারক', 'মধ্যবর্তিনী', 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'অতিথি' প্রভৃতি গল্পে মানবহৃদয় রহস্যের বিচিত্র সমাবেশ। রবীন্দ্রনাথের বৃহত্তম গল্প 'নষ্টনীড়' এই পর্বে রচিত। ত্রিকোণ প্রেমের বিয়োগান্তক পরিণতি আশ্চর্য দক্ষতায় পরিবেশিত।

'সবুজপত্র' পর্যায়ের গল্পগুলিতে সামাজিক সমস্যা মুখ্য। এই পর্বের কিছু গল্পে নারীচেতনার নবজাগ্রত রূপ পরিলক্ষিত হয়। 'পয়লা নম্বর', 'স্ত্রীর পত্র' গল্পে রবীন্দ্রনাথের মননদৃপ্ত উপস্থিতি। বৈষ্ণব ধর্মের অন্তঃসার শূন্যতার কাহিনী 'বোষ্টমী'। 'শেষের রাত্রি', 'অপরিচিতা', 'হালদার গোষ্ঠী' প্রভৃতি এ সময়ের উল্লেখযোগ্য গল্প। 'তিনসঙ্গী'

গল্পগ্রন্থের গল্পত্রয় যথাক্রমে 'রবিবার', 'শেষকথা', 'ল্যাবরেটরি'। 'ল্যাবরেটরি' গল্পের সোহিনী চরিত্রে রবীন্দ্রনাথের নারী-চেতনা চরম রূপ লাভ করেছে। 'লিপিকা'র বেশ কিছু রচনা কবিতা ও ছোটোগল্পের মিশ্রণ। 'সে' ও 'গল্পস্বল্পে'র গল্পগুলি আধুনিক অর্থেই ছোটগল্প। এ সময়ের গল্পের মধ্যে কখনো মননশীলতা, কখনো বাল্যস্মৃতির সমাবেশ ভিন্ন স্বাদ বহন করে আনে।

১৭.৪ গল্পের উৎসের সন্ধানে

জীবনের ভুগোল সীমায় রচিত হয়েও দেশ-কালের সকল গণ্ডীকে ছাপিয়ে নির্বিশেষ হয়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলিওয়ালা' ছোটগল্পটি। 'সাধনা' পত্রিকায় ২য় বর্ষ প্রথম সংখ্যায় অর্থাৎ ১২৯৯ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় গল্পটি প্রকাশিত হয়।

'কাবুলিওয়ালা' গল্পটি কল্পনাপ্রসূত নাকি বাস্তব অভিজ্ঞতার ছোঁয়ায় রঞ্জিত? রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রে এ প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করা যেতে পারে। ১৪ আগস্ট, ১৮৯৫ (৩০ শ্রাবণ, ১৩০২) শিলাইদহ থেকে ইন্দিরা দেবীকে লেখা চিঠিতে আছে, ''সাজাদপুরে থাকতে সেখানকার খানসামা একদিন দেরি করে আসাতে আমি রাগ করেছিলুম, সে এসে তার নিত্য-নিয়মিত সেলামটি করে ঈষৎ অবরুদ্ধ কণ্ঠে বললে, 'কাল রাত্রে আমার আট বছরের মেয়েটি মারা গেছে।' এই বলে ঝাড়নটি কাঁধে করে আমার বিছানাপত্র ঝাড়পোঁছ করতে গেল। কঠিন কর্মক্ষেত্রে মর্মান্তিক শোকেও অবসর নেই। অবসর নিয়েই বা ফল কী? কর্ম যদি মানুষকে বৃথা অনুশোচনার বন্ধন থেকে মুক্ত করে সম্মুখের পথে প্রবাহিত করে নিয়ে যেতে পারে, তবে ভালোই তো.... কর্মের এই নিষ্ঠুরতায় মানুষের কঠোর সান্ত্বনা।' অনুরূপ ভাবনার রণন শোনা যায় 'চৈতালি' কাব্যের 'কর্ম' কবিতায়। কবিতাটি লিখেছিলেন ১৮ চৈত্র, ১৩০২। তবু ভাবতে ইচ্ছে করে, এই 'মর্মান্তিক শোক'-এর সংবাদ শুনে এইটেই কি কবি মনের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ছিল? মানবপ্রেমী যে রবীন্দ্রনাথ যৌবনের পদ্মাসনে বসে মানুষের অতলান্ত পরিচয় আবিষ্কার করে চলেছেন? চিঠির অনুভবের পিঠোপিঠি প্রায় কবিতাটি লেখা— একই ভাবনার বিস্তার অপরে। কিন্তু যদি বলি, যে মানুষটিকে প্রয়োজনের তাঁবেদার ভৃত্য ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারেননি তরুণ অনভিজ্ঞ জমিদার, তারই মধ্যে আহত পিতাকে আবিষ্কার করার আর্ত বিস্ময়টুকুর অবচেতনালীন অভিঘাত গল্পের রূপ ধরেছে 'কাবুলিওয়ালা'য় ? রবীন্দ্রনাথ নিজেও তো তখন একাধিক সন্তানের পিতা!

তথ্যের জোড় মেলালে 'কাবুলিওয়ালা' গল্পটিকে নিছক মনগড়া বলে মনে হয় না। রবিজীবনীকারের মতে, গল্পটি অগ্রহায়ণ সংখ্যায় (১২৯৯) প্রকাশিত হলেও লেখা হয়েছিল সম্ভবত আষাঢ়ের আগে। সেদিক থেকে, ছিন্নপত্রের প্রাসঙ্গিক চিঠিটি আরও তিনবছর পরের লেখা শিলাইদহ থেকে। নিবিষ্ট লক্ষ্যে সহজেই বোঝা যায়, কবির চিঠিতে বর্ণিত কাহিনি প্রকৃতপক্ষে স্মৃতিচারণার অনুষঙ্গ অর্থাৎ সাজাদপুর বাসের পুর্বস্মৃতির মন্থন করেছেন চিঠিতে। ১২৯৬ অঘ্রাণ মাস (Nov 1889) থেকে তিনি জমিদারী পরিদর্শনের দায়িত্ব পান। জমিদারি পরিচালনার কাজে তরুণ রবীন্দ্রনাথ সে সময় থেকেই শিলাইদহ, পতিসর ও সাজাদপুরে নিয়মিত যাতায়াত করেছেন। অধিকাংশ সময় তখন কাটছে বোটে, পদ্মার বুকে। কখনো বাস করছেন কুঠিবাড়িতে। সাজাদপুরের কুঠি বাড়িতে বসবাসের বিবরণ পাওয়া যায়, ১২৯৬ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসের শেষ থেকে ফাল্গুন মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত। এসময় রচিত হয় তাঁর 'বিসর্জন' নাটক। এর পরেও ১৮৯১ সালেও হয়ত তিনি সাজাদপুরে কিছুকাল বাস করেছিলেন। একথা মনে করেন রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। আবার ১২৯৯ আষাঢ়ে (1892 Jun) তিনি সাজাদপুরে

কিছুদিন ছিলেন। সাজাদপুর থেকে বলেন্দ্রনাথকে রেজিস্ট্রি ডাকে কয়েকটি লেখা পাঠান। সেগুলির মধ্যে 'কাবুলিওয়ালা' অন্যতম। সেই সঙ্গে গল্পটি পত্রিকায় না পাঠানোর নির্দেশও দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ — 'তোমার কাছে রেখে দিও ওদুটো আপাততঃ ব্যবহারের জন্য নয়।' গল্পটি প্রথম ''ব্যবহার' হল 'সাধনা'র জন্য।

পরে ৭ আশ্বিন ১৩৩৮ (24 Sep 1931) রবীন্দ্রনাথ হেমন্তবালা দেবীর প্রশ্নের উত্তরে তাঁকে লিখেছিলেনঃ ''কাবুলিওয়ালা বাস্তব ঘটনা নয়। মিনি আমার বড়ো মেয়ের আদর্শে রচিত।" তার আগে (Jul 1918) সীতা দেবীকে বলেছিলেন ঃ ''বেলাটা ঠিক অমনি ছিল, মিনির কথা; তার কথাই সব তুলে দিয়েছি।" কিন্তু দিঘাপতিয়ার শরৎকুমার রায় বলেছেন অন্য কথা - ''শুনিয়েছিলাম,কাবুলিওয়ালার ক্ষুদ্রমিনি রবিবাবু তাঁহার বন্ধু রাধারমণ কর মহাশয়ের (সুপ্রসিদ্ধ ডাঃ রাধাগোবিন্দ করের ভ্রাতা) কন্যা মনোরমাকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন।" গবেষকগণ অবশ্য রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যকেই অধিক নির্ভরযোগ্য বলে মনে করেছেন।

পূর্বোক্ত ঘটনার অভিঘাত যে কবিকে কতদুর নাড়া দিয়েছিল, তা বোঝা যায় গল্প রচনার প্রায় বিয়াল্লিশ বছর পর 'সাহিত্যের পথে' প্রবন্ধে এ ঘটনার উল্লেখের মধ্য দিয়ে। ছিলেম মফস্বলে, সেখানে আমার এক চাকর ছিল, তার বুদ্ধি বা চেহারা লক্ষ্য করবার মতো ছিল না। রাত্রে বাড়ি চলে যায়, সকালে এসে ঝাড়ন কাঁধে কাজকর্ম করে। তাঁর প্রধান গুণ, সে কথা বেশি বলে না। সে যে আছে সে তথ্যটা অনুভব করলুম যেদিন সে হল অনুপস্থিত। সকালে দেখি, স্নানের জল তোলা হয়নি, ঝাড়পোঁছ বন্ধ। এল বেলা দশটার কাছাকাছি। বেশ এক রূঢ় স্বরে জিজ্ঞাসা জিজ্ঞাসা করলুম, ''কোথায় ছিলি।" সে বললে, ''আমার মেয়েটি মারা গেছে কাল রাতে" বলেই ঝাড়ন নিয়ে নিঃশব্দে কাজে লেগে গেল। বুকটা ধক করে উঠল। ভৃত্যরূপে যে ছিল প্রয়োজনীয়তার আবরণে ঢাকা, তার আবরণ উঠে গেল; মেয়ের বাপ বলে দেখলুম, আমার সঙ্গে তার স্বরূপের মিল হয়ে গেল....। এই মোমিন মিঞা, একে কী বলব?' এই অনুভূতির বোধ ছুঁয়ে থাকে গল্পকেও।

১৫ ফাল্গুন ১৩০০ বঙ্গাব্দে (২৬ ফেব্রুয়ারী ১৮৯৪) রবীন্দ্রনাথের প্রথম গল্পগ্রন্থ 'ছোট গল্প' প্রকাশিত হয়। গল্পটি এই গ্রন্থভুক্ত হয়। বইটি উৎসর্গ করেন বিহারীলাল গুপ্তকে। ১৩০৭ বঙ্গাব্দে (২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯০০) রবীন্দ্রনাথের প্রথম গল্পগ্রন্থ সংকলনে 'কাবুলিওয়ালা' অন্তর্ভুক্ত হয়। সে সময়ে বইটির মুদ্রিত মূল্য ছিল দুই টাকা। আরও পরে ১৯০৮-০৯ সালে 'গল্পগুচ্ছ' নামে পুনরায় একটি আলাদা বই পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এই সংকলনের দ্বিতীয় খণ্ডে গল্পটি স্থান পায়। ১৯২৬-২৭ সালে (১৩৩৩ বঙ্গাব্দে) পুনরায় ওই একই নামে তিন খণ্ডে গল্প সংকলন প্রকাশিত হয় বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় থেকে। তিনটি খণ্ডে ছিল মোট ৭৯টি গল্প। ১৩৪০ বঙ্গাব্দে 'গল্পগুচ্ছ'-এর এই তিনটি খণ্ডের সামান্য পরিবর্তন করে বর্তমান রূপ দেওয়া হয়।

১৭.৫ গল্প বিশ্লেষণ

ছেলেবেলা থেকেই রবীন্দ্র-মানসে মুক্তির বোধ, মানববিশ্বের উদার প্রাঙ্গণতলে উপনীত হওয়ার বোধ ছিল জাগ্রত। ''নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' বা 'দুই পাখি' কবিতার কথা প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়ে। পদ্মাবিজরিত পল্লীপ্রকৃতি, পল্লীজীবন 'প্রভাত পাখির গান' হয়ে কবি রবীন্দ্রনাথের কথাশিল্পী সত্তাকে উন্মুক্ত করেছে। প্রখ্যাত রবীন্দ্র সমালোচকের কথায়, ''গ্রামের সান্নিধ্য লাভ করার অনেক আগেই রবীন্দ্রনাথের মনে জেগে উঠেছিল বিরাট মানববিশ্বের সান্নিধ্য লাভের নিগূঢ় আকাঙ্ক্ষা। পূর্ববঙ্গের পল্লীর মানুষদের সংস্পর্শ পেয়ে তাঁর সেই আকাঙ্ক্ষা প্রাথমিক ভাবে চরিতার্থ হয়েছে বটে, কিন্তু সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ববঙ্গের ঐ পল্লীর মানুষদের মধ্যেই নিঃশেষিত হয়ে যায়নি। বরং পল্লীর ক্ষুদ্র

দেশকালের গণ্ডির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যে মানববিশ্বকে দেখেছেন, অনিঃশেষ বিস্ময়ে তিনি সেই মানববিশ্বকেই দেখতে চেয়েছেন পল্লীকে অতিক্রম করা বৃহত্তর দেশকালের পটভূমিকায়"। 'কাবুলিওয়ালা' গল্পটি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। গল্পের পটভূমি শহর কলকাতা। সেকারণেই পূর্ববঙ্গের গ্রামাঞ্চল এই সময়ে লেখা রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি গল্পকে উদ্দীপিত করে তুললেও শুধু সেই কারণেই রবীন্দ্রনাথের "এই সময়কার গল্পগুলি বিশেষ অর্থে গ্রামীণ কিংবা আঞ্চলিক হয়ে ওঠেনি। সর্বকালের সর্বস্তরের মানুষের এক চিরন্তন আকুতির সূত্রে 'কাবুলিওয়ালা' গল্পটি শাশ্বত মানব পরিচয়কে মালা করে গেঁথেছে। প্রায় একই সময়ে লিখিত "পঞ্চভূত" —এর 'বৈষ্ণব-কবিতা' প্রবন্ধে এই মনোভাব সুব্যক্ত হয়েছে: "যাহাকে আমরা ভালোবাসি কেবল তারই মধ্যে আমরা অনন্তের পরিচয় পাই। এমন কি জীবের মধ্যে অনন্তকে অনুভব করারই নাম ভালবাসা।" 'কাবুলিওয়ালা' গল্পে প্রেমের সেই অনন্তরূপের প্রকাশ।

'কাবুলিওয়ালা' গল্পটি উত্তমপুরুষের জবানীতে লেখা। উত্তমপুরুষে লেখা রবীন্দ্র গল্পগুলিতে দুটি বিশেষ দৃষ্টিকোণের সন্ধান মেলে। প্রথমটি হল, বহিরঙ্গ অবস্থান। দর্শকের দৃষ্টিতে ঘটনার নিরীক্ষণ ও বর্ণনা। দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত অবস্থান। অর্থাৎ কথক নিজেই involve হয়ে যান কাহিনির সঙ্গে, গল্পের চরিত্রে রূপান্তরিত হন। 'কাবুলিওয়ালা' গল্পের দ্বিতীয় ধরনটির প্রয়োগ। গল্প কথক এখানে মিনির পিতা। যিনি পেশায় লেখক। লেখক কন্যা মিনি 'পঞ্চমবর্ষীয়া' বালিকা। পাঁচ বছরের বালিকার শিশু সুলভ চাপল্য, দুরন্তপনা, উচ্ছ্বল স্বভাবের বর্ণনা দিয়ে গল্পের সূচনা। 'একদণ্ড' কথা না বলে মিনি থাকতে পারে না। ছোট মিনির মিষ্টি কথার ফুলঝুড়ির মধ্যে দিয়ে স্নেহের বাতাবরণ নির্মাণ করলেন কথক। একই সঙ্গে পিতা-কন্যার সম্পর্কের মধুরিমা কাহিনির লক্ষ্য বা কেন্দ্রবিন্দু নির্ধারণ করে দিল। ছোটগল্পের এই সংহত, সংযত অভিনিবেশ একান্ত কাম্য। ছোটগল্পের রচয়িতা রূপে রবীন্দ্রনাথ এ গল্পে সেই লক্ষ্যে অর্জুনের দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন। মিনির প্রসঙ্গে বাৎসল্যের উৎসার। সন্তানের প্রতি পিতা-মাতা উভয়ের ভালোবাসাই সুতীব্র অথচ গভীর। উভয়ের স্নেহধারা বাহ্যত একই মনে হলেও একটু নজর করলে বোঝা যায়, পিতার স্নেহে মিশে থাকে প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয়। "তাহার মা অনেক সময় ধমক দিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দেয়, কিন্তু আমি তাহা পারি না'। এই সরল স্বীকারোক্তির মধ্য দিয়ে মিনির প্রতি কথক পিতার হার্দ্য অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ। সেকারণেই মিনির আগলহীন সহজ কথার যথার্থ শ্রোতা তিনিই। পিতার সঙ্গেই মিনির সৌহার্দ্য অধিক। বাল্যের অর্থহীন সংলাপের মধ্যে থাকা সারল্য ও মিষ্টতা হৃদয় স্পর্শ করে আবালবৃদ্ধবনিতার। "বাবা, রামদয়াল দারোয়ান কাককে কৌয়া বলছিল, সে কিচ্ছু জানে না। না?" কিংবা "দেখো বাবা, ভোলা বলছিল আকাশে হাতি শুঁড় দিয়ে জল ফেলে, তাই বৃষ্টি হয়। মাগো, ভোলা এত মিছিমিছি বকতে পারে। কেবলই বলে, দিনরাত বকে।" —এসব সংলাপের সাহায্যে গল্পকার তৈরি করে দেন মিনির চরিত্রটি। অকৃত্রিম সারল্য ও প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর মিনি রবীন্দ্রনাথের অনন্যসৃষ্টি।

মিনির পিতা লেখক। নভেল লেখেন। লেখা পৌঁছেছে 'সপ্তদশ পরিচ্ছেদে'। "প্রতাপসিংহ তখন কাঞ্চনমালাকে লইয়া অন্ধকার রাত্রে কারাগারের উচ্চ বাতায়ন হইতে নিম্নবর্তী নদীর জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িতেছেন।" টেবিলের পাশে চলছে মিনির 'আগডুম বাগডুম' খেলা। রবীন্দ্রনাথ কল্পনা সর্বস্ব দুঃসাহসিক রোমান্সের প্রতি কি কটাক্ষ করলেন? নভেলের মধ্যে রোমান্সের বর্ণবহুল, বীরোচিত বিকাশের সঙ্গে উঁচু সুরে বাঁধা ঝংকারগুলি মধ্যবিত্ত জীবনের বাস্তব থেকে দূরগামী। বিশেষত "আগডুম বাগডুম" শব্দটি যেখানে অর্থহীন, মিথ্যা প্রগলভতা বোঝাতেও ব্যবহার করা হয়। কিন্তু রোমান্সের আবহ দানা বাঁধবার আগেই বাস্তবতার ধাক্কায় কথকের কল্পনা থেকে তার বিদায় ঘণ্টা ধ্বনিত হল মিনির সঙ্গে কাবুলিওয়ালার সাক্ষাতে।

কথকের বাড়ি 'পথের ধারে'। মিনির ডাকে পথ থেকে বাড়িতে কাবুলিওয়ালার আগমন ঘটল। গল্পে কাবুলিওয়ালার বেশভূষা ও দৈহিক চিত্রটি বাস্তবানুগ। ময়লা ঢিলা কাপড় পরা, পাগড়ি মাথায়, ঝুলি ঘাড়ে, হাতে গোটা দুই-চার আঙুরের বাক্স, এক লম্বা কাবুলিওয়ালা'র 'মৃদুমন্দ গমনে' পথচলার দৃশ্যটি একালে খুব সহজলভ্য না হলেও চলচ্চিত্রের গুণে কাবুলিওয়ালার সাজে ছবি বিশ্বাসকে সাধারণ পাঠকের মনে পড়তে পারে। তবে রবীন্দ্রনাথ স্বচক্ষে কাবুলিওয়ালা দেখেছিলেন বাল্যকালে। তাঁর 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে আছে, 'ঝোলাঝুলিওয়ালা ঢিলাঢালা ময়লা পায়জামা-পরা বিপুলাকায়' কাবুলিওয়ালার কথা। প্রায় হুবহু একই চেহারায় ও পোশাকে ছেলেবেলার স্মৃতি থেকে উঠে আসা কাবুলিওয়ালাই সম্ভবত রহমত নামে স্থান পেয়েছে রবীন্দ্র ছোটগল্পে। কাবুলিওয়ালার সঙ্গে মিনির প্রথম পরিচয়ের ঘটনাটির মধ্যে শিশুর কার্য-কারণবিহীন আচরণের নির্ভুল অভিজ্ঞতা সঞ্চারিত করেছে বাৎসল্যের মাধুর্য। 'ঊর্ধ্বশ্বাসে' কাবুলিওয়ালাকে ডাকাডাকির পর তার আগমনের ইঙ্গিত পেয়েই আবার 'ঊর্ধ্বশ্বাসে' মিনির 'অন্তঃপুরে দৌড়'-এর চিত্র একেবারে সিনেমাটোগ্রাফিক ভঙ্গিমায় উপস্থাপিত হয়েছে। প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর মিনির এজাতীয় আচরণে পাঠক যেমন আনন্দ পায়, তেমনি বর্ণনার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায় নাটকীয়তা। মিনি এই আচরণও রবীন্দ্র স্মৃতি থেকে সংগৃহীত। ছেলেবেলায় কাবুলিওয়ালা ছোট রবির কাছে ছিল 'ভীতিমিশ্রিত রহস্যের সামগ্রী।' মিনির আচরণেও অনুরূপ ভীতি — ''তাহার মনের মধ্যে একটা অন্ধ বিশ্বাসের মতো ছিল যে, ওই ঝুলিটার ভিতর সন্ধান করিলে তাহার মতো দুটো-চারটে মানবসন্তান পাওয়া যাইতে পারে।"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ অসমাপ্ত রেখে মিনির পরিবর্তে কাবুলিওয়ালার সঙ্গে বার্তালাপ জুড়তে হল কথককেই। 'লোকটাকে ঘরে' ডেকে এনে 'কিছু না কেনাটা ভালো' দেখায় না যেমন, তেমনি এ আচরণ ভদ্রলোকের দৈনন্দিন যাপন স্বভাবের মধ্যেও পড়ে। কাবুলিওয়ালার সঙ্গে 'আবদর রহমান, রুশ, ইংরাজ' প্রভৃতির 'সীমান্ত-নীতি' নিয়ে কথকের কথা চলতে লাগল। কথকের এই ব্যবহারের মধ্যে লেখক বাঙালি মধ্যবিত্তের স্বভাব বৈশিষ্ট্যটি তুলে ধরেছেন সূক্ষ্মভাবে। ভদ্রতার পাশাপাশি রাজনীতি প্রসঙ্গে স্বভাবজ আকর্ষণের দিকটি লেখকের নজর এড়ায়নি। আবদর রহমান বা আবদুর রহমান খান ছিলেন ১৮৮০ খ্রীঃ থেকে ১৯০১ খ্রীঃ পর্যন্ত আফগানিস্থানের আমির। তিনি শের আলি খানের কাছে পরাজিত হয়ে তাশখন্দে নির্বাসিত হন। তখন অঞ্চলটি ছিল রুশদের অধীনে। দ্বিতীয় ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধের পর তিনি আফগানদের সংগঠিত করেন। ১৮৮০ খ্রীঃ আবদুর রহমান আফগানিস্থানে ফিরে এলে লর্ড লিটন শর্তসাপেক্ষে তাঁকে আমির হিসেবে মেনে নেয়। ১৮৮১ খ্রীঃ ব্রিটিশরা কান্দাহার প্রত্যর্পণ করে। রবীন্দ্রনাথের কালচেতনার ছাপটি গল্পে স্পষ্ট 'সীমান্তনীতি' প্রসঙ্গ অবতারণার মধ্য দিয়ে। কথক কাবুলিওয়ালার সঙ্গে 'সীমান্তনীতি'র আলোচনায় সময় ব্যয় করলেও কাবুলিওয়ালার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল ছোট্ট মিনির সঙ্গে সাক্ষাৎ। কথক কর্তৃক সন্তানের অমূলক ভয় ভাঙানোর চেষ্টার চিত্রটিও বাস্তবিক। তিনি মিনিকে অন্তঃপুর থেকে ডেকে আনলেন। মিনি কথকের গা ঘেঁষে 'কাবুলির মুখ' এবং 'ঝুলির' প্রতি 'সন্দিগ্ধ নেত্রক্ষেপ' করে দাঁড়িয়ে রইল। ''কাবুলি, ঝুলির মধ্য হইতে কিসমিস, খোবানি বাহির করিয়া তাহাকে দিতে গেল, সে কিছুতেই লইল না, দ্বিগুণ সন্দেহের সহিত আমার হাঁটুর কাছে সংলগ্ন হইয়া রহিল।' তাদের প্রথম পরিচয় এভাবেই। অপরিচিতের কাছে আসার ক্ষেত্রে সংকোচ ভয় মিশ্রিত আচরণে গল্পকার যেমন বাস্তবতার অনুসরণ করেছেন, তেমনি শিশু মনস্তত্ত্বের সফল প্রয়োগ ঘটিয়েছেন।

প্রথম পরিচয়ের সন্দেহ অবশ্য দূর হতে বেশি সময় লাগেনি। কিছুদিনের মধ্যে মিনি ও কাবুলিওয়ালার প্রগাঢ় পরিচয়ের প্রমাণ পেলেন কথক। 'পঞ্চবর্ষীয়' মিনি কাবুলিওয়ালার মধ্যে এক ধৈর্যবান শ্রোতাকে আবিষ্কার করেছিল। বাবা ছাড়া তার অনর্গল কথার এমন শ্রোতা আর কখনও সে পায়নি। ফলে পরিচয় গাঢ় হতে বিশেষ সময়

লাগেনি। কথকের অজ্ঞাতেই তাদের মধ্যেকার পরিচয় বহু সাক্ষাতে গভীর হয়ে উঠেছে। তাই 'বাদাম-কিসমিসে'র মূল্য স্বরূপ কথকের দেওয়া আধুলি ফিরে আসে মিনির হাতে। কারণ মিনিকে বাদাম-পেস্তা-কিসমিস দেওয়ার মধ্যে সওদা নেই। আছে আন্তরিক ভালোবাসা, হৃদ্যতা। তার টানেই বাদাম-পেস্তার ঘুষ দিয়ে মিনির ক্ষুদ্র লুব্ধ হৃদয়টুকু অনেকটা অধিকার করে নেয় রহমত।

রহমত ও মিনির অসম বন্ধুতার নিগূঢ় রসটি বাৎসল্য। সংসারের সকল কালিমা মুক্ত, স্বার্থহীন সম্পর্কের বন্ধনে তারা আবদ্ধ। দুই বন্ধুর কৌতুকের, ঠাট্টা-তামাশার কিছু নিজস্বতা ছিল। সম্পর্কের সরলতা ও গভীরতা প্রকাশ পায় এই নিজস্বতায়। রহমতকে দেখা মাত্র মিনি হাসতে হাসতে জানতে চাইত, ''কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা, তোমার ও ঝুলির ভিতর কী।" রহমত 'অনাবশ্যক চন্দ্রবিন্দু' যোগ করে উত্তর দিত 'হাঁতি।' এই সামান্য সংলাপে সূক্ষ্ম হাস্যরসের অন্বেষণ বৃথা। তবে অনাবশ্যক আনন্দ পরিহাসের বিচ্ছুরণে মিনির প্রতি রহমতের প্রগাঢ় বাৎসল্যের পরিচয় মেলে। তাদের মধ্যে প্রচলিত দ্বিতীয় পরিহাসটি গভীর ব্যঞ্জনাবাহী। রহমত মিনিকে বলত, ''খোঁখী, তোমি সসুরবাড়ি কখুনু যাবে না।" 'সসুরবাড়ির অর্থ মিনি তখনও বুঝত না। অথচ চুপ করে থাকাও তার স্বভাব বিরুদ্ধ। সে উল্টে প্রশ্ন করত রহমতকে, 'তুমি শ্বশুরবাড়ি যাবে?' প্রত্যুত্তরে রহমতের শূন্যে মুষ্ঠি আস্ফালন করে বলা, 'হামি সসুরকে মারবে' মিনির হাসি উদ্রেক করত। শ্বশুর নামক অপরিচিত জীবের দুরবস্থায় মিনি কৌতুক অনুভব করত। কাবুলিওয়ালা ও মিনির এই সহজ-সুন্দর স্নিগ্ধ হাস্যালাপ শরতের শুভ্র পটভূমিতে ঐশ্বরিক আনন্দের উৎসমুখ উন্মোচিত করেছে। কিন্তু তাদের এই হাস্য-কৌতুক, মধুর সময় দীর্ঘস্থায়ী নয়। শরতের দাবদাহহীন, প্রবলবর্ষণহীন শুভ্র সুন্দর উজ্জ্বল সময়ের মতোই ক্ষণস্থায়ী। ক্ষণস্থায়িত্ব বোঝাতেই বোধ হয় গল্পকার শরৎ ঋতুর অনুপ্রবেশ ঘটালেন কাহিনি বিন্যাসে। অন্য কোন ঋতুর আবহে সম্পর্কের এ সুর মূর্ছনা যথার্থ হত।

মিনির সঙ্গে কাবুলিওয়ালার অসম বন্ধুত্ব মিনির মা"কে শঙ্কিত করত। বস্তুত তিনি ছিলেন 'শঙ্কিত স্বভাবের'। রহমত সম্পর্কে তাঁর সম্পূর্ণ নিঃসংশয় না হওয়ার প্রকৃত কারণ স্নেহ। সন্তানের প্রতি স্নেহ বশতই তিনি অমূলক সন্দেহের দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেন রহমতের প্রতি। সীমিত কয়েকটি শব্দ ব্যবহারের দ্বারা সংযত সীমায়িত প্রকাশে 'মিনির মা'-এর স্নেহপ্রবণ মাতৃরূপটি আভাসিত। মায়ের স্নেহ ব্যাকুল চিত্ত সন্তানের সুরক্ষা চিন্তায় কতই না বিচিত্র কল্পনায় শঙ্কিত হয়। আশঙ্কিত চিত্তে যে প্রশ্নের উদয় হয়েছে তা নিতান্ত অযৌক্তিক নয়। তিনি তিনটি প্রশ্ন পর্যায়ক্রমে কথকের অর্থাৎ মিনির পিতার সম্মুখে উত্থাপন করেছিলেন। ''কখনও কি কাহারও ছেলে চুরি যায় না। কাবুলদেশে কি দাস-ব্যবস্থা প্রচলিত নাই। একজন প্রকাণ্ড কাবুলির পক্ষে একটি ছোটো ছেলে চুরি করিয়া লইয়া যাওয়া একেবারেই কি অসম্ভব।" শঙ্কিত মাতৃহৃদয়ের যুক্তি জাল কথকের পক্ষে ছিন্ন করা অসম্ভব হলেও রহমতকে চিনতে তাঁর ভুল হয়নি। স্নেহপ্রবণ পিতৃসত্তার উপস্থিতি কথক হয়তো অনুভব করতে পেরেছিলেন। তাই মিনির মায়ের যুক্তির খণ্ডন যেমন করতে পারলেন না তেমনি রহমতকে অবিশ্বাস করতেও পারলেন না। বিনা দোষে রহমতকে বাড়িতে আসতে নিষেধও করলেন না। ইতিপূর্বে রহমতের থেকে আধুলি নেওয়ার জন্য মিনিকে মায়ের ভর্ৎসনা শুনতে হয়েছিল। সে ঘটনাতেও যেমন রহমতের স্নেহাতুর পিতৃহৃদয়ের ছবি ফুটে ওঠে, তেমনি অপরিচিতের প্রতি সহজ সন্দেহ, অবিশ্বাসে মিনির প্রতি মায়ের শঙ্কা মিশ্রিত স্নেহের ইঙ্গিত পাওয়া যায় এবং প্রকাশিত হয় রহমতের প্রতি কথকের বিশ্বাস। প্রকৃতপক্ষে মিনিকে কেন্দ্র করে মিনির মা, পিতা ও পার্বত্যবাসী কাবুলিওয়ালা রহমতের স্নেহপরবশ হৃদয় চিত্রের বিচিত্র গতিধারা গল্পদেহে প্রবহমান।

রহমত ব্যবসায়ী। পেশার তাগিদেই তার কলকাতায় বাস। প্রতি বছর মাঘের মাঝামাঝি সে দেশে ফিরে যায়। এই সময়টা পাওনা টাকা আদায়ে সে বড়ো ব্যস্ত থাকে। তবুও মিনিকে একবার 'দর্শন' দিয়ে যায়। এ কি শুধু

'দর্শন'? এই সাক্ষাতের মধ্যে আছে অন্তর্লীন স্নেহ, শিশুর প্রতি ভালোবাসার টান, যা চূড়ান্ত কর্ম ব্যস্ততার মধ্যেও হীরকদ্যুতির ন্যায় থাকে জাজ্বল্যমান। 'সকালে' যেদিন রহমত আসতে পারে না, সেদিন সে 'সন্ধ্যায়' উপস্থিত হয়। 'অন্ধকারে ঘরের কোণে সেই ঢিলেঢালা জামা পায়জামা পরা সেই ঝোলাঝুলিওয়ালা লম্বা লোকটাকে দেখিলে বাস্তবিক হঠাৎ মনের ভিতরে একটা আশঙ্কা উপস্থিত হয়।' অর্থাৎ মিনির মায়ের আশঙ্কা সঞ্চারিত হয় মিনির পিতার মধ্যেও। বিশালদেহী কাবুলি রহমতের দীর্ঘ কায়া গড়পড়তা বাঙালির থেকে পৃথক। তাই কি এই আশঙ্কা? কিন্তু কথকের মনে এ আশঙ্কা স্থায়ী হয় না। যখন মিনি 'কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা' বলে হাসতে হাসতে ছুটে আসে, এবং দুই অসমবয়সী বন্ধুর সরল পরিহাস চলতে থাকে, তখন আশঙ্কা দূরীভূত হয়ে কথকের হৃদয় প্রসন্ন হয়ে ওঠে।

'কাবুলিওয়ালা' গল্পটিতে তিনটি স্তর লক্ষ করা যায়। প্রথম স্তরটিতে কাবুলিওয়ালা ও মিনির সরল হাস্য-পরিহাসময় বন্ধুত্ব স্থাপনার কথা। গল্পের দ্বিতীয় অংশ বা দ্বিতীয় স্তরে কাবুলিওয়ালার জীবনে বিপর্যয় নেমে আসে। ছেদ পড়ে বন্ধুত্বে। সময়টা শীতের। অর্থাৎ শরতের প্রসন্নতা আর নেই। গল্পকার প্রকৃতির পট পরিবর্তনের মাধ্যমে কাহিনির বাঁক পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিলেন। ''বিদায় লইবার পূর্বে আজ দুই-তিনদিন হইতে শীতটা খুব কনকনে হইয়া উঠিয়াছে, চারিদিকে একেবারে হাঁহীকার পড়িয়াছে।' 'বিদায় লইবার পুর্বে বাক্যাংশটি লক্ষণীয়। অর্থাৎ কাহিনির মধ্যেও বিদায়ের সুর ধ্বনিত হয়ে উঠল প্রকৃতির আবহে। কনকনে ঠান্ডার মধ্যে জানলা দিয়ে মিঠে রোদ্দুর এসে পড়েছে কথকের টেবিলের নীচে পায়ের উপরে। সময় 'আটটা' হবে। অর্থাৎ সকালের মধুর উত্তাপের উপভোগ্য রেশ ছড়িয়ে দিলেন লেখক। কিন্তু পূর্বেই বিদায়ের ইঙ্গিত দিয়েছেন। পরমুহূর্তেই 'রাস্তায় ভারি গোল শুনা গেল।' অর্থাৎ স্নিগ্ধতার আবেশ ছিন্ন হয়ে গেল রুক্ষ বাস্তবের অভিঘাতে। দেখা গেল, ''আমাদের রহমতকে দুই পাহারাওয়ালা বাঁধিয়া লইয়া আসিতেছে''। 'আমাদের রহমতকে' বাক্যাংশে অপরিচয়ের দূরত্ব অতিক্রম করে কথকের পরিবারের সঙ্গে বিশেষত মিনির সঙ্গে হৃদ্যতার সূত্রে গড়ে ওঠা সহজ সম্পর্কের ঐকান্তিকতার পাশাপাশি তাকে আপন করে নেওয়ার মধ্যেকার নিবিড়তার স্পষ্ট ইঙ্গিত। ''রহমতের গাত্রবস্ত্রে রক্ত চিহ্ন এবং একজন পাহারাওয়ালার হাতে রক্তাক্ত ছোরা।'' কথক এই দৃশ্যাভিঘাতে ঘরের মধ্যে স্থির হয়ে থাকতে পারেননি। পথে নেমে ঘটনার বৃত্তান্ত জেনেছেন। অর্থাৎ পরিচিত আত্মীয়ের বিপদে তার পাশে ছুটে গেছেন। এর মধ্যে কৌতুহল অপেক্ষা উদ্বেগ অধিক অনুভূত হয়। রামপুরী চাদরের জন্য ধারিত ব্যক্তি রহমতের দেনা অস্বীকার করলে, উভয়ের মধ্যে বচসার সময় রহমত তাকে ছুরিকাঘাতে আহত করে। রহমতের আওয়াজ শুনে মিনি ঘর থেকে বেরিয়ে এলেও তাদের নিত্যপরিহাসের আলাপ পরিবর্তিত পটভূমিতে জমতে পারে না। সাংঘাতিক আঘাত করার অপরাধে রহমতের কারাদণ্ড হয়।

সময় বড়ই বিস্মৃতিপ্রবণ। সময়ের সঙ্গে মিনি ও তার পরিবারের সকলের বিস্মৃতির অতলে চলে যায় রহমত। ''তাহার কথা সকলে একপ্রকার ভুলিয়া গেলাম। একজন স্বাধীন পর্বতচারী পুরুষ কারাপ্রাচীরের মধ্যে যে কেমন করিয়া বর্ষযাপন করিতেছে, তাহা আমাদের মনেও উদয় হইত না। কথকের এই সহজ স্বীকারোক্তি সাধারণ মানুষের মনের স্বাভাবিক প্রবণতাকেই ইঙ্গিত করে। একজন শিশুর পক্ষে খেলার সঙ্গীর দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে পরিবর্ত সঙ্গী অন্বেষণও তেমনই স্বাভাবিক। তাই রহমতকে বিস্তৃত হয়ে প্রথমে 'নবী সহিস' পরে 'সখার পরিবর্তে' 'সখী'দের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের মধ্যে দ্রুত কালাতিপাত ও মিনির বেড়ে ওঠাকে সংহত ভঙ্গিমায়, দু-একটি বাক্যপ্রয়োগে নিবদ্ধ করেছেন গল্পকার। এ কেবল মিনির বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া নয়। বন্ধুত্ব নির্বাচনের মধ্যে তার মধ্যে জেগে ওঠা নারীত্বের বোধ, পিতার সঙ্গে তৈরি হওয়া স্বাভাবিক দূরত্বটুকুর সার্থক প্রকাশে লেখকের সচেতনতা বোধ ও শৈশব

আচরণের প্রতি অভিনিবেশ নজর কাড়ে।

এরপরেই প্রলম্বিত কালসীমা বোঝাতে পৃথক পঙক্তি বিন্যাস করা হয়েছে। শুরুতেই দেখি 'কত বৎসর কাটিয়া গেল। আর-একটি শরৎকাল আসিয়াছে।' অর্থাৎ গল্পের তৃতীয় স্তরের অবতারণা। খুঁটিয়ে পড়লে দেখা যাবে আট বছর সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। 'আমার মিনির বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে।' মিনির বিবাহের সংবাদে কাহিনি নতুন মোড় নিয়েছে। 'আমার মিনির' শব্দবন্ধের মধ্যেও বয়ঃপ্রাপ্ত মিনির প্রতি কথকের স্নেহ বর্ষিত হচ্ছে। মিনির বিবাহ হবে পূজার ছুটির মধ্যে। এই সংবাদ পরিবেশনের অনতিপরেই সানাইয়ে 'ভৈরব রাগিণী'র সুরে আসন্ন বিচ্ছেদ ব্যাথার বিশ্বজগৎময় ব্যাপ্তির মধ্য দিয়ে পাঠককে উপস্থিত করেছেন একেবারে বিবাহের দিনটিতে। 'আজ আমার মিনির বিবাহ' অর্থাৎ অতি দ্রুত ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে অভীষ্ট উদ্দেশ্যে পৌঁছনোর প্রয়াস। বিবাহের আয়োজনে, গৃহে লোক সমাগমে, বিচিত্র ধ্বনিতে মুখর দিনটিকে বিশেষায়িত করতে শব্দছবি নির্মাণ করা হয়েছে। 'উঠানে বাঁশ' বেঁধে 'পাল খাটানো' চলছে, 'বাড়ির ঘরে ঘরে' 'বারান্দায় ঝাড়', টাঙানোর 'ঠুংঠাং' শব্দে, লোকজনের 'হাঁকডাকে'র আওয়াজে উৎসব মগ্ন গৃহছবিতে মধ্যবিত্ত গৃহস্থের আনন্দমুখর বিবাহদিনটিকে গল্পকার শৈল্পিক দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন।

মিনির বিবাহ উৎসবের প্রাঞ্জলতার মধ্যে দীর্ঘ কয়েকবছরের কারাবাস উত্তীর্ণ করে রহমত কাবুলিওয়ালার পুনরাগমন। বিবাহের ব্যস্ততার মধ্যে, হিসেবের খাতার প্রতি মনোযোগ উপেক্ষা করে সেলাম জানানো রহমতকে চেনা কয়েকমুহূর্তের জন্য সম্ভব হয়নি কথকের পক্ষে। তাছাড়া সঙ্গে পুরোনো পরিচিত 'ঝুলি'টি নেই, 'সে লম্বা চুল' নেই, নেই 'শরীরের পূর্বের তেজ'। অর্থাৎ কারাদণ্ড জনিত মানসিক ও শারীরিক ধকল স্পষ্ট রহমতের চেহারায়। কেবল হাসির দ্বারা কথক চিনতে পারলেন বিস্মৃতির অতলে চলে যাওয়া পরিচিত মানুষটিকে। কথক বললেন, 'কী রে রহমত, কবে আসিলি?' ক্রিয়াপদটি লক্ষ করার মতো। 'আসিলি' অর্থাৎ সম্বোধনে তুই-তোকারি, যা সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতারও পরিচায়ক। ইতিপূর্বে রহমতের সঙ্গে কথকের কথোপকথনে 'দিয়াছ' বা 'দিয়ো না' অর্থাৎ 'তুমি'র দূরত্ব ছিল। 'আমাদের রহমত' রূপে পরিচয় দেওয়ার মধ্যে যে হৃদ্যতার ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল, দীর্ঘ আট বছর সময় অতিক্রম করেও তা অটুট। একথা বোঝাতেই কি ক্রিয়াপদের এরূপ প্রয়োগ? কিন্তু রহমতের মুখে 'জেল থেকে খালাস পাওয়ার কথা শুনেই প্রথাগত সংস্কার মাথা চাড়া দিয়েছে। চমকে উঠেছেন তিনি। 'জেল হইতে খালাস পাইয়াছি' কানে বিসদৃশ ঠেকেছে। 'ইহাকে দেখিয়া সমস্ত অন্তঃকরণ যেন সংকুচিত হইয়া গেল।..... আজিকার শুভদিনে এ লোকটা এখান হইতে গেলেই ভালো হয়।' 'আমাদের রহমত' তখন আর পরিচিত আত্মীয়তার ঘনিষ্ঠতায় আবদ্ধ কেউ নয়। তার পরিচয় কেবল 'খুনী'। সহজাত স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়ায় শুভ-অশুভ সংস্কারে বিশ্বাসী কথকের গৃহস্থ সত্তাটি উন্মোচিত হয়েছে। ব্যস্ততার অজুহাতে রহমতকে ফিরিয়ে দিতেও উদ্যত হয়েছেন। খেয়াল করলে দেখা যায়, রহমত দুবার দ্বার পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েও ফিরে এসেছে। প্রথমবার, 'খোঁখীকে' দেখতে চেয়ে। দ্বিতীয়বার, খোঁখীর জন্য চেয়ে চিন্তে সংগ্রহ করে আনা 'আঙুর এবং কিঞ্চিৎ কিসমিস বাদাম' দিতে। এসব উপহার তার স্নেহের পরিচয়। তা অমূল্য। সে কখনোই এই উপহারের অর্থ মূল্য নেয়নি। পূর্বের আধুলি সে মিনিকে ফিরিয়ে দিয়েছিল। এবারে সে স্পষ্টই জানিয়েছে, তার উপহার 'সওদা' নয়। প্রকাশ হয়েছে তার অকারণ স্নেহের প্রকৃত রহস্য। তার নিজের কন্যার হাতের ছাপ বুক পকেট থেকে সযত্নে বের করে রেখেছে কথকের টেবিলে। 'সযত্নে' শব্দটি লক্ষ্য করার মতো। দীর্ঘ আট বছরেরও বেশি সময় ধরে যত্নের সঙ্গে এই 'হাতের ছাপ'টি 'বুক পকেটে' রাখার মধ্যে স্নেহাতুর পিতৃ হৃদয়ের মরমী চিত্র এঁকে দিলেন গল্পকার। 'ফটোগ্রাফ' নয়, হাতে ভুষোকালি লাগিয়ে কাগজে তার ছাপ নেওয়া। স্মরণ চিহ্নটুকুর মধ্যে থাকা সন্তানের স্পর্শ, সুখের নিবিড় অনুভূতি হয়ে 'বিরাট বিরহী বক্ষের মধ্যে

সুধা সঞ্চার করে রাখে। তার অনুভূতি কথকের হৃদয়কেও নাড়া দিয়েছে। তিনি অনুভব করেছেন, "সেও পিতা, আমিও পিতা।" অর্থাৎ শুভ-অশুভ সংস্কারের সংকীর্ণ সীমার ঊর্ধ্বে স্নেহাতুর দুটি পিতৃহৃদয় এক সরলরেখায় মিলেছে।

নবজাগ্রত পিতৃত্ববোধে কথক রহমতের সঙ্গে একাত্ম অনুভব করেছেন। তাই বাড়ির অন্যান্যদের অমত সত্ত্বেও মিনির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়েছেন। কিন্তু সময়ের দুশ্চর সীমা অতিক্রম করে রহমতের সঙ্গে মিনির পুরোনো সখ্যতা নতুনভাবে জমে ওঠেনি। তা সম্ভব ছিল না। কারণ নারীত্বের জাগরণে কন্যা ও পিতার স্নেহ সম্পর্কের মধ্যে সৃষ্টি হয় স্বাভাবিক ব্যবধান। তারই বেদনার্ত অনুভূতিতে কথক ও রহমত এক বিন্দুতে উপনীত হয়েছে। শ্বশুরবাড়ির কথায় বধূবেশিনী সলজ্জ মিনির অন্তঃপুরে প্রবেশ, রহমতের নিজের কন্যারও বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার সত্যতা সম্পর্কে অবহিত করে। দীর্ঘ আট বছরে যা তার কল্পনাতেও আসেনি। "সে হঠাৎ স্পষ্ট বুঝিতে পারিল, তাহার মেয়েটিও ইতিমধ্যে এইরূপ বড়ো হইয়াছে, তাহার সঙ্গেও আবার নূতন আলাপ করিতে হইবে— তাহাকে ঠিক পূর্বের মতো তেমনটি আর পাইবে না। এ আট বৎসরে তাহার কী হইয়াছে তাই বা কে জানে।" রহমতের আন্তরিক বেদনা গভীর দীর্ঘশ্বাসে প্রকাশ পেয়েছে। তার 'মাটিতে বসিয়া' পড়ার মধ্যে ধরা পড়ে অসহায়তা। কাহিনির মধ্যে চরিত্রের দেহ ভঙ্গিমার সংযত বর্ণনায় গল্পকার আলোকিত করেছেন চরিত্রের অন্তর্লোক।

রহমতের অসহায়তা কথকের পিতৃহৃদয় স্পর্শ করেছে। তাই অন্তঃপুরের মেয়েদের অসন্তোষ সত্ত্বেও 'উৎসব সমারোহের দুটো-একটা অঙ্গ ছাঁটিয়া' 'একখানি নোট' রহমতের হাতে তুলে দিয়ে কথক প্রকৃতই স্নেহপ্রবণ পিতার দায়িত্ব পালন করলেন। বিশ্ব পিতৃত্ববোধে উন্নীত হলেন। রহমতকে বললেন, "তুমি দেশে তোমার মেয়ের কাছে ফিরিয়া যাও; তোমাদের মিলনসুখে আমার মিনির কল্যাণ হউক।" গল্প এখানেই শেষ হতে পারত। কিন্তু অর্থ দেওয়ার ফলে সাধারণ গৃহস্থের উৎসব আয়োজনের কিছু অঙ্গ বাদ দেওয়ার প্রসঙ্গ উত্থাপন করে গল্পকার কাহিনিকে আরও হৃদয়স্পর্শী করে তুললেন। কথক নিজে ধনী নন, কন্যার বিবাহের আয়োজনে যেটুকু মধ্যবিত্ত স্বপ্ন ছিল — আলো-বাজনার, সেই বাড়তি সমারোহটুকুর বিনিময়ে রহমতকে তার কন্যার কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার প্রয়াসে কথক চরিত্রের অনুপম হার্দ্য মূল্যই অনুচ্ছ্বসিত সহজ সুরঝঙ্কারে রণিত হয়েছে। লেখকও বিশ্বজনীন এক পিতৃত্ববোধের উপলব্ধিতে আলোকিত হয়ে উঠলেন। সমগ্র রবীন্দ্র সাহিত্যে এমন অপরূপ সৌন্দর্য মণ্ডিত পিতৃচরিত্র দ্বিতীয়রহিত।

১৭.৬ গল্পের শিল্পরূপ সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক আলোচনা

'The craft of Fiction' গ্রন্থে পার্সি লাবক কাহিনির Point of view বা দৃষ্টিকোণ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। 'কাবুলিওয়ালা' গল্পে কথকের সঙ্গে কাহিনির অবস্থানগত সম্পর্ক বা নিরীক্ষণ বিন্দু দ্বারা সমগ্র কাহিনিটি নিয়ন্ত্রিত। অর্থাৎ গল্প কথকের দৃষ্টিকোণেই চরিত্র, পরিবেশ, ঘটনা সংস্থান নির্ধারিত হয়েছে। গল্পে রহমত ও মিনির সম্পর্ক, রহমতের আবির্ভাবের আগে মিনির আচরণ, স্বভাব, রহমতের জেলে যাওয়া, খালাস পাওয়া, মিনির রূপান্তর সবটুকুই গল্প কথক অর্থাৎ মিনির পিতার দৃষ্টিকোণে নিয়ন্ত্রিত। ফলে অনুভবের এক ভিন্ন নান্দনিক রূপ ফুটে উঠেছে, যা গল্পটিকে সার্থক রসসিদ্ধি দান করেছে।

হিমালয়ের রুক্ষ উপত্যকার বাসিন্দা রহমত। বাংলার অখ্যাত গৃহস্থ কন্যা মিনি। অসমবয়সী দুটি প্রাণ বয়স, ভাষা, সামাজিক অবস্থানের অমিল সীমার ঊর্ধ্বে মরমী টানে পৌঁছে যায় সমবিন্দুতে। রহমতের কথাতেই স্পষ্ট এ অসম্ভবের গোপন কথা। "বাবু, তোমার যেমন একটি লড়কী আছে, তেমনি দেশে আমারও একটি লড়কী আছে।

আমি তাহারই মুখখানি স্মরণ করিয়া তোমার খোঁকীর জন্য কিছু কিছু মেওয়া হাতে লইয়া আসি, আমি তো সাওদা করিতে আসি না। - অশিক্ষিত মেওয়া বিক্রেতা, কাবুলি রহমতের মধ্যে দিয়ে গল্পকার উন্মোচন করেন অনন্ত স্নেহের জগৎ। নিজের মেয়েকে ভালোবেসে, সেই ভালোবাসাকে আলম্বন বিভাব করে সে পৌঁছে যায় বৃহত্তর বোধে। অপর দিকে মিনির পিতা উৎসবের সমারোহ ও 'গড়ের বাদ্য' বাতিল করে সেই টাকা তুলে দেয় রহমতের হাতে। ''রহমত, তুমি দেশে তোমার মেয়ের কাছে ফিরিয়া যাও, তোমাদের মিলনসুখে আমার মিনির কল্যাণ হউক।' সমারোহের মাত্রা কিছুটা হ্রাস পাওয়ায় অন্তঃপুরের বাতাস অসন্তোষে ভারী হলেও মিনির পিতা অনুভব করেছিলেন, ''মঙ্গল আলোকে আমার শুভ উৎসব উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।' এই মঙ্গল আলো, উজ্জ্বলতা প্রকৃতপক্ষে আন্তরিক ভালোবাসার বিচ্ছুরণ। এই গল্পে 'প্রেমের বিশ্বরূপ বিশেষের রং-রস-হারা নির্বিশেষ মূর্তিতে করুণাঘন অপরূপ রূপ ধরেছে।' 'কাবুলিওয়ালার' এই সুরটি ধরা পড়েছে রবীন্দ্রনাথের 'খেয়া'য়—

কাউকে চেনে পরশ আমার,
কাউকে চেনে ঘ্রাণ,
কাউকে চেনে বুকের রক্ত
কাউকে চেনে প্রাণ।
ফিরিয়ে দিতে পারি না যে
হায় রে—
ডেকে বলি 'আমার ঘরে
যার খুশি সেই আয়রে তোরা।
যার খুশি সেই আয়রে।

'কাবুলিওয়ালা' গল্পে স্থান ও কালের অপরূপ সাযুজ্যের সংবেদন তৈরি করেছেন গল্পকার। গল্প আরম্ভ ও শেষের আট বছরে মিনির পরিবর্তিত রূপ রহমতের মনের দর্পণে সুদূর আফগানিস্থানের মরুপর্বতের দৃশ্য ফুটিয়ে তুলেছে— যেখানে রয়েছে তার মেয়ে। অর্থাৎ সময়ের সঙ্গে ঘটনা, পরিস্থিতির বহিরঙ্গ পরিবর্তনের সঙ্গে চেতনার গভীরের গূঢ় পরিবর্তনের ইঙ্গিতটি পাঠকের মনে সময়ের নতুন মাত্রা সংযুক্ত করে দিল। মানব সম্পর্কের গভীরে অনুপ্রবিষ্ট সময়টিকেও তুলে ধরলেন লেখক। 'তাহাকে ঠিক পূর্বের মতো তেমনি আর পাইবে না।' পূর্বের মতো না পাওয়ার মধ্যে সময়ের অন্তর্বাহী প্রবণতার দ্বারা পাঠকমনে নতুন সংবেদন সঞ্চার করলেন লেখক।

ছোটগল্প হিসেবে সার্থকতা :

জীবনের ভূগোল সীমায় রচিত হয়েও দেশ-কালের গণ্ডীকে অতিক্রম করে মানবতার চিরন্তন কাহিনি হয়েছে 'কাবুলিওয়ালা' গল্পটি। সর্বকালের সর্বস্তরের পিতৃহৃদয়ের চিরন্তন আকৃতি গল্পের মূল সুর। প্রায় একই সময়ে লেখা 'পঞ্চভূত' এর 'বৈষ্ণব কবিতা' প্রবন্ধে অনুরূপ শাশ্বত মানবতার কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ- ''যাহাকে আমরা ভালোবাসি কেবল তারই মধ্যে আমরা অনন্তের পরিচয় পাই। এমনকি জীবের মধ্যে অনন্তকে অনুভব করারই নাম ভালোবাসা।" 'কাবুলিওয়ালা' গল্পে প্রেমের সেই অনন্ত রূপ পরিস্ফুট। এখানে সে প্রেমের নাম 'স্নেহ'। সাধারণ মধ্যবিত্ত জীবনের দর্পণে বিশ্বচেতনার বিম্বনে 'কাবুলিওয়ালা' সার্থক ছোটগল্প। কবির 'বিশ্বতোমুখী মন' এর কারণে দেশ-কালের সীমা পেরিয়ে বৈশ্বিক স্তরে বিশ্বচেতনার সুর ধ্বনিত হয় তাঁর গল্পেও। 'কাবুলিওয়ালা' ও 'যেতে নাহি

দিব' কবিতার মধ্যে প্রমথনাথ বিশী একারণেই 'মর্মগত মিল' লক্ষ্য করেছেন। এই সময়েই লেখা 'বসুন্ধরা' কবিতায় শোনা যায় একই সুর, 'ইচ্ছা করে মনে মনে / স্বজাতি হইয়া থাকি সর্বলোকসনে / দেশে দেশান্তরে'। ছিন্নপত্রের চিঠিগুলিতেও সেই বোধের আন্তরিক উচ্চারণ। এই বিশ্ব চেতনার প্রকাশ রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলিওয়ালা' গল্পে। সেখানে পরিবারের তট থেকে স্নেহ সান্নিধ্যের স্থায়ীভাবে উদার মানবিক চৈতন্যের উন্মুখ প্রস্ফুটন। দুটি অসম পিতৃহৃদয়কে অবলম্বন করে মানবহৃদয়ের চিরন্তন বিচ্ছেদ বেদনার সুরে গল্পটি হয়ে উঠেছে লিরিকধর্মী।

ছোটগল্প এক আসনে বসে শেষ করার মতো আয়তন বিশিষ্ট। 'কাবুলিওয়ালা' গল্পটি মাত্র ছয় পৃষ্ঠার। তাছাড়া গল্প ভাষার অপরূপ গতি পাঠককে নিমগ্ন করে রাখে। পিতৃহৃদয়ের বিশ্বজনীন পরিব্যাপ্ত রূপের সন্ধান— জগৎ সংসারের সামান্য বিষয় হয়েও অসামান্য ছোটগল্পের উপজীব্য হিসেবেও যথোপযুক্ত।

ছোটগল্পের একটি বড় শর্ত হল বৃহত্তর সত্য-উদ্ভাসন-সামর্থ্য। 'কাবুলিওয়ালা' গল্পে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমানবিক চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে। বৃহত্তর মানবতার সুর ধ্বনিত হয়েছে। স্নেহ-মমতাকে সর্বজনীন স্তরে উন্নীত করেছেন গল্পকার, যা দেশ কাল-জাতি-ধর্মের ঊর্ধ্বে। গল্পের পরিসমাপ্তি চমকান্তক নয়, ব্যঞ্জনাত্তক। বরং বিচিত্র অর্থাভাসে, নানা প্রশ্নের অনুরণন নিয়ে আসে শেষ হয়েও শেষ না হওয়ার ভাব। গল্পের একমুখীনতা বা unity of Impression গল্পের অভিমুখটি নির্দিষ্ট রাখে।

গল্পকারের নিরাসক্তি সত্ত্বেও লেখকের পিতৃহৃদয় যেন শেষ অবধি সকল ছদ্ম আবরণ, শিল্প নির্মোঘ ছিঁড়ে আত্মপ্রকাশ করে। — "আমার ঘরের আনন্দময়ী পিতৃ ভবন অন্ধকার করিয়া পতিগৃহে যাত্রা করিবে। ... আমার ঘরে আজ রাত্রি শেষ হইতে না হইতে সানাই বাজিতেছে। সে বাঁশি যেন আমার বুকের পঞ্জরের হাড়ের মধ্য হইতে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বাজিয়া উঠিতেছে। কারণ ভৈরবী রাগিনীতে আমার আসন্ন বিচ্ছেদব্যথাকে শরতের রৌদ্রের সহিত সমস্ত বিশ্বজগৎময় ব্যাপ্ত করিয়া দিতেছে। আজ আমার মিনির বিবাহ।" পিতৃহৃদয়ের শাশ্বত বেদনায় রবীন্দ্রনাথ একান্ত হয়ে গেছেন মিনির পিতার সঙ্গে। নিটোল ছোটগল্পের সবকটি গুণই 'কাবুলিওয়ালা' গল্পে বিদ্যমান।

বাংলা ছোটগল্প রবীন্দ্রনাথের সযত্ন পরীক্ষায় বর্ণময়, শিল্পিত হয়ে উঠেছে। গল্পের ভাষাশৈলীর নিজস্বতায় তিনি নির্মাণ করেছেন নতুন পথ। বিষয় বৈচিত্র্য ও আঙ্গিক-পরিচর্যায় বাংলা ছোটগল্পকে বিশ্বের দরবারে উপস্থাপিত করেছেন। রবীন্দ্র-প্রতিভার স্পর্শে বাংলা ছোটগল্প হয়ে উঠেছে বিশ্বজনীন। 'কাবুলিওয়ালা' তারই অনন্য নিদর্শন।

১৭.৭ সারাংশ

বিশ্বজনীন পিতৃহৃদয়ের অন্তর্লীন রূপের বহিঃপ্রকাশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কাবুলিওয়ালা' ছোটগল্পটি বাংলা গল্প সাহিত্যের অনন্য উদাহরণ। মিনি নাম্নী একটি পাঁচ বছরের শিশুকে কেন্দ্র করে লেখক এ গল্পে দেশ-কালের সীমানা পেরিয়ে বাৎসলা রসের উৎসার ঘটিয়েছেন। মিনির পিতা ও রহমত কাবুলিওয়ালা সন্তান স্নেহের বাৎসল্য বিন্দুতে এক হয়ে গেছে। জাগতিক সকল স্বার্থের ঊর্ধ্বে স্নেহের ঐশ্বরিক রূপ সঞ্চারিত হয়েছে 'কাবুলিওয়ালা' গল্পে।

১৭.৮ অনুশীলনী

অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

(ক) 'কাবুলিওয়ালা' গল্পটি কবে, কোন পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়?

খ) গল্পকথকের কন্যার নাম কী? গল্পের সূচনায় তার বয়স কত?

গ) কথকের কন্যার বন্ধুদের নাম লেখ?

ঘ) রহমত কে? তার কারাদণ্ড হয়েছিল কেন?

ও) 'কাবুলিওয়ালা' গল্পের মূল সুরটি কী?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

ক) 'কাবুলিওয়ালা' গল্প অবলম্বনে মিনির স্বভাবের পরিচয় দাও।

খ) মিনির মা অত্যন্ত শঙ্কিত স্বভাবের লোক—কে একথা বলেছেন? উক্তির নিরিখে মিনির মায়ের চরিত্র আলোচনা করো।

গ) 'চঞ্চলহৃদয়া মিনির আচরণ যে অত্যন্ত লজ্জাজনক তাহা তাহার বাপকেও স্বীকার করিতে হয়'। মিনির কোন আচরণ তার পিতার লজ্জাজনক মনে হয়েছে এবং কেন?

ঘ) 'সেও পিতা, আমিও পিতা'- উক্তিটি কার? কোন প্রসঙ্গে তার একথা মনে হয়েছে?

রচনাধর্মী প্রশ্ন

ক) 'গল্প কথক ও কাবুলি রহমতের সংবেদনশীল পিতৃসত্তার মধ্য নিয়ে গল্পকার স্নেহের অনন্ত রূপ আবিষ্কার করেছেন' — গল্পের পরিপ্রেক্ষিতে কথাটি কতখানি যুক্তিসঙ্গত তা নিজের ভাষায় বুঝিয়ে দাও।

খ) ছোটগল্প হিসেবে 'কাবুলিওয়ালা' গল্পটি সফল কিনা নিজের ভাষায় আলোচনা করো।

গ) 'কাবুলিওয়ালা' গল্পটির নামকরণ কি যথাযথ— যুক্তি সহযোগে বিশ্লেষণ করো।

১৭.৯ সহায়ক গ্রন্থ

ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দশম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি

খ) নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, *কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ*, বাকসাহিত্য

গ) তপোব্রত ঘোষ, *রবীন্দ্র ছোটগল্পের শিল্পরূপ*, দে'জ পাবলিশিং

ঘ) প্রমথনাথ বিশী, *রবীন্দ্র ছোটগল্প*, মিত্র ও ঘোষ

ঙ) ক্ষেত্রগুপ্ত, *রবীন্দ্র গল্পঃ অন্য রবীন্দ্রনাথ*, গ্রন্থনিলয়

চ) শ্রী ভূদেব চৌধুরী, *বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার*, মর্ডাণ বুক এজেন্সী

ছ) গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, *রবীন্দ্রনাথঃ ছোটগল্প প্রকরণ শিল্প*, সাহিত্যলোক

একক-১৮ ❑ নিশীথে : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গঠন

১৮.১ উদ্দেশ্য
১৮.২ প্রস্তাবনা
১৮.৩ গল্পের উৎস সন্ধানে
১৮.৪ গল্পের বিশ্লেষণাত্মক পাঠ
১৮.৫ নামকরণ
১৮.৬ চরিত্র আলোচনা
১৮.৭ গল্পটি অতিপ্রাকৃত না কি মনস্তাত্ত্বিক
১৮.৮ সারাংশ
১৮.৯ অনুশীলনী
১৮.১০ সহায়ক গ্রন্থ

১৮.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে পারবে। বিশেষত একটি অসামান্য যুগাতিক্রমী রবীন্দ্র গল্পের সঙ্গে পরিচয় ঘটবে। মানবমনের গহন গভীরে অবচেতনের সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের সঙ্গে পরিচিত হবে। শিক্ষার্থীরা উপলব্ধি করতে পারবে জীবনের জটিল গ্রন্থিগুলি সম্পর্কে। কামনা-বাসনায় জর্জরিত মানবমনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-অপরাধবোধ ইত্যাদির পাশাপাশি ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবে। ভৌতিক রহস্যের প্রকৃত সত্য সন্ধানে আগ্রহী হবে।

১৮.২ প্রস্তাবনা

একটি গল্পকে বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গিতে পাঠ করতে গেলে কয়েকটি বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজন — কাহিনি অংশ, চরিত্রনির্মাণ, শিল্পরীতি ও লেখকের নিজস্বতা। এই চারটি বিষয়কে অবলম্বন করে গল্পের অন্দরে প্রবেশ করা হবে। প্রসঙ্গক্রমে চরিত্রের অন্তর্লোকে অবগাহনের মধ্য দিয়ে মনোবিকারের জটিল সমস্যা, ইদ-ইগোর দ্বন্দ্ব, মানব মনে প্রকৃতির প্রভাব ইত্যাদি অনুসন্ধান করা যাবে। সেইসঙ্গে লেখকের শিল্পকৌশল, নতুনত্ব সৃষ্টির প্রচেষ্টার দিকটিও আলোচিত হবে।

১৮.৩ গল্পের উৎস সন্ধানে

রবীন্দ্রনাথের এক-একটি গল্পে একটি ভাব বা অনুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ পাত্র-পাত্রী বা ঘটনাকে ছাপিয়ে গেছে। অবান্তর ঘটনা বা ভাবের শাখা-প্রশাখাহীন এই ধরনের গল্পগুলিতে একটানা সুরের আবহে, বর্ণনার ভঙ্গিতে নায়কের অতীত জীবন আভূমি ছুঁয়ে থাকে বর্তমানকে। 'নিশীথে' গল্পটিকে এই শ্রেণীভুক্ত করা যেতে পারে। 'নিশীথে' গল্পটি সাধনা পত্রিকার মাঘ সংখ্যায় ১৩০১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়।

১৮.৪ গল্পের বিশ্লেষণাত্মক পাঠ

'নিশীথে' গল্পটি রবীন্দ্রনাথের সেরা ছোটগল্পগুলির মধ্যে অন্যতম। সমালোচক মহলে কেউ কেউ একে 'অতিপ্রাকৃত', আবার কেউ কেউ 'মনস্তাত্ত্বিক' অভিধায় চিহ্নিত করেছেন। 'কঙ্কাল' গল্পের ন্যায় এ গল্পে 'অতিপ্রাকৃত' ছায়া সৃষ্টির সচেতন প্রয়াস আছে বলে আমরা মনে করি না। বরং দাম্পত্য সমস্যার ইঙ্গিত স্পষ্ট। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের জটিলতা স্থায়ী প্রভাব ফেলেছে মনের গভীরে। সেই সঙ্গে অপরাধবোধ মিশে মানসিক সমস্যাকে বাড়িয়ে তুলেছে বহুগুণ। অপরাধবোধ জনিত ভয় মিশেছে গল্প দেহে। সেই 'ভয়ের স্বাদ' জাগিয়ে তুলেছে অপার্থিব শিহরণ। এই ভয়ানুভূতি ভৌতিক নয়। কিন্তু অন্ধকারে সঞ্চারিত হয়েছে ভয়ের আবহ। অবশ্যই এ ভয় কৃতকর্মের। আর সেকারণেই মানসিক জটিলতা। 'হৃদয়বৃত্তির তীব্রতায়' প্রচলিত 'সমাজনীতি' কে অস্বীকার করার প্রবণতা খুব দুর্লভ নয়। কিন্তু নিহিত অপরাধবোধ যখন পীড়িত করে সর্বক্ষণ তখন মনের অন্ধকার গাঢ় হয়ে জমে বাইরের প্রকৃতিতেও। এ গল্প সেই অন্ধকারের।

গল্পের নায়ক দক্ষিণাচরণবাবু। তিনিই কাহিনির কেন্দ্রে। তাঁর 'মানসিক বিকার' গল্পের বিষয়। কিন্তু গল্পটির বিন্যাস রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য 'অতি-প্রাকৃত' গল্পের 'পরিচিত শিল্পরূপেই'। অর্থাৎ গল্প লিখিত হয়েছে 'উত্তম পুরুষ'-এর জবানিতে। এ গল্পের কথক দুজন। প্রথমজন ডাক্তার, যিনি গল্প পাঠককে বলেন সরাসরি। দ্বিতীয়জন দক্ষিণাচরণ, তিনি নিজের জীবন কাহিনি শোনান ডাক্তারকে।

ডাক্তারের বাড়িতে 'অর্ধেক রাত্রে' দক্ষিণারঞ্জনবাবুর আগমনের মাধ্যমে গল্পের সূচনা। একটু লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, গল্পের অধিকাংশ ঘটনা ঘটেছে আঁধারের অবকাশে অর্থাৎ রাত্রে। কখনো সন্ধ্যায়, কখনো গভীর রাতে। গল্প নামের সঙ্গে রাতের অন্ধকার ও অবচেতনার অন্ধকার মিশে তৈরি করেছে বহুমাত্রিকতা। গল্পকথন শুরু হয়েছে রাত আড়াইটেতে। ডাক্তারকে ঘুম থেকে জাগিয়ে। তাঁকে নিজের সমস্যার কথা বলতে শুরু করেন জমিদার দক্ষিণারঞ্জন। 'আজ রাত্রে আবার সেইরূপ উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে।' লক্ষ্য করার মতো শব্দ হল 'আবার'। অর্থাৎ পূর্বেও এই 'উপদ্রব' হয়েছে এবং 'উপদ্রব' নিবারণে ডাক্তার ঔষধ দিয়েছেন। সুতরাং ডাক্তার ও দক্ষিণারঞ্জনবাবু পূর্ব পরিচিত। 'উপদ্রব'টিও ডাক্তারের জানা। তাই কি গভীর রাত্রে পুনরায় সেই উপদ্রবের বর্ণনা তার কাছে 'জ্বালাতন'-এর নামান্তর? কিন্তু ঔষধ কাজে না লাগার সরাসরি অভিযোগে ডাক্তার কিঞ্চিৎ সংকোচ বোধ করেন। 'মদের মাত্রা' বাড়ানোই যে ওষুধের কাজ না করার কারণ এ জাতীয় যুক্তি-নির্মাণ ডাক্তারের পক্ষে একান্তই স্বাভাবিক। কিন্তু দক্ষিণাচরণবাবুর উক্তি, "ওটা তোমার মতিভ্রম। মদ নহে; আদ্যোপান্ত বিবরণ না শুনিলে তুমি আসল কারণটা অনুমান করিতে পারিবে না"। একথায়

দক্ষিণাচরণবাবুর মদ্যাসক্তির প্রমাণ যেমন মেলে, তেমনি রোগটি যে শারীরিক নয়, তারও প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত মেলে। ''ম্লানভাবে'' কুলুঙ্গির মধ্যে জ্বলতে থাকা কেরোসিনের আলো উসকে দেওয়া, ''কোঁচাখানা গায়ের উপর টানিয়া'' খবরের কাগজ-পাতা প্যাকবাক্সের উপর ডাক্তারের বসার মধ্যে এমন এক ভঙ্গিমা আছে, যাতে বোঝা যায় দক্ষিণাচরণবাবুর 'আদ্যোপান্ত বিবরণ' সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। একই সঙ্গে নজর টানে কেরোসিন শিখার 'একটুখানি আলো' জেগে ওঠা ও 'অনেকখানি ধোঁয়া' বের হওয়া। অর্থাৎ পরবর্তী বিবরণে অনেক গোপন গহন কথাও যে প্রকাশ হয়ে পড়বে তারই কি ইঙ্গিত দিল 'অনেকখানি ধোঁয়া'? ধোঁয়া অর্থাৎ দহনের অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া। যা কিনা দক্ষিণাচরণবাবুর মধ্যে অবিরাম চলছে। তাই কি ওষুধ কাজ করে না? এ দহনে আছে এমন কিছু যা দিবালোকে ব্যক্ত করার নয়। সেকারণেই মধ্যরাতে আসতে হয় ডাক্তারের কাছে।

উপদ্রবের আদ্যোপান্ত বিবরণ দিতে গিয়ে দক্ষিণাচরণবাবুর প্রথম কথা, ''আমার প্রথম পক্ষের স্ত্রীর মতো এমন গৃহিণী অতি দুর্লভ ছিল।'' লক্ষণীয় 'ছল' ক্রিয়াপদ এবং 'প্রথম পক্ষের স্ত্রী' শব্দবন্ধ। অর্থাৎ প্রথম পক্ষের স্ত্রী বর্তমান নন। তিনি অতীত। কিন্তু তিনি যখন ছিলেন, তখন দক্ষিণাচরণ বাবুর 'বয়স বেশি ছিল না'। অল্প বয়সের 'রসাধিক্য ছিল'। সেইসঙ্গে 'কাব্যশাস্ত্র ভালো করে অধ্যয়ন' করায় প্রথমার 'অবিমিশ্র গৃহিণীপনায়' মন ভরত না। কালিদাসের রঘুবংশের ইন্দুলেখার মতো সচিব, সখী, প্রিয় শিষ্যা তুল্য ললিত কলায় পারঙ্গম স্ত্রী তাঁর কাঙ্ক্ষিত ছিল। অর্থাৎ স্ত্রীকে নিয়ে কাব্যরসসিক্ত কল্পনার যে জগৎ তিনি নির্মাণ করেছিলেন আপন মনে, বাস্তবে তা ছিল সুদূর অলকাপুরী। একটু খুঁটিয়ে দেখলে নজরে আসে প্রথম পক্ষের স্ত্রী অনামিকা অর্থাৎ নামহীনা। কেবল 'গৃহিণী' মাত্র। সংসারের বৃত্তিতে পারঙ্গম হলেও স্বামীর হৃদয়াকাশের ধ্রুবতারা যে তিনি হয়ে উঠতে পারেননি তা স্পষ্ট দক্ষিণাচরণের কথায়। তাঁর হৃদয়াবেগ, 'ললিত কলাবিধির' উপদেশ কিংবা 'সখীভাবে প্রণয় সম্ভাষণ' 'অপদস্থ' হয়ে ভেসে যেত স্ত্রীর হাসির কাছে। লেখক এস্থানে একটি পৌরাণিক প্রসঙ্গ উপস্থাপন করেছেন, 'গঙ্গার স্রোতে ইন্দ্রের ঐরাবতের নাকাল' হওয়া। সগররাজার সহস্র সন্তানকে পুনর্জীবন দিতে গঙ্গা ভগীরথের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে মর্তে আসেন। সাগরাভিমুখী গঙ্গার পথরোধ করতে গিয়ে মদমত্তে গর্বিত ইন্দ্রবাহন ঐরাবত নাকাল হয়। ইন্দ্রের ঐরাবত অর্থাৎ ব্যক্তির প্রবল কামনাজাত অহংবোধ। দক্ষিণাচরণের কাব্যরস সিঞ্চিত প্রগলভ অহং-এর হাসির দ্বারা অপদস্থ হওয়া অর্থাৎ আহত অহং-এর কথাই পৌরাণিক উপমার দ্বারা আত্মপ্রকাশ করল।

দক্ষিণাচরণের এই আহত 'আমি-চেতনা' ক্রমাগত আহতই হয়েছে। পংক্তির পরিবর্তনে কাহিনির মোড় ঘুরেছে। তাহার পর, আজ বছর চারেক হইল আমাকে সাংঘাতিক রোগে ধরিল। ওষ্ঠব্রণ থেকে জ্বরধিকার হয়ে বাঁচার আশা না থাকলেও সে যাত্রায় তিনি বেঁচে গেলেন। অসুস্থতার সময় তাঁর স্ত্রীর অহর্নিশি সেবার মধ্যে পত্নীর প্রেম, সখীর সহৃদয়তা, সেবিকার যত্নের সঙ্গে মাতার স্নেহ মিশে ছিল। তার সকল মনোযোগ ছিল স্বামীর প্রতি। 'জগতের আর কোনো-কিছুর প্রতিই দৃষ্টি ছিল না'। 'পোস্টমাস্টার' গল্পের রতনকেও দেখা যায় পোস্টমাস্টারের অসুস্থতায় স্নেহপরায়ণ সেবিকার আসন গ্রহণ করতে। বয়স বা অভিজ্ঞতা ছাড়াই নারীর সহজাত স্নেহ, সেবা, যত্নপটু সরল মাতৃমনটি রবীন্দ্রনাথের আরও অনেক ছোটগল্পে প্রকাশ পেয়েছে। অসুস্থতার সময়েই দক্ষিণাচরণবাবুর 'দুর্লভ গৃহিণী'র প্রকৃত পরিচয় পান। তাঁর অনুশোচনার শুরু এখানেই। কিন্তু স্বামীকে অক্লান্ত সেবায় সুস্থ করে তুলতে পারলেও 'মৃত সন্তান প্রসব' করে নানাপ্রকার জটিল ব্যামোয় আক্রান্ত হলেন 'গৃহিণী'। অসুস্থতাকালেও স্বামীর সেবা নিতে তিনি ছিলেন নিতান্ত নারাজ। দক্ষিণাচরণ সেবা আরম্ভ করলে

তিনি বিব্রত হতেন। 'লোকে বলিবে কী' কিংবা 'পুরুষমানুষের অতটা বাড়াবাড়ি ভালো নয়'— স্ত্রীর এ জাতীয় বাক্য তাঁকে নিরস্ত করত। কিন্তু শয্যাশায়ী অবস্থার মধ্যেও স্বামীর যত্নের প্রতি তাঁর পূর্ণ মনোযোগ ছিল। আহারে 'দশ মিনিটে'র বিলম্ব 'অনুনয়', 'অনুরোধ', 'অনুযোগের' কারণ হয়ে যেত। প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণাচরণবাবু ও তাঁর প্রথমা পত্নীর মানসিক সাদৃশ্য ছিল না।

গল্পে দক্ষিণাচরণবাবু গঙ্গার ধারে 'বরানগরের বাড়ি'র কথা বলেছেন। এ বাড়ি কি 'চন্দননগরের বাগান বাড়ি', যেখানে কাদম্বরী দেবী ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে রবীন্দ্রনাথ কিছুকাল কাটিয়েছিলেন? সেখানেও 'বকুলবৃক্ষ শোভিত' বাড়িটির সামনে দিয়ে বয়ে চলত গঙ্গা। বরানগরের বাড়িতেও আছে বকুল গাছ। দক্ষিণাচরণ বলেছেন, "আমাদের শোবার ঘরের নীচেই দক্ষিণের দিকে খানিকটা জমি মেহেদির বেড়া দিয়া ঘিরিয়া আমার স্ত্রী নিজের মনের মতো একটুকরা বাগান বানাইয়াছিলেন। সমস্ত বাগানটির মধ্যে সেই খণ্ডটিই অত্যন্ত সাধাসিধা এবং নিতান্ত দিশি। অর্থাৎ তাহার মধ্যে গন্ধের অপেক্ষা বর্ণের বাহার, ফুলের অপেক্ষা পাতার বৈচিত্র্য ছিল না, এবং টবের মধ্যে অকিঞ্চিৎকর উদ্ভিজ্জের পার্শ্বে কাঠি অবলম্বন করিয়া কাগজে নির্মিত ল্যাটিন নামের জয়ধ্বজা উড়িত না। বেল, জুঁই, গোলাপ, গন্ধরাজ, করবী এবং রজনীগন্ধার প্রাদুর্ভাব কিছু বেশি। প্রকাণ্ড একটা বকুল গাছের তলা সাদা মার্বল পাথর দিয়া বাঁধানো ছিল। গ্রীষ্মকালে কাজের অবকাশে সন্ধ্যার সময় সেই তাঁহার বসিবার স্থান ছিল। সেখান হইতে গঙ্গা দেখা যাইত, কিন্তু গঙ্গা হইতে কুঠির পানসির বাবুরা তাঁহাকে দেখিতে পাইত না।" লক্ষ করার মতো যে, বাগানে বর্ণহীন সাদা ফুলের আধিক্য। যারা নিশীথে সুবাস ছড়ায়। লোকচক্ষুর আড়ালে আঁধারের অবকাশে তাদের প্রস্ফুটন। এই বর্ণনায় যেন দক্ষিণাচরণের গৃহিণীর হৃদয়সত্তার প্রকাশ। কাব্যজাল বিস্তারী বাহ্য বর্ণচ্ছটার কৃত্রিম আড়ম্বর তাঁর ভালোবাসায় নেই। বকুলতলার বেদীতে তাঁর অবস্থানও অর্থপূর্ণ। তিনি গঙ্গা দেখতে পেতেন কিন্তু পানসির বাবুর তাঁকে দেখতে পেত না। অর্থাৎ দক্ষিণাচরণবাবুর উত্তাল হৃদয়ের যৌবন বাসনা তাঁর চেনা ছিল কিন্তু তাঁর অন্তঃস্থল উৎসারিত ভালোবাসা "দুর্লভ গৃহিনীপনা"র আড়ালে থাকায় 'পানসির বাবু'দের মতো দক্ষিণাচরণের পক্ষে তাঁর সেই ভালোবাসার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি সম্ভব হয়নি। অন্ততঃ এই অসুস্থতার পূর্বে।

আমাদের মনে রাখতে হবে গল্পের কথক দুইজন। প্রথমজন ডাক্তার, যাঁর কাছে রাত আড়াইটেতে দক্ষিণাচরণবাবু এসেছেন। অপরজন দক্ষিণাচরণ স্বয়ং। এ পর্যায়ে দক্ষিণাচরণবাবুর নিজেই ঘটনার বর্ণনা দিচ্ছেন। ফলতঃ আলোকিত হচ্ছে তাঁর অন্তঃকরণ, তাঁরই কথায়। তাঁরই 'দেখার ফ্রেমে' তাঁর স্ত্রীর মতো তিনি নিজেও ধরা পড়ছেন। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ঘোষ যথার্থই বলেছেন, "নিজের মনোভাব নিজের স্বভাব সে আপনার মতো করেই বুঝেছে— তা কিছুতেই নিরপেক্ষ দৃষ্টির সমগ্রতা লাভ করতে পারেনি। এবং সেটাই ছিল লেখকের অভিপ্রায়।

অনেকদিন শয্যাগত থাকার পর প্রথমা স্ত্রী 'চৈত্রের শুক্লপক্ষ সন্ধ্যায় অর্থাৎ বসন্তকালের জ্যোৎস্নালোকিত সাঁঝবেলায় বাগানের বকুল তলায় যেতে চাইলেন। 'চৈত্রের শুক্লপক্ষ সন্ধ্যা' কেবল একটি সময়মাত্র নয়। বিশেষ ইঙ্গিতবাহী। চৈত্র" অর্থাৎ বসন্ত। আবার বছরের অন্তিম মাসও বটে। 'শুক্লপক্ষ' অর্থাৎ আগামী উজ্জ্বলতার সম্ভাবনা। কারণ ক্রমশ পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় আলোকিত হবে চারিপাশ। কিন্তু 'সন্ধ্যা'? অর্থাৎ গভীর রাত্রির সূচনালগ্ন। একদিকে অসুস্থ স্ত্রীর ক্রমক্ষীয়মান জীবনীশক্তি অন্যদিকে দক্ষিণাচরণের জীবনে নতুন অধ্যায়ের সূচনার প্রহর গোনা শুরু। অথচ আলোর আড়ালে সে সূচনা অন্ধকারের। উপভোগের ছদ্মবেশে আতঙ্কের

আগমনের ইঙ্গিত কি উপস্থাপিত হল সচেতনভাবে?

"আমারই জানুর উপরে তাঁহার মাথাটি তুলিয়া রাখিতে পারিতাম, কিন্তু জানি, সেটাকে তিনি অদ্ভুত আচরণ বলিয়া গণ্য করিবেন। তাই একটি বালিশ আনিয়া তাহার মাথার জল রাখিলাম।" দু-একটি বকুল ঝরতে লাগল। 'ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভের বাসনা ও তার সংহরণ'। স্ত্রী-র শীর্ণ মুখের উপর এসে পড়ল 'ছায়াঙ্কিত জ্যোৎস্না'। প্রেম ও মৃত্যুর অর্থাৎ চির বিচ্ছেদের যুগপৎ ছায়া বিস্তার। ঘনিয়ে উঠছে মৃত্যুর ছায়া। দৃশ্য হিসেবেও রোমান্টিক চিত্রকল্প। ধীরে ধীরে স্ত্রী-র 'উত্তপ্ত শীর্ণ হাত' হাতের মধ্যে নিলেন। কিন্তু কোনো আপত্তি এলো না। দক্ষিণাচরণের হৃদয় 'উদ্বেলিত' হল। যে পরিবেশ নির্মিত হয়েছে, তাতে দক্ষিণাচরণের 'আবেগপ্রবণ' হৃদয়ের উদ্বেল হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। "তোমার ভালোবাসা আমি কোনোকালে ভুলিব না।" 'প্রেমের শপথে' আবেগের তাড়না। এ শপথ তিনি ভেঙেছেন। আবার রেখেছেনও। মনোরমাকে বিবাহের মধ্যে যেমন আছে শপথ ভঙ্গ, তেমনি স্বীয় রোগগ্রস্ততায় আছে প্রতিশ্রুতি বদ্ধতা। অবশ্য সেখানে মিশে গেছে শ্লেষ। তাঁর নিজের কানেই বেজেছে নিজেরই আবেগতাড়িত সংলাপ। তাই 'তখনি' বুঝতে পারলেন 'কথাটা' বলা 'আবশ্যক' ছিল না। তাঁর কথায় স্ত্রী হেসে উঠলেন। সে হাসিতে রয়েছে 'লজ্জা', 'সুখ'। 'কিঞ্চিৎ অবিশ্বাসের সঙ্গে' অনেকটা পরিমাণে পরিহাস' ও যেন মিশে ছিল। সেই হাসির অর্থ যেন, "কোনোকালে ভুলিবে না, ইহা কখনো সম্ভব নহে এবং আমি তাহা প্রত্যাশাও করি না।' সেই 'সুমিষ্ট' সুতীক্ষ্ণ হাসিতে পিছু হটত দক্ষিণাচরণের উচ্ছ্বসিত 'প্রেমালাপ'। দক্ষিণাচরণের কাব্যরসাসিক্ত প্রেমাবেগ কখনো প্রশ্রয় পায়নি তাঁর প্রথমার কাছে। আবার প্রথমার মিতভাষী স্বভাবে 'সুমিষ্ট সুতীক্ষ্ণ' হাসি, দক্ষিণাচরণের 'উদ্বেলিত' আবেগকে দমিয়ে দিয়েছে। 'বাদ প্রতিবাদ কথায় চলে কিন্তু হাসির উপরে তর্ক চলে না।' উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় কোকিল ক্রমাগতই 'কুহু কুহু ডাকিয়া অস্থির হইয়া গেল।' এই অস্থিরতা কি দক্ষিণাবাবুরও? তিনি ভাবতে লাগলেন, "এমন জোৎস্নারাত্রেও কি পিকবধূ বধির হইয়া আছে?" পুরুষ কোকিলের আশাভঙ্গের মধ্যে প্রকাশ পেল দক্ষিণাচরণের অতৃপ্ত বাসনা।

'নিশীথে'র নিটোল কাহিনিকে যদি কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়, তাহলে এ পর্যন্ত প্রথম পর্যায়, যেখানে দক্ষিণাচরণের প্রথমা স্ত্রীর সঙ্গে যাপিত দাম্পত্যে অতৃপ্তির আত্মপ্রকাশ। আবেগের অন্তরালে অতৃপ্ত বাসনায় ক্লান্ত দক্ষিণাচরণের অস্পষ্ট অবয়ব ক্রমশ স্পষ্ট হতে শুরু করেছে। এজন্য অবশ্য তাকে দায়ী করা চলে না। তাঁর মনের সাংগঠনিক অবস্থান সম্পর্কে সে নিজেও সচেতন নয়। আসলে আমাদের 'বাইরের আমি' ও 'ভিতরের আমি' কেউই স্পষ্ট নয় আমাদের কাছে। তাই দ্বিধা এসে জড়িয়ে ধরে। মনের গোপন আঁধারে, অবচেতনের গভীরে নিজের অজান্তেই চলে অন্য এক খেলা। তার আত্মপ্রকাশে ব্যক্তি নিজেই চমকে ওঠে।

গল্পের দ্বিতীয় পর্যায়টি সংঘটিত হয়েছে এলাহাবাদে। দক্ষিণাচরণ ডাক্তারের পরামর্শে 'বায়ুপরিবর্তনে'র জন্য স্ত্রীকে নিয়ে গেলেন সেখানে। গল্পে মোট তিনজন ডাক্তারের প্রসঙ্গ আছে। প্রথমজন, যাঁর কাছে দক্ষিণাচরণ নিজের কথা বলেছেন। দ্বিতীয়জন, যাঁর পরামর্শে স্ত্রীকে নিয়ে এলাহাবাদে গেছেন। তৃতীয় জন, এলাহাবাদের চিকিৎসক, মনোরমার বাবা, হারান ডাক্তার। হারান ডাক্তারের চিকিৎসায় 'অনেককাল একভাবে' কাটানোর পর উভয়েই বুঝলেন 'এ ব্যামো সারিবার নহে।' 'চিররুগ্ণ' হয়ে দিন কাটানোই যখন প্রথমা স্ত্রীর একমাত্র সত্য হয়ে উঠল, তখন তিনি বললেন, 'যখন ব্যামোও সারিবে না এবং শীঘ্র আমার মরিবার আশাও নাই,

তখন আর কতদিন এই জীবন্মৃতকে লইয়া কাটাইবে। তুমি আর একটা বিবাহ করো'। খেয়াল করা দরকার, প্রথমা স্ত্রী সুস্থ হবার আশা যেমন করেনি, তেমনি 'মরিবার আশা'ও করেনি। সুতরাং অসুস্থ অবস্থাতেও মৃত্যুর বাসনা তখনও তাঁর মধ্যে ঘনীভূত হয়ে ওঠেনি। বরং দক্ষিণাচরণ কখনো প্রকাশ না করলেও 'আরোগ্যহীন সেবাকার্যে' 'মনেমনে' 'পরিশ্রান্ত' হতে পারেন, তা স্ত্রী বুঝতে পেরেছিলেন বলেই কি পুনরায় বিবাহ করতে বলেছিলেন? নাকি একথা ছিল অসুস্থ স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ভালোবাসা বুঝে নেওয়ার প্রচেষ্টা? রবীন্দ্রনাথের 'মধ্যবর্তিনী' গল্পের হরসুন্দরীকে অসুস্থ অবস্থায় স্বামীকে একই অনুরোধ করতে দেখা যায়।

দক্ষিণাচরণের নিজের তুলনায় তাঁর প্রথমা স্ত্রী তাঁর স্বভাব-প্রকৃতি জানতেন ও বুঝতেন অধিক বেশি। এর ইঙ্গিত আছে দক্ষিণাচরণের কথায়। তিনি আমাকে যুক্তাক্ষরহীন প্রথম ভাগ শিশুশিক্ষার মতো অতি সহজে বুঝিতেন।' পূর্বে আরও একবার নিজের অসুস্থতার সময় স্ত্রীর সেবাপরায়ণতা বোঝাতে 'শিশুর মতো' শব্দবন্ধ ব্যবহার করেছেন এবং স্ত্রীর আসন্ন মৃত্যুকালে দক্ষিণাচরণকে 'পীড়িত শিশু'র মতো সান্ত্বনা দেওয়া ও 'বক্ষের কাছে' টেনে নিয়ে 'করুণ স্পর্শ' করার মধ্যে রয়েছে মাতৃসুলভ নমনীয়তা। অনুমান করা যায় প্রথমা স্ত্রীর ভালোবাসায় মাতৃ-স্নেহের ভাগ ছিল অধিক।প্রসঙ্গত মনে পড়ে 'পোস্টমাস্টার' গল্পের রতনকে। পোস্টমাস্টারের অসুস্থতার সময় সেই বালিকা অনায়াসে 'জননীর পদ অধিকার' করেছিল। দক্ষিণাচরণের 'উপন্যাসের প্রধান নায়কের' মতো ভালোবাসায় 'অনন্যনিষ্ঠ' থাকবার নাটকীয় গাম্ভীর্যময় সংলাপ স্ত্রীর হাসির কাছে খেই হারিয়ে ফেলত। প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণাচরণের কবিত্ব মেশানো; উপন্যাসের "নায়ক" সাজা ভালোবাসার অতি নাটকীয় প্রচার সেকারণেই 'সুগভীর স্নেহ' ও 'অনিবার্য কৌতুক' মিশ্রিত হাসির উদ্রেক ঘটাত। 'সুগভীর স্নেহ'-ই প্রথমার ভালোবাসার ধরন, যা দক্ষিণাচরণের কাব্য-নাটকের কল্পনাবিলাসী প্রেমভাবনায় প্রথমে ধরা পড়েনি। আবার, সেবার কাজে ভঙ্গ দেওয়ার কল্পনা দক্ষিণাচরণ করেননি বটে কিন্তু তাঁর কাছে চিরজীবন এই 'চিররুগণকে' সঙ্গে নিয়ে অতিবাহিত করার 'কল্পনা' 'পীড়াদায়ক' হয়েছিল। তাঁর সেবার মধ্যেও 'আন্তরিক শ্রান্তি' তাই স্ত্রীর দৃষ্টি এড়ায়নি।

এলাহাবাদের হারান ডাক্তার দক্ষিণাচরণবাবুর স্বজাতীয়। সেই সুবাদে ডাক্তারের বাড়িতে তাঁর থাকত 'প্রায়ই নিমন্ত্রণ" কিছুদিন পর ডাক্তারের 'যেমন সুরূপ তেমনি সুশিক্ষা'র অধিকারী বছর পনেরর মেয়ে মনোরমার সঙ্গে আলাপ হল। মেয়েটি অবিবাহিত। গুজব ছিল, 'মেয়েটির কুলের দোষ' আছে। 'আর কোনো দোষ ছিল না'। অর্থাৎ মনোরমার 'সুরূপ' ও 'সুশিক্ষা'র কাছে তার 'কুলের দোষ' ঢাকা পড়েছিল। অন্তত দক্ষিণাচরণের কাছে। তিনি 'আন্তরিক শ্রান্তি' থেকে মুক্তির পথ পেলেন। এই 'সুরূপ', সুশিক্ষিত মেঘের সঙ্গে নানা আলোচনায় তাই দেরি হতে লাগল মাঝে মাঝেই। উত্তীর্ণ হয়ে যেতে লাগল স্ত্রীকে ওষুধ খাওয়ানোর নির্দিষ্ট সময়। অর্থাৎ অসুস্থ স্ত্রীর প্রতি মনোযোগ ক্রমশ কমতে লাগল। হয়তো ভালোবাসাও। দাম্পত্যে এই ঘনায়মান দূরত্ব স্ত্রী বুঝতে পেরেছিলেন বলেই বিলম্বের কারণ তিনি জানতে চাননি কখনও। দক্ষিণাচরণও মরুভূমির মধ্যে আর একবার মরীচিকা দেখতে লাগলেন। তৃষ্ণার্ত দক্ষিণাচরণবাবু 'কূলপরিপূর্ণ স্বচ্ছ জল' অর্থাৎ মনোরমার প্রতি তাঁর আকৃষ্ট মনকে প্রাণপণে টেনেও ফেরাতে পারলেন না। অসুস্থ স্ত্রীর কক্ষ রূপান্তরিত হল

'রোগীর ঘর'-এ। পরিণামে 'প্রায়ই শুশ্রূষা' করার ও ওষুধ খাওয়ানোর নিয়মভঙ্গ হতে লাগল।

হারান ডাক্তার কেবলমাত্র একজন চিকিৎসক হিসেবে নিজের ভূমিকা পালন করেছিলেন বলে আমাদের মনে হয় না। আর একটি রূপ তাঁর ছিল তা হল 'প্রচ্ছন্ন হত্যাকারী'র। একটু নজর করলেই বোঝা যায়, হারান

ডাক্তার যখন বুঝে যায় 'ব্যামো সারবার' নয়, তখনই তিনি স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে মগ্ন হয়েছেন। ডাক্তারের কন্যা মনোরমার 'সুরূপ' ও 'সুশিক্ষা' সত্ত্বেও বিয়ে দেওয়া সহজ ছিল না 'মেয়েটির কুলের দোষ ছিল।' এমতাবস্থায় তিনি হাতের কাছে পেলেন স্বজাতি দক্ষিণাচরণকে। নিমন্ত্রণের অছিলায় প্রথমে তাঁকে বারবার বাড়িতে আনা, কিছুদিন পরে মনোরমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়ার মধ্যে স্পষ্ট উদ্দেশ্য পরিলক্ষিত হয়। চিররুগ্ন স্ত্রীর সেবায় 'আন্তরিক শ্রান্ত' ও কাতর দক্ষিণাচরণের জীবন হয়ে উঠেছিল 'আশাহীন সুদীর্ঘ সতৃষ্ণ মরুভূমি।' 'বুক পর্যন্ত তৃষ্ণা নিয়ে 'চোখের সামনে কূলপরিপূর্ণ স্বচ্ছ জল'-এর ন্যায় মনোরমাকে দেখে মনকে 'প্রাণপণে' টেনে রেখেও ফেরানো সম্ভব হয়নি। এ যে অবশ্যম্ভাবী, তা হয়তো হারান ডাক্তার অনুমান করতে পেরেছিলেন। সেক্ষেত্রে বলতে হয় প্রথমা স্ত্রীর মতো হারান ডাক্তারও দক্ষিণাচরণকে পাঠ করেছিলেন। তাই ডাক্তারের বাড়িতে 'প্রায়ই নিমন্ত্রণ' ও 'কিছুদিন যাতায়াতের পর' মনোরমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার মধ্যে অভিসন্ধির আভাস মেলে। বিশেষত, যখন তিনি দেখলেন দক্ষিণাচরণ মনোরমার প্রতি আকৃষ্ট এবং স্ত্রীকে শুশ্রূষা ও ওষুধ খাওয়ানোয় নিয়মভঙ্গ হতে লাগল, তখন তিনি বলতে শুরু করলেন— "যাহাদের রোগ আরোগ্য হইবার কোনো সম্ভবনা নাই, তাহাদের পক্ষে মৃত্যুই ভালো; কারণ, বাঁচিয়া তাহাদের নিজেদেরও সুখ নাই, অন্যেরও অসুখ।" লক্ষ্য করুন দুটি শব্দ বন্ধ : 'মৃত্যুই ভালো' ও 'অন্যেরও অসুখ'। দক্ষিণাচরণ একথার প্রতিবাদ করেননি, সমর্থনও নয়। কিন্তু প্রচ্ছন্ন সমর্থন বোধহয় ছিল। কথাটা সাধারণভাবে বলিতে দোষ নাই। কিন্তু স্ত্রীর প্রসঙ্গে এমন কথা বলা তাঁর 'উচিত হয়নি'তেই দক্ষিণাচরণ ক্ষান্ত দিলেন। তাও নিজের মনে। দক্ষিণাচরণ যে নিজ কৃতকর্মের জন্য দ্বিধান্বিত তা স্পষ্ট তাঁর নিজের কথায় ও আচরণে। তাতেই কি হারাণ ডাক্তার পরোক্ষ সমর্থনের ইঙ্গিত পেলেন? সেই সঙ্গে সাহসও? তাই কি তিনি আত্মহত্যার প্ররোচনা দেওয়ার পরিকল্পিত পথে এগিয়ে গেলেন?

প্রথমা স্ত্রী দক্ষিণাচরণকে 'যুক্তাক্ষরহীন প্রথমভাগের মতো' অতি সহজেই বুঝতে পারতেন। ফলে তাঁর পক্ষে শুশ্রূষা কিংবা ঔষধ খাওয়ানোর নিয়মভঙ্গের কারণ অনুমান করতেও বিলম্ব হয়নি। একদিকে নিজের অসুস্থতার যন্ত্রণা, অন্যদিকে স্বামীর অন্যত্র সুখান্বেষণের প্রয়াস, তাঁকে ব্যথিত করে। জীবিত থাকার ইচ্ছা বিনষ্ট করে। পূর্বের 'শীঘ্র আমার মরিবার আশা নেই' থেকে হারান ডাক্তারের কাছে বলা 'একটা ওষুধ দাও যাহাতে শীঘ্র এই প্রাণটা যায়'— এই পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে দক্ষিণাচরণের অকৃত্রিম অনাদরে বাক্যের 'যখন' শব্দটি লক্ষণীয়। অর্থাৎ এতদিন তাঁর ব্যামো থাকলেও তিনি স্বামীর ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত ছিলেন না। কিন্তু বর্তমানে তাঁর জীবিত থাকাই স্বামীর সুখের পথে অন্তরায়। তিনি পূর্বেই স্বামীকে 'আর একটা বিবাহে'র কথা বলেছিলেন। তাঁর জীবিতাবস্থায় তা হয়তো সম্ভবপর ছিল না, নাকি সে কথা ছিল 'কথার কথা'? স্বামীর অনাদর তাঁর কাছে রোগযন্ত্রণার চেয়েও অসহনীয় বোধ হয়েছিল। স্বামীর প্রতি তার অভিমানও অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু স্ত্রীর এই 'অসতর্ক বাক্যে' হারান ডাক্তার পেয়ে গেলেন উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহজতম পন্থা।

হারান ডাক্তারকে বলা স্ত্রীর কথায় আহত দক্ষিণাচরণ ডাক্তার চলে যাওয়ার পর স্ত্রীর ঘরে গিয়ে তাঁর শয্যাপ্রান্তে বসলেন। স্ত্রীর 'কপালে ধীরে ধীরে'' হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। এই স্পর্শে প্রকাশ পায় অভিমানী স্ত্রীকে শান্ত করার প্রয়াস, অন্যদিকে 'নিয়মভঙ্গ' করার অনুশোচনা। স্ত্রী বললেন, 'এ ঘর বড়ো গরম, তুমি বাহিরে যাও। তোমার বেড়াইতে যাইবার সময় হইয়াছে। খানিকটা না বেড়াইয়া আসিলে আবার রাত্রে তোমার ভূখা হইবে না।' এতো অভিমানী হৃদয় উৎসারিত ক্ষোভের কথা। শ্লেষও মিশে রয়েছে কিছুটা।

'ক্ষুধা' শব্দে কি শুধু নৈশ আহারকেই বোঝাচ্ছে? আমাদের মনে হয় প্রেমের ক্ষুধা, কামনার ক্ষুধার পরোক্ষ ইঙ্গিত রয়ে গেল স্ত্রীর বাক্যে। কার্যবিলাসী, কল্পনাপ্রবণ, দোলাচলচিত্ত স্বামীকে চিনতে তাঁর ভুল হয়নি। দক্ষিণাচরণ নিজেই বলেছেন, 'বেড়াইতে যাওয়ার অর্থ ডাক্তারের বাড়ি যাওয়া। আমিই তাঁহাকে বুঝাইয়াছিলাম, ক্ষুধাসঞ্চারের পক্ষে খানিকটা বেড়াইয়া আসা বিশেষ আবশ্যক। এখন নিশ্চয় বলিতে পারি, তিনি প্রতিদিনই আমার এই ছলনাটুকু বুঝিতেন। আমি নির্বোধ, মনে করিতাম তিনি নির্বোধ।

এ পর্যন্ত বলে দক্ষিণাচরণ থামেন। 'করতলে মাথা' রেখে চুপ করে থাকেন। কেন? অতীত স্মৃতিচারণার সূত্রে নিজের ভুল ত্রুটি নাকি কামনার বশে ঘটিয়ে ফেলা অপরাধবোধে জর্জরিত হতে থাকেন? নাকি আসন্ন চরম মুহূর্তের বর্ণনা দেওয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে সময় নেন? এসময় তাঁর জল পানের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় নিজেকে সামলানোর প্রয়াস।

একালে, বিশেষত নাটকের ক্ষেত্রে অভিনয়, শব্দ, আলোর নিপুণ ব্যবহারে ঘটনা, চরিত্র সংলাপকে জীবন্ত করে তোলা হয়। কথাসাহিত্য 'ন্যারেটিভ আর্ট' - তা শুধুমাত্র পাঠযোগ্য। সেখানে ভাষার বন্ধনে পটভূমি তথা পরিবেশকে জীবন্ত করে তোলা হয়। রবীন্দ্রনাথের 'নিশীথে' এর অনন্য নিদর্শন। শব্দ ও আলোর ভাষারূপের মাধ্যমে মিতবয়ানে সুচারু শব্দ প্রয়োগে দক্ষিণাচরণের প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুদিনের দৃশ্যপট নির্মাণ করেছেন লেখক। গল্পের অধিকাংশ ঘটনা সন্ধ্যার আবছায়া আলোহীনতার প্রেক্ষাপটে বিন্যস্ত। সেদিন হারান ডাক্তারের কন্যা মনোরমা দক্ষিণাচরণের অসুস্থ স্ত্রীকে দেখতে আসার 'ইচ্ছা প্রকাশ' করেন। এই প্রস্তাব দক্ষিণাচরণের ভালো লাগেনি। কেন? 'চিররুগণ' স্ত্রীর সামনে 'ছলছল ঢলঢল' মনোরমা উপস্থিত হলে কি সত্য প্রকাশ হওয়ার আশঙ্কা? কিন্তু প্রতিবাদেরও 'হেতু' না থাকায় সন্ধ্যাবেলায় অর্থাৎ আঁধারের সূচনা লগ্নে মনোরমা এলেন। দক্ষিণাচরণের স্ত্রীর বেদনা সেদিন অন্যদিনের চেয়ে বেড়েছিল। 'যেদিন তাঁহার ব্যথা বাড়ে সেদিন তিনি অত্যন্ত স্থির নিস্তব্ধ হয়ে থাকেন। মাঝেমাঝে 'মুষ্ঠি বদ্ধ' হওয়া ও 'মুখ নীল' হয়ে যাওয়ায় সুতীব্র বেদনার প্রকাশ। এই সামান্য চিহ্নটুকুতে তাঁর 'যন্ত্রণা' বোঝা যায়। 'সেদিন ঘরে কোনো সাড়া ছিল না' অর্থাৎ মৌখিক উচ্চারণ প্রকাশে স্ত্রী ছিলেন অসমর্থ। তাঁর অন্তর্মুখী চরিত্রের আভাস মেলে এ আচরণে। দক্ষিণাচরণ বসে ছিলেন শয্যাপ্রান্তে। সেদিন 'বেড়াতে' যাওয়ার অনুরোধ করার সামর্থ্য তাঁর ছিল না। 'হয়তো বড়ো কষ্টের সময়' স্বামীর নিভৃত সঙ্গই তাঁর ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তারও প্রকাশ ছিল না। নীরবতার ভাষাই স্ত্রীর গভীর প্রেমের বয়ান। যাতে চোখে আলো না লাগে তাই কেরোসিনের আলো রাখা ছিল দ্বারের পাশে। ঘর ছিল 'অন্ধকার ও নিস্তব্ধ'। নিস্তব্ধ অন্ধকার ঘরে স্বামী-স্ত্রী দৃশ্যগোচর নন। আলো এসে পড়েছে দরজায়। অপেক্ষমান মৃত্যুর পরিপাটি মঞ্চসজ্জা অর্থাৎ প্রবেশপথের আলো যেন দাম্পত্যে তৃতীয় ব্যক্তির প্রবেশ সূচিত করছে। মনোরমা ঘরের দরজায় দাঁড়াল। কেরোসিনের আলো মনোরমার উপর। তাই তার পক্ষে ঘরের 'আলো-আঁধারি'র মধ্যে স্পষ্ট দেখা সম্ভব নয়। দরজার সামনে দাঁড়ানো মনোরমাকে দেখে দুর্বল অবস্থায় স্ত্রী ভয় পেয়ে চমকে উঠে অস্ফুটস্বরে জানতে চাইলেন, "ও কে..... ওকে! ও কে গো?

সচেতন মনের অন্তরালে অবচেতনের গহনে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে থাকা অন্ধকারে আবৃত মনকে সঠিকভাবে চেনা যায় না। দক্ষিণাচরণও চিনতে পারেননি। তাঁর অসংযত প্রবৃত্তির অন্তরালে থাকা সুখলিপ্সা তাঁকে দুর্বলচিত্ত করেছিল। দুর্বলতায় স্ত্রীকে ফেলে তিনি সময় অতিবাহিত করেছেন ডাক্তারের বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষায়, মনোরমা সন্নিকাশে। ক্ষুধা বৃদ্ধির জন্যে ভ্রমণের অজুহাতটি যখন সশরীরে দরজায় উপস্থিত

হয়েছে, ধরা পড়ার আশঙ্কা তাঁকে মুহূর্তেই মিথ্যা বলতে প্ররোচিত করেছে। ''আমার কেমন দুর্বুদ্ধি হইল আমি প্রথমেই বলিয়া ফেলিলাম, 'আমি চিনি না'। এই 'দুর্বুদ্ধি' স্বামীর অপরাধপ্রবণ মনকে উন্মোচিত করে। দক্ষিণাচরণ 'ক্রিমিনাল' নন। সে কারণে অনুভব করেন, 'মিথ্যা বলিবা মাত্রই কে যেন আমাকে কশাঘাত করিল।' এখানে 'কে' অর্থাৎ তাঁর বিবেক দংশন সূচিত হল। পরের মুহূর্তেই বলিলাম, 'ওঃ, আমাদের ডাক্তারবাবুর কন্যা!' বাক্যটি বিস্ময়সূচক। দক্ষিণাচরণ জানতেন মনোরমা আসবে। তাহলে বিস্ময় কেন? মনোরমার আগমন পূর্বনির্ধারিত নয়, একথা বোঝাতেই কি বিস্ময়ের ছদ্ম আবরণ? স্ত্রী একবার আমার মুখের দিকে চাহিলেন; আমি তাঁহার মুখের দিকে চাহিতে পারিলাম না অর্থাৎ স্ত্রীর কাছে স্বামীর মিথ্যা ধরা পড়ল। তাই স্বামী আর স্ত্রীর সত্যদৃষ্টির প্রতি দিকপাত করতে পারলেন না। অপরাধবোধের সাময়িক অনুভূতি অবশ্য ঢাকা পড়ে গেল পরবর্তী কথায়। স্ত্রী 'ক্ষীণস্বরে' অভ্যাগতকে বললেন, 'আপনি আসুন'। দক্ষিণাচরণকে বললেন, আলোটা ধরো স্ত্রী-র সংক্ষিপ্ত, সংযত অথচ সাংকেতিক সংলাপ। অভ্যাগতকে আমন্ত্রণ অর্থাৎ দাম্পত্যে মনোরমার অনিবার্য প্রবেশ। মনোরমার সঙ্গে 'রোগিণীর' স্বল্প স্বল্প আলাপ চলতে লাগল। 'প্রাণদাত্রী স্ত্রী পুনরায় হয়ে গেলেন 'রোগিণী'। কথার মাঝেই হারান ডাক্তারের প্রবেশ। দুই শিশি ওষুধ তিনি এনেছিলেন। একটি খাবার, অন্যটি মালিশের। ডাক্তার এটুকু জানিয়ে ক্ষান্ত হলেন না। বিশেষভাবে সতর্ক করলেন, 'দুইটাতে মিলাইবেন না, এ ওষুধটা ভারি বিষ। কেবল স্ত্রীকে নয়, স্বামীকেও ওষুধ বিষয়ে সতর্ক করে ওষুধ দুটি রাখলেন 'শয্যা পার্শবর্তী টেবিল'-এ। অর্থাৎ রোগিণীর নাগালের মধ্যে। কেন? মালিশের ওষুধটি 'ভারি বিষ। তার রং নীল। নীল মৃত্যুর রং। সেই নীল বিষ ওষুধের শিশি 'শয্যাপার্শ্বে'র টেবিলে রাখা হল। এবং বিষের কথা বারবার জানানো হল। এ যেন মৃত্যুর আয়োজন। মৃত্যুর সহজতম উপায়টি জানিয়ে উপকরণ জোগাড় করে রাখা হল হাতের নাগালে। মনোরমার মনে কি সামান্য হলেও সন্দেহ উঁকি দিয়েছিল? পিতার সঙ্গে বিদায় না নিয়ে সে থেকে যেতে চাইল কেন? 'বাবা, আমি থাকি না কেন। সঙ্গে স্ত্রীলোক কেহ নাই, ইহাকে সেবা করিবে কে?' স্ত্রী অসম্মতি জানালেন। অপরিচিতের সেবা তাঁকে স্বস্তি দিত না। এটাই স্বাভাবিক। ডাক্তার কৌশলে কন্যাকে নিয়ে বিদায় নিতে কৌশলী বাক্যপ্রয়োগ করেছেন। 'উনি মা-লক্ষ্মী, চিরকাল পরের সেবা করিয়া আসিয়াছেন, অন্যের সেবা সহিতে পারে না।' বাক্যের দ্বিতীয় অংশটি অভিপ্রায়মূলক। দীর্ঘদিন অসুস্থতার কারণে স্বামীর সেবা তাঁকে গ্রহণ করতে হচ্ছে। সে সেবার মধ্যেকার ক্লান্তিও তিনি অনুভব করেছেন। অতএব, 'সেবা সহিতে পারে না'র মধ্যে ঈষৎ বিদ্রূপের সঙ্গে মিশে আছে পরোক্ষ প্ররোচনা। সেবা আর না সহ্য করে মৃত্যুকে গ্রহণ করার ইঙ্গিতে বাক্যাংটি গুরুত্বপূর্ণ। উপকরণ, উপায়ের পাশাপাশি প্ররোচনা দ্বারা আত্মহত্যার দিকে এগিয়ে দেওয়া হল সুচতুর কৌশলে। লক্ষ্যণীয়, দক্ষিণাচরণ এ অংশে নীরব। তাঁর যেন কিছুই বলার নেই। আত্মহত্যার প্ররোচনায় এই নীরবতা কি সমর্থন জোগায় না? কন্যাসহ ডাক্তারের বিদায় মুহূর্তে স্ত্রী বললেন, ''ডাক্তারবাবু, ইনি এই বদ্ধঘরে অনেকক্ষণ বসিয়া আছেন, ইহাকে একবার বাহিরে বেড়াইয়া লইয়া আসিতে পারেন?'' এ কথা তো সামান্য নয়। 'বদ্ধঘর' অর্থাৎ অসুস্থ 'চিররুগণ' স্ত্রীর সাহচর্য এবং 'বাহির' অর্থাৎ মনোরমার সান্নিধ্যে দক্ষিণাচরণের আরামের কথাই কি তিনি প্রকারান্তরে বলতে চাইলেন? অথবা স্বামীর পত্নীনিষ্ঠা, প্রেমকে শেষবারের মতো পরখ করে নিতে চাইলেন এই প্রস্তাবের মধ্যে দিয়ে? খেয়াল করে দেখুন এই সংলাপই গল্পের মধ্যে স্ত্রীর ব্যবহৃত দীর্ঘতম বাক্য। এ বাক্যে অনুরোধ নেই, দৃঢ়তার স্পষ্ট ছাপ বিনয়ের আবরণে। দক্ষিণাচরণ 'ঈষৎ আপত্তি' করে 'অনতিবিলম্বে' সম্মত হলেন।

'ঈষৎ' আপত্তির 'অনতিবিলম্বেই সম্মত হওয়া কিসের ইঙ্গিত দেয়? আসলে আপত্তি তাঁর ছিল না। মনোরমার সঙ্গে সময় কাটানোই তাঁর কাছে গুরুত্ব পেয়েছে। স্ত্রীর মৃত্যুর ইচ্ছা রূপায়িত হল সিদ্ধান্তে। উপকরণ, উপায় এনেছিলেন হারান ডাক্তার। বিদায়কালেও তিনি 'দুই শিশি' সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। তিনবার সতর্ক করার বিশেষ প্রয়োজন ছিল কি? ছিল বৈকি। হারান ডাক্তার তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যে জাল বিছিয়ে ছিলেন, সেখানে এই সতর্ক বাণী কার্যসিদ্ধিকে নিশ্চিত করেছে। হারানের অভিপ্রায়কে নিশ্চিত সুযোগ করে দিলেন দক্ষিণাচরণ। কারণ তিনি কেবল বেড়িয়েই ফিরে আসেননি। ডাক্তারের বাড়িতে আহার করে রাতে ফিরেছেন—ফিরিয়া আসিতে রাত হইল।' অর্থাৎ সন্ধ্যার আলো আঁধারি পরিণত হয়েছে জমাট অন্ধকারে। এ অন্ধকার তো দক্ষিণাচরণের অপরাধ-মনস্তত্ত্বের। স্ত্রীকে সে কেবল সুযোগ দিয়েছে তা নয়, সেই সুযোগ সদ্‌ব্যহারের জন্য দিয়েছে দীর্ঘ সময়।

দীর্ঘ সময়ের অবকাশে ঘটেছে হারাণ ও দক্ষিণাচরণের কাঙ্ক্ষিত ঘটনা। হারানের সচেতন অভিপ্রায় ও দক্ষিণাচরণের অবচেতনের কামনা তো একই। বাড়ি ফিরে স্ত্রীকে 'ছটপট' করতে দেখে অনুতপ্ত হয়েছেন স্বামী। ডাক্তার ডেকেছেন। 'প্রথমটা আসিয়া অনেকক্ষণ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।' কিন্তু কেন? 'অনেকক্ষণ' সময় অতিবাহিত করা কি অভিপ্রেত লক্ষ্যপূরণের জন্য? ডাক্তার সত্য জানতেন। তাই অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলেন। ''অবশেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সেই ব্যথাটা কি বাড়িয়া উঠিয়াছে। ঔষধটা এতোবার মালিশ করিলে হয় না?' ডাক্তারের একথায় খটকা লাগে। একবার মালিশ করিলে হয় না? অর্থাৎ কথার মধ্যে ভীতির প্রবাহ, দোলাচলতা। টেবিল থেকে ওষুধের শিশিটা নিয়ে দেখলেন, সেটা খালি। এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, ''আপনি কি ভুল করিয়া এই ওষুধটা খাইয়াছেন?'' মালিশের ওষুধটি স্ত্রী ভুলবশত খেয়েছেন, একথা আলাদা করে প্রমাণ করার তাগিদ কেন? ডাক্তার বাড়ি ছুটলেন পাম্প আনতে। স্বামী অর্ধমূর্ছিতের ন্যায়' স্ত্রীর বিছানার উপর গিয়ে পড়লেন। পীড়িত শিশুকে মা যেমন করে সান্ত্বনা দেয়, তেমনি করে স্বামীর মাথা নিজের বক্ষের কাছে টেনে দুই হাতের স্পর্শ দিয়ে যেন নিজের মনের কথা বারবার বলতে লাগলেন, 'শোক করিয়ো না, ভালোই হইয়াছে, তুমি সুখী হইবে, এবং সেই মনে করিয়া আমি সুখে মরিলাম।' সুস্থ অবস্থায় স্বামীকে সেবা নিয়ে তার প্রাণরক্ষা করেছিলেন, অসুস্থ দশাতেও স্বামীর সুখের-স্বাস্থ্যের প্রতি নজর দিয়েছেন। স্বামীর সুখের কারণেই তিনি আত্মত্যাগ করলেন।

দক্ষিণাচরণ মনোরমাকে বিবাহ করে দেশে ফিরলেন। মনোরমা পিতার সম্মতিক্রমে বিবাহ করল। অর্থাৎ মনোরমাকে বিবাহ করায় দক্ষিণাচরণের যে আগ্রহ ছিল, মনোরমার কি তা ছিল না? পিতার ইচ্ছাক্রমে, তাকে বিবাহ করতে হল। তাই কি বিবাহের পরে দক্ষিণাচরণের আদরের কথায়, প্রেমালাপে সে হাসত না, গম্ভীর হয়ে থাকত? ''তাহার মনের কোথায় কোনখানে কী খটকা লাগিয়াছিল, আমি কেমন করিয়া বুঝিব?' তবে কি মনোরমা গোপন ষড়যন্ত্রের কোনো আভাস পেয়েছিল? না কি দুর্বল চিত্ত দক্ষিণাচরণকে বিশ্বাস করতে পারেনি। মনোরমার গাম্ভীর্য আর 'ঘটকা'ই কি তাহলে বাড়িয়ে তুলল দক্ষিণাচরণের মদের নেশা — ''এই সময় আমার মদ খাইবার নেশা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল।'' লক্ষণীয় গল্পে এই বাক্যটি একা একটি পৃথক অনুচ্ছেদ। অর্থাৎ লেখক বাক্যটিকে পৃথক গুরুত্ব দিয়েছেন। মদ্যপানের নেশা বেড়ে যাওয়ার অন্তরালে রয়েছে বিবেক দংশন কিংবা অপরাধ-বোধের আলোড়ন। অর্থাৎ তাঁর মনের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলছে।

'শরতের সন্ধ্যায়' মনোরমাকে নিয়ে বরানগরের বাড়ির বাগানে দক্ষিণাচরণ বেড়াতে বেড়িয়েছেন। কিন্তু

সন্ধ্যার রূপ ভিন্ন। আলো-আঁধারির পরিবর্তে 'ছমছমে' অন্ধকার। 'ঘনছায়াবৃত' ঝাউগাছের সশব্দ কম্পন শোনা যায়। 'ছমছম' শব্দে ভৌতিক আবহ তৈরির প্রয়াস। ভ্রমণ-ক্লান্ত মনোরমা শয়ন করলেন সেই 'বকুলতলার শুভ্র পাথরের বেদির' উপর। দক্ষিণাচরণ সেদিন মদ্যপান করে 'বেশ একটু তরলাবস্থা' প্রাপ্ত হয়েছিলেন। কৃষ্ণপক্ষের জ্যোৎস্না মনোরমার মুখের উপর পড়লে তিনি হঠাৎ আবেগবিষ্ট হয়ে পড়লেন। আমি আর থাকিতে পারিলাম না। কাছে আসিয়া দুই হাতে তাহার হাতটি তুলিয়া ধরিয়া কহিলাম, 'মনোরমা, তুমি আমাকে বিশ্বাস করো না, কিন্তু তোমাকে আমি ভালোবাসি। তোমাকে আমি কোনোকালে ভুলিতে পারিব না।' এ যেন পুরোনো নাটকের পুনরাভিনয়। একই রঙ্গমঞ্চে। নিজ বাক্য শ্রবণে তাই নিজেই চমকে উঠেছেন। সেই মুহূর্তে এক ঝাঁক পাখির ডানা ঝাপটিয়ে উড়ে যাওয়ার শব্দ অপার্থিব হাসির মতো মনে হয়েছে দক্ষিণাচরণের। সেই 'মর্মভেদী হাসি'র মধ্যেকার 'অভ্রভেদী হাহাকার' তাঁর মর্মস্থলকে স্পর্শ করেছে। অর্থাৎ প্রথমা স্ত্রীর ভালোবাসার প্রতিদানে অবহেলা করার পাপবোধ তাঁকে সম্পূর্ণ গ্রাস করেছে। দিনের বেলায় স্বাভাবিক থাকলেও, রাতের অন্ধকারে অবচেতনের গভীর থেকে জেগে উঠে ভয়। 'অবশেষে এমন হইল, সন্ধ্যার পর মনোরমার সহিত একটা কথা বলিতে আমার সাহস হইত না।' মৃত স্ত্রীর হাসি, যা তাঁর প্রণয়াবেগকে প্রতিহত করত, সেই হাস্যধ্বনি আরোপিত হল পাখির ডানা ঝাপটানোর ধ্বনির সঙ্গে। অপরাধবোধের তাড়নায় অন্ধকারের আলেখ্য জীবন্ত হয়ে আচ্ছন্ন করতে লাগল দক্ষিণাচরণকে। এটি তার মানসিক বিকারের প্রথম পর্যায়।

বরানগরের বাড়ি ছেড়ে বোটে তারা ভেসে চললেন। গঙ্গা ছাড়িয়ে, খ'ড়ে অর্থাৎ জলঙ্গী ছাড়িয়ে পদ্মায় পৌঁছলেন। কৃষ্ণপক্ষের ভয় তিরোহিত হয়ে শুক্লপক্ষের আলোয় দাম্পত্য সুখের সূচনা হল। কিন্তু তা সাময়িক। মরিচীকা মাত্র। পদ্মার চরে শুক্র 'জ্যোৎস্নাবিকশিত' মনোরমার মুখে চুম্বনের আবেশ মেলানোর আগেই 'চরবিহারী জলচর পাখির ডাক-এ ধ্বনিত হল, 'ওকে? ও কে? ও কে?'। রোগশয্যায় স্ত্রীর ওই প্রশ্নবাক্য তাঁর নিজের অজ্ঞাতসারেই তার অবচেতনকে অধিকার করল। দক্ষিণাচরণের ভীতি সঞ্চারিত হল মনোরমায়। আমি চমকিয়া উঠিলাম, আমার স্ত্রীও কাঁপিয়া উঠিলেন। বোটে ফিরে মনোরমা 'শ্রান্ত শরীরে' অবিলম্বে ঘুমিয়ে পড়লেও দক্ষিণাচরণের অবচেতনের অপরাধবোধ, ভয় রূপ পরিগ্রহ করল— তখন অন্ধকারে কে একজন আমার মশারির কাছে দাঁড়াইয়া সুষুপ্ত মনোরমার দিকে একটিমাত্র দীর্ঘ শীর্ণ অস্থিসার অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া যেন আমার কানে কানে অত্যন্ত চুপিচুপি অস্ফুটকণ্ঠে কেবলই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, 'ও কে? ও কে? ও কে গো?' ভীত দক্ষিণাচরণ আলো জ্বালালেন। হা হা ধ্বনির স্মৃতি তাঁর মস্তিষ্কের প্রতিকোণে ব্যাপ্ত হতে লাগল। প্রশ্নবাক্য ও হাস্যধ্বনির যুগ্ম সঞ্চার ঘটে গেল দক্ষিণচরণ-এর অবচেতনে। উৎসেচকের ভূমিকা নিল রাতের অন্ধকার। অন্ধকারে তাঁর মানসিক বিকারের এতই প্রাবল্য যে রক্তস্রোতে, হৃৎযন্ত্রের তালে তালে, ঘড়ির কাঁটায় পরিচিত প্রশ্নবাক্য তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর হয়ে ওঠে, যা আতঙ্কের প্রতিরূপ। 'নিশীথে' গল্পের সঙ্গে 'মধ্যবর্তিনী' মৃতবালিকা শৈলর স্বামী-স্ত্রীর মাঝে অবস্থানের প্রসঙ্গটির সঙ্গে সাদৃশ্য অনুভূত হয়। এখানেও প্রথমা স্ত্রী যেন মৃত্যুর পর দক্ষিণাচরণের ভয়ার্ত অবচেতনে রয়ে গেল।

অসহনীয় সুতীব্র এই ভীতি যন্ত্রণার বর্ণনা দিতে দিতেও দক্ষিণাচরণ 'পাংশুবর্ণ' হয়ে যান। এমন সময় কেরোসিন শিখা নিভে যায়। আলো ফোটে। কাক ডাকে। প্রভাতের সূচনায় 'ভয়ের চিহ্ন' থাকে না। দক্ষিণাচরণবাবুর মুখের ভাবও যায় বদলে। 'রাত্রির কুহকে', 'কাল্পনিক শঙ্কার মত্ততায়' ডাক্তারকে (ইনি

হারান ডাক্তার নন) এত কথা বলে ফেলায় যুগপৎ লজ্জিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে দ্রুত প্রস্থান করলেন। গল্প এখানেই শেষ হতে পারত। কিন্তু তা হয়নি। সে দিন রাতেই দক্ষিণাচরণবাবু পুনরায় অর্ধরাত্রে ডাক্তারের দরজায় উপস্থিত হলেন। অর্থাৎ পুনরাবর্তনের না শেষ হওয়া বৃত্তাকার ব্যূহ রচনা করলেন লেখক। গল্প আবার পৌঁছে গেল আরম্ভে, যা পাপবোধের মানসবিকারে বন্দি দক্ষিণাচরণের নিদানহীন পরিণতিকে ব্যক্ত করে।

১৮.৫ গল্পের নামকরণ প্রসঙ্গে

নামের মধ্য দিয়েই রচনার সঙ্গে পাঠকের প্রথম পরিচয়। নামের নিশানে মেলে গল্পের ঠিকানা। 'নিশীথে' অর্থাৎ রাত্রে। গল্প নামেই অন্ধকারের অম্লান উপস্থিতি। সায়াহ্নের আলো-আঁধারি নয় 'নিশীথে' শব্দে মধ্যযামের গাঢ় অন্ধকারের দ্যোতনা। গল্পনামে দ্বিমাত্রিকতা। এক অর্থে রাত্রির আঁধার, অন্য অর্থে মানব মনের অবচেতনের গূঢ় অন্ধকার-নিশীথের মধ্যে যার ব্যঞ্জনা। নামের মধ্য দিয়ে মূল গল্পের আদলটা আভাসিত হয়, পাঠকের মনে জাগে প্রত্যাশা। গল্পপাঠে এই প্রত্যাশা পূরণে ঘটে গল্পনামের সার্থকতা।

'নিশীথে' শব্দটি শুনলেই অন্ধকারের আবহ ভেসে ওঠে মানসপটে। এ গল্পের সূচনা, সমাপ্তি, এমনকি প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সংঘটনকাল রাত্রি। অন্ধকারের মাধুর্য ও ভয়াবহতা দুয়ের রূপ নির্মাণ করেছেন লেখক। গল্পটি মূলত দাম্পত্য সমস্যার। কাব্যের প্রেমিকাকে গৃহিণীর মধ্যে অনুসন্ধানে ব্যর্থ দক্ষিণাচরণের মানসিক বিকারের গল্প 'নিশীথে'। ব্যর্থতার একাকীত্ব স্ত্রীর অসুস্থতার অবকাশে অন্যাসক্তিতে মুক্তি খোঁজে। সেই সন্ধান পক্ষান্তরে ইন্ধন জোগায় স্ত্রীর আত্মহত্যায়। দ্বিতীয় স্ত্রীর আগমন ঘটে। হৃদয়বৃত্তির তীব্রতার অন্তরালে থাকা পাপবোধ কৃতকর্মের জন্য পীড়া দিতে শুরু করে। অবচেতনের অন্ধকার ঘনীভূত হতে থাকে। রাতের অন্ধকারের অবকাশে চলে তার অবাধ পক্ষবিস্তার। অপরাধবোধ জনিত ভয় নৈশান্ধকারে বিকারে রূপান্তরিত হয়। গল্পের বয়নশিল্পে মিশে থাকে প্রকৃতির অন্ধকার ও মনস্তাত্ত্বিক অন্ধকার।

১৮.৬ চরিত্র আলোচনা

'নিশীথে' গল্পে চরিত্রের সংখ্যা স্বল্প। দক্ষিণাচরণ, প্রথমা স্ত্রী, হারান ডাক্তার ও মনোরমা। এছাড়া দক্ষিণাচরণ যাঁর কাছে জীবন কথার আদ্যোপ্রান্ত বিবৃতি দিয়েছেন, সেই ডাক্তারও গল্পের চরিত্র। তিনিই গল্পের প্রথম কথক, প্রথম শ্রোতাও বটে কিন্তু তিনি প্রায় 'অদৃশ্য মানুষ'। দক্ষিণাচরণের পদস্খলনের গল্প যেন 'জাদু' করে বের করে এনেছেন। এই ডাক্তার আসলে সাইক্রিয়াটিস্ট।গল্পের আবর্তন কেন্দ্রে রয়েছেন দক্ষিণাচরণ। তিনিই গল্পের প্রধান কথক, কাহিনির নায়ক। তাঁর মানসসত্তা দ্বিখণ্ডিত। তিনি জীবনকে দেখেছিলেন কাব্যের মায়া অঞ্জন লাগিয়ে। 'বসন্তের চশমা' চোখে। তাঁর ভাবনার ফ্রেমে ধরা পড়েছে গল্পের সকল চরিত্র। এমনকি তিনি নিজেও। বইপড়া রোম্যান্টিক ভাবনা-চিন্তার বশবর্তী হয়ে জীবনের প্রকৃত প্রেম-ভালোবাসা তিনি চিনতে পারেননি। তাঁর প্রেমের প্রকাশে এসে যেত কাব্য পাঠের মেলোড্রামাটিক নকলনবিশি। প্রথমা স্ত্রী তা বুঝতেন বলেই স্বামীর আচরণের ছেলেমানুষী হাসির উদ্রেক ঘটাত। দক্ষিণাচরণের ভাবালুতাও প্রতিহত হত সেই হাসির কাছে। ফলে অতৃপ্তি, হতাশা, হীনম্মন্যতা ঘনীভূত হচ্ছিল দক্ষিণাচরণের মধ্যে। তাই 'প্রাণদাত্রী' স্ত্রীর আরোগ্যহীন অসুস্থতায় একদিকে কাব্য-উপন্যাসের নিঃস্বার্থ হৃদয়, ত্যাগী আদর্শ নায়ক হবার প্রয়াস

অন্যদিকে জীবন-যৌবনের দাবিতে তাঁর মধ্যে দুই বিপরীত স্রোতের টানাপোড়ন শুরু হল।।

মানুষ তার নিজের মনের অনেক কিছুই জানে না। সচেতন মনের অন্তরালে থাকা অবচেতনে প্রতিনিয়ত ডুব দেয় অসংখ্য কথা, ঘটনা, দৃশ্য, শব্দ — ব্যক্তির নিজেরই অজান্তে। গোপন, গহন, অন্ধকারাবৃত এই মন নিশীথের সঙ্গে তুলনীয়। মনের নিভৃতে স্বীয় অপরাধের গ্লানি, বিকারের পথে জেগে ওঠে অন্ধকারে। দক্ষিণাচরণ নিজের কৃতকর্মের জন্য নিজেকেই ক্ষমা করতে পারেনি। এই ক্ষমাহীনতাই পাপবোধ, অপরাধবোধে রূপান্তরিত হয়ে মানসিক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে।

দীর্ঘদিন সেবার মধ্যেকার 'আন্তরিক ক্লান্তি' মনোরমার আগমনে তাকে প্রকৃতই স্খলনের দিকে ঠেলে দিল। 'চিররুগণ' স্ত্রীর সেবায় সে ভিতরে ভিতরে যেমন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, তেমনি প্রবৃত্তির তাড়নাও তৃষ্ণার্ত করে তুলেছিল। দক্ষিণাচরণ- এর চরিত্রের মূলে রয়েছে অতৃপ্তি। কিন্তু সে ক্রিমিনাল নয়। তাই 'প্রবৃত্তির তাড়না', সুখ-লিপ্সার বাসনা তার বিবেকের কাছে নিষ্ঠুর, অমানবিক রূপে বিশেষায়িত হয়েছে। অপরাধবোধ জনিত বিবেক দংশনের দু-একটি চিহ্ন মাত্র বাইরে অনুভূত। যা আসলে ইদ্ আর ইগোর সংঘাত। স্ত্রীর প্রশ্নের জবাবে মনোরমাকে প্রথমে চিনতে অস্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গেই বিবেকের 'কশাঘাত'। কিন্তু স্বীয় কৃতকর্মের অধিকাংশ 'দুবুদ্ধি'ই জমা পড়েছে মনের অতলে। তারই পরোক্ষ সমর্থনে, প্ররোচনায় স্ত্রীর আত্মহত্যার দায় থেকে দক্ষিণাবাবু নিজেকে অব্যাহতি দিতে পারলেন না। নায়িকা ভেদে একই মঞ্চে একই সংলাপের সাড়ম্বর প্রকাশে তাঁর নিজেরই চমক লাগে। অর্থাৎ 'ভীষণ বিবেক' জাগ্রত হয়। অন্ধকারের আপাত নিরীহ পাখির ডানা ঝাপটানো ও পাখির চকিত স্বরে মৃত স্ত্রীর হাস্যধ্বনি এবং 'ও কে? ও কে? ও কে গো?' প্রশ্নবাক্য দক্ষিণাচরণের অবচেতনে ধ্বনি সাম্য তৈরি করে জুড়ে যায় নিবিড়ভাবে। এই 'স্বকপোলকল্পিত বিভীষিকা' থেকে তাঁর নিষ্কৃতি নেই।

'নিশীথে' গল্পে দক্ষিণাচরণের প্রথমা স্ত্রী প্ররোচিত হয়েছিলেন আত্মহত্যায়। প্ররোচনা প্রধানত দিয়েছেন হারান ডাক্তার। এলাহাবাদে তিনিই নিয়েছিলেন দক্ষিণাচরণবাবুর অসুস্থ স্ত্রীর চিকিৎসার দায়িত্ব। হারান ডাক্তার মাঝে মাঝেই বলতেন, যাদের আরোগ্যের আশা নেই, তাদের মৃত্যুই শ্রেয়। এই কথায় একধরনের প্ররোচনা আছে। তেমনি রোগ যন্ত্রণায় কাতর দক্ষিণাচরণবাবুর স্ত্রীর শয্যা পার্শ্ববর্তী টেবিলে মালিশের ও খাবার—দুই ওষুধই রাখলেন এবং মালিশের ওষুধটি যে বিষ, তা বারবার স্মরণ করিয়ে দেওয়ার মধ্যেও রয়েছে প্ররোচনা। স্ত্রীর বিষপানের পর দক্ষিণাচরণবাবুর ডাকে ডাক্তার এসে প্রথমেই অকারণ ব্যয় করেছেন অনেকটা সময়। এ আসলে বিষক্রিয়া নিশ্চিত করা। মৃত্যু নিশ্চিত করা। স্ত্রীর মৃত্যুর পর ডাক্তারেরও প্রয়োজন ফুরিয়েছে। হারান একাধারে পিতা, আবার সে চিকিৎসক। চিকিৎসক হিসেবে প্রাণরক্ষার পরিবর্তে প্রাণহরণের অভিপ্রায় পোষণ ও তা সম্পাদনের মাধ্যমে সে হত্যাকারীতে পরিণত হয়েছে। সে অত্যন্ত সাবধানী। পরিস্থিতি ও মনোগত ইচ্ছা বুঝে হারান তার উদ্দেশ্য সিদ্ধি করেছে। প্রকৃতপক্ষে সেই অপরাধী। অবশ্য অপরাধের কোনো প্রমাণ সে রাখেনি। ফলতঃ বিবেক দংশন তারও হওয়ার কথা। কিন্তু তা দেখানো লেখকের উদ্দেশ্য নয় এবং তার মানসিক গঠনে কোথায় ইদ্ ও ইগোর দ্বন্দ্ব বা Conflict দেখা যায়নি।

দক্ষিণাচরণবাবুর প্রথমা স্ত্রীর মতো 'গৃহিণী অতি দুর্লভ ছিল'। কিন্তু সখী, মিত্র, সচিব হয়ে উঠতে তিনি পারেননি। তবুও তাঁর স্বামী সেবায়, পতিনিষ্ঠায় খামতি ছিল না। তাঁর 'হাসিবার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল।' সেই

হাসির কাছে দক্ষিণাচরণের প্রেম বিহ্বল আবেগ সম্ভাষণ অপদস্থ হত। কঠিন রোগে আক্রান্ত দক্ষিণাচরণবাবুর অবিরাম সেবার মধ্যে তাঁর মাতৃপ্রতিম, স্নেহবৎসল রূপটি প্রকাশিত। তিনি নিজে সন্তানের জননী হতে পারেননি। কিন্তু তাঁর চরিত্রে স্নেহপ্রবণতার ভাগটি ছিল প্রবল। তাঁর প্রণয়ও ছিল স্নেহ রসে সিক্ত। মৃত্যুশয্যাতেও পীড়িত শিশুর মতো স্বামীর মাথা আপন বক্ষে টেনে সান্ত্বনা দিয়েছেন। স্বীয় রোগশয্যায় সুস্থতা অসম্ভব জেনে স্বামীকে দ্বিতীয় বিবাহের প্রস্তাব দেওয়ায় তাঁর উদারতার প্রকাশ। স্বামী অন্যসক্তা, তা অনুভব করেও বাহ্যত মান-অভিমান করেননি। এ আচরণে প্রকাশ পায় তাঁর অন্তরের আভিজাত্য। মনোরমাকে দেখার পর স্বামীর পদস্খলন স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাঁর কাছে। অসুস্থ যাপনের চেয়ে মৃত্যুই তাঁর কাছে সম্মানের বলে মনে হয়। বেশি কষ্টের দিনে তাই স্বামীর ভালোবাসা যাচাই করতে হারান ডাক্তারকে বলেছিলেন, স্বামীকেও বেড়িয়ে আনতে। কিন্তু মন থেকে স্বামীর বেড়াতে যাওয়া চেয়েছিলেন কি? স্বামীর বেড়াতে যাওয়া আর ফিরতে দেরি হওয়ায় নিজের অনাকাঙ্ক্ষিত উপস্থিতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে নিজেরই কাছে। বিষপানে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে স্বামীর সুখকে তিনি পথ করে দিলেন। আদ্যন্ত পতিনিষ্ঠ প্রথমা স্ত্রী চরিত্রটি স্বামীকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। 'অবিমিশ্র গৃহিণী'র বাইরে তার আরও একটি বিচরণশীল মন ছিল। গঙ্গারধারের বাড়িতে সাধারণ দেশী জুঁই-বেল-গোলাপ গন্ধরাজ-করবীর ছোট বাগান করা, মার্বেল বাঁধানো বকুল বেদী নিজ হাতে ধোয়া, গরমকালের সন্ধ্যায় কাজের অবকাশে গঙ্গা দেখার মধ্যে সেই মনের প্রকাশ। কিন্তু তাকে তিনি নিভৃতই রাখতে চেয়েছেন।

১৮.৭ অতিপ্রাকৃত না কি মনস্তাত্ত্বিক— কোন শ্রেণির গল্প?

'নিশীথে' গল্পটিকে কেউ কেউ অতিপ্রাকৃত বললেও অনেকেই একে মনস্তাত্ত্বিক গল্প রূপে চিহ্নিত করেছেন। অতিপ্রাকৃতের ছদ্মবেশে এ গল্প ফ্রয়েডের free association এর মধ্য দিয়ে মনোবিকারের জটিল সমস্যাকে তুলে ধরে। রবীন্দ্রনাথের প্রত্যেকটি অতিপ্রাকৃত গল্পে আছে অতিলৌকিক প্রতীতি জাগানোর প্রয়াস। তার সঙ্গে মিশে গেছে ব্যক্তির সাময়িক হ্যালুশিয়েসন। এই বিভ্রম কখনো দৃশ্যময়, কখনো শ্রুতিগ্রাহ্য। নিশীথে গল্পে দৃশ্য ও শ্রুতি উভয় বিভ্রম জাত চিত্তবিকারের উল্লেখ রয়েছে। এডগার এলান পো'র গল্পে এ ধরনের 'বিভ্রান্ত ভগ্নপ্রায় সত্তার' দেখা পাওয়া যায়। The fall of the House of Usher" গল্পের Roderick চরিত্রের কথা মনে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের "অতিপ্রাকৃত" গল্পগুলি ওয়াল্টার অ্যালেন কথিত "Disintegration of the human psyche" র অনন্য নিদর্শন। এগুলি নিঃসন্দেহে সাধারণ মোটা দাগের ভূতের গল্প বা Horror Story থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ব্যক্তি মানুষের অন্তর্দ্বন্দ্ব কিংবা বিবেক তাড়িত অন্তরসত্তার বা কামনায় বিক্ষত গূঢ় চেতনার twilight সিচুয়েশন গল্পে আত্মপ্রকাশ করেছে ভয় জাগানো অন্ধকারের মধ্য দিয়ে। শয্যাগত স্ত্রীর জীবিত অবস্থাতেই অন্য নারীর প্রতি গোপন আকর্ষণ, স্ত্রীর মর্মান্তিক মৃত্যু, তার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই মনোরমাকে বিবাহ এবং প্রেমালাপের একই পুনরুচ্চারণ— দক্ষিণাচরণের বিবেকবান সত্তাকে নিরন্তর পীড়িত করে ক্ষান্ত হয়নি, বরং ইদ ও ইগোর ভারসাম্য বিনষ্ট করেছে।

Real Hallucinations নিত imaginary অর্থাৎ আপাত বিপরীত উপাদানের মেলবন্ধন ঘটে অতিপ্রাকৃত গল্পে। কাহিনির অন্দরে প্রবেশ করলে দেখা যাবে অচেনা রহস্য-ছায়া নির্মিত আলো-আঁধারির পথ বেয়ে চরিত্রের অন্তর্জগতের উন্মোচন ঘটে। যা একান্ত বাস্তব। মনের দ্বিধা জটিল রূপটি আরোপিত হয় পরিবেশে।

পাঠক মনে শিহরণ জাগে। পরিবেশের অন্ধকার ও 'মনস্তাত্ত্বিক অন্ধকার' একাত্ম হয়ে যায়। মোপাসাঁর কথায়, "The higherorder of resists should rather call themselves Illusionists." দ্বিতীয় বিবাহের পরে বিহ্বল প্রণয়সম্ভাষণে মনোরমার গম্ভীর হয়ে থাকা দক্ষিণাবাবুর মানসিক বিপন্নতা আরও বাড়িয়ে তোলে। মদ্যপান বেড়ে যাওয়ায় তার বহিঃপ্রকাশ। উড়ন্ত রাতপাখির ডানা ঝাপটানোর শব্দকে নৈতিক শিথিলতার প্রতি অট্টহাস্য বলে। মনে হয়েছে চিত্ত-বিকারের প্রেক্ষাপটে। 'সেদিনও বৈকালে আমি কিছু মদ খাইয়াছিলাম'- দক্ষিণাবাবুর কথায় স্পষ্ট তাঁর অতিপ্রকৃত শ্রুতির অপর কারণ মদ্যপান।

লেখক নিজেও এই গল্পকে অতিপ্রাকৃত হিসেবে গড়ে তুলতে চাননি। চাইলে 'হাহা হাহা' ধ্বনি কিংবা 'ওকে? ওকো? ও কে গো?' প্রশ্নবাক্যের অন্তরালে থাকা সত্যতা উড়ন্ত পাখির ডানা ঝাপটানো ও জনশূন্য পদ্মাচরের জলচর পাখিদের ডাকের কথা পাঠকের সামনে তুলে ধরতেন না। এই দুটি বিশেষ শব্দগুচ্ছের বারবার প্রয়োগ একধরনের effect সৃষ্টি করে এবং প্রতিধ্বনির এই অবিশ্রান্ত আঘাতে দক্ষিণাবাবুর মানসিকতা ক্ষত-বিক্ষত হয় দুঃসহ বিবেক যন্ত্রণায়। চরিত্রের Incalculability তুলে ধরে পাঠক মনে অনিঃশেষ চেতনা জাগিয়ে তোলার প্রয়াসে গল্প সফল।

১৮.৮ সারাংশ

রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পগুলির মধ্যে 'নিশীথে' অন্যতম। অতিপ্রাকৃতের অবয়বে দেখা যায় দাম্পত্য সমস্যার মনস্তাত্ত্বিক উন্মোচন। উত্তমপুরুষের জবানীতে লেখা এ গল্প দক্ষিণাচরণবাবুর কৃতকর্মের স্বীকারোক্তি। অসংহত কামনার পরিণামে ভয়, অপরাধবোধের মধ্য দিয়ে মনের গভীরে জন্ম নেয় বিকার। সেই বিকারগ্রস্ত মনের বহিঃপ্রকাশ ঘটে ব্যক্তির আচরণে, শ্রবণে, দর্শনে। কাব্যরসাসিক্ত কাল্পনিক রোমান্সের ধারণায় সৃষ্ট দক্ষিণাচরণ প্রণয়াবেগ প্রথমা স্ত্রীর স্নেহসিক্ত মানসিকতার কাছে আত্মপ্রকাশের সুযোগ পেত না। দুজনের অসম মানসিকতা তাদের দাম্পত্যে বিঘ্ন ঘটায়। তদুপরি দক্ষিণাবাবুর অসুস্থতায় তাঁকে সেবায় যত্নে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনতে পারলেও প্রথমা স্ত্রী নিজেই নিরাময়হীন অসুখের শিকার হন। সেবার ইচ্ছা থাকলেও স্বভাবধর্মের কারণেই বায়ু পরিবর্তনে এলাহাবাদে এসে মনোরমার প্রতি দক্ষিণাচরণের আকর্ষণ প্রথমা স্ত্রীকে স্বেচ্ছামৃত্যু গ্রহণে একপ্রকার বাধ্য করে। দ্বিতীয় বিবাহেও শান্তি পান না দক্ষিণাচরণ। মনের মধ্যে জেগে ওঠে অপরাধবোধ। পরিবেশের অন্ধকার ও মনের অন্ধকার মিলেমিশে মানসিক বিকারগ্রস্ত করে তোলে দক্ষিণাচরণকে।

১৮.৯ অনুশীলনী

অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

ক) 'নিশীথে' গল্পটি কবে, কোন পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়?

খ) এলাহাবাদের ডাক্তার ও তার কন্যার নাম কী?

গ) গল্পে উল্লিখিত শ্লোকটি কার লেখা, কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত?

ঘ) দক্ষিণাচরণ ডাক্তারের কাছে কখন এসেছিল?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

ক) 'ও কে? ও কে? ও কে গো?' 'নিশীথে' গল্পে উক্তিটির বারংবার ব্যবহারের মধ্য দিয়ে গল্পকার কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে চেয়েছেন? খ) 'নিশীথে' গল্পের হারান ডাক্তারের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হত্যাকারী সত্তার সন্ধান মেলে— গল্পের নিরিখে উক্তিটির সত্যতা বিচার করো।

গ) "আজ হইতে শেষ পর্যন্ত কেবলই আশাহীন সুদীর্ঘ সতৃষ্ণ মরুভূমি"— উক্তিটি কার? তাঁর এরূপ উক্তির কারণ কী?

(ঘ) "এই সময় আমার মদ খাইবার নেশা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়া ছিল" — কার মদ খাবার নেশা কেন বেড়ে উঠেছিল?

রচনাধর্মী প্রশ্ন

ক) "সেইদিনই অর্ধরাত্রে আবার আমার দ্বারে আসিয়া ঘা পড়িল" গল্পের পরিপ্রেক্ষিতে কথাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো। ছোটোগল্পের শিল্পরূপের দিক থেকে পরিসমাপ্তিসূচক বাক্যটি কতখানি যথোপযুক্ত হয়েছে, বুঝিয়ে দাও।

খ) 'নিশীথে' গল্পের দক্ষিণাচরণ চরিত্রটি অপরাধবোধজনিত মানসিক অসুস্থতার শিকার — বক্তব্যের আলোকে চরিত্রটি পরিস্ফুট করো।

গ) 'নিশীথে' গল্পের প্রাকৃত রসাবেদন অতিপ্রাকৃতকে কীভাবে ছাপিয়ে গেছে তা সংক্ষেপে আলোচনা করো।

ঘ) 'নিশীথে' গল্পটির নামকরণের সার্থকতা আলোচনা করো।

ঙ) কবিকল্পনাশ্রয়ী মণ্ডনশিল্প ও নির্জন রহস্যময় নিসর্গের নিবিড় সংযোগ অনিবার্য প্রভাব ফেলেছে রবীন্দ্র গল্পে 'নিশীথে' ছোটোগল্পের প্রেক্ষিতে উক্তিটির যথার্থ ব্যাখ্যা করো।

১৮.১০ সহায়ক গ্রন্থ

ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দশম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি

খ) তপোব্রত ঘোষ, *রবীন্দ্র-ছোটগল্পের শিল্পরূপ*, দে'জ পাবলিশিং

গ) প্রমথনাথ বিশী, *রবীন্দ্র ছোটগল্প*, মিত্র ও ঘোষ

ঘ) ক্ষেত্র গুপ্ত, *রবীন্দ্র গল্পঃ অন্য রবীন্দ্রনাথ*, গ্রন্থনিলয়

ঙ) অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, *সাধনা ও সাহিত্য*, দে'জ পাবলিশিং

চ) গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, *রবীন্দ্রনাথঃ ছোটগল্প প্রকরণ শিল্প*, সাহিত্যলোক

একক-১৯ □ অতিথি : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গঠন

১৯.১ উদ্দেশ্য
১৯.২. প্রস্তাবনা
১৯.৩. গল্পের উৎস সন্ধানে
১৯.৪. গল্পের বিশ্লেষণাত্মক পাঠ
১৯.৫. প্রাসঙ্গিক আলোচনা
১৯.৬. সারাংশ
১৯.৭. অনুশীলনী
১৯.৮. সহায়ক গ্রন্থ

১৯.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যাবে। বিশেষত একটি অসামান্য যুগাতিক্রমী রবীন্দ্র গল্পের সঙ্গে পরিচয় ঘটবে। মানবজীবনের একটি নিগূঢ় ভাবসত্যের সঙ্গে পরিচিত হবে। শিক্ষার্থীরা উপলব্ধি করতে পারবে গল্পকারের নিজস্ব জীবনবোধ। প্রকৃতি-মানবের পারস্পরিক বন্ধনের মধ্য দিয়ে পরিপূরক সম্পর্কের ধারণা লাভ করতে সক্ষম হবেন শিক্ষার্থীরা। গল্পপাঠের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হল পাঠকৃতি। এই এককে পাঠকৃতি ও সেইসঙ্গে চরিত্র বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে দেখান হয়েছে এই গল্পের শিল্পরূপতা। শিক্ষার্থীরা মূল গল্প পাঠের সঙ্গে সঙ্গে এককটি পাঠ করলেই সেই শিল্পরূপের সন্ধান পাবেন।

১৯.২ প্রস্তাবনা

একটি গল্পকে বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গিতে পাঠ করতে গেলে কয়েকটি বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজন— কাহিনি অংশ, চরিত্রনির্মাণ, শিল্পরীতি ও লেখকের নিজস্বতা। এই চারটি বিষয়কে অবলম্বন করে গল্পের অন্দরে প্রবেশ করা হবে। প্রসঙ্গক্রমে চরিত্রের অন্তর্লোকে অবগাহনের মধ্য দিয়ে বয়ঃসন্ধিক্ষণের বিশেষ মানসিকতা, পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতার জগৎ ও বোধের জগতের সঙ্গে বাস্তবতার সংযোগ অনুসন্ধান করা যাবে।

১৯.৩ গল্পের উৎস সন্ধানে

অনন্তকাল ধরে বহমান জলধারার অসীম রহস্য মানবের প্রবহমান রক্তস্রোতে সঞ্চারিত করে চলেছে দুর্নিবার আকর্ষণ। জমিদারি পরিদর্শনের কাজে দীর্ঘকাল পদ্মার তীরে বসবাসের সূত্রে পদ্মার অকূল স্রোতের

টান রূপায়িত হয়েছে রবীন্দ্র সাহিত্যে। অতিথি গল্পে নদীর জলময় সত্তার লিরিক্যাপ প্রবাহ।১৩০২ বঙ্গাব্দে (1895) 'সাধনা' পত্রিকার ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যায় 'অতিথি' গল্পটি প্রকাশিত হয়। এটি 'সাধনা' পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের শেষ গল্প। 'অতিথি' গল্পটি সম্ভবত সাজাদপুরে লেখা বলে অনুমান করেছেন রবিজীবনীকার প্রশান্তকুমার পাল। এই বছরের আষাঢ়ে ইন্দিরা দেবীকে সাজাদপুর থেকে (২৮ জুন, ১৮৯৫) রবীন্দ্রনাথ লেখেন, "বসে বসে সাধনার জন্য একটা গল্প লিখছি, একটু আষাঢ়ে গোছের গল্প। লেখাটা প্রথম আরম্ভ করতে যতটা প্রবল অনিচ্ছা ও বিরক্তি বোধ হচ্ছিল এখন আর সেটা নেই। এখন তারই কল্পনাস্রোতের মাঝখানে গিয়ে পড়েছি— একটু একটু করে লিখছি এবং বাইরের প্রকৃতির সমস্ত ছায়া আলোক বর্ণ ধ্বনি আমার লেখার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। আমি যে সকল দৃশ্য লোক ও ঘটনা কল্পনা করছি তার চারিদিকে এই রৌদ্র-বৃষ্টি, নদীস্রোত এবং নদীতীরের শরবন, এই বর্ষার আকাশ, এ ছায়াবেষ্টিত গ্রাম, এই জলধারা প্রফুল্ল শস্যের ক্ষেত ঘিরে দাঁড়িয়ে তাদের সত্যে ও সৌন্দর্যে সজীব করে তুলছে। আমার নিজের মনের কল্পনা আমার নিজের কাছে বেশ রমণীয় হয়ে উঠছে। কিন্তু পাঠকেরা এর অর্ধেক জিনিসও পাবে না। তারা কেবল কাটা শস্য পায়, কিন্তু শস্যক্ষেত্রের আকাশ এবং বাতাস, শিশির এবং শ্যামলতা, সবুজ এবং সোনালী এবং নীল — সমস্তই বাদ দিয়ে পায়। আমার গল্পের সঙ্গে যদি এই মেঘমুক্ত বর্ষাকালের স্নিগ্ধ রৌদ্ররঞ্জিত ছোট নদীটি এবং নদীরতীরটি, এই গাছের ছায়া এবং গ্রামের শান্তিটি এমনি অখণ্ডভাবে তুলে দিতে পারতুম, তাহলে গল্পটি কেমন সুমিষ্ট সজীব হয়ে দেখা দিত! তা হলে সবাই তার মর্মের সত্যটুকু কেমন অতি সহজেই বুঝতে পারত!" পত্রের এই নদীস্রোত, 'নদীতীর', 'জলধারা প্রফুল্ল' প্রকৃতির 'বর্ণ', 'ছায়া', 'আলো' মিশে আছে 'অতিথি' গল্পে। তবে 'অতিথি' গল্পটি 'আষাঢ়ে গোছের' কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে। কিন্তু পূর্ববঙ্গের পল্লীগ্রামের সজীব সান্নিধ্য তাঁর গল্পে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছে। এ সময় রবীন্দ্রনাথ কিছুদিন পদ্মাবক্ষে বোটে বাস করছিলেন। নদীবক্ষ থেকে তীরবর্তী গ্রাম, গ্রামের মানুষ, তাদের জীবনের স্পর্শ পাওয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চারিত হয়েছে গল্পে। 'অতিথি' গল্পটি পাঠে তা অনুভূত হয়।

১৯.৪ গল্পের বিশ্লেষণাত্মক পাঠ

'অতিথি' গল্পটি লেখার কিছু বছর পূর্বেই রবীন্দ্রজীবনে শুরু হয়েছে পদ্মাবিধৌত জনপদভূমিতে যাপন পর্ব। শিলাইদহ, সাজাদপুর, পতিসরে তখন নিয়মিত যাতায়াত। কলকাতার নগর জীবনের স্বাদে অভিজ্ঞ কবি পল্লী প্রকৃতির নিবিড় আলিঙ্গনে অনুভব করছেন বিচিত্র রং-রূপ-রস সম্বলিত দিন-রাত্রির অপ্রতিম আলেখ্য। চন্দননগরে মোরান সাহেবের বাগানবাড়িতে ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথ কিছুকাল কাটিয়ে গ্রাম জীবনের দৃশ্যপট প্রত্যক্ষ করলেও পদ্মার তীরে তাঁর প্রবেশ অন্দরের মহলে। পদ্মা তীরের গ্রাম বাংলার স্নিগ্ধ স্পর্শে কবি রবীন্দ্রনাথের সার্থক আত্মপ্রকাশ ছোটগল্পকার রূপে। অবশ্য তার আগে 'ঘাটের কথা', 'রাজপথের কথা' তিনি লিখেছেন। সেসব গল্প সার্থক ছোটগল্প রূপে সমালোচক মহলে তেমন স্বীকৃতি পায়নি। পূর্ববঙ্গের পল্লীগ্রামের সজীব সান্নিধ্যে তাঁর গল্পে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছে। গ্রাম, গ্রামের মানুষ, তাদের জীবনের স্পর্শ পাওয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চারিত হয়েছে এ সময়ে লেখা গল্পগুলিতে।

'অতিথি' তারাপদর গল্প। রবীন্দ্রনাথের বাল্যস্মৃতি ও কল্পনা মিলেমিশে এ গল্পের তারাপদ চরিত্রকে নির্মাণ

করেছে। ''রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় এক 'নিত্যকালের বালকবীর' আছে যে চিরযাত্রিক, প্রকৃতির প্রাণসত্তার প্রতীক''। তারাপদর ব্যক্তিত্বের মধ্যে অনন্তের আহ্বান। পরিচিত মানব আশ্রয়, প্রেম-ভালোবাসা- স্নেহের বন্ধন ছাড়াও খাওয়া-পরা ও অন্যান্য যেসব জৈব তাগিদগুলি মানুষকে নির্দিষ্ট শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখে, তা স্থিতি পায় না তারাপদর মধ্যে। 'বন্ধন মুক্তির' 'প্রসন্ন আলোয়' তার মন আশ্রয় পায়। সেকারণেই তার জীবনের মসৃণগতি নদীকে ছাড়া সম্ভব ছিল না। নিরবিচ্ছিন্ন নদী প্রবাহে যে নিরাসক্ত চলমান পথিক সত্তা নিবিষ্ট হয়েছে, তারাপদ তারই প্রতিরূপ। নদী ও তার প্রবহমানতা তারাপদর বৈরাগ্যপ্রবণ চরিত্রের প্রধান উপাদান হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও 'ঘর পালানো', পথে বেড়ানো চঞ্চল অথচ উদাসীন পথিক-প্রাণ মন ছিল চির জাগ্রত। তাঁর কবিতায়, গানে সেই চিরপথিক সুরটি অনুভব করা যায়। 'ঘর ছাড়ানো আকুল সুরে / উদাস হয়ে বেড়ায় ঘুরে'। চিরকিশোর রবীন্দ্রনাথের পথিক প্রাণ রূপটি আরও স্পষ্ট করে উন্মোচিত হয়েছে তার চরিত্রে। তাই স্থলজীবন থেকে জলজীবনে তারাপদর প্রবেশের মধ্যে দিয়ে কাহিনির সূচনা। অতঃপর ফ্ল্যাকফ্লাশে তারাপদর অতীত জীবন তথা বাল্যের কথায় ক্রমশ স্পষ্ট রূপ পায় তার চির পথিক সত্তা।

পথের হাতছানি অবহেলা করতে পারে না তারাপদ। সকলের স্নেহ, ভালোবাসা, আদর তাকে অজানা স্রোতে ভেসে যাওয়া থেকে আটকাতে পারে না। পরিচিত চেনা জীবনের ছকে বাঁধা যাপন তাকে স্বস্তি দেয় না। তাই তো বারবার ঘর ছাড়ে সে। তারাপদর এই স্বভাবের বীজটি কি তার শৈশবেই লুকিয়ে আছে? সে পিতা-মাতার চতুর্থ সন্তান। তাকে নিয়ে মোট ভাইবোনের সংখ্যা ৮। শৈশবেই সে পিতৃহীন। 'বহু সন্তানের ঘরেও' স্নেহ-আদরের অভাব তার ছিল না। গ্রামবাসীর কাছেও সে ছিল আদরণীয়। 'গুরুমহাশয়ও তাহাকে মারিত না— মারিলেও বালকের আত্মীয়পর সকলেই তাহাতে বেদনা বোধ করিত। সে 'উপেক্ষিত নয়'। তাহলে কি সব পাওয়ার বেদনাই তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াত? 'তাসের দেশ'-এর রাজপুত্রের কথাতেও একই সুর শোনা যায়। 'সকল পাওয়ার মাঝে আমার প্রাণে বেদন বাজে।' নাকি জীবনানন্দের ''আট বছর আগের একদিন'' কবিতার সেই স্ত্রী-পুত্র পরিবৃত্ত অপার সুখের কাঁটায় স্থির হতে না পারা ছেলেটি, যে জীবনকে হারিয়ে দেয় অহেতুক, অকারণে, স্বেচ্ছায়— তারাপদ ঠিক কার মতো? তারাপদর প্রতিবিম্ব বোধহয় সে স্বয়ং। কিশোর বয়স তার। 'বয়স পনের-ষোলোর অধিক হইবে না।' স্নেহ আদর-প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসার মোহ বন্ধনে আবদ্ধ জীবনে বহু বিচিত্র, বহুস্তরীয় স্বাদের সবটুকু আস্বাদের বয়স তার হয়নি। অথচ সুযোগ ছিল। অনাস্বাদিত জীবনের স্বাদ গ্রহণে। 'ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ' করো বৈরাগ্য সাধনা, উদাসীনতার অধ্যয়ন তারাপদ করেনি। সে স্বভাবজ 'বন্ধনভীরু'। আবার 'সংগীতমুগ্ধ'। 'বিশ্বপ্রকৃতির মর্মে মর্মে রন্ধ্রে রন্ধ্রে এক অনবিচ্ছিন্ন সংগীত অরণ্য দেবতা প্যানের বাঁশির সুরের মতো তাকে ভুলিয়া নিয়ে যায়। সঙ্গীতমুগ্ধতাই তার প্রথম গৃহত্যাগের কারণ— যাত্রার গান তাকে প্রথম ঘর হইতে বিবাগী করিয়া দেয়। আর তার 'বন্ধনভীরু' স্বভাব তাকে স্থায়ী নোঙর ফেলতে দেয় না কোথাও। 'জন্মনক্ষত্র' তাকে গৃহহীন করেছে। জোয়ার-ভাঁটার টানের মতো সে বহতা জীবনের টানে ভেসে বেড়ায় নানা দলের সঙ্গে। কিন্তু কোনো দলের বিশেষত্বই তাকে বেঁধে রাখতে পারে না। 'পাখি কিছু কিছু গান শিখিল এবং একদিন প্রত্যুষে উড়িয়া চলিয়া গেলা।'

মতিলালবাবুর বাড়িতে বছর দুয়েক তারাপদর জীবন প্রকৃতপক্ষে 'দুর্ভেদ্য প্রহেলিকা' সমাধানের অপেক্ষা মাত্র। তার প্রতি ঈর্ষা-বিদ্বেষ, অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশে দিবারাত্র মুখর করে রাখা চারুশশীর নিগূঢ় মনের আসল পরিচয় পেতে সময় লেগেছে তারাপদর। মতিলালবাবু ও অন্নপূর্ণার অত্যধিক আদর ও প্রশ্রয় চারুশশীকে

জেদী, খামখেয়ালী করে তুলেছিল। পিতা-মাতার স্নেহ-আদরের ভাগ সে কাউকেই দিতে চায় না। অন্যদিকে তারাপদ সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ও মুক্তমনা। অপার কৌতূহল আর বিস্ময়ও তার বিশেষত্ব। তাই চারুশশীর অকারণ ঈর্ষা, বিদ্বেষ তাকে কৌতূহলী করেছে। ''দীপ্ত নয়না বালিকার' সুতীব্র অসন্তোষ, বিমুখতার রহস্যজাল তাকে আকৃষ্ট করে। চারুশশীর 'স্বাভাবিক সুতীব্রতা তারাপদর নিকটে অত্যন্ত কৌতুকজনক বোধ হইত।' এই কৌতূহলের কারণেই নন্দীগ্রামে তারাপদর নামা হয়ে ওঠে না।

তারাপদ প্রকৃতির সন্তান। নদীপ্রকৃতির মানবরূপ। চিত্রের মধ্য দিয়ে চরিত্রের স্ফুটনের মিতবাক শিল্পরীতি রবীন্দ্র-ছোটগল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। চেহারার সংহত বর্ণনার সাহায্যে লেখক ফুটিয়ে তোলেন চরিত্রের মৌল বৈশিষ্ট্য। সেইসঙ্গে পোষাক-পরিচ্ছদের সীমিত বর্ণনা মিশে অর্থবহ হয়ে ওঠে। তার 'গৌরবর্ণ', দীর্ঘ আয়ত নয়ন, হাস্যময় ওষ্ঠাধারে' দেবদূতের সুললিত, নিষ্পাপ সারল্য। স্বভাবগুণে সে অতি সহজেই সকলের আপনার হয়ে ওঠে। ছুঁয়ে যায় হৃদয়। অন্তর সৌন্দর্যের প্রকাশ তার বাহ্যরূপেও। গল্পকার দুবার প্রত্যক্ষভাবে তারাপদর দৈহিক রূপের প্রত্যক্ষ বর্ণনা করেছেন। প্রথমবার, প্রথম পরিচ্ছেদে। ''গৌরবর্ণ ছেলেটিকে বড় সুন্দর দেখিতে। বড়ো বড়ো চক্ষু এবং হাসাময় ওষ্ঠাধারে একটি সুললিত সৌকুমার্য প্রকাশ পাইতেছে। পরিধানে একখানি মলিন ধুতি। অনাবৃত দেহখানি সর্বপ্রকার বাহুল্যবর্জিত, কোনো শিল্পী যেন বহু যত্নে নিখুঁত নিটোল করিয়া গড়িয়া দিয়াছেন। যেন সে পূর্বজন্মে তাপস বালক ছিল এবং নির্মল তপস্যার প্রভাবে তাহার শরীর হইতে শরীরাংশ বহুল পরিমাণে ক্ষয় হইয়া একটি সম্মার্জিত ব্রাহ্মণ্যশ্রী পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।" তার অপাপবিদ্ধ স্নিগ্ধ মধুর রূপটি দৈহিক সুষমায় প্রতিফলিত। চিত্রের মাধ্যমে ঘটেছে চরিত্রটির স্ফুটন। সেকারণেই সকলেই এই সুন্দর বালকটির প্রতি আকৃষ্ট হয়। প্রেম-ভালোবাসা-স্নেহ অনুভব করে। তারাপদর স্বভাবজ "অসংকোচ" তাকে সকল অবস্থায়, সকলের মধ্যে মিলিয়ে দেয়। অথচ নিজস্বতায় তাকে নজরে পড়ে আলাদা করে। ''ছেলেটি সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছা অনুসারে কাজ করে অথচ এমন সহজে করে যে, তাহাতে কোনো প্রকার জেদ বা গোঁ প্রকাশ পায় না'। আবার তার নিঃসঙ্কোচ ব্যবহারে লজ্জার লেশমাত্র দেখা যায় না। তার মুখের 'শুভ্র স্বাভাবিক' অম্লান তারুণ্য মতিলালবাবুর মতো প্রবীণ বিষয়ী মানুষের হৃদয়ও দ্রবীভূত করে।

কাঁঠালিয়ার আন্তরিকতার প্রেক্ষাপটে চারুশশী নামক সূক্ষ্ম বন্ধনজাল তাকে আবদ্ধ করতে পেরেছিল। তাও মাত্র বছর দুয়েক। ঈর্ষার অন্তরালে চারুশশীর অন্তরে জাগ্রত অনুরাগ হয়তো সে নিজেও অনুধাবন করতে পারেনি। রাগ-অনুরাগের দোলায় অভিমানের কাঠিন্য অজান্তেই পৌঁছে গেছে অত্যাচারের স্তরে। প্রথম দিকে চারু তার পিতা-মাতার স্নেহের ভাগ সহ্য করতে পারেনি। বিরাগে পূর্ণ হয়েছে হৃদয়। তবুও তারাপদর দৈহিক সৌন্দর্য তাকে মোহিত করেছে। ভরা নদীর মতো তারাপদর বাহুল্য বর্জিত নিখুঁত নিটোল তার সন্তরণ ভঙ্গিমা। 'পরিপূর্ণ জলরাশির মধ্যে গৌরবর্ণ সরল তনু দেহখানি নানা সন্তরণভঙ্গিতে অবলীলাক্রমে সঞ্চালন করিয়া তরুণ জল-দেবতার মতো শোভা পাইত, তখন বালিকার কৌতূহল আকৃষ্ট না হইয়া থাকিত না। সে এই সময়টির জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিত; কিন্তু আন্তরিক আগ্রহ কাহাকেও জানিতে দিত না।' 'অত্যন্ত উপেক্ষার কটাক্ষে'র মধ্যেই ঘটে চারুশশীর প্রেমের উন্মেষ। ঈর্ষা রূপান্তরিত হয় প্রেমে।

প্রণয়ের বৈশিষ্ট্য হল অধিকার। প্রেমাবশে চারুশশী তারাপদর উপর 'একাধিকার' চেয়েছে। উদ্বিগ্ন হয়েছে বারবার। প্রিয় সখী সোনামণির সঙ্গে একরকম 'মনোবিচ্ছেদ' ঘটেছে তার। তারাপদ বিশেষরূপে তাহাদের

তারাপদ - এই অধিকারবোধের সামান্য বিচ্যুতি তার অসহনীয়। তারাপদ তার কাছে 'অত্যন্ত গোপনে সংরক্ষণীয়।' আসলে মনের অন্তরালে ঘনিয়ে ওঠা অনুরাগ চারুশশী নিজেও চিনতে পারেনি। নিজের মনের দুর্জ্ঞয়তায়, দুর্বোধ্যতায় সে নিজেই অস্থির হয়েছে। সোনামণির কাছে তারাপদর 'সহজগম্যতা', স্নেহের সম্পর্ক -- বিশেষত, তারাপদর 'সোনামণির দাদা' হয়ে ওঠা তাকে যতটা বিস্মিত করে, ততোধিক করে ক্রুদ্ধ। 'সোনামণির দাদা! শুনিয়া সর্বশরীর জ্বলিয়া যায়' - এ আচরণ তো নিগূঢ় প্রেমের বহিঃপ্রকাশ। অথচ সেই প্রেমচেতনার বোধ না থাকায় একদিকে তারাপদকে যেমন ''বিদ্বেষশরে জর্জরা করতে চেষ্টা করেছে, তেমন তারাপদর 'একাধিকার' নিয়ে 'প্রবল উদ্বেগ' লালন করেছে। গল্পকারের অর্থগূঢ় মন্তব্য, 'বুঝিবে কাহার সাধ্য'। চতুর্থ পরিচ্ছেদে লেখক আরও একবার এজাতীয় গূঢ় মন্তব্য করেছেন, ''বালিকাবস্থাতেও নারীদের অন্তররহস্য ভেদ করা সুকঠিন। চারুশশী তাহার প্রমাণ দিল''। তার প্রবল হৃদয়াবেগের প্রকাশ ঘটে চরম ক্রোধে। তারাপদর শখের বাঁশি নির্দয় ভাবে সে ভেঙে দেয়। বালিকার এই প্রলয়মূর্তি" দেখে তারাপদ ক্রুদ্ধ হয় না। বরং আশ্চর্য হয়। আর চারুও "রক্তনেত্রে রক্তিম মুখে বিদীর্ণ বাঁশিকে আরও কয়েকবার অকারণ পদাঘাতের পর উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কেঁদে ওঠে। রাগ-ক্রোধ-অভিমান-রোদনের এই মুহুর্মুহু পট পরিবর্তনে পূর্বরাগের প্রকাশ। অধিকারবোধ জনিত সংগুপ্ত অভিমান মুক্তি খোঁজে ক্রন্দনে। চারুশশীর এ আচরণের সঙ্গে 'পোস্টমাস্টার' গল্পের রতনের সূক্ষ্ম সাদৃশ্য আছে।

চারুর সঙ্গে তারাপদর সাক্ষাৎ নয় বছর বয়সে। এরপর দুবছর চারুর জীবন আবর্তিত হয়েছে তারাপদকে কেন্দ্র করে। অর্থাৎ বয়ঃসন্ধিক্ষণের বিজন মনে নারীত্বের উন্মেষ ঘটেছে তার নিজেরই অগোচরে, সংগোপনে। যে চারু তারাপদর ইংরেজি শিক্ষায় বিস্তর ব্যাঘাত ঘটিয়ে অনুতপ্ত হয়েও ক্ষমা প্রার্থনা করেনি, সেই চারুর, প্রথমে খাতার পাতায় "আমি আর কখনও খাতায় কালি মাখাব না", উক্তিতে প্রকাশিত হয় তার নারীত্বে উত্তরণ। ক্রমশ সে তার হৃদয় সত্য উপলব্ধি করতে পারে। দেহের সৌন্দর্যের আকর্ষণ ক্রমশ মনের উপকূলে উপনীত হয়। তারাপদ ও তার মাঝে তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি তার অসহনীয় বলেই এমন পরিস্থিতিতে সে আত্মসংবরণ করতে পারে না। ক্রোধ, ঈর্ষার সম্মিলিত ঝড়, 'ঝড়ের পরে প্রচুর অশ্রুবর্ষণ। তাহার পরে প্রসন্ন স্নিগ্ধ শান্তি' —ক্রমান্বয়ে আনাগোনা করতে থাকে চারু ও তারাপদর জীবনে। এমনই মেঘ-রৌদ্রের খেলায় একদিন তারাপদ রাগ করে না খেয়ে চলে যেতে চাইলে, 'অনুতপ্ত ব্যাকুল' চারুর করজোড়ে সানুনয়ের দ্বারা প্রতিভাত হয় তার প্রেমমগ্ন সমর্পণ। তার স্পষ্ট প্রমাণ মেলে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে। অন্নপূর্ণার বয়ানে, চারুর জন্য পাত্র অন্বেষণের প্রসঙ্গে। ''তোমার মেয়েরও ওকে পছন্দ হয়েছে''। রায়ডাঙ্গার বাবুদের বাড়ি থেকে চারুকে দেখতে এলে সে নিজেকে দ্বাররুদ্ধ করে রাখে। তার এই আচরণের কারণ পাঠক সহজেই অনুমান করতে পারেন। এগারো উত্তীর্ণা চারুর গোপন প্রেম প্রকাশ্যে আসে তার এই আচরণে।

তারাপদর 'স্নেহহীন স্বাধীনতার' জন্য 'যাযাবর অনিকেত' হৃদয় পুনরায় জেগে ওঠে উদ্দাম বর্ষার রাত্রে। চারুশশীর ঈর্ষাতুর প্রেমের মধ্যে বয়ঃসন্ধিলগ্নের রহস্য দানা বেঁধে ছিল। সেই দুর্বোধ্য রহস্য তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। চারুর 'নিয়ত দৌরাত্ম্য চঞ্চল সৌন্দর্য অলক্ষিতভাবে বন্ধন জাল বিস্তার করেছিল। গল্পকার অনেকগুলি সম্ভাবনার কথাই 'হয়তো' সহযোগে উল্লেখ করেছেন। ঈর্ষাতুরা বালিকাকে বশ করতে না পারা, তার চাঞ্চল্য, দৌরাত্ম্য তারাপদর কাছে কৌতূহল সৃষ্টি করেছিল। রহস্যসমাধানে তার কৌতূহলের নিবৃত্তি। প্রসঙ্গত, 'সোনার তরী' কাব্যের 'দুই পাখি' কবিতার বনের পাখিটির কথা মনে আসে। তারাপদ যেন তারই

প্রতিরূপ। চারুশশীর উপস্থিতি তার নির্লিপ্ত মুক্ত মনে ‘ক্ষণকালের জন্য বিদ্যুৎস্পন্দনের’ মতো ‘অপূর্ব চাঞ্চল্য সঞ্চার’ করতে লাগল। নির্লিপ্ত হৃদয়ে কী লাগল প্রেমের ঢেউ? বন্ধনের মধ্যেও আছে মুক্তির স্বাদ, অপার আনন্দ। তারাপদ নিজের অন্তরের গূঢ় পরিবর্তন অনুভব করতে পারে। ‘আবদ্ধ’, ‘আসক্তভাব’, ‘বন্ধনভীরু’ মনের কাছে তা ‘নূতন স্বপ্নের মতো।’ কাঁঠালিয়ার জমিদারবাবুর ‘স্নেহপিঞ্জরে’ চিরকালের জন্য তারাপদকে আবদ্ধ রাখার আয়োজন শুরু হল। বিবাহের প্রস্তুতি। চারুর সঙ্গে। দিন স্থির। শ্রাবণ মাসে গোপনতা-প্রিয় মতিলালবাবু তা জানতে দিলেন না তারাপদকে। কিন্তু তারাপদর সদ্য জাগ্রত প্রেমচেতনা জমিদার বাড়ির বিবাহ আয়োজনের বিপুল আড়ম্বরের মাঝে ‘প্রতিরোধহীন নীরবতায় ভেঙে স্রোতে ভেসে গেল’। তারাপদও রক্ত-মাংসের মানুষ। কামনার রাঙা রাগে ‘অধিকতর রঙিন’, স্বতন্ত্র ‘কল্পনালোক’ সৃজিত হলেও তা স্থায়ী হওয়ার পূর্বেই নববর্ষার মেঘ-মেদুর জ্যোৎস্না-সন্ধ্যায় জলজীবনের হাতছানি তার হৃদয়ের মৌন নির্জন দেশকে আন্দোলিত করে তুলল। ‘স্নেহ-প্রেম-বন্ধুত্বের ষড়যন্ত্রবন্ধন’ তাকে ‘সম্পূর্ণরূপে ঘিরিবার পূর্বেই সমস্ত গ্রামের হৃদয়খানি চুরি করিয়া একদা বর্ষার মেঘান্ধকার রাত্রে এই ব্রাহ্মণ বালক আসক্তিবিহীন উদাসীন জননী বিশ্বপৃথিবীর নিকটে চলিয়া গিয়াছে’। ‘‘গ্রামের হৃদয়খানির মধ্যে তো চারুর হৃদয়ও ছিল। খাঁচার পাখির সঙ্গে বিবাদ না থাকলেও, মুক্তির আনন্দ আর বদ্ধতার ভয় তারাপদকে পুনরায় ফিরিয়ে নিয়ে গেল তার পথের জগতে। অনির্দেশ্যের উদ্দেশ্যে।

১৯.৫ প্রাসঙ্গিক আলোচনা

‘অতিথি’ গল্পের তারাপদ নদীর মানবরূপ। জলময় তার সত্তা। যে কোনো অবস্থানেই সে স্বচ্ছন্দ অনুভব করে কিন্তু চরৈবেতির মন্ত্র ক্ষণে ক্ষণে নেশা জাগায় সঞ্চারিত রক্তস্রোতে। নদীর মতো তাই সেও ক্রমাগতই চলতে থাকে দূর পথে। ‘হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনোখানো।’ তারাপদকে ‘মূর্তিমান অনাসক্ত নিসর্গতত্ত্ব’ বলে কেউ কেউ মনে করেছেন। লেখক স্বয়ং প্ররোচিত করেছেন এই তাত্ত্বিক অন্বেষণে। গল্পের কাহিনি বয়নে নিসর্গ প্রকৃতি, বিশেষত নদীপ্রবাহ তারাপদর জীবন রেখাচিত্রের সঙ্গে সমান্তরাল বর্ণনায় অগ্রসর হয়েছে। নিরপেক্ষ অথচ স্বাধীন প্রকৃতি মানবজীবনের চারধারে এমনকি ভিতরেও সঞ্চারিত হয়। তারাপদর মুক্তজীবন ও কাঁঠালিয়ার আবদ্ধ জীবনের বর্ণনায় নদী ও নদীকেন্দ্রিক জলজীবন যেন তার প্রতিরূপ হয়ে উঠেছে। বহমান দুই তীরের দৃশ্যে তারাপদর জীবনবৃত্তে এসে পড়া বদ্ধ মানুষের কথা ধ্বনিত হয়েছে। নিসর্গ একই সঙ্গে বদ্ধ ও মুক্ত প্রাণকে বিম্বিত করেছে ‘অতিথি’ গল্পে। আর নিসর্গপ্রাণ তারাপদ চরিত্রের সঙ্গে কবিপ্রাণ গল্পকার নিজেই একাত্ম। ঘর ছাড়া, বাউল প্রাণ, উদাসীন এই বালক সকলকে প্রেম-প্রীতি-স্নেহের জালে আবদ্ধ করে নিজেই ‘নাড়ী ছিঁড়ে’ পলায়ন করেছে বারবার। তাই তার প্রতি কবির স্নেহ প্রবল। জননীরূপা বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে হারিয়ে যাওয়ার আকুলতা রবীন্দ্র-মানসের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তাঁর ‘বসুন্ধরা’ কবিতাতেও ‘প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হওয়ার আর্তি’ শোনা যায়—

যাই পরশিয়া
স্বর্ণ শীর্ষে আনমিত শস্যক্ষেত্রতল
অঙ্গুলির আন্দোলনে : নব পুষ্পদল

করি পূর্ণ সঙ্গোপনে সুবর্ণলেখায়
সুধা গন্ধে মধুবিন্দুভারে : নীলিমায়
পরিব্যাপ্ত করি দিয়া মহাসিন্ধু নীর
তীরে তীরে করি নৃত্য স্তব্ধ ধরণীর
অনন্ত কল্লোল গীতে।.....
.... শুভ্র উত্তরীয়-প্রায়
শৈলশৃঙ্গে বিছাইয়া দিই আপনায়
নিষ্কলঙ্ক নীহারের উত্তুঙ্গ নির্জনে
নিঃশব্দ নীরবে।

'প্রকৃতির পালাবদল, ঋতু পরিবর্তন তার নবীন রক্তে জাগায় চঞ্চলতা— বলে চলো চলো, অশ্ব তোমার আনো সে।' 'রবীন্দ্রসাহিত্যে বর্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বন্ধন ও বন্ধন মুক্তি — দুই বিপরীত ধারণার সম্মীলন ঘটেছে বর্ষায়। 'পোস্টমাস্টার' গল্পে বর্ষা বদ্ধ জীবনের রূপকার। 'অতিথি' গল্পে বর্ষা উন্মুক্ত করেছে মুক্তির পথ। নিসর্গ এখানে তারাপদর জীবনদৃষ্টির সঙ্গে আশ্লিষ্ট। অনতিস্ফুট আসক্তিতে সাময়িক আবদ্ধ তারাপদর 'ছিন্নবাধা উদাসীন চিত্ত' আবার জেগে উঠল রথযাত্রা উপলক্ষ্যে গ্রামের বহতা বর্ষার নদীস্রোতে অসংখ্য নৌকার ভেসে যাওয়ার দৃশ্যটি প্রত্যক্ষ করে। পথদেবতার অমোঘ ইঙ্গিতের চলমানতার ব্যঞ্জনাময় চিত্রকল্পটি এ গল্পের 'কেন্দ্রীয় মোটিফ' —

'দেখিতে দেখিতে পূর্ব দিগন্ত হইতে ঘনমেঘরাশি প্রকাণ্ড কালো পাল তুলিয়া দিয়া আকাশের মাঝখানে উঠিয়া পড়িল; চাঁদ আচ্ছন্ন হইল পুর্বে বাতাস বেগে বহিতে লাগিল, মেঘের পশ্চাতে মেঘ ছুটিতে লাগিল, নদীর জল খলখল হাস্যে স্ফীত হইয়া বহিতে লাগিল...। সম্মুখে আজ যেন সমস্ত জগতের রথযাত্রা চাকা ঘুরিতেছে, ধ্বজা উড়িতেছে, পৃথিবী কাঁপিতেছে, মেঘ উড়িয়াছে, বাতাস ফুটিয়াছে, নদী বহিয়াছে, নৌকা চলিয়াছে, গান উঠিয়াছে... সুদূর অন্ধকার একটা মুষলধারাস্পর্শী বৃষ্টির গন্ধ আসিতে লাগিল।"

এই চিত্রকল্পে ব্যবহৃত ক্রিয়াপদগুলি লক্ষ্য করার মতো। নৌকার মতো সঞ্চরণশীল তারাপদর মুক্ত জীবন থেকে বদ্ধতায় ও পুনরায় মুক্ত জীবনে ফিরে যাওয়ার অন্তর্বর্তী পরিসরের মানস ছবি এই চিত্রকল্প। প্রথমের উঠিয়া পড়িল', 'আচ্ছন্ন হইল', 'বহিতে লাগিল" প্রভৃতি ক্রিয়াপদগুলির মধ্য দিয়ে পরিবেশের অমোঘ আহ্বান। সেই আহবান স্পর্শ করল তারাপদর হৃদয়পট। শুরু হল আন্দোলন। তখন ক্রিয়াপদগুলিও গেল বদলে— 'ঘুরিতেছে, উড়িতেছে', 'কাঁপিতেছে'। নিসর্গ 'Objective Co relative' রূপে উপস্থিত। ভবঘুরে, 'নির্লিপ্ত ও মুক্ত স্বভাব দ্বন্দ্বে দোলায়িত হয়নি দীর্ঘক্ষণ। সেমিকোলনের প্রয়োগে দ্বন্দ্বের স্বল্পতার প্রকাশ। অতঃপর আবার ক্রিয়াপদের পরিবর্তন 'উড়িয়াছে', 'ছুটিয়াছে', 'বহিয়াছে', 'চলিয়াছে' ইত্যাদি। সহজ সরল রঙে রেখায় তারাপদর স্বভাবের সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাময় প্রকাশ। নিসর্গের 'বন্ধনভীরু' মনের অনন্য শিল্পরূপ। বর্ষণমুখর ঘন অন্ধকার নিশীথ চিত্রে একদিকে অনির্দেশ্য, উদাসীনতা, নির্লিপ্ততা; অন্যদিকে বেদনা বিধুর শূন্যতার সমবেত সম্মিলন।

'অতিথি' গল্পের প্রধান সুরটি লিরিক্যাল। 'আশ্চর্য কাব্যস্বাদী' এ গল্পে 'আলঙ্কারিক সৌন্দর্য ও ছন্দ-ঝংকারের কবিতাধর্মী অতিশয়তা কল্পনাতীত।' 'বাচ্যার্থ, ছন্দ, অলংকার, রীতি-সৌষ্ঠব এর অতীত সে রসধ্বনি, তা এই ছোট গল্পটির প্রাণ। সমালোচকের মতে, শাদা কথার ফাঁকে ফাঁকে কানায় কানায় ভরে উঠেছে কবিতার অনির্বাচ্য ধ্বনি -যা সুরের মতোই আবহময়।' রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বলেছেন, 'একটিমাত্র পরিচয় আমার আছে, সে আর কিছুই নয়, আমি কবি মাত্র।' 'অতিথি' গল্পে লেখকের কবি আত্মা মুক্তি পেয়েছে গদ্যের সীমানায়। এই 'আবহঝংকার কবি-চেতনার প্রকৃতি, তন্ময়তার দান।" 'খেয়া' কাব্যের অনন্ত অতলস্পর্শী প্রকৃতির সঙ্গে আত্মলীনতা এ গল্পে 'অলৌকিক সুরভি' সঞ্চার করেছে। এই স্পর্শ পেয়েছে তারাপদ। তাই সে 'সর্বাতিক্রমী' হয়েছে। 'আত্ম-উৎক্রান্তির এই অসীমাভিসার' যেমন গল্পে তেমনি তারাপদর জীবনে। অসীম, নির্বিচার বহতা প্রকৃতি তারাপদর সঙ্গে একাত্ম।

ও হেনরির 'Whistling Dick"s Shristmas Stocking' গল্পের ডিক্‌চরিত্রটির সঙ্গে তারাপদর কিছুটা সাদৃশ্য আছে, বলে অনেকে মনে করেন। তারাপদর মতো ভিক্ষুক ভবঘুরে স্বভাবের। ভিক্ষা তার জীবিকা। ছকে বাঁধা জীবনকে সেও ভয় পায়। তবুও তারাপদ ও ডিকএক নয়। কোনো কাজকে ভয় পায় না তারাপদ। অনেক কাজই সে নিপুণ দক্ষতায় করতে পারে। কিন্তু স্নেহের নিগড়েও আবদ্ধ হতে সে চায় না। স্থায়ী বন্ধন তাকে স্বস্তি দেয় না। এখানেই সে সকলের চেয়ে আলাদা। প্রসঙ্গত 'ছুটি' গল্পের ফটিক ও 'আপদ' গল্পের নীলকান্তকেও আমাদের মনে পড়ে। ফটিক আপনজনের স্নেহের অভাবে একা, নিঃসঙ্গ হয়ে গেছে। তারাপদ সকলের কাছেই স্নেহ পেয়েছে। স্নেহের অভাব তাকে নিঃসঙ্গ করেনি। তাই ফটিকের মতো মায়ের কাছে ফিরে যাওয়ার গভীর ইচ্ছা তারাপদকে পোষণ করতে দেখা যায় না। নীলকান্ত কিরণের স্নেহ পেয়েও ঘটনাচক্রে তা হারিয়ে ফেলেছে। এরা সকলেই কাছাকাছি বয়সের। কিন্তু মানসিকতায় সকলেই আলাদা। বিশেষত তারাপদ। নিজস্ব অধিষ্ঠানভূমি সে কখনোই চায়নি। ভেসে বেড়ানোতেই তার মুক্তি। এখানেই তার চরিত্রে সঞ্চারিত হয়েছে নিসর্গের দ্যোতনা।

রবীন্দ্রনাথের শিল্পকৃতির বিশেষ বৈশিষ্ট্য ইঙ্গিতময়তা। গল্প সমাপ্তিতে 'প্রচ্ছন্নকে আকস্মিক অবারিত' করে দেওয়ার মধ্যে চমক আছে। আছে বিস্ময়মিশ্রিত সুস্পষ্ট পরিণতি। রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু গল্প সমাপ্তিতে এই 'চমক' আছে। কিন্তু তাঁর কবি-প্রাণতার অন্তরে নিহিত নিগূঢ় জীবন রহস্য অনেক সময় চমকহীন গল্প সমাপ্তিকে অনন্ত জিজ্ঞাসায় উচ্চকিত করে তোলে। 'অতিথি' এই শ্রেণীর। কাহিনির পরিসমাপ্তি ঘটলেও 'অন্তহীনতার ব্যঞ্জনা' পাঠক হৃদয়কে নিঃসীম শূন্যতায় পৌঁছে দেয়। যেখানে গল্পপাঠের তৃপ্তির পরিবর্তে অপূর্ণতার সংবেদনে পূর্ণ হয় পাঠক চিত্ত। অনন্ত জীবনবোধের সংবেদনে পাঠক চিত্তের উত্তরণ ঘটে। ''সুদূরস্পর্শিতার ইঙ্গিতের মাধ্যমে গল্পের সমাপ্তিকে এক লোকোত্তর সাঙ্গীতিক ব্যঞ্জনায় উত্তীর্ণ করে দেওয়ার অসামান্য শিল্পদক্ষতার পরিচয় আছে 'অতিথি' গল্পে সমালোচকের এই মন্তব্য যথার্থ।

গল্পনাম স্বল্পাক্ষরে দ্যোতিত করে বৃহত্তর ব্যঞ্জনা। 'অতিথি' গল্পনামে ঝলসে ওঠে রচনার গূঢ় পরিচয়। 'অতিথি' অর্থাৎ যার আগমনের তিথি নেই। তিথি নেই বিদায় নেওয়ারও। আগাম বার্তা না দিয়েই তারাপদ কাঁঠালিয়ার জমিদার মতিলালবাবু ও তাঁর পরিবারের যাপনে উপস্থিত হয়েছে। স্নিগ্ধ-মধুর, অপাপবিদ্ধ উপস্থিতি দিয়ে সকলের মন জয় করেছে। সমগ্র গ্রামের সঙ্গে তার গড়ে উঠেছে সখ্যতা। কিন্তু স্নেহ-প্রেম-বন্ধুত্বের সহজ সুর তাকে চিরকালের বন্ধনে আবদ্ধ করতে অপারক। কেবল সম্পর্কের বন্ধন নয়, কোনো প্রকার

'অভ্যাস বন্ধন' ও তার মনকে 'বাধ্য' করতে পারেনি। বন্ধন মুক্ত তারাপদর মন 'সংসারের পঙ্কিল জলে' 'রাজহংসের মতো' সাঁতার দিয়ে বেড়ায়। কৌতূহলবশত জলে ডুব দিলেও "পাখা সিক্ত বা মলিন" হয় না। কৌতূহলই তাকে কাঁঠালিয়ায় দীর্ঘ দুই বছর আটক করেছিল। কিন্তু 'পাখা সিক্ত বা মলিন' করতে পারেনি। চারুশশীর ঈর্ষা-বিদ্বেষ-বিরাগ অভিমান শেষে সমর্পণে রূপান্তরিত হতেই বন্ধনভীরু মন পুনরায় সচকিত হয়েছে। বাঁধনহারা প্রকৃতির আহ্বান তকে আবার গৃহহীন করেছে। গল্প-সূচনায় তারাপদর ব্যক্তি পরিবারে অতিথির রূপ সমাপ্তিতে বিশ্বপৃথিবীর অতিথিতে রূপান্তরিত। পাঁচালী গানের দল বা জিমন্যাস্টিকের দল কিংবা কাঁঠালিয়া-কোথাও সে স্থায়ী হয় না। চিরকালীন পথিক সত্তা তাকে আসক্তিবিহীন উদাসীন বিশ্বজননীর কাছে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে। যেখানে অতিথি রূপেই জীবনের সার্থকতা।

১৯.৬ সারাংশ

'অতিথি' গল্পের প্রধান চরিত্র তারাপদ। তার জীবনের খণ্ড চিত্রের মাধ্যমে উন্মোচিত হয়েছে তার চরিত্র। অন্যদিকে কাহিনির অন্যান্য চরিত্রগুলির বিচিত্র মানসছবি পরিস্ফুট হয়েছে। প্রকৃতির উদাসীন সত্তার প্রভাব তারাপদর উপর সর্বাধিক। তার নিঃস্পৃহতার বিপ্রতীপে অবস্থান করে চারুশশী। বালিকা চারুশশীর আচরণে বয়ঃসন্ধির রহস্যময়তা নিবিড়ভাবে প্রতিফলিত। মতিলালবাবু একদিকে জমিদার, আবার তিনি পিতা। এই দুইয়ের মিলিত রূপে চরিত্রটি উজ্জ্বল। অন্নপূর্ণা স্নেহশীলা জননী। তাঁর স্নেহ কেবল কন্যার মধ্যে সীমিত থাকেনি। তারাপদর প্রতিও বর্ষিত হয়েছে। তাঁর বিচক্ষণ, বুদ্ধিমতী রূপটিও গল্পে প্রকাশ পেয়েছে। চলমান স্রোতের গতিময় প্রবাহ তারাপদর চরিত্রের মূল সুরটি বেঁধে দিয়েছে। খণ্ড জীবন দৃশ্যের মধ্যে বৃহত্তর ব্যঞ্জনার আভাসে গল্পটি সার্থক ছোটগল্প হয়ে উঠেছে। সুললিত ভাষার ব্যবহারে গল্পটি লিরিক্যাল।

১৯.৭ অনুশীলনী

অতিসংক্ষিপ্ত

ক) 'নৌকা করিয়া সপরিবারে স্বদেশে যাইতেছিলেন'- কে স্বদেশে যাচ্ছিলেন?

খ) কাঁঠালিয়ার জমিদারবাবুর স্ত্রী ও কন্যার নাম কী?

গ) যাত্রার দলে ও জিমন্যাস্টিকের দলে তারাপদ কী কাজ করত?

(ঘ) সোনামণি কে?

(ঙ) রথযাত্রার বিখ্যাত মেলা কোথায় হয়?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

ক) 'অতিথি' গল্প অবলম্বনে তারাপদর চেহারার পরিচয় দাও।

খ) 'তোমার দুটি পায়ে পড়ি, তুমি খেয়ে নাও' - বক্তার একথা বলার কারণ কী?

গ) 'নারীদের অন্তররহস্য ভেদ করা সুকঠিন' কার উদ্দেশ্যে, কেন একথা বলা হয়েছে?

ঘ) অন্নপূর্ণার স্নেহশীলতার পরিচয় দাও।

রচনাধর্মী প্রশ্ন

ক) 'তারাপদ প্রকৃতির বন্ধনহীন সত্তা' মন্তব্যের আলোকে 'অতিথি' ছোটগল্পের তারাপদ চরিত্র বিশ্লেষণ করো।

খ) 'অতিথি' ছোটগল্পরূপে কতখানি সার্থক হয়েছে বিচার করো।

গ) 'অতিথি' গল্পের নামকরণ সম্পর্কে আলোচনা কর।

ঘ) ব্যক্তির মানস-দর্পণেই প্রতিফলিত হয় বহির্বিশ্ব 'অতিথি' গল্পে প্রকৃতি কীভাবে তারাপদর মানস-পটে প্রতিফলিত হয়েছে, তা প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বিশ্লেষণ করো।

১৯.৮ সহায়ক গ্রন্থ

ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দশম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি

খ) প্রমথনাথ বিশী, *রবীন্দ্র ছোটগল্প*, মিত্র ও ঘোষ

গ) ক্ষেত্র গুপ্ত, *রবীন্দ্র গল্পঃ অন্য রবীন্দ্রনাথ*, গ্রন্থনিলয়

ঘ) অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, *সাধনা ও সাহিত্য*, দে'জ পাবলিশিং

ঙ) গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, *রবীন্দ্রনাথঃ ছোটগল্প প্রকরণ শিল্প*, সাহিত্যলোক

চ) নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, *কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ*, বাকসাহিত্য

একক-২০ ❑ স্ত্রীর পত্র : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গঠন

২০.১ উদ্দেশ্য
২০.২ প্রস্তাবনা
২০.৩ গল্পের উৎস সন্ধানে
২০.৪ গল্পের বিশ্লেষণাত্মক পাঠ
২০.৫ চরিত্র আলোচনা
২০.৬ গল্পের আঙ্গিক ও প্রকরণ ঃ নতুনত্বের সন্ধান
২০.৭ সারাংশ
২০.৮ অনুশীলনী
২০.৯ সহায়ক গ্রন্থ

২০.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে 'সবুজপত্রে'র সময়কালে ছোটগল্পে রবীন্দ্রমানসের প্রতিফলন সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে পারবে। সে সময়ের সমাজে নারীর অবস্থান সম্পর্কে যেমন তারা জ্ঞান অর্জন করতে পারবে, তেমনই নারী স্বাধীনতা, নারী মুক্তির ইতিহাস অন্বেষণে আগ্রহী হবে। সমাজে নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থান, পরিবারের সীমায় নারীর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য, মর্যাদা, সম্মানের জন্য যে সংগ্রাম, অর্থাৎ স্বীকৃতি লাভের জন্য নারীর যে লড়াই, তার সঙ্গে পরিচয় ঘটবে। বিশেষত একটি অসামান্য যুগাতিক্রমী রবীন্দ্র গল্পের সঙ্গে শিক্ষার্থীরা পরিচিত হবে।

২০.২ প্রস্তাবনা

একটি গল্পকে বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গিতে পাঠ করতে গেলে কয়েকটি বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজন- কাহিনি অংশ, চরিত্রনির্মাণ, শিল্পরীতি ও লেখকের নিজস্বতা। এই চারটি বিষয়কে অবলম্বন করে গল্পের অন্দরে প্রবেশ করা হবে। প্রসঙ্গক্রমে বিভিন্ন চরিত্রের অন্তর্লোকে অবগাহনের মধ্য দিয়ে মনের সঙ্গে বাস্তব পরিস্থিতির দ্বন্দ্ব, তৎকালীন সমাজবাস্তবতার প্রতিফলন প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হবে। কাহিনির মধ্যে সেইসঙ্গে লেখকের শিল্পকৌশল, নতুনত্ব সৃষ্টির প্রচেষ্টার দিকটিও আলোচিত হবে।

২০.৩ গল্পের উৎস সন্ধানে

বিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে 'সবুজপত্র' নতুন দিশার সন্ধান দিয়েছিল। প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায় ১৩২১ বঙ্গাব্দের ২৫ বৈশাখ অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিনে 'সবুজপত্র'-এর প্রথম প্রকাশ। এর

আত্মপ্রকাশের কয়েকমাস আগে রবীন্দ্রনাথ নোবেল পান। জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শন আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে জীবনোপলব্ধির পরিপূর্ণ মিশ্রণে, প্রশান্ত প্রত্যয়ে উজ্জ্বল এসময়কার রবীন্দ্র সাহিত্যের ভাব-ভাষায় লক্ষ্য করা যায় বুদ্ধির ধারালো চমক। শব্দের ব্যাচার্থ বহুলাংশে ব্যঙ্গার্থকেও ছাড়িয়ে গেছে। বুদ্ধিদীপ্ত তীব্রতা ও তির্যক ভঙ্গিমায় প্রকাশশৈলীতে এসেছে সাংকেতিকতা। ছোটগল্পের ক্ষেত্রেও এসেছে প্রকরণের নবীনতা।

'সবুজপত্রে' প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের প্রথম ছোটগল্প 'হালদার গোষ্ঠী' (বৈশাখ, ১৩২১)। প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত 'বিবেচনা ও অবিবেচনা' প্রবন্ধে আছে খাঁচা ভাঙ্গার উদার আহ্বান। গতানুগতিক দিনযাপনের অন্ধ সংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হল এসময়কার ছোটগল্পে। তীব্র যন্ত্রণা ও মুক্তির দৃপ্ত সাধনার কথা ক্রমশ প্রকাশ পেতে লাগল। 'হালদার গোষ্ঠী'তে বনোয়ারীর বিদ্রোহীপ্রাণ হালদার গোষ্ঠীর খাঁচা ভেঙেছিল। সেই সুর আরও তীব্র হলো 'স্ত্রীর পত্র'-এ। বাঁধন ভাঙার বিদ্রোহী মেজাজ এসময়কার সকল গল্পের সাধারণ সাধর্ম। নারীব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যবোধের উজ্জ্বল উপস্থিতি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করল 'স্ত্রীর পত্র'। ১৩২১ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল 'স্ত্রীর পত্র'। সুপরিণত শিল্পী মনীষা কৃত বিদ্রোহের শিল্পমূর্তি এ ছোটগল্প। পুরাতন পারিবারিক, সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের পাশাপাশি ব্যক্তিক স্বাতন্ত্র্য রবীন্দ্রনাথের প্রখর চেতনায় যে আলোড়ন তুলেছিল তার সফল উন্মোচন 'স্ত্রীর পত্র'-এ।

২০.৪ গল্পের বিশ্লেষণাত্মক পাঠ

এক নারীর বিদ্রোহের ধ্বজা তুলে সংস্কারাচ্ছন্ন সংসারের রুদ্ধ দ্বার ভেঙে বাইরে আসার গল্প স্ত্রীর পত্র"। এ গল্প মৃণালের। কলকাতার সাতাশ নম্বর মাখন বড়াল লেনের শ্বশুর বাড়িতে তার পরিচয় 'মেজ বৌ'। এই পরিচয়েই সে চিঠি লিখতে শুরু করেছে। স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রচলিত সংস্কারবশত 'শ্রীচরণকমলেষু' সম্বোধনে তার পত্রারম্ভ। গল্প ক্রমশ যত এগিয়েছে, 'মেজ বৌ' এর নির্মোক ছেড়ে স্বতন্ত্র ব্যক্তি মৃণাল রূপে তার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। তাই 'শ্রীচরণকমলেষু' সম্বোধনে পাতিব্রত্য, শ্রদ্ধা, সংস্কার প্রকাশ পেলেও স্বামীর প্রেমহীনতার প্রতি ঈষৎ শ্লেষ বুঝি পাঠকের নজর এড়ায় না। পনেরো বছরের বিবাহিত জীবনে প্রথম 'চিঠি লেখবার মতো ফাঁকটুকু' মৃণাল পেয়েছে শ্রীক্ষেত্রে অর্থাৎ জগন্নাথ ধামে তীর্থে গিয়ে। পাঠক অনুমান করতে পারবেন, পনেরো বছরের দাম্পত্য যাপনের পর নবপরিণীতা ব্রীড়াবনতা বধূর লজ্জা রাঙা প্রেমপত্র এ হতে পারে না। বরং সংসারের কূট-জটিল আবর্তাভিজ্ঞতার মালিন্য পত্রের প্রতি রন্ধ্রে। তীর্থক্ষেত্রে স্বামীর সঙ্গে যাওয়ার ইচ্ছে হয়তো মৃণালের ছিল, কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। স্বামী 'আপিসে ছুটির দরখাস্ত" না করায়। স্বামীর এ আচরণে মৃণাল কি দুঃখ পায়নি? নিশ্চই পেয়েছে। আর পেয়েছে বলেই চিরকালের মতো সাতাশ নম্বর মাখন বড়াল লেনে না ফেরার চরম সিদ্ধান্তটি গ্রহণে সমর্থ হয়েছে। 'বিধাতার তাই অভিপ্রায় ছিল, তিনি আমার ছুটির দরখাস্ত মঞ্জুর করেছেন। রবীন্দ্রসাহিত্যে 'ছুটি' শব্দটি বহুমাত্রিক। স্বামীর 'ছুটির দরখাস্ত' ও মৃণালের 'ছুটির দরখাস্ত' সমব্যঞ্জক নয়। স্বামীর ক্ষেত্রে ছুটি অর্থাৎ অফিসের প্রাত্যহিক নিয়মানুবর্তিতা থেকে সাময়িক বিশ্রাম। মৃণালের 'ছুটি' অর্থাৎ মুক্তি। মুক্তি 'মেজ বৌ' নামী পরাধীন জীবন থেকে।

চিঠির আঙ্গিক লেখা 'স্ত্রীরপত্র' কে পত্রগল্প বলা যেতে পারে। পত্র রচয়িতার পরিচয় দুটি পারিবারিক বা সামাজিক ও ব্যক্তিক। পরিবারতন্ত্রের নিয়ম-নীতি-নিষ্ঠার দুর্গ বহুক্ষেত্রেই বন্দী করে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য। 'আমি

তোমাদের মেজোবউ' হয়েও, পত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে গুরুত্ব দিয়ে আত্মমর্যাদার স্বপক্ষে পত্র রচয়িতা সামাজিক পারিবারিক পরিচয় গণ্ডী মুছে দেয় সাহসে ভর করে। "... আজ সাহস করে এই চিঠিখানি লিখছি, এ তোমাদের মেজোবউয়ের চিঠি নয়"। অর্থাৎ গল্পের উদ্দেশ্য স্পষ্ট। মেজো বউ-এর একমাত্র পরিচয় শুধু 'মেজোবউ" নয়, সে যে মৃণাল অর্থাৎ ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য প্রমাণের প্রচেষ্টা।

দুর্গম পাড়াগাঁয়ের মেয়ে মৃণাল। বুদ্ধিমতী ও রূপবতী। রূপ স্বভাবতই দৃশ্যগ্রাহ্য। তাই বাড়ির 'বড়োবউয়ের রূপের অভাব মেজোবউকে দিয়ে পূরণ করার" 'একান্ত জিদ'-এর কারণেই গাঁয়ে পৌঁছানোর হয়রানি মেনে নিয়ে মৃণালকে বৌ করে আনা হয়। কিন্তু বুদ্ধির অস্তিত্ব অনুভব করতে সময় লাগলেও, তার উপস্থিতি বিস্মৃত হওয়ার উপায় নেই। মৃণালের শ্বশুরবাড়ির লোকজনের অবস্থাও হল তাই। 'আমার যে রূপ আছে সেকথা ভুলতে তোমার বেশিদিন লাগেনি। কিন্তু, আমার যে বুদ্ধি আছে, সেটা তোমাদের পদে পদে স্মরণ করতে হয়েছে। মনে হয়, মৃণালের এ চিঠির অন্তরালে আছে স্বামীর প্রতি সুগভীর অভিমান। উপরের উদ্ধৃতিটিতে 'তোমার' ও 'তোমাদের' সর্বনাম দুটি লক্ষণীয়। রূপের যথাযথ মূল্য না পাওয়ার অভিযোগটি সরাসরি স্বামীর কাছেই।

শুধু সেকালে নয়, সাধারণ ঘরের সাধারণ বউয়ের রূপ-গুণ একালেও যতটা কাঙ্ক্ষিত, বিদ্যা-বুদ্ধি কোনোকালেই ততটা নয়। প্রত্যাশিত মাপ অতিক্রান্ত হলেই প্রশংসা রূপায়িত হয় নিন্দায়। সংসারের স্বাভাবিক নিয়মেই তাকেও 'মেয়ে-জ্যাঠা' বলে দুবেলা কটু কথা শুনতে হয়েছে। সে বোঝে, 'মেয়েমানুষের পক্ষে এ এক বালাই'। তাই সে বলে, "যাকে বাধা মেনে চলতে হবে, সে যদি বুদ্ধিকে মেনে চলতে চায় তবে ঠোকর খেয়ে তার কপাল ভাঙবেই। বুদ্ধি যদি তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রথম বৈশিষ্ট্য হয়, দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য অবশ্যই তার শিল্পী সত্তা। তার সহজ স্বীকারোক্তি, 'কবিতা লিখতুম'। কবিতার মধ্যেই পাঁচিলাবদ্ধ অন্দরমহলে সে খুঁজে পায় মুক্তির আকাশ। বদ্ধতার জগৎ থেকে মুক্ত হয়। সে জন্যই মৃণাল লেখে, "আমার মধ্যে যা-কিছু তোমাদের মেজো বউকে ছাড়িয়ে রয়েছে, সে তোমরা পছন্দ করোনি, চিনতেও পারোনি; আমি যে কবি, সে এই পনেরো বছরেও তোমাদের কাছে ধরা পড়েনি"। অর্থাৎ গৃহবধূর চেনা গতে বাঁধা ছাঁদকে ছাপিয়ে উঠেছে মৃণাল। কেবল মৃণালের কবিত্ব নয়, মাখন বড়াল লেনের কর্তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে অনেক কিছুই। দুর্বলের প্রতি অনাদর, 'পশমের কাজের উলটো পিঠের' মতো সজ্জাহীন, শ্রীহীন অন্দর, অনড় আবর্জনার স্তূপে ভরা উঠোন, অস্বাস্থ্যকর আঁতুড়ঘর — কোনো কিছুই মৃণালের দৃষ্টি এড়ায়নি। পল্লী গ্রামের উন্মুক্ত পরিবেশে বেড়ে ওঠা মৃণাল সাতাশ নম্বর মাখন বড়াল লেনের বদ্ধ পরিবেশের মানুষদের মধ্যে আত্মীয়তার সন্ধান পায়নি। পেয়েছে অনাদরে থাকার গৃহপালিত পোষ্যগুলির মধ্যে। তালুকের প্রজা যখন তাদের জমিদারকে ভেড়া ভক্ষণ করতে দেয়, সেই ভয়ার্ত প্রাণীটির প্রাণ রক্ষার জন্য সে প্রয়াসী হয়। নিজের জন্য যেমন অন্যদের জন্যেও মুক্তিকে তেমনি সর্বদা কামনা করেছে সে। তাই উপবাসী গরুগুলোর জন্য তার 'প্রাণ কাঁদত।' ক্ষুধার বন্ধন থেকে অবলা পশুগুলিতে মুক্তি দিতে "নিজে না খেয়ে লুকিয়ো তাদের খাবার দেওয়ায় তার 'গোত্র' সম্পর্কে 'ঠাটার সম্পর্কীয়েরা' সন্দেহ প্রকাশ করলেও তার সহমর্মিতা সম্পর্কে পাঠক নিঃসন্দিহান।

মৃণাল তার পিতা-মাতার কন্যা সন্তান রূপে মুক্তির স্বাদ পেয়েছিল কি না গল্প তা স্পষ্ট নয়। স্ত্রী বা বাড়ির মেজো বউ হিসেবে তার বদ্ধতার কথা চিঠিতে সে নিজেই লিখেছে। মাতৃত্বের মধ্যেও নারী খোঁজে মুক্তির স্বাদ। কিন্তু তার 'মেয়েটি জন্ম নিয়েই মারা গেল।' মা হবার মধ্যেকার মুক্তি সে পেয়েও পেল না। 'মা

হবার দুঃখটুকু পেলুম; কিন্তু মা হবার মুক্তিটুকু পেলুম না।' এক সংসারের মধ্যে থেকেও বিশ্বসংসারের মধ্যে নিজেকে ছড়িয়ে দেওয়ার স্বাদ তার অপূর্ণ রয়ে গেল। বিন্দু তার জীবনে মৃত কন্যার স্থান নেয়নি বটে, তবুও তার স্নেহাতুর হৃদয় বহুলাংশে আবর্তিত হয়েছে তাকে ঘিরেই। এমনকি বিন্দুর আত্মহত্যাই মৃণালকে বাঁধা ছকের বাইরে বের হতে সাহায্য করেছে। "বাতাসে সামান্য বীজ উড়িয়ে নিয়ে এসে পাকা দালানের মধ্যে অশ্বত্থ গাছের অঙ্কুর বের করে; শেষকালের সেইটুকু থেকে ইটকাঠের বুকের পাঁজর বিদীর্ণ হয়ে যায়। আমার সংসারের পাকা বন্দোবস্তের মাঝখানে ছোটো একটুখানি জীবনের কণা কোথা থেকে উড়ে এসে পড়ল; তার পর থেকে ফাটল শুরু হল"।

বিন্দু সেই 'জীবনের কণা' যার সান্নিধ্য মৃণালের বদ্ধ জীবনে 'ফাটল' ধরিয়েছে।

বিন্দু মৃণালের বড় জায়ের বোন। বিধবা মা'র মৃত্যুর পরে খুড়তুতো ভাইদের অত্যাচার থেকে বাঁচতে আশ্রয় নিয়েছে দিদির কাছে। কিন্তু মাখন বড়াল লেনের বাড়ির 'তোমাদের' কাছে সে 'আপদ'। সমাজবাস্তবতায় ঋদ্ধ 'মোটাদাগের রূঢ় অংশ' বিন্দু অধ্যায়। ধনী আত্মীয়ের বাড়িতে অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিতান্ত নিরুপায় হয়ে আশ্রয় নেওয়া অনাথা বালিকার প্রতি নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন আচরণে শ্বশুরবাড়িটির অগৌরবই অধিক প্রকটিত হয়। মৃণাল ছাড়া আর কারোরই সেই বোধ জাগেনি। মৃণালের বিপরীত মেরুতে রয়েছে ওই বাড়ির আর এক বৌ — বিন্দুর দিদি, মৃণালের বড়ো জা। তার মনস্তত্ত্বটি লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন সুচারু লেখনীর মাত্র কয়েকটি আঁচড়ে। শ্বশুরবাড়িতে মৃণালকে মেজো বৌ রূপে গ্রহণের অবশ্য কারণ ছিল বড় জায়ের রূপহীনতা। তার 'বাপের বংশে কুল ছাড়া আর বড়ো কিছু ছিল না, রূপও না, টাকাও না'। শ্বশুরের কৃপায় এ বাড়িতে তার প্রবেশ। সহজেই অনুমেয় অসুন্দরের, অর্থহীনতার গ্লানি তাকে নিশ্চয়ই স্পর্শ করে থাকবে। সেকারণেই সংসার পরিধিতে তার সশঙ্ক, সংকুচিত অবস্থান। এই পরিবারের প্রতি হওয়া বিষম অপরাধ হিসেবেই তিনি নিজের বিবাহকে দেখেছেন। এমতাবস্থায় পিতৃমাতৃহীন বোনকে সংসারে আশ্রয় দেওয়ার মধ্যে স্নেহ থাকলেও, তার বশবর্তী হয়ে শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে বিন্দুর পক্ষ অবলম্বনের সাহসিকতা তার মধ্যে ছিল না। একদিকে হীনমন্য মানসিক সংস্কার, অন্যদিকে অর্থনৈতিক পরাধীনতা কি এর জন্য দায়ী? বড় জা 'নিতান্ত দরদে প'ড়ে বোনটিকে নিজের কাছে এনেছেন। কিন্তু যখন দেখলেন স্বামীর অনিচ্ছা, তখন এমনি ভাব করতে লাগলেন, যেন এ তাঁর এক বিষম বালাই, যেন একে দূর করতে পারলেই তিনি বাঁচেন। এই অনাথা বোনটিকে মন খুলে প্রকাশ্যে স্নেহ দেখাবেন সে সাহস তাঁর হল না। তিনি পতিব্রতা।" এই পাতিব্রত্যও আসলে নিরুপায় অবলম্বন। সেই নিরুপায় পাতিব্রত্যের দাবিতেই কি বিন্দুকে সুবিধাদরে পাওয়া, বিস্তর কাজ দেওয়া অথচ 'খরচের হিসেবে বেজায় সস্তা প্রমাণ করে সংসার মাঝে বিন্দুর আসনটি তার দিদি স্থায়ী করতে চেয়েছিল?

কবি প্রাণের অধিকারী মৃণালের সংসার চৌহদ্দীর প্রতিটি অবহেলিত, পীড়িত প্রাণী, এমনকি দৃশ্যের প্রতিও ছিল সজাগ দৃষ্টি। সেখানে বিন্দুর প্রতি সহৃদয়তার প্রকাশে অস্বাভাবিকতা কোথায়? সকলকে তুষ্ট করার অভিলাষে বিন্দুর খাওয়া-পড়ার 'মোটা রকমের ব্যবস্থা', বাড়ির 'সর্বপ্রকার দাসীবৃত্তিতে তাকে নিযুক্ত করার প্রয়াসটুকু তাই মৃণালের সজাগ দৃষ্টিতে ধরা পড়ল সহজেই। মৃণাল চিন্তায়-চেতনায় সমকালের থেকে এগিয়ে। পারিপার্শ্বের চেয়ে সে পৃথক। অনাদৃতা বিন্দুর প্রতি তার স্নেহ স্বাভাবিক। বছর চোদ্দর বিন্দুকে তাই মৃণাল নিজের ঘরে টেনে নিল। এতে বড়ো জা মনে মনে নিশ্চিন্ত হলেও সকলের কাছে নালিশ জানিয়ে প্রকৃতপক্ষে নিজের অসহায় অবস্থানকেই স্পষ্ট করে তুলেছেন। "আমি যেন বিষম একটা বিপদ ঘটালুম,

এমনি ভাবে তিনি সকলের কাছে নালিশ করে বেড়ালেন। কিন্তু, আমি নিশ্চয় জানি, তিনি মনে মনে বেঁচে গেলেন। এখন দোষের বোঝা আমার উপরেই পড়ল। তিনি বোনকে নিজে যে স্নেহ দেখাতেন পারতেন না আমাকে দিয়ে সেইটুকু করিয়ে নিয়ে তাঁর মন হালকা হল।” বড়ো জা-এর মধ্যে এক অদ্ভুত defence mechanism লক্ষ্য করা যায়। এ ধরনের মানসিকতা বাস্তবে অবশ্য বিরল নয়। মৃণাল চরিত্রের সর্বোত্তম প্রস্ফুটনের খাতিরে বড়ো জা চরিত্রটি একান্ত প্রয়োজনীয়। লক্ষণীয়, বিন্দুর নাম থাকলেও তার দিদির কোনো নাম নেই। সে কেবলই বড়ো জা কিংবা পরিবারের কাছে বড়ো বৌ। অর্থাৎ তার নামহীনতা আসলে সংসারে তার গুরুত্বহীন অস্তিত্বকে প্রমাণ করে। একই সঙ্গে মৃণালের বিপরীতে ব্যক্তিত্বহীন, অসহায়, দুর্বল, নিরুপায় চরিত্র রূপে তার অবস্থানে গল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে।

বিন্দু আসলে বিন্দুই। যার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ নেই। নেই বেধ, পরিধিও। যথা সম্ভব সংকুচিত হয়ে, টিকে থাকাতেই তার অস্তিত্ব। মাখন বড়ালের গলির বাড়িতে তার মূল্য নির্ধারিত হবার মতো কোনো গুণ তার ছিল না। “সে দেখতে এতই মন্দ ছিল যে, পড়ে গিয়ে সে যদি মাথা ভাঙত তবে ঘরের মেঝেটার জন্যই লোকে উদ্‌বিগ্ন হত’। মেঝের জন্য সংসারের লোকের উদ্‌বিগ্ন হওয়ার মধ্যেই প্রকৃত পক্ষে ‘মন্দ’ মানসিকতার পরিচয় মেলে। জীবনের চেয়ে বস্তুর দাম বেশি! মহাপুরুষদের সুমহান মানবতার বাণী কেবল বিন্দুর ক্ষেত্রে নয়, কিংবা শুধু সেকালে বা একালে নয়, সভ্যতার চিরকালের ইতিহাসে জীবন আর বস্তুর তুল্যমূল্য বিচারে প্রায়শই জীবনের পরাজয় পরিহাসে পরিণত হয়। কাজেই পিতামাতাহীন, অনাথা বালিকাকে যেমন বিয়ে দেবার কেউ ছিল না, তেমনি রূপহীন, অর্থহীন কন্যাকে স্ত্রী রূপে গ্রহণ করার সাহসও কেউ দেখায়নি। এখনও খবরের কাগজের পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপনের পাতায় সচেতন পাঠক নজর করলেই এ কথা অনুধাবন করতে সত্যতা পারবেন। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে কেবল, স্থবির মানসিকতা এখনও জাঁকিয়ে শিকড় ছড়িয়ে আছে মস্তিষ্কের কোষে কোষে। আবর্জনা ঘরের পাশের আঁস্তাকুড়ে অনাবশ্যক স্থান পায়। কারণ তার অস্তিত্ব মানুষ ভুলে যেতে পারে। কিন্তু ‘মেয়েমানুষে’র অনাবশ্যক উপস্থিতি ক্ষণিক বিস্মৃত হওয়ার নয়, তাই আঁস্তাকুড়েতেও তার স্থান হয় না। এহেন বিন্দুকে পরম মমতার স্পর্শে নিজের ঘরে শুধু নয়, মনেও স্থান দিয়েছে মৃণাল। অসহায়ের প্রতি সহজাত সহানুভূতির বোধ তাকে মানবিক করে তুলেছে। পরবর্তীকালে আশাপূর্ণা দেবীর লেখা ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’ উপন্যাসের নায়িকা সত্যবতীর মধ্যে মৃণালের এই স্বভাব বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।চির অনাদৃতা দিদির ঘরে দাসীবৃত্তি করা বিন্দুকে পরম মমতায় আদরে নিজের কাছে এনেছে মৃণাল। বিন্দুর গায়ে যখন ‘ঘামাচি’র মতো বের হয়, তখন তাকে ‘বসন্ত’ বলে সকলে ঘৃণায় ঠেলে দিলেও মৃণাল দেয় না। আবার তা মিলিয়ে গেলেও সকলে ‘বসন্ত বসে গিয়েছে’ বলে শোরগোল বাধায়। বিন্দুর অসুস্থতায় মৃণাল পাশে থাকে, ভরসা জোগায়। ঘৃণার বদলে ভালোবাসা, আদরে তাকে মনের ঘরেও আশ্রয় দেয়। সংকোচ, লজ্জায় কুঁকড়ে থাকা বিন্দু যেমন সহজ হতে পেরেছে মৃণালের ভালোবাসায়, তেমনি উজাড় করে ভালোওবেসেছে মৃণালকে। ‘মেয়েটা আমাকে নিয়ে একেবারে পাগল হয়ে উঠল।’ ভালোবাসার এ পাগলামির কারণ পিতৃমাতৃহীন চির অনাদরে থাকা স্নেহবুবুক্ষু হৃদয়। বিন্দুকে ঘরে স্থান দিয়ে, তাকে যে সম্মান, আদর মৃণাল দিয়েছে তারই প্রতিদানে রূপহীন, ‘কালো’ বিন্দু মৃণালকে সাজিয়ে, চুলবেঁধে দিয়ে তার অনাবিল ভালোবাসায় ‘পাগল’ করে তুলেছে। এ ‘পাগল’ করে তোলায় আছে ভালবাসার আনন্দ। বিন্দুর জীবনে মৃণাল একইসঙ্গে মা ও দিদির আসন লাভ করেছে। আর বিন্দুর ভালোবাসার ‘দুঃসহ বেগ’ মৃণালকে

চিনিয়েছে তার 'মুক্ত স্বরূপ'।

বিন্দুকে ঘিরে সাতাশ নম্বর মাখন বড়াল লেনের বাড়িতে আদর-অনাদরের দড়ি টানাটানি চলেছে। বিন্দুর মতো মেয়েকে 'আদর যত্ন' করা সংসারের দৃষ্টিতে মনে হয়েছে 'বাড়াবাড়ি'। তা নিয়ে 'খুঁতখুঁত খিটখিটে'র সঙ্গে মৃণালের নিন্দেও হয়েছে। দাসীরা বিন্দুর কাজ করতে আপত্তি করেছে। বাজুবন্ধ চুরি গেলে বিন্দুকে সন্দেহ করা হয়েছে অবলীলায়। আবার 'স্বদেশী হাঙ্গামায়' বাড়িতে তল্লাসি হলে বিন্দুকে 'পুলিশের পোষা মেয়ে-চর' বলতেও দ্বিধা হয়নি কারো। আসলে তাকে দোষারোপ করতে, অপবাদ দিতে প্রমাণ লাগে না। কারণ সে বিন্দু। সহায় সম্বলহীন, অসুন্দর আশ্রিতার প্রতি গৃহস্থের ব্যবহারের মাধ্যম সমাজক্ষতটি লেখক গল্পে তুলে ধরেছেন নিপুণ দক্ষতায়। বিন্দুর জন্য আলাদা দাসীর বন্দোবস্ত করা হলে মৃণালের হাত খরচ বন্ধ করা হয়েছে। এ আচরণে ঐ বাড়ির সংকীর্ণ মানসিকতাই প্রকাশ পায়।

'স্ত্রীর পত্র' গল্পের গুরুত্বপূর্ণ অংশ বিন্দু প্রসঙ্গ। তাকে কেন্দ্র করেই মৃণালের 'মুক্ত স্বরূপ' উন্মোচন এবং অবশেষে মুক্তি লাভ। বিন্দুকে বাড়ি থেকে বিদায়ের সুযোগ এল 'প্রজাপতিদেবতার শরণাপন্ন হয়ে। বরপক্ষ বিন্দুকে দেখতে এলো না। বর বিয়ে করতেও এলো না। কনেকেই বরের বাড়ি নিয়ে গিয়ে বিয়ে দেওয়া হল। এই বিসদৃশ আচরণ কি সন্দেহজনক নয়? কিন্তু বিন্দুর জন্য সংসারে অনেক লড়াই করলেও বিয়ে বন্ধ করার জোর মৃণালের ছিল না। 'একে তো মেয়ে; তাতে কালো মেয়ে; কার ঘরে চলল, ওর কী দশা হবে, সে-কথা না ভাবাই ভালো।' বিন্দুও বিয়ের বিকল্প রূপে মৃত্যুকে কামনা করেছে। এমনকি গোয়ালঘরের এককোণে পড়ে থাকা বা দাসীবৃত্তিকেও ভালো মনে করেছে। অনিশ্চিত বিবাহ তাকে সুখী ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখাতে পারেনি। বিবাহের মধ্য দিয়ে ঐ বাড়ির 'আপদ' বিদায় হল। পরিত্যক্ত হল বিন্দু। নিজের কিছু গয়নায় মৃণাল সাজিয়ে দিয়েছিল বিন্দুকে। এ আচরণে বিন্দুর প্রতি তার স্নেহ, মমতার প্রকাশ। বিবাহের তিন দিন পর কয়লা রাখার ঘরের এক কোণে, যেখানে তালুকের প্রজাদের থেকে পাওয়া ভেড়াটিকে মৃণাল নিজের স্বভাবশত পরিবারের জঠরাগ্নি থেকে বাঁচাতে আশ্রয় দিয়েছিল, সেখানে দেখতে পেল বিন্দুকে 'কোণে জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে। অসহায়ত্বে বিন্দু ও কয়লা রাখার ঘরের মনুষ্যেতর প্রাণীটি সমরেখায় দাঁড়িয়েছে। উভয়েই যেন জঠরাগ্নি নির্বাপনের জন্য বলিপ্রদত্ত। ভেড়াটি মানুষের বাস্তবিক ক্ষুধার ও বিন্দু সংকীর্ণ সমাজ সংস্কার ও হীন মানসিকতার ক্ষুধার কাছে নিতান্ত নিরুপায়। স্বামী তার পাগল। শাশুড়ি ততোধিক প্রচন্ডা 'সেও পাগল, কিন্তু পুরো নয় বলেই আরও ভয়ানক।' বিন্দু কোনোমতে পালিয়ে এসেছে সেখান থেকে। মৃণালের কাছে সে আশ্রয় পাবে, এই পরম আশ্বাসে। কিন্তু মৃণাল সাতাশ নম্বর মাখন বড়াল লেনের বাড়ির অংশ মাত্র। সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার তার নেই। তাই অচিরেই গোল বাঁধে। সংসারের বিরুদ্ধে গিয়েও সে বিন্দুকে রক্ষা করতে পারে না। বলা ভালো, এ বাড়িতে থেকে মৃণালকে 'বিষম বিপদে', বিড়ম্বনায় ফেলার চেয়ে সমর্পণের পথই বিন্দুর কাছে শ্রেয় বোধ হয়। সংঘাতে প্রবৃত্ত হয়েও বিন্দুকে রক্ষা করতে না পারার ঘটনা তৎকালীন সময়ের সাধারণ বাঙালি নারীর গৃহাভ্যন্তরীণ যাপনের বাধ্যতাকে স্পষ্ট করে দেয়। মৃণালের প্রতি ভালোবাসার কারণেই সে নিজেকে ঠেলে দিয়েছে যন্ত্রণায় এবং অসহ্য বোধে দ্বিতীয়বার পলায়ন করলেও মৃণালের কাছে পুনরায় ফিরে আসেনি।

শ্বশুরবাড়ি থেকে পালিয়ে এসে বিন্দু 'আপন দুঃখ' বাড়াল। কিন্তু মৃণাল অপরিসীম দুঃখে 'কেবল' কাতর হয়ে দিনাতিপাত করেনি। যন্ত্রণার মধ্যেও সহজাত বুদ্ধি প্রয়োগে বিন্দুকে রক্ষার প্রয়াস করেছে ভাই শরতের

সাহায্যে। দ্বিতীয়বার শ্বশুরবাড়ি থেকে পালিয়ে বিন্দু খুড়তুতো ভাইদের কাছে আশ্রয় চেয়েছিল। বিধবা মা-র মৃত্যুর পর যারা আশ্রয় দেয়নি, 'পাগল' স্বামীর থেকে মুক্তির আশায় বাঁচতে চেয়ে তাদের কাছেও ছুটে গেছে বিন্দু। তারা শুধুমাত্র তাকে প্রত্যাখ্যান করেই ক্ষান্ত হয়নি 'তুমুল রাগ করে তখনই আবার তাকে শ্বশুরবাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেছে।' অন্যদিকে কেবলমাত্র বিন্দুকে তার পাগল স্বামীর থেকে বাঁচানোর চেষ্টায় সহসাই খুড়িমার সঙ্গে শ্রীক্ষেত্রে তীর্থ করতে যেতে যায় মৃণাল। নির্ধারিত সময়ে ভাই শরৎ 'যেমন করে হোক" বিন্দুকে তুলে দেবে পুরীর গাড়িতে। বিন্দুকে নিয়ে সকলের থেকে দূরে চলে গিয়ে তাকেই বাঁচাতে চাওয়ার পরিকল্পনায় মৃণাল সফল হতে পারেনি। তার এই পরিকল্পনা দুঃসাহসিক, বাস্তববোধের অভাবও যথেষ্ট। কিন্তু অন্তরের ভালোবাসা ও আবেগকে কোনোমতে অস্বীকার করা যায় কি? মৃণালের এই সিদ্ধান্তের পশ্চাতে রয়েছে বিন্দুর প্রতি অসম্ভব স্নেহ। কিন্তু হতদরিদ্র, অনাথ, ত্রস্ত 'কালো মেয়ে'টি জীবনযুদ্ধে পরাজিত হয়ে সকল সমস্যার সমাধান খুঁজেছে আত্মবিনাশের মধ্যে। জীবিত অবস্থায় যে অনাদর, অবহেলা, গঞ্জনা সে পেয়েছে মৃত্যুতেও তার কোনো পরিবর্তন হল না। বিন্দুদের মৃত্যুর জন্য যারা প্রকৃতই দায়ী তাদের শাস্তি হবে কি? পোষ্যগুলিকে মৃণাল বাঁচাতে পেরেছিল। কিন্তু বিন্দুকে পারল না। বিন্দুকে বড়ো বেশি ভালোবেসেছিল বলেই এই ব্যর্থতা, অপারগতা তাকে বিদ্ধ করেছে। মৃণালের আপ্রাণ চেষ্টা ছিল বিন্দুকে 'পাগল' স্বামীর থেকে বাঁচানো, বিন্দুও তেমনি স্নেহ, আদর, ভালোবাসার স্বাদ পেয়ে যাকে 'দিদি' ডেকেছে, সেই মৃণালকে বিপদে ফেলতে চায়নি। মৃত্যুই তার কাছে সহজ বোধ হল।

বিন্দুর মৃত্যু সবচেয়ে আহত করেছে মৃণালকে। এ আঘাত মৃণালকে বুঝিয়েছে, সাতাশ নম্বর মাখন বড়াল লেনের বাড়িতে তার ঘরটুকুও তার একার নয়। 'সংসারের মাঝখানে মেয়েমানুষের যে পরিচয় সে পেয়েছে, তা আর তার দরকার নেই।' অর্থাৎ বিন্দু আত্মবিনাশ থেকেই মৃণালের 'আত্ম-আবিষ্কার'। তাই সেও মুক্তি খোঁজে। অবশ্য তার মুক্তি জীবন ত্যাগে নয়, আত্মসম্মান বোধে। 'অন্দরমহলের বাঁধা নিয়ম', 'বাঁধা অভ্যাস', 'বাঁধা বুলি'র দীনতাকে অস্বীকার ও পরিত্যাগে। প্রথা সর্বস্ব 'পতিব্রতা' নারীর আত্মমর্যাদাহীন সংস্কারাচ্ছন্ন জীবনে সে আর ফিরে যেতে চায় না। বিন্দুর মৃত্যু তাকে সংসার-সমাজে নারীর মূল্য যে কত তুচ্ছ, তা বুঝিয়ে দিয়েছে। সেকারণেই 'আত্মক্ষয়ে প্রবৃত্ত' না হয়ে বিধাতার আনন্দধামে নিজেকে মূল্যবান ভেবে মীরার মতো জীবনের সঙ্গে স্বাধীনভাবে লেগে থেকেই মুক্ত হতে চেয়েছে --- 'আমিও বাঁচব। আমি বাঁচলুম।' 'বাঁচব' ও 'বাঁচলুম', দুই ক্রিয়াপদে আকাঙ্ক্ষা ও তাকে ফলপ্রসূ করার দৃঢ়তা প্রতীয়মান। মেজ বৌ-এর খোলস ছিন্ন করে সে মৃণাল হয়ে উঠেছে।

নিষ্ঠুর কঠিন পারিবারিক বদ্ধতা থেকে মৃণাল অবাধ মুক্তির স্বাদ পেয়েছে সমুদ্র তীরে এসে। শ্বশুরবাড়ির সংকীর্ণ গলি যেন সংকীর্ণ মানসিকতার প্রতীক হয়ে গেছে। অন্যদিকে সীমাহীন সমুদ্র পরিবেশ - আত্ম-আবিষ্কার ও চেতনার উত্তরণের প্রতিরূপ। অর্থাৎ পটচিত্রের মধ্য দিয়ে গূঢ় ব্যঞ্জনার উদ্ভাস। গল্পের শেষাংশে লেখক মীরাবাঈ-এর প্রসঙ্গ এনে মৃণালকে আধ্যাত্মিকতার পথে চালিত করলেন, এমনটা ভাবার কারণ নেই। রক্ষণশীলতা, প্রথাসর্বস্ব কূপমণ্ডুকতা থেকে মুক্তির প্রসঙ্গেই সে মীরার সঙ্গে সাদৃশ্য অনুভব করেছে। পরনির্ভরশীলতাকে অতিক্রম করে যে মুক্ত জীবন পেয়েছে। সেই জীবনে সম্পৃক্ত থাকার বাঞ্ছা প্রকাশে মীরার ভজনের উল্লেখ করেছে — ছাড়ুক বাপ, ছাড়ুক মা, ছাড়ুক যে যেখানে আছে, মীরা কিন্তু লেগে রইল, প্রভু, তাতে তার যা হবার তা হোক।' এখানেই বিন্দুর প্রার্থিত মুক্তির সঙ্গে মৃণালের মুক্তির তফাৎ। নতুন

জীবনেও সে হাল ছাড়বে না। মৃণালের ব্যক্তিত্বের এই প্রত্যয়ী সত্তার উন্মোচন লেখকের উদ্দেশ্য। এই স্বাতন্ত্র্য, ভাবনার নতুনত্ব, আত্মজাগরণ তাকে আধুনিক নারীতে রূপান্তরিত করেছে।

২০.৫ চরিত্র আলোচনা

'স্ত্রীর পত্র' গল্পে দ্বান্দ্বিক কাঠামোর মধ্যে চরিত্রগুলির অবস্থান। মৃণাল গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র। তার বিপ্রতীপে রয়েছে বড় জা। বিন্দুর অবস্থানও প্রায় বড় জা-এর পাশাপাশি। তবু তারা এক নয়। প্রকৃতপক্ষে বড় জা ও বিন্দু-চরিত্র দুটির দ্বারা গল্পকার মৃণাল চরিত্রটিকে প্রস্ফুটিত, বিকশিত ও উদ্ভাসিত করে তুলেছেন।

নবযুগের নবভাবনার দ্বারা আলোকিত চরিত্র মৃণাল। বড় জা প্রথাগত সনাতন ভাবনায় আবদ্ধ। মৃণাল রূপবতী। রূপের কারণেই 'দিনের বেলা শেয়াল ডাকা' 'দুর্গম পাড়া গাঁ' থেকে তাকে কলকাতার পাত্রপক্ষ বধূরূপে নির্বাচন করে এনেছে। বড় জা-এর রূপ ছিল না। তার পরিবারে ছিল না অর্থ প্রাচুর্য ছিল বংশ কৌলিন্য। শ্বশুরের হাতে-পায়ে ধরে অর্থাৎ পাত্রপক্ষের অনুগ্রহ, কৃপায় তার সাতাশ নম্বর মাখন বড়াল লেনের বাড়িতে বধূ হয়ে ওঠা। ফলে বধূর মর্যাদায় যে খামতি ছিল তা 'দেনাপাওনা' গল্পের নিরুপমার কথা স্মরণ করায়। এই খামতিটুকু মেটাতেই বুঝি সংসারে তার সংকুচিত অবস্থান। 'সকল বিষয়েই নিজেকে যতদূর সম্ভব সঙ্কুচিত করে' শ্বশুরঘরে 'অতি অল্প জায়গা জুড়ে থাকেন। তাই স্বামীদেবতার চরিত্র দোষ থাকলেও তিনি ভাগ্যদেবতার দোষ দেন, প্রকৃত দোষীর দিকে অঙ্গুলি উত্থাপনে রয়ে যান অপারগ। মৃণালের বিয়ে হয়েছিল এ বাড়িতে বড় জায়ের রূপহীনতার ক্ষতিপূরণের জন্য। ফলে রূপহীনতা, বাপের বাড়ির অর্থহীনতা তার মধ্যে হীনমন্যতা তৈরি করেছে, যা থেকে তার নিষ্কৃতি নেই। 'তিনি নিজের বিবাহকে এ বংশের প্রতি বিষম অপরাধ বলেই চিরকাল মনে জেনেছেন'। মৃণালের বড় জা সেকালের অগণিত পতিব্রতা বাঙালি কূলবধূর প্রতিনিধি। শাস্ত্র জর্জরিত দ্বিধাবিভক্ত হৃদয়ে জগৎ-সংসারের যে চিত্র সেখানে অঙ্কিত, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য সেখানে হয়ে যায় অলীক কল্পনা, নিতান্তই শাস্ত্র বিরোধী। বিধবা মায়ের মৃত্যুর পর 'নিতান্ত দরদে' পড়ে অনাথা বোনটিকে নিজের কাছে নির্দ্বিধায় রাখতে পারে না সে। খুঁজতে হয় ফন্দিফিকির। 'কোথাকার আপদ' হওয়া থেকে বাঁচাতে সংসারে বিনা মাইনের দাসীবৃত্তিতে বিন্দুকে নিয়োজিত করে 'খাওয়াপরার' 'মোটারকমের ব্যবস্থা' করতে হয়। যেন 'বিন্দুকে সুবিধাদরে পাওয়া গেছে' 'ও কাজ দেয় বিস্তর অথচ খরচের হিসাবে বেজায় সস্তা।

মৃণালের বড় জা-এর চিন্তনবৃত্ত গণ্ডীবদ্ধ। স্ত্রীলোকের একমাত্র অবলম্বন স্বামী এবং তাকে ঘিরে জীবনের পরিব্যাপ্তি ও পরিত্রাণ - ভাবনার এই প্রথাবদ্ধতার শিকড়ে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা বড় জা চরিত্র। গল্পে সে নামহীন - — মৃণালের বড় জা, বিন্দুর দিদি, এটুকু তার পরিচয়। এই নামহীনতা কি তার স্বতন্ত্র ব্যক্তিচেতনাহীনতার পরিচয় দেয় না? তাই শ্বশুরঘরে নারীর স্বাধীনতাহীন অসহায় জীবনের পাশাপাশি প্রতিবাদহীন মেনে নেওয়ার ধারণাতেই সে বিশ্বাসী। 'দরদে পড়ে' বোনটিকে আনলেও 'স্বামীর অনিচ্ছা'র কারণে 'মন খুলে প্রকাশ্যে স্নেহ' প্রদর্শনের সাহস করতে পারে না। বরং বোনের পাগল স্বামীর জন্য ভীত সন্ত্রস্ত হলেও বিন্দুকে স্বামীর কাছে পাঠিয়ে সে নিজেও দায়মুক্ত হতে চায়। কারণ তার স্বামী ও স্বামীর পরিবারের অনৈতিক কাজের বিরোধিতা করার সাহস বা মানসিকতা কোনটাই তার নেই। সেজন্যই সে ভাগ্যের দোহাই দেয়, ধর্মকে ভয়

পায়, শাস্ত্রকে মান্য করে। ''জানিস তো বিন্দি, পতিই হচ্ছে স্ত্রীলোকের গতি মুক্তি সব। কপালে যদি দুঃখ থাকে তো কেউ খণ্ডাতে পারবে না।'' হৃদয়ের দ্বারে শাস্ত্রের খিল পড়ে। কারণ তিনি পতিব্রতা। পতিব্রতা বড় জা সংসারের সকল সিদ্ধান্ত মেনে নেন কিংবা নিতে বাধ্য হন সেকালের সাধারণ নারীদের মতোই ধর্ম আর শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে। সুতরাং সেই দিদির শ্বশুরবাড়িতে আশ্রিতা বোনের অবস্থা যে ততোধিক শোচনীয় হবে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

বিন্দুর নামটিও অত্যন্ত ব্যঞ্জনাগর্ভ। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, পরিধিহীন অস্তিত্ব—তা বোঝাতেই যেন গল্পকার নাম দিলেন বিন্দু। বিন্দু সুন্দরী নয়, কালো। চিরকালীন বর্ণ-বৈষম্যের শিকার। তদুপরি পিতৃ-মাতৃহীন, অনাথ। সে অর্থহীনও। ফলে খুড়তুতো ভাইদের সংসারে তার ঠাঁই হয় না। ভাইদের অত্যাচার থেকে বাঁচতে আশ্রয় নিতে হয় দিদির শ্বশুরবাড়ি। সেখানে সে 'আপদ'। সকলকে পাশ কাটিয়ে সকলের চোখ এড়িয়ে, ভয়ে ভয়ে থাকার মধ্যে যে তীব্র অসহায়তা, তা বিন্দুর চরিত্রে স্পষ্ট। 'কেননা, ও যে বিন্দু' বাক্যাংশ প্রায় ধ্রুবপদের মতো ব্যবহার করেছেন লেখক। বিন্দুর গায়ে লাল লাল গুটি বা ঘামাচি হলে কিংবা মিলিয়ে গেলেও সকলের বিরক্তি ঝরে পড়ে তার প্রতি। কিছু চুরি গেলেও নির্দ্বিধায় দায়ী করা হয় তাকে। বাড়িতে পুলিশের হাঙ্গামা হলে সকলের দৃষ্টিতে সে হয়ে যায় 'মেয়ে-চর'। অর্থাৎ সংসার তাকে ব্যবহার করে। কেবল পরিশ্রম করিয়ে নিয়ে নয়, তার নামে অপবাদ দিয়েও মানসিক আরাম খোঁজে।

বিন্দু হতদরিদ্র, অসহায়, ত্রস্ত, একাকী বলেই উন্মাদের সঙ্গে তার বিয়ে দিতে কারো বিন্দুমাত্র দ্বিধা হয় না। কারো কিছু বলার থাকে না। অত্যাচারিত হয়ে ফিরে এলেও আশ্রয় পায় না। ফিরিয়ে দেওয়া হয়। অনাদৃত বলেই যে মৃণালের স্নেহ-ভালোবাসার স্পর্শ তাকে সঞ্জীবিত করেছিল, আশ্রয়দাত্রীর বিপদ বাড়াতে না চেয়ে সে আত্মনাশের পথ বেছে নেয়। 'দেনাপাওনা' গল্পের নিরুপমার সঙ্গে তার মিল। দরিদ্র পিতার অর্থসংকট বাড়াতে না চেয়ে নিরুপায় হয়ে নিজের প্রতি নিদারুণ অবহেলায় অসুস্থ হয়ে মারা যায়। সেই মৃত্যুও একপ্রকার স্বেচ্ছাকৃত। বিন্দু 'কালো মেয়ে', নিরুপমা সুন্দরী কিন্তু উভয়ের একই পরিণতি তথাকথিত সুন্দর-অসুন্দরের ঊর্ধ্বে সমাজে নারীর অসহায়ত্বের আখ্যান উপস্থাপন করে। 'রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে সৌন্দর্য চেতনা আর শৈল্পিক শুচিতার প্রতীক হল নারী'। তাঁর 'যুগসজাগ মন' নারীর মর্যাদা, তার অধিকার, মুক্তি সম্পর্কে নতুন মোড় নিয়েছে 'সবুজপত্র'এর আশ্রয়ে। এই সময়েই লেখা 'পলাতকা'র মঞ্জুলিকার মধ্যেও দেখি নারীশক্তির জাগরণ। তারই প্রদীপ্ত রূপ পাওয়া গেল মৃণাল-এ। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ও নারীত্বের মর্যাদার দাবিতে শাণিত যুক্তি, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-বেদনাবোধ-তিরস্কার মিশ্রিত ভাষার প্রয়োগে, নতুন যুগের নারী ভাবনার আলোকে মৃণাল প্রতিনিধি স্থানীয় চরিত্র। পারিবারিক হৃদয়হীনতার প্রতিবাদে মৃণালের মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে নারীর নিজের সম্পর্কে মূল্যবোধ। 'মেয়েমানুষ' বলে তার প্রতি অবহেলার বিরুদ্ধে রয়েছে সোচ্চার বিদ্রোহ। মৃণালের এই বিদ্রোহ হয়তো সফল হয়নি, কিন্তু তার চেষ্টাটুকু অস্বীকার করার উপায় নেই। 'ল্যাবরেটরি'র সোহিনী''র অস্পষ্ট আদল মৃণালের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। আত্মমর্যাদাবোধের তাড়নায় মৃণাল পরিচালিত। বিন্দু স্বামীগৃহ ত্যাগ করে তার প্রতি কৃত অন্যায়ের বিরোধিতা করতে চেয়েও পারেনি। তার হয়ে মৃণাল প্রতিবাদ করেছে স্বামীগৃহ ত্যাগের পর খোলাচিঠি পাঠিয়ে। যেখানে মৃত্যুর মধ্যে বিন্দু মুক্তি খুঁজে নেয়, সেখানে জীবনের সঙ্গে লেগে থেকে মুক্তির সন্ধান পায় মৃণাল। বিন্দুর ঘটনায় মৃণালের উত্তেজনা বোধ কেবল সামাজিক সচেতনতা নয়, বরং ব্যক্তিগত মমতা-প্রীতির দাবিই অধিক। ফলতঃ ব্যক্তিগত যন্ত্রণার

জায়গা থেকেই মৃণালের প্রতিবাদ। আর এর বীজ সংগুপ্ত রয়েছে তার চরিত্রে।

১. গ্রাম-জীবনের মুক্ত পরিবেশে বেড়ে ওঠা মৃণালের মনে শহরের বদ্ধ পরিবেশের শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে প্রাণের যোগ কখনোই তৈরি হয়নি। এর একটি কারণ হয়তো গ্রাম ও শহরের পরিবেশ ও সংস্কৃতিগত তফাৎ।

২. মৃণাল লুকিয়ে কবিতা লেখে এবং বারবার সে নিজের বুদ্ধির কথা বলেছে। অর্থাৎ নিজের স্বাধীন বিচার বুদ্ধিতে অগাধ আস্থা তাকে স্বতন্ত্র সত্তার অধিকারী করেছে।

৩. সহানুভূতি, মমতা তার চরিত্রের বিশেষ গুণ। যে কারণে মনুষ্য ও মনুষ্যেতর প্রাণী উভয়কেই রক্ষার বিষয়ে তার সতর্ক দৃষ্টি।

মৃণাল তার স্বামীকে কোথায় দুশ্চরিত্র বলেনি, এমনকি অভাবও তার ছিল না। তবু বোঝা যায়, স্বামীকে সে সহযোদ্ধা হিসেবে পায়নি। বরং বিন্দুর জন্য আলাদা দাসীর ব্যবস্থা করায়, তার হাত খরচের টাকা বন্ধ হয়ে যাওয়ার মধ্যে স্বামীরও প্রচ্ছন্ন সমর্থন অনুমান করা যায়। লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, সে সরাসরি স্বামীকে ত্যাগ করেনি। ত্যাগ করেছে স্বামীগৃহ অর্থাৎ মাখন বড়ালের গলির বিশেষ বাড়িটি। পত্র সমাপ্তিতেও সেই ইঙ্গিত 'তোমাদের চরণতলাশ্রয় ছিন্ন', অর্থাৎ 'তোমাদের' বহুবচনে বাড়ি ও তার বাসিন্দাদের প্রতি তির্যক শ্লেষ ধ্বনিত হয়েছে। বাসিন্দাদের অংশ হিসেবে এই শ্লেষ স্বামীর প্রতিও।

মৃণালের বিপরীতে বড় জা ও বিন্দু চরিত্রদ্বয় অবস্থিত হলেও এক অর্থে তারা তিনজনেই সমগোত্রীয়। তারা প্রত্যেকই নিঃসঙ্গ। মৃণাল মা হওয়ার যন্ত্রণা পেলেও সুখটুকু পায়নি। সন্তানের মৃত্যু তাকে নিঃসঙ্গ করেছে। স্বামী সঙ্গে বাস করেও তাদের পরস্পরের জীবনবোধ মেলেনি। একাকীত্ব গ্রাস করেছে তাকে। সংসারে তার অভাব না থাকলেও মর্যাদার অভাব সর্বদাই তাকে যন্ত্রণা দিয়েছে। সংবেদনশীল স্বতন্ত্র ব্যক্তি মানসিকতায় সে সকলের থেকে পৃথক হয়ে রয়ে গেছে। সুতরাং সে নিঃসঙ্গ। তার বড় জা'র স্বামী অর্থাৎ ভাসুরের ছিল চরিত্রদোষ। বড় জা তার সমস্ত কষ্ট-যন্ত্রণা ধর্মের দোহাই দিয়ে ঢাকা দিতে চেয়েছেন। এখানেই বোঝা যায় তার অসহায়তা। বোনকে স্নেহ দেখাতে না পারার কষ্টও তাঁকে গোপন রাখতে হয়। সুতরাং যন্ত্রণা গোপনের প্রয়াসে তিনিও সংসারে একা নিঃসঙ্গ। বিন্দুর অসহায়তা, একাকীত্ব তাকে এতটাই নিঃসঙ্গ করেছে, যে সে বাধ্য হয়েছে মৃত্যুকে সঙ্গী নির্বাচন করতে। উনিশ শতকের নারীদের রচনায়, বিশেষত আত্মজীবনীতে সংসারের যাঁতাকলে সারাজীবন পিষ্ট হওয়ার বহু কথা জানা যায়। এই অমর্যাদার যন্ত্রণা ক্রমশ অধিকারবোধের জন্ম দেয়। জাগ্রত করে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ।

মৃণালের প্রতিবাদী ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তুলতেই রবীন্দ্রনাথ আত্মকথন রীতির আশ্রয় নিয়েছেন। স্বামীকে লেখা চিঠিতেই স্বীয় জীবনের অভিজ্ঞতার তাৎপর্যপূর্ণ উপাদানগুলিকে বেছে নিয়ে 'পরিণামী সিদ্ধান্তকে অনিবার্য' করে তুলেছে মৃণাল। সেকারণে ঘটনা অপেক্ষা সত্তার প্রতিবাদী চেতনার বিকাশই প্রধান হয়ে উঠেছে। অভ্যাসের অন্ধকারের যে আবরণ তার সত্তাকে ঢেকে রেখেছিল, বিন্দুর মৃত্যু তা ছিন্ন-ভিন্ন করে দিল। বিন্দুর আখ্যান-বিন্যাসের আয়োজন মৃণালের প্রত্যয়ী চরিত্রের উন্মোচনের জন্য।

২০.৬ গল্পের আঙ্গিক ও প্রকরণ ঃ নতুনত্বের সন্ধান

'স্ত্রীরপত্র' গল্পটির অবয়ব বৈশিষ্ট্য স্বতন্ত্র। গল্প-শরীর পল্লবিত হয়েছে চিঠির আকারে। 'সমাপ্তি' অংশের সূত্র ধরে গল্পের আরম্ভ। রবীন্দ্রনাথের বেশ কয়েকটি গল্পে, যেমন- 'নিশীথে', 'বোষ্টমী', 'হৈমন্তী'' প্রভৃতিতে শেষ থেকে শুরু করার প্রয়োগ রীতি দেখা যায়। 'উত্তমপুরুষের দৃষ্টিকোণের প্রকরণ' প্রায়শই সংশ্লিষ্ট থাকে এই প্রয়োগরীতিতে। গল্প কথক প্রায়শই জীবনের বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভের পর, গল্প বলা শুরু করেন। গল্পে কথকের অভিজ্ঞতাজাত জীবনবোধ পরিচালিত করে কাহিনির গতি। এ ধরনের গল্পের ক্ষেত্রে যেহেতু কথকের বোধ ও অভিজ্ঞতার জগতের অনুভববেদ্য প্রকাশ ঘটে, ফলে গল্পকার নৈর্ব্যক্তিক হতে পারেন না সবসময়। গল্পের সূচনা থেকে পরিণতিতে, শ্রীক্ষেত্র থেকে স্বামীগৃহে ফিরে না যাওয়ার কঠিন সিদ্ধান্তের ক্রম উন্মোচনে মৃণালের বক্তব্যের অন্তরাল থেকে মাঝেমাঝেই স্পষ্ট হয়ে ওঠেন স্বয়ং গল্পকার।

স্যামুয়েল রিচার্ডসনের লেখা 'Pamela– or Virtue Rewarded' বা 'Clarissa' উপন্যাসদ্বয় পত্রের আঙ্গিকে রচিত। এটিকে অনেকেই 'পত্রোপন্যাস' বলেন। সেদিক থেকে 'স্ত্রীর পত্র' কে 'পত্রগল্প' বলা যেতে পারে কি না তা নিয়ে কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন। প্রেরক ও প্রাপকের ব্যক্তিগত সীমানায় লেখা পত্র অবশ্যই ব্যক্তিগত। যেখানে প্রেরক তাঁর মনের কথা, ভাবনা, চিন্তন, মননের কথা জানাতে চান প্রাপককে। ডাইরিও ব্যক্তিগত ভাবনা প্রকাশের মাধ্যম। কিন্তু সেখানে দুই ব্যক্তির মধ্যে পরিচয়, আন্তরিকতার প্রয়োজন হয় না। কারণ ডায়েরি পাঠকের উদ্দেশ্য লেখা হয় না। 'স্ত্রীরপত্র' গল্পে পত্র প্রেরক মৃণাল; প্রাপক সাতাশ নম্বর মাখন বড়াল লেনের বাড়ির বাসিন্দা, তার স্বামী। অর্থাৎ স্বামীকে লেখা স্ত্রীর পত্র। প্রসঙ্গত, মনে পড়ে পত্রের আঙ্গিকে লেখা মোপাসাঁর 'The Relic' নামক গল্পটির কথা। স্বীকারোক্তির ভঙ্গিতে গল্পটিতে পত্র প্রেরক তাঁর প্রিয়জনের কাছে প্রবঞ্চনার মর্মস্পর্শী কাহিনি ব্যক্ত করেছে। অর্থাৎ আপন সত্তাকে অবারিত করার প্রয়াস। 'স্ত্রীর পত্র' গল্পেও পুরুষ শাসিত সমাজ কাঠামোয় নারীর প্রতি অমানবিক পীড়নে বিক্ষুব্ধ মৃণালের অন্তরজ্বালার, প্রতিবাদের প্রকাশ ঘটেছে পত্রে। উৎপীড়িত বিন্দুর জীবনের পরিণাম মৃণালের কাছে স্পষ্ট করেছে 'সংসারের মাঝখানে মেয়েমানুষের পরিচয়টা।' সে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছে নারীর প্রতি নির্মম অবহেলা। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অধিকার বঞ্চিত নারীসত্তার অসহায় যাপন যন্ত্রণার সরণি বেয়ে ক্রমাগত জমতে থাকা নিদারুণ ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটেছে পত্রে। সুতীব্র প্রতিবাদী মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। এখানেই তৈরি হয়

প্রশ্ন ১. গল্পে মৃণালের বেড়ে ওঠা 'দুর্গম পাড়াগাঁয়ে', 'যেখানে দিনের বেলা শেয়াল ডাকে।' সে গ্রামে পৌঁছতে স্টেশন থেকে সাত ক্রোশ 'ছ্যাকড়া গাড়ি' চলা পথে এবং বাকি 'তিন মাইল কাঁচা রাস্তা' দিয়ে যেতে হয়। এই গ্রামে মৃণাল আদৌ লেখাপড়া শিখেছিল কি? যদি তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া হয় সে শিক্ষিত ছিল, তথাপি তার ব্যক্তি পরিচয়ের সঙ্গে পত্রের ভাষার সাদৃশ্য পাওয়া যায় কি?

২. পত্রের ভাষা চলিত। কিন্তু এ পত্র রোমান্টিক পত্র নয়, বরং প্রতিবাদের, ক্ষোভের। অথচ এটি আবার স্বামীকে লেখা স্ত্রীর পত্র। অভিযোগ পত্র। কিন্তু পত্রের ভাষায় দৈনন্দিন যাপনে ব্যবহৃত শব্দের প্রয়োগ হয়নি। সাহিত্যের মার্জিত দর্পণে প্রতিফলিত ক্ষোভ আর বাস্তবের ক্ষোভের প্রকাশ এক নয়। তাছাড়াও মৃণাল পত্রে নিজেকে 'কবি' বলে দাবি করেছে। সে লুকিয়ে লুকিয়ে কবিতা লিখত। ফলে পত্রটি কি মৃণালের

নাকি মৃণালের ছদ্মবেশে রবীন্দ্রনাথের?

রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য উত্তম পুরুষের জবানীতে লেখা গল্পগুলির অধিকাংশই প্রায় 'স্মৃতিচারণধর্মী'। বহুক্ষেত্রেই কথক একাই গল্প বলে চলেন। কোনো বিশেষ ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে কথক গল্প বলেন না। কিন্তু পত্র মাধ্যমে অবশ্যই পত্র লেখক ও পত্র পাঠকের মধ্যেকার সম্পর্ক সূত্র ধরেই 'আবেগ অনুভূতির আলোড়ন' প্রকাশ পায়, ফলে এজাতীয় গল্পে 'স্বতন্ত্র রসসঞ্চার' ঘটে। 'স্ত্রীর পত্র' খুব জনপ্রিয় গল্প। কিন্তু শিল্পরূপের বিচারে ততটা উঁচুদরের নয়। কাহিনি বা চরিত্র চিত্রণ অত্যন্ত সরল ও একমুখী। দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, কিংবা মানসিক ঘাত-প্রতিঘাত প্রায়শই দেখা যায় না। বরং পূর্ব নির্ধারিত উদ্দেশ্যেই কাহিনির পদসঞ্চার। মৃণালের দৃপ্ত ভাষণে সামাজিক সমস্যা যতটা প্রকট ব্যক্তিগত টানাপোড়েন ততটাই অবহেলিত। মৃণালের বক্তব্যে আবেগের প্রাধান্য। রীতির অভিনবত্বে পাঠককে মজিয়ে শিল্পগত দুর্বলতা আড়াল করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় 'স্ত্রীর পত্র' গল্পে।

২৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৩৬ 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল, "My stories of a letter period have got the necessary technique but I wish I could go back once more to my former life.' এই বক্তব্যের থেকে মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তাঁর জীবনের শেষ পর্বের গল্প-গুলিকে প্রথম পর্বের তুলনায় সামান্য নিরেস বলেই মনে করেছেন। তাঁর 'মেঘদূত' প্রবন্ধে যে কালগত বিরহের কথা তিনি বলেছেন, এই মন্তব্যের মধ্যেও অতীতের স্বর্ণপ্রসূ সময়ে ফিরে যাওয়ার কথায় সেই বিরহের ইঙ্গিত। বাংলার পল্লী-প্রকৃতির অন্তরঙ্গ আতিথেয়তায়, হৃদ্যতার স্পর্শে উৎকৃষ্ট গল্পগুলির জন্ম। তার অনুপস্থিতি নিশ্চয় কবিকে শেষ জীবনে পীড়া দিয়েছিল, করেছিল বিরহ কাতর। 'সবুজপত্র' প্রকাশের পরও কবি একাধিকার গেছেন পদ্মাবিধৌত বাংলার পল্লীভূমিতে। কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে পূর্বের সখ্যতা, অন্তরঙ্গতা আর গড়ে ওঠেনি। রবীন্দ্রনাথের প্রথমযুগের গল্পের স্বতঃস্ফূর্ততা 'সবুজপত্রে'র অধিকংশ গল্পে অনুপস্থিত। উপদেশ বা তত্ত্ব পরিবেশনের বাসনামুক্ত প্রথম দিককার গল্পগুলি মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মতো উড়াল দিয়েছে। কিন্তু 'সবুজপত্রে'র গল্পগুলিতে বিশেষত্ব বা উদ্দেশ্য স্থাপনের অভিপ্রায় পরিলক্ষিত হয়। সে কারণে কয়েকটি বিশেষ বক্তব্য ঘুরে ফিরে আসে গল্পগুলিতে। নারীর স্বাধিকারবোধের উন্মোচন তাঁর শেষ পর্বের বেশ কয়েকটি গল্পে দেখা যায়। গল্পগুলি মিলিয়ে পড়লে তা সহজেই নজরে আসে। ফলে বক্তব্যের দিকে জোর দিতে গিয়ে কখনো শিল্পরূপ দুর্বল হয়ে পড়েছে। কখনো শিল্পরূপের দুর্বলতা ঢাকতে কথার জাল বুনতে হয়েছে। সেজন্য সজীবতার দিক থেকে গল্পগুলিকে ম্লান দেখায়। 'স্ত্রীর পত্র' গল্পটি 'নারী ব্যক্তিত্বের মুক্ত দলিল" যতখানি, শিল্পগুণান্বিত ততখানি নয়।

২০.৭ সারাংশ

নারীর ব্যাক্তি স্বাধীনতা অর্জনের গল্প 'স্ত্রীর পত্র'। কলকাতার একটি পরিবারের অন্দরে প্রতিনিয়ত ঘটে চলা নারীর স্বাধিকারভঙ্গের কথা নায়িকা মৃণালের জবানীতে প্রতিফলিত হয়েছে। প্রাত্যহিক যাপনের মধ্যেকার লাঞ্ছনা, যন্ত্রণা, অপমান, অসহায়তার বিরুদ্ধে ধ্বনিত হয়েছে প্রতিবাদ। বন্দি জীবন থেকে মুক্ত জীবনে মৃণালের উত্তরণের কাহিনি এ গল্প। গল্পটি চিঠির আঙ্গিকে রচিত। ফলে আঙ্গিকের ক্ষেত্রে নতুনত্ব এনেছেন লেখক।

২০.৮ অনুশীলনী

অতি সংক্ষিপ্ত

(ক) মৃণাল বিবাহের কত বছর পর চিঠি লিখেছে?

(খ) বিন্দুকে মৃণাল কার সঙ্গে তুলনা করেছে?

(গ) গল্পে মৃণালের শ্বশুরবাড়ি কোন গলিতে অবস্থিত?

(ঘ) মৃণালের ভাইয়ের নাম কী? সে কী করে?

(ঙ) মৃণাল কোথায় তীর্থ করতে গিয়েছিল?

(চ) 'স্ত্রীর পত্র' গল্পে কোন ভক্তিবাদী সাধকের নাম উল্লেখ করা হয়েছে?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

(ক) 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের বিকাশ ও প্রতিষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথ মূলত নারী চরিত্রগুলিকেই আশ্রয় করেছিলেন' এই মন্তব্যের যৌক্তিকতা 'স্ত্রীরপত্র' গল্পের পাঠ অভিজ্ঞতার সাহায্যে নির্ণয় করো।

(খ) 'স্ত্রীর পত্র' গল্পে মৃণালের পরিণতি শিল্পসঙ্গত কিনা সংক্ষেপে আলোচনা করো।

(গ) 'ও যে বিন্দু বিন্দু কে? গল্পে তার ভূমিকা কী? (ঘ) 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের আঙ্গিকে লেখক নতুনত্ব এনেছেন- উক্তিটির যাথার্থ্য বিচার করো।

রচনাধর্মী প্রশ্ন

ক) পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর অবমূল্যায়ন 'স্ত্রীরপত্র' গল্পে কীভাবে ফুটে উঠেছে তা মৃণালের চরিত্রের আলোকে বিচার করো।

(খ) 'পতিই হচ্ছে স্ত্রী লোকের গতি মুক্তি সব' - কে একথা বলেছে? উক্তির আলোকে তার চরিত্র বিশ্লেষণ করো।

(গ) ছোটগল্প হিসেবে 'স্ত্রীর পত্র'কে সার্থক বলা যায় কি? আলোচনা করো।

২০.৯ সহায়ক গ্রন্থ

(ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দশম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি

(খ) তপোব্রত ঘোষ, *রবীন্দ্র-ছোটগল্পের শিল্পরূপ*, দে'জ পাবলিশিং

(গ) প্রমথনাথ বিশী, *রবীন্দ্র ছোটগল্প*, মিত্র ও ঘোষ

(ঘ) ক্ষেত্রগুপ্ত, *রবীন্দ্র গল্পঃ অন্য রবীন্দ্রনাথ*, গ্রন্থনিলয়

(ঙ) শ্রী ভূদেব চৌধুরী, *বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার*, মর্ডাণ বুক এজেন্সী

(চ) গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, *রবীন্দ্রনাথঃ ছোটগল্প প্রকরণ শিল্প*, সাহিত্যলোক

(ছ) নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, *কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ*, বাকসাহিত্য

মডিউল-৪ (ক)

বাংলা ছোটগল্প-১

একক-২১ ❑ ছোটগল্প : পয়োমুখম্—জগদীশ গুপ্ত

গঠন

২১.১ উদ্দেশ্য

২১.২ লেখক ও তার সাহিত্যরীতি পরিচয়

২১.৩ প্রস্তাবনা

২১.৪ গল্প বিশ্লেষণ

২১.৫ সারাংশ

২১.৬ অনুশীলনী

২১.৭ নির্বাচিত পাঠ্যগ্রন্থ

২১.১ উদ্দেশ্য

জগদীশ গুপ্তের গল্প আপাত নমনীয়তার মোহে ভ্রান্ত নয়। লোভ, ক্রোধ, হিংসা, কামনা, ক্রুরতা, দিয়ে গড়া মানুষের অন্তর্লোকের উন্মোচন তার লক্ষ্য। ফলতঃ অনেক সময় তার সাহিত্যে এক ধরনের নেতিবাচক জীবন ভঙ্গির আবির্ভাব লক্ষ্য করা যায়।

২১.২ লেখক ও তার সাহিত্যরীতি পরিচয়

জগদীশ গুপ্ত (জন্ম: ৫ই জুলাই ১৮৮৬, কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ — মৃত্যু: ১৫ই এপ্রিল ১৯৫৭, কলকাতা)

মানব প্রকৃতি সম্পর্কে যথার্থ আধুনিক কথাশিল্পীর থাকে না কোন মোহ। তিনি ভাবাকুলতা, আবেগ মুগ্ধতাকে প্রশ্রয় দেন না। নৈতিক সাধারণীকরণে আস্থা পোষণ করেন না। সংশয় অবিশ্বাস বিজ্ঞান বুদ্ধিকে আশ্রয় করেন। জীবনের শুভ পরিনাম এর অনিবার্যতায় ও মঙ্গলের শেষ বিজয়ে তার আস্থা নেই। জীবনের আঁধার চোরাপথে মনগহনের পিচ্ছিল সর্পিল পথে তার স্বচ্ছন্দ পরিক্রমা। কূটৈষণা ও অন্তর্গূঢ় জটিলতার পথে তিনি মানবজীবনকে দেখেন, রূপ দেন। আধুনিক দুনিয়া সম্পর্কে তিনি সদা সচেতন, ব্যক্তি ও তার পরিবেশ চিত্রণে ধরা পড়ে এই সচেতনতা। বাংলা ছোটগল্পে আধুনিকতার প্রবর্তক জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭)। জগদীশ গুপ্তের প্রথম গল্প 'পেয়িং গেস্ট' প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক বিজলী পত্রিকায় (২৯ ফাল্গুন ১৩৩১/১৯২৫)। দ্বিতীয় গল্প 'পল্লী-শ্মশান' বের হয় বিজলী পত্রিকাতেই। এরপর আরো নয়টি গল্প প্রকাশিত হয়েছিল মাসিক 'কালি কলম' পত্রিকার প্রথম বছরের সংখ্যাগুলোতে। জগদীশ গুপ্তের প্রথম গল্পগ্রন্থ 'বিনোদিনী' প্রকাশিত হয় পৌষ ১৩৩৪, এই গল্পগ্রন্থতে এই পয়োমুখম গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল।

জগদীশ গুপ্তের জীবন দৃষ্টির স্বাতন্ত্র্য প্রথম থেকেই পাঠক ও সমালোচককে বিচলিত করেছে। তাকে পাঠক

গ্রহণ করতে পারেননি আবার অস্বীকার করতে পারেননি। জগদীশ গুপ্তের নির্মমতা, প্রথার বিরোধিতা, তিক্ততা, নৈরাশ্যবাদ সমালোচকদের ভাবিত করলেও তার লেখায় লালসার অসংযম ও অশ্লীলতার উৎসাহ আছে বলে মনে করা যায় না। আসলে তাঁর গল্পে এমন এক অনিবার্যতা আছে যাকে আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজ মানসিকতার সঙ্গে আমরা মেলাতে পারিনা। তাঁর গল্প বলার ভঙ্গীর মধ্যে একটা বিদ্রূপ লুকিয়ে থাকে, চারপাশের জগতে নখদন্ত বিশিষ্ট মানুষের যে ধারালো চেহারাটা দেখেছেন তিনি, নিষ্ঠুর পরিহাস তীর যেন ছুঁড়ে দিয়েছেন তাদের দিকে। নিয়তির প্রতি লেখককের নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গি ভাষার কুশলতায় সার্থক হয়ে ওঠে তার ছোটগল্পগুলিতে।

২১.৩ প্রস্তাবনা

প্রথম প্রকাশ — পয়োমুখম্ (বিনোদিনী গ্রন্থ, ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে)

কল্লোল গোষ্ঠীর রোমান্টিক ভাবলুতার জীবনদৃষ্টি থেকে জগদীশ গুপ্ত বাংলা গল্পকে এক রুক্ষ নির্মোহ অন্ধ নিয়তি-তাড়িত হতাশাময় জনহীন দেশের স্থানান্তরিত করেছিলেন যেখানে আর্ত মানুষ নিরুপায়, অসহায় হয়ে হাহাকারে ভেঙে পড়ে। কল্লোল পত্রিকা কে আশ্রয় করে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে যে যুগচেতনা বাংলা সাহিত্যের পালাবদল ঘটাল এক ভঙ্গুর কালের চোরাবালিতে কোথাও তা ছিল ভীষণভাবে আশাহত তারুণ্যের আক্ষেপে বিক্ষুব্ধ। পরিবর্তিত জীবনের অগোছালো মাত্রা গুলোকে ঠিক ভাবে সাজাতে চাইছিল একালের গল্প লেখকরা। দীনেশরঞ্জন, গোকুলনাগ এরা অতৃপ্ত শিল্পী চেতনাকেই মূল্য দিলেন তাদের গল্পে। এর পরেই কল্লোল যুগের গল্প সত্যিকারের নিষ্ঠাবান হলো প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত আর বুদ্ধদেব বসুর হাতে। বাংলা ছোটগল্পের শরীর উত্তীর্ণ যৌবনের চোখ ধাঁধানো আলোয় স্নাত হল। মধ্যবিত্তের ভারসাম্যহীন মর্বিডিটি দিয়ে তৈরি করলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র তার শিল্পিত জগত। অচিন্ত্য কুমারের গল্পে এল ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের যৌবনঘন চোরা দৃষ্টি। এই পথেই বাংলা গল্পকে আরো প্রাপ্তমনস্ক করে তোলার স্পষ্ট মেজাজ নিয়ে সাহিত্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন জগদীশ গুপ্ত। কল্লোল সমকালীন শিল্পীদের মত কেবল পুরাতন এর প্রতি অবিশ্বাস নয়, সৌন্দর্য -কল্যান -সত্য সম্পর্কে চিরায়ত মূল্যবোধের ভিতটাকে ধ্বস্ত করার প্রবল ইচ্ছা তার সাহিত্যের চালিকাশক্তি। সমকালীন অন্যান্য লেখকদের তুলনায় তিনি অনেক বেশি নির্মম। ঈশ্বর-ধর্ম-নৈতিকতা এসব তার কাছে মিথ্যার বেসাতি। বিধাতা স্বয়ং যেন এক ক্রূর শয়তান। মোহহীন এই অনুভূতির রসে জারিত হয়েছে জগদীশ গুপ্তের গল্প। সমকালে জগদীশ গুপ্ত যে খুব জনপ্রিয় গল্পকার ছিলেন এমন নয়, তবে বিভিন্ন সাহিত্য সাময়িকীতে তার গল্প নিয়মিত ছাপা হয়েছে। তিনি যে প্রচুর গল্প লিখেছেন এমনটাও নয়।

ছোটগল্পের পরিধিতে আত্ম-আবিষ্কারের যে মাত্রাগুলো বিন্যস্ত করেছেন জগদীশ গুপ্ত ও তার কয়েকটি রূপ দেখা যায়।

প্রথমত।। সামাজিক নীতিবোধকে তিনি অস্বীকার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর পুরাতন ভৃত্যকে মনিবের প্রতি বিশ্বস্ত রূপে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আর জগদীশ গুপ্তের পুরাতন ভৃত্য সেই মূল্যবোধকে চোখ রাঙিয়ে রাস্তায় মনিবের টাকা নিয়ে পালায়।

দ্বিতীয়ত।। জগদীশ গুপ্তের গল্পের চরিত্ররা নিচ ও প্রকৃতির। কথা ঠিক যে কল্লোলের কাল এটাই ছিল গল্পকারদের স্বাভাবিক প্রবণতা। তবু জগদীশ গুপ্তের মতো মানব মনকে এমনভাবে আর কেউ অনাবৃত করেননি। গুরুদয়াল হঠাৎ সম্পত্তি লাভ করলে তার আশ্রয়দাতা তিরিক্ষি হয়ে ওঠেন, দুই প্রাণের সখীর একজন বিধবা হলে নিজের

অদৃষ্টকে সে মেনে নেয়, কিন্তু যেই মুহূর্তে অন্য বান্ধবীর ছেলে মারা যায় তখন সহানুভূতির ছলে নিপুণভাবে উদ্বেগের বিষ ঢালে।

তৃতীয়ত।। তার গল্পে নর-নারীর প্রেমের স্নিগ্ধ রূপ একেবারেই নেই। বরং বিকৃত কামনার উদ্দাম রূপ আছে। এই বিকৃত দেহতৃষ্ণা অন্ধ শক্তির মতো নিয়ন্ত্রণ করেছে মানুষের পরিণতিকে। "আদি কথার একটি" গল্পে ২৩ বছরের যুবক সুবল বিধবা যুবতী কাঞ্চনের একরত্তি মেয়েকে বিয়ে করে মাতৃসম শাশুড়িকে ভোগ করার লালসায়।

চতুর্থত।। তাঁর গল্পের চরিত্রগুলোর যে পরিণতি তার যেন অবশ্যম্ভাবী এর থেকে কোন ভাবেই তার মুক্তি নেই। নিয়তি ও যেন কুচক্রী। দিবসের শেষে গল্পের কুমির এক অমোঘ নিয়তি তার হাত থেকে পাঁচুর যেন পরিত্রাণ নেই। পাচুর মৃত্যু যে অনিবার্য তা সম্পর্কে লেখকেরও কেন কোনো সংশয় নেই তিনি জানেন পাঁচুকে কুমিরের নেবেই। অনিবার্য ভয়ঙ্কর নিয়তি জগদীশ গুপ্তের একটি বৈশিষ্ট্য হলো।

২১.৪ গল্প বিশ্লেষণ

পৃথিবীর চারিদিকে যে জীবনের গান ধ্বনিত হয়ে চলেছে সেই জীবনের নিগূঢ় গভীরে বাস করে মানুষের দানব বৃত্তি। মানুষের অবচেতনায় তার আশ্রয়। আপাত দৃশ্যমান মানুষ শিক্ষা সংস্কৃতি ও সভ্যতার পারিপাট্যে বাইরে থেকে যতটা সুন্দর, ও সম্মানীয় হয়তো তার সেই অবচেতনার উন্মোচন ঘটলে সে ততোধিক নিচ ততোধিক নিষ্ঠুর। জগদীশ গুপ্তের গল্প এই আপাত নমনীয়তার মোহে ভ্রান্ত নয়। লোভ, ক্রোধ, হিংসা, কামনা, ক্রূরতা, দিয়ে গড়া মানুষের অন্তর্লোকের উন্মোচন তার লক্ষ্য। ফলতঃ অনেক সময় তার সাহিত্যে এক ধরনের নেতিবাচক জীবন ভঙ্গির আবির্ভাব লক্ষ্য করা যায়। পৃথিবীর যে সত্য বাস্তবতা তাকে সম্পূর্ণ অনাবৃত করতে গিয়ে এক ধরনের আপাত কুৎসিত প্রবৃত্তির বর্ণনা তিনি করেছেন। তার সম্পর্কে এ অভিযোগ আছে কিন্তু কোন সাহিত্য বিধ্বস্ত সমাজের কথা বলে থেমে থাকে না। টি এস এলিয়টও ওয়েস্টল্যান্ড-এর শেষে উপনিষদের বাণী শুনিয়েছেন। জগদীশ গুপ্তও তাই জঘন্য মানুষের বর্বরতাকে চিত্রিত করেও সচেতন মানবতার জাগৃতির শেষ গান শুনিয়েছেন। আমাদের আলোচ্য 'পয়োমুখম' গল্পেই তার প্রমাণ রয়েছে।

মানুষের অন্তর্জগতের দুটি দিক — একদিকে সে Biological Man, কাম ও ক্ষুধায় জর্জরিত মানুষ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় শিশ্ন ও উদর সর্বস্ব মানুষ। উচ্চ ধারণা ও আদর্শ বোধ মানবতা প্রভৃতি নেই। আরেকদিকে সে (spritual Man, ঈশ্বরপ্রতিম গুণসম্পন্ন মানুষ।

প্রথম বিভাগে মানুষ অনেকটাই পশুর মত আচরণ করে -- সেখানে ক্ষুধায় সে হিংস্র, লোভে সে বর্বর, কামনায় সে উন্মত্ত। সেখানে প্রেমের সুরভী নেই সুরভিত নন্দনকানন নেই, প্রেমের আদর্শ নেই, প্রেমের জন্য ত্যাগ তিতিক্ষা নেই, মানুষের জন্য মানুষের মানবতাবোধের স্ফুরণ নেই, হৃদয়াবেগটাই নেই এখানে। বিবেক ও বিচারের বাধা এই জৈব প্রবৃত্তির মানুষ স্বীকার করে না। আত্ম ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি তার চূড়ান্ত দর্শন, এখানে সে ভয়ংকরভাবে স্বার্থমগ্ন। মানুষের সমাজে এরাই ঘৃণ্য পরিত্যাজ্য। আরেকটি বিভাগে মানুষ তার কামনা-বাসনা লোভ হিংসা স্বার্থপর দিকে সংযত করতে চেষ্টা করে, বিবেক বিচার দিয়ে নিজের বল্গাহীন দুষ্প্রবৃত্তিকে টেনে রাখে। এই পর্বে সে মহৎ হয়ে ওঠার চেষ্টা করে। কেবল স্বার্থই এখানে বড় নয়। পরের জন্য মানুষ ভাবে, ভ্রান্তি থেকে উত্তরণের চেষ্টা করে। অন্যায়ের অনুশোচনায় নিজেকে পুড়িয়ে মারে। কল্লোলের কালের সাহিত্যিক হিসেবে জগদীশ গুপ্ত মানুষের অন্তর্জগতের এই দুটি দিকে তুলে ধরেছেন তার 'পয়োমুখম' গল্পে। কোন নেতিবাদী দর্শনে

তিনি থেমে যাননি। বর্বর লোভ আর অমানবিক স্বার্থসিদ্ধির জঘন্য চক্রান্তকে শেষপর্যন্ত ব্যর্থ করে দিয়েছেন— শুভ চেতনার উদ্বোধনের আলোক নিক্ষেপে।

এ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র দুটি, বাবা কৃষ্ণকান্ত এবং ছেলে ভূতনাথ। বাবা কৃষ্ণকান্ত সেনশর্মা একজন সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিত এবং কবিরাজ। পরিবারের তিনি কর্তা। দুই পুত্র ভূতনাথ দেবনাথ এবং স্ত্রী মাতঙ্গিনী কে নিয়ে তার সংসার। গল্পের মধ্যে স্ত্রী মাতঙ্গিনী ও কনিষ্ঠপুত্র দেবনাথ এর অবস্থান ক্ষুদ্র পরিসরে। গল্পের শুরুতে জ্যেষ্ঠপুত্র ভূতনাথকে কিছুটা নির্বোধ, অপরিণত মস্তিষ্ক ও কিশোররূপে আমরা দেখেছি। পিতা ও পুত্র উভয়ই ভিন্নধর্মী চরিত্রের। পুত্রের লেখাপড়ায় প্রচন্ড অনীহা অথচ পিতা চান তাকে কবিরাজি বিদ্যায় পারদর্শী করতে। গল্পের আরম্ভেই ভূতনাথের লেখাপড়া সম্বন্ধে লেখক জানিয়েছেন, 'ভূতনাথ আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অধ্যায়ন করিতেছে, কিন্তু কলাপই বলুন আর মুগ্ধবোধই বলুন পাঠে তেমনি ভক্তি কী আগ্রহ তাহার নাই।' জৈষ্ঠপুত্রের ভবিষ্যৎ জীবন গঠনের দায়িত্ব পিতা যখন পালন করতে বদ্ধপরিকর সেখানে বাধা দেওয়া বা পাওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং পিতৃস্নেহের এই দাবির কাছে বাধ্য হয়েই ভূতনাথকে বিয়ে করতে হয় ন বছরের মনিমালিকাকে। বউয়ের বয়স এতই কম যে ভূতনাথের সে জীবনসঙ্গিনী নয়, খেলার সাথী। আগত যৌবনের তৃষ্ণা না মিটলেও, কৈশোরের চপলতা তাতে সঙ্গী খুঁজে পেয়েছে। যৌবনের ভরা বসন্তে উপনীত হওয়ার পূর্বেই তার অন্তিম কাল উপস্থিত হল। হঠাৎ একদিন অসুস্থ হয়ে মারা গেল। কৃষ্ণকান্ত কোন ওষুধ দিলেন না -- কারণ বিধিনির্দিষ্ট রোগ তারা বুঝতে পারেন কিন্তু আরোগ্য করতে পারেন না। মনিমালিকার মৃত্যু ভূতনাথের খেলাঘর ভেঙে দিয়েছে, ভূতনাথের জীবনে প্রথম আঘাত। ছেলেও বুঝতে পারেনি, মাতঙ্গিনীও বুঝতে পারেননি, গল্পের পাঠকও বুঝতে পারে না, যে এই অকাল মৃত্যুর আড়ালে জীবনের কোন বীভৎস প্রবৃত্তির ষড়যন্ত্র ছিল।

অচিরেই কৃষ্ণকান্ত কৌলিন্য প্রথা মেনে ভূতনাথের দ্বিতীয়বার বিবাহ দিতে মনস্থ করলেন। তার নিজের কাজের পেছনে যুক্তি দেখালেন স্বয়ং শিব দুবার বিবাহ করেছিলেন। লেখক কৃষ্ণকান্তের এই অসার মানবিকতাহীন যুক্তিকে তীক্ষ্ণ শ্লেষে বিদ্ধ করলেন, 'কিন্তু অশৌচমুক্তির পর অষ্টাহের মধ্যে শিবের পাত্রী স্থির হইয়া গিয়াছিল কিনা তা উল্লেখ করলেন না।' —

এখানেই কৃষ্ণকান্তের অমানবিক অর্থলিপ্সু মানসিকতাটি প্রকাশ পায়। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর কয়েক দিনের মধ্যেই কৃষ্ণকান্ত ভূতনাথ এর জন্য দ্বিতীয় পাত্রী নির্বাচন করে রেখেছিলেন। সুতরাং ভূতনাথের দ্বিতীয় বিবাহ হয়ে গেল। প্রথমবারের মতো এবারও পণ পেয়েছেন। দ্বিতীয়বার বলে পণের টাকার অংকটা কিছুটা কম —

'এবার পণ পাঁচশত টাকা -- কিছু লোকসান গেল, মনি মরিয়া পাত্র হিসাবে ভূতনাথের জীবনে খাদ মিশাইয়া দিয়া গেছে।'

মাতঙ্গিনী সংসারে এই দ্বিতীয় পুত্রবধূ এক অন্য আবহাওয়া নিয়ে এসেছে। মনিমালিকার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁর ক্রোধে, ক্ষোভে, অভিমানে, বেদনায় সে নিজে যেমন প্রতি মুহূর্তে প্রচন্ড মুখর; তেমনই ভূতনাথের জীবনসহ সংসারটিকে সেইরকম একই মুখরতায় সে ভরিয়ে তুলেছে। অথচ তার অপরূপ লাবণ্যে ভূতনাথ মুগ্ধ। তাই খেলাঘর ভেঙে গেলেও যৌবনের উপবন খুঁজে পেয়েছে ভূতনাথ অনুপমার মধ্যে। তার জীবন পরিণতির পথে এক বড় পদক্ষেপ। ভূতনাথ এর জীবনের চঞ্চলতা যৌবনের সুদূর অথচ সুনিশ্চিত আবেশ জীবন আসক্তিতে পরিণতি পেয়েছে এই সময়। অনুপমার বিদ্রুপ সেখানে তুচ্ছ হয়ে গেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য তার, সামান্য অসুখে অনুপমাও মৃত। মৃত্যু সম্পর্কে কোন প্রশ্ন ওঠে না, রহস্যাবৃত মৃত্যু রহস্য থেকে যায়। যৌবনের কুঞ্জকানন ভূতনাথের জীবনে অকালে শুকিয়ে গেল।

তবে এই দ্বিতীয় আঘাত ভূতনাথকে জীবন অভিজ্ঞতায় আরো সমৃদ্ধ করেছে, করেছে স্থিতধী। তৃতীয়বার বিবাহে সে রাজি ছিল না তার বিবেক তাকে বুঝিয়ে দিচ্ছিল এই দুটি মৃত্যুর মধ্যে কোন এক বিচিত্র দুর-সংযোগ আছে। ইতিমধ্যে সে কবিরাজ বিদ্যায় পারঙ্গম হয়ে উঠেছে। অথচ কৃষ্ণকান্তের প্রবল পীড়াপীড়িতে তাকে তৃতীয়বার বিবাহ করতে হল। কৃষ্ণকান্ত বিষয়ী লোক তাঁর ক্ষুরধার যুক্তি হল, 'চলাচলম ইদম সর্বম - মরিবে সবাই, দুদিন আগে দুদিন পরে। মূর্খ আর কাকে বলে? স্ত্রী মারা গেলে তার ধ্যানেই যাবজ্জীবন কাটাইয়া দিতে হইবে -- ইহা কোন শাস্ত্রের কথা।'

ভূতনাথ এর তৃতীয় স্ত্রী বীণাপাণি মাতঙ্গিনীর সংসারকে রূপে ভোলায়নি গুণে ভুলিয়েছে। তার শান্ত ও মার্জিত ব্যক্তিত্বের সামনে এই দুঃখ ভরা সংসার সুখের স্বপ্ন দেখেছে, মৃত্যু অভিশপ্ত গৃহে জীবনের ফুল ফুটতে শুরু করেছে। দুই মৃত্যুর যে আঘাত ভূতনাথকে বিমূঢ় করে তুলেছিল, বীণাপাণির কাছে এসে সেই ভূতনাথ জীবনের প্রতি আবার ভালোবাসার টান অনুভব করেছে। কিন্তু এবারও যখন বীণাপাণি অসুস্থ হয়ে পড়ল তখন একই আসন্ন ছায়া নেমে এসেছিল গৃহে।

ইতিমধ্যে পিতা-পুত্রের সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটে গেছে। যে ভূতনাথ সংসার অনভিজ্ঞ ছিল, সেই ভূতনাথ সংসার অভিজ্ঞ কৃষ্ণকান্তের এক ঘৃণ্য ছলনার রহস্য আবিষ্কার করেছে। বীণাপাণির বিবাহে কৃষ্ণকান্ত শুধু মোটা অংকের আদায় করেনি, উপরন্তু মেয়ের কালো রূপের অপরাধে মেয়ের বাবাকে যেন মাসিক অর্থদণ্ড দিয়েছেন। তাই মাসে মাসে দশটি করে টাকা আসে কৃষ্ণকান্তের হাতে। কৃষ্ণকান্তের আকস্মিক অনুপস্থিতিতে এই গোপন ঘটনা ভূতনাথ এর সামনে প্রকাশ পেয়ে যায়। সেদিন থেকে হয়তো ভূতনাথ তার জাগ্রত বিবেক নিয়ে এই শয়তানি দুনিয়ার শঠতা খুঁজতে পেরেছিল। তাই যে মুহূর্তে পুত্রবধূর আরোগ্য কামনায় কৃষ্ণকান্ত কবিরাজের ওষুধের কাগজ ঢাকা খল বীণাপাণির খাটের পায়ায় এসে থামলো সে মুহূর্তে এক অনভিজ্ঞ কবিরাজ জীবনে প্রশান্ত ভূমিতে মৃত্যুর দুঃসহ আবির্ভাব এর সংকেত বুঝে নিয়েছে। বীণাপাণি কৃষ্ণকান্তের দেওয়া ওষুধ খেতে পারেনি ভূতনাথ তা নিয়ে বাবার পায়ে রেখে দিয়ে বলেছে, 'এ বৌটার পরমায়ুর আছে তাই কলেরায় মরলো না বাবা, পারেন তো নিজেই খেয়ে ফেলুন।'

এই গল্পে কৃষ্ণকান্ত অপরাধী, মানুষের অর্থগৃধ্নুতা কোন ভয়াবহ নাটকীয়তায় পৌঁছতে পারে কৃষ্ণকান্ত তার দৃষ্টান্ত। মানবের সংসারে দানবের এহেন খেলা বিরল হলেও দুর্লভ নয়। কৃষ্ণকান্ত তার শিক্ষা খ্যাতি প্রতিপত্তি সবকিছুর উপরে কেবল অর্থকেই চিনেছেন। ভূতনাথ এই পাশবিক প্রবৃত্তি সামনে মনুষ্যত্বের উদ্বুদ্ধ প্রতীক। আপাতমনোহর আপাত পয়োমুখ নিয়ে বিষকুম্ভ কৃষ্ণকান্ত এ গল্পের কাহিনী কে নিয়ন্ত্রণ করেছিল। গল্পের শেষে সেই বিষের পাত্র তারই হাতে তুলে দিয়েছে তারই সন্তান। বিন্দুমাত্র অনুশোচনার বলিরেখা কৃষ্ণকান্তের ললাটে দেখা যায়নি। শীতল মস্তিষ্ক নিয়ে এক পরিকল্পিত হত্যালীলা চালিয়ে গেছে সে, কেবল স্বার্থতৃপ্তির উন্মাদ বাসনায়। মানুষের লোভ রিপু কি ভয়ানক আকারে জেগে উঠতে পারে কৃষ্ণকান্ত তারই প্রমাণ। তবু শঠতা তো শেষ কথা নয়, প্রতারণার প্রীতি পুষ্পস্তবকে চিরকাল মানুষ ভুলে থাকে না। মানুষের সচেতন বিবেক আর বিচার যেদিন জেগে ওঠে সেদিন হত্যাকারীর অস্ত্র হত্যাকারীর দিকেই ফিরে আসে। ভূতনাথ সমাজের এই শেষ দায়টি সম্পন্ন করেছে। পয়োমুখের আড়ালে বিষকুম্ভের উপস্থিতি, জীবনের স্থানে মৃত্যুর নিমন্ত্রণ, এটা বুঝতে পেরেই সেই বিষকুম্ভ চিরতরে ভেঙে দেওয়ার চেষ্টায় ভূতনাথ সফল। এখানে নেতিবাচক জীবন দর্শনের উপর মানুষের কল্যাণময় স্বপ্ন সুন্দর জীবনের জাগৃতি ঘোষণা।

২১.৫ সারাংশ

এ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র দুটি, বাবা কৃষ্ণকান্ত এবং ছেলে ভূতনাথ। বাবা কৃষ্ণকান্ত সেনশর্মা একজন সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিত এবং কবিরাজ। পরিবারের তিনি কর্তা। দুই পুত্র ভূতনাথ দেবনাথ এবং স্ত্রী মাতঙ্গিনী কে নিয়ে তার সংসার। গল্পের মধ্যে স্ত্রী মাতঙ্গিনী ও কনিষ্ঠপুত্র দেবনাথ এর অবস্থান ক্ষুদ্র পরিসরে। গল্পের শুরুতে জ্যেষ্ঠপুত্র ভূতনাথকে কিছুটা নির্বোধ, অপরিণত মস্তিষ্ক ও কিশোররূপে আমরা দেখেছি। পিতা ও পুত্র উভয়ই ভিন্নধর্মী চরিত্রের। অর্থলোভে বাবা কৃষ্ণকান্ত ভূতনাথের পর পর তিনবার বিবাহ দেয়। প্রতিবার বিবাহে পাওয়া পণ তার লোভকে যেন আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। ভূতনাথের প্রথম পত্নী প্রায় কিশোরী মণিমালিকা, যে তার খেলাঘরের সাথি হয়ে উঠেছিল। মাত্র কয়েকদিনের অসুখে ভেদ-বমি হয়ে মারা যায়। ভুতনাথ কিছু বুঝে ওঠার আগেই যেন ঘটে যায় সব কিছু। পিতা কৃষ্ণকান্ত তার আবার বিবাহ দেয়। এবার অনুপমা দ্বিতীয় পুত্রবধূ। যৌবনের উপবন খুঁজে পেয়েছে ভূতনাথ অনুপমার মধ্যে। তার জীবন পরিণতির পথে এক বড় পদক্ষেপ। কিন্তু সামান্য অসুখে অনুপমাও মারা যায়।

কিন্তু এবার ভূতনাথ অনেক বেশী অভিজ্ঞ, জীবন সম্পর্কে তার ভাবনার গভীরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সে আর তৃতীয়বার বিবাহে রাজী নয়। তারপরেও তাকে বিবাহ করতে হয়। ভূতনাথ এর তৃতীয় স্ত্রী বীণাপাণি সংসারকে রূপে ভোলায়নি গুণে ভুলিয়েছে। তার শান্ত ও মার্জিত ব্যক্তিত্বের সামনে এই দুঃখ ভরা সংসার সুখের স্বপ্ন দেখেছে, মৃত্যু অভিশপ্ত গৃহে জীবনের ফুল ফুটতে শুরু করেছে। দুই মৃত্যুর যে আঘাত ভূতনাথ কে বিমূঢ় করে তুলেছিল, বীণাপাণির কাছে এসে সেই ভূতনাথ জীবনের প্রতি আবার ভালোবাসার টান অনুভব করেছে। কিন্তু এবারও যখন বীণাপাণি অসুস্থ হয়ে পড়ল তখন একই আসন্ন ছায়া নেমে এসেছিল গৃহে।

ইতিমধ্যে পিতা-পুত্রের সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটে গেছে। যে ভূতনাথ সংসার অনভিজ্ঞ ছিল, সেই ভূতনাথ সংসার অভিজ্ঞ কৃষ্ণকান্তের এক ঘৃণ্য ছলনার রহস্য আবিষ্কার করেছে। বীণাপাণির বিবাহে কৃষ্ণকান্ত শুধু মোটা অংকের আদায় করেনি, উপরন্তু মেয়ের কালো রূপের অপরাধে মেয়ের বাবাকে যেন মাসিক অর্থদণ্ড দিয়েছেন। তাই মাসে মাসে দশটি করে টাকা আসে কৃষ্ণকান্তের হাতে। কৃষ্ণকান্তের আকস্মিক অনুপস্থিতিতে এই গোপন ঘটনা ভূতনাথ এর সামনে প্রকাশ পেয়ে যায়। সেদিন থেকে হয়তো ভূতনাথ তার জাগ্রত বিবেক নিয়ে এই শয়তানি দুনিয়ার শঠতা খুঁজতে পেরেছিল। তাই যে মুহূর্তে পুত্রবধূর আরোগ্য কামনায় কৃষ্ণকান্ত কবিরাজের ওষুধের কাগজ ঢাকা খল বীণাপাণির খাটের পায়ায় এসে থামলো সে মুহূর্তে এক অনভিজ্ঞ কবিরাজ জীবনে প্রশান্ত ভূমিতে মৃত্যুর দুঃসহ আবির্ভাব এর সংকেত বুঝে নিয়েছে। বীণাপাণি কৃষ্ণকান্তের দেওয়া ওষুধ খেতে পারেনি ভূতনাথ তা নিয়ে বাবার পায়ে রেখে দিয়ে বলেছে, 'এ বৌটার পরমায়ুর আছে তাই কলেরায় মরলো না বাবা, পারেন তো নিজেই খেয়ে ফেলুন।'

২১.৬ অনুশীলনী

ক। রচনাধর্মী প্রশ্ন

১। জগদীশ গুপ্তের গল্পে মানব মনের যে দিকগুলি উঠে আসে তা পাঠ্য গল্প অবলম্বনে আলোচনা করুন?

২। এই গল্পে ভূতনাথ কীভাবে তার পিতার অন্ধকার দিকটি অনুধাবন করেছিল তার পরিচয় দিন।

৩। গল্পের নাম পয়োমুখম কেন?

৪। 'এ বৌটার পরমায়ুর আছে তাই কলেরায় মরলো না বাবা, পারেন তো নিজেই খেয়ে ফেলুন।' — ভূতনাথের এই কথার মধ্যে যে তীব্র শ্লেষ ও বিদ্রূপ রয়েছে তা আলোচনা করুন।

৫। মণিমালিকা, অনুপমা ও বীণাপাণি — ভূতনাথের তিন পত্নীর সাথে তিন রকমের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল — আপনার নিজের ভাষায় লিখুন।

খ। সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন

১। ''... আয়ুর্বেদ আয়ত্ত করিতে বদ্ধপরিকর সে নিশ্চয়ই হয় নাই — সম্মত হইয়াছে...'' — আয়ুর্বেদ শিক্ষার প্রতি ভূতনাথের মনোভাব কেমন ছিল?

২। ''বলিলেন — স্বয়ং শিব দুবার বিবাহ করিয়াছিলেন।'' — কেন এমন কথা কৃষ্ণকান্ত ভূতনাথকে বলেছিলেন?

৩। ''দন্তচূর্ণ পাকে চড়িয়ে এসেছ বুঝি? — তা এস।'' — কে কাকে এমন বিদ্রূপ করেছিল?

৪। ''ভূতনাথ নতুনতর একটা আঘাত পাইল, মণির মৃত্যুতে যাহা সে পায় নাই।'' — অনুপমার মৃত্যুতে ভূতনাথ নতুন কোন আঘাত পেয়েছিল?

৫। ''কিন্তু বীণাপাণি একেবারে অন্যরকম।'' — বীণাপাণি কোন দিক থেকে কীভাবে অন্যরকম?

গ। অতি-সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন

(এখানে দেওয়া অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নগুলি আগে নিজে সমাধান করবেন, পরে উত্তর সংকেতের সাথে মিলিয়ে নেবেন।)

১। অনুপমার সাথে বিবাহে কৃষ্ণকান্ত পণ পেয়েছিলেন - (অ) সাতশত টাকা, (আ) আটশত টাকা, (ই) সাতশত পঞ্চাস টাকা, (ঈ) পাঁচশত পঞ্চাশ টাকা।

২। মণি মরিয়াছিল — (অ) কাঁচা আম খেয়ে, (আ) গুরুপাক খাবার খেয়ে, (ই) শেষ রাত থেকে ভেদবমি হয়ে, (ঈ) জ্বর হয়ে।

৩। মাসে মাসে দশটাকা মানি অর্ডার করত — (অ) মণির বাবা, (আ) অনুপমার বাবা, (ই) বীণাপাণির বাবা, (ঈ) কৃষ্ণকান্ত।

৪। ভূতনাথ নাম রেখেছিল — (অ) বাবা কৃষ্ণকান্ত, (আ) মা মাতঙ্গিনী, (ই) ঠাকুর্দা, (ঈ) ঠাকুরমা।

৫। বীণাপাণির বাবা হলেন — (অ) রামরামবাবু, (আ) বলরামবাবু, (ই) তারিনীবাবু, (ঈ) হরেকৃষ্ণবাবু।

উত্তর সংকেত :

গ। ১। - (ঈ)

গ। ২। - (ই)

গ। ৩। - (ই)

গ। ৪। - (অ)

ঘ। ৫। - (আ)

২১.৭ নির্বাচিত পাঠ্যগ্রন্থ

১। গুপ্ত জগদীশ, *জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ, কলকাতা।

২। মুখোপাধ্যায় অরুণকুমার, "*কালের পুত্তলিকা*, বাংলা ছোটগল্পের একশ" বিশ বছর/১৮৯১ — ২০২১, দে'জ পাবলিশার্স, চতুর্থ সংস্করণ ২০১১, কলকাতা।

৩। *জগদীশ গুপ্তের শ্রেষ্ঠ গল্প*

একক-২২ ❑ ছোটগল্প : প্রাগৈতিহাসিক—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

গঠন

২২.১ উদ্দেশ্য
২২.২ লেখক ও তার সাহিত্যরীতি পরিচয়
২২.৩ প্রস্তাবনা
২২.৪ গল্প বিশ্লেষণ
২২.৫ সারাংশ
২২.৬ অনুশীলনী
২২.৭ নির্বাচিত পাঠ্যগ্রন্থ

২২.১ উদ্দেশ্য

- লেখক এখানে বৈজ্ঞানিকের স্বচ্ছ দৃষ্টি ও স্থির বুদ্ধি দিয়ে মানুষের মনোলোকের জটিল ও কুটিল পথে বিচরণ করেছেন অথচ তাতে নগ্ন অশ্লীলতার নোংরামি প্রশ্রয় পায় নি।
- এই গল্পে লেখক একদিকে যেমন তাদের মনস্তত্ত্বকে আলোয় আনার চেষ্টা করেছেন, তেমনই অন্যদিকে সমাজের প্রান্তে বাস করা এই মানুষের অর্থনৈতিক-সামাজিক অবস্থানকে চিহ্নিত করেছেন।

২২.২ লেখক ও তার সাহিত্যরীতি পরিচয়

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (জন্ম: ১৯ মে ১৯০৮, দুমকা, বিহার — মৃত্যু: ৩ ডিসেম্বর ১৯৫৬, কলকাতা)

১৯২৮ থেকে ১৯৫৬ পর্যন্ত মোট ২৮ বছর নিরবচ্ছিন্ন সাহিত্যকর্মে তিনি ব্যাপৃত ছিলেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মোট গল্প গ্রন্থের সংখ্যা ১৬ টি। প্রথম গল্পগ্রন্থ 'অতসীমামী' ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ 'প্রাগৈতিহাসিক' ১৯৩৭ এ প্রকাশিত হয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকৃত নাম প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। লেখক হিসেবে তিনি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নামেই পরিচিত। তার দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ প্রাগৈতিহাসিকএ ছিল মোট দশটি গল্প। এই গ্রন্থের প্রথম গল্পটি প্রাগৈতিহাসিক।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সংশয় হতাশা ব্যর্থতা ও অসহায়তা বোধের কাছে পরাজয় মেনে নেননি। মানিকের গল্প পাঠককে কূলহারা জীবনরহস্যের দিকে ঠেলে দেয় না। সংগ্রামী সংকল্প কঠিন মানুষের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। বিজ্ঞান বুদ্ধি, সত্যএষনা, বস্তু জিজ্ঞাসা মানিকের শিল্প-মানসকে গোড়া থেকেই ভাবালুতার হাত থেকে রক্ষা করেছে। বিজ্ঞানের ছাত্র মানিক জীবনের সব কিছুতেই কেন এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করেছেন। তিনি এমন একজন লেখক যিনি বুর্জোয়া ভাবাদর্শ ও মধ্যবিত্ত জীবনের ভন্ডামি, হীনতা, স্বার্থপরতা ও বিকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

ঘোষণা করেছিলেন। ভাববাদী হৃদয়সর্বস্বতার পথ পরিহার করে ছিলেন। রিক্ত বঞ্চিত জীবনের কঠোর উলঙ্গ বাস্তবতায় প্রাণিত হয়ে সাধারণ বাস্তব মানুষকে সাহিত্যের অমরতা দিতে চেয়েছিলেন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোট গল্পের আলোচনায় অনেক দ্বিধা ও সংশয় দেখা গেছে, স্ববিরোধী বিশ্লেষণে দেখা গেছে। মার্কসবাদে দীক্ষিত হবার আগে ও পরে - এভাবে মানিকের গল্পে দুই পর্বে বিভাজন ও তুলনামূলক বিচারে প্রথম পর্বের শিল্পোৎকর্য ও দ্বিতীয় পর্বের অপকর্য ঘোষণার প্রবণতা অনেক সমালোচনায় দেখা যায়।

২২.৩ প্রস্তাবনা

গল্প প্রকাশকাল - প্রাগৈতিহাসিক (প্রাগৈতিহাসিক গল্পগ্রন্থ, ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে)

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কল্লোলিয় উত্তরাধিকার: মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পের ব্যক্তি ও ব্যষ্টিকে যে দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়েছে তা অভিনব এবং ব্যতিক্রমী। বুদ্ধদেব বসু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরাগত কল্লোলিয় বলে দাবি করেছেন। তিনি যে এক অর্থে কল্লোলিয় তাতে কোন সন্দেহ নেই। কল্লোলের শিল্পীদের চেতনায় ছিল গতানুগতিকতার প্রতি বিক্ষোভ। নতুন নতুন ভিন্নধর্মী চরিত্র ও পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়াস। নর-নারীর রোমান্টিক সম্পর্ককে বাস্তব করে তোলার দুঃসাহসী উল্লাস এবং সেইসঙ্গে ভাষার তীক্ষ্ণতা ও ভঙ্গির নতুনত্ব। কিন্তু এর সীমাবদ্ধতা ও ছিল। কল্লোলের প্রাথমিক প্রেরণার মূলে ছিল অবদমিত যৌবনের বাঁধন ভাঙ্গা উন্মাদনা ও আবেগ সর্বস্ব উচ্ছ্বাসের মাত্রাতিরেক, তারই পাশাপাশি 'হালকা নোংরা রোমান্টিক ন্যাকামি।'

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই ('সাহিত্য করার আগে' ঃ লেখক এর কথা) বলেছেন, 'কল্লোলের আসরে বস্তি জীবন এসেছে কিন্তু বস্তির জীবনের বাস্তবতা আসেনি। বস্তির মানুষ ও পরিবেশকে আশ্রয় করে রূপ নিয়েছে মধ্যবিত্তের রোমান্টিক ভাবাবেগ।'

বলাবাহুল্য মানিকের এই গল্পে কল্লোলিয় ধ্যান ধারণার শৈল্পিক উত্তরণ ঘটেছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থ রিয়ালিজম বা বাস্তববাদকে জীবনের সত্য স্বরূপ হিসাবে আবিষ্কার করতে চেয়েছেন। তাঁর রচনায় জীবনের কঠোর নগ্ন বাস্তব রূপ উদ্ভাসিত হয়েছে। কিন্তু তাতে কল্লোলিয় ও রোমান্টিক আবেগ ব্যাকুলতা ভাবালুতা স্পর্শমাত্র করেনি। শুধু তাই নয় তিনি বৈজ্ঞানিকের স্বচ্ছ দৃষ্টি ও স্থির বুদ্ধি দিয়ে মানুষের মনোলোকের জটিল ও কুটিল পথে বিচরণ করেছেন অথচ তাতে নগ্ন অশ্লীলতার নোংরামি প্রশ্রয় পায় নি। গল্পটির ভিখু চরিত্রের মধ্য দিয়ে মানুষের আদিম শরীর প্রবৃত্তির ভয়াবহ লেলিহান শিখা প্রজ্বলিত হয়েছে কিন্তু তাতে বিধ্বংসী দাবানল অপেক্ষা জীবনের আদিম উল্লাস এক বীর্যবান অগ্নিস্ফুরণে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। এই গল্পের ফ্রয়েডীয় যৌনচেতনা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হলেও তার পশ্চাৎপট রয়ে গেছে গভীরতম জীবনপ্রীতি।

২২.৪ গল্প বিশ্লেষণ

ভিখু ছিল দুর্ধর্ষ ডাকাত, হত্যা-লুণ্ঠন আর নারী উপভোগে ছিল পাশব পৌরুষের তান্ডব উল্লাস। একদিন ডাকাতি করতে গিয়ে ডান কাঁধে আঘাত পেয়ে আত্মগোপন করতে বাধ্য হল। পশুর মত কদর্য আক্ষেপে কত দিন কাটালো ঘন জঙ্গলে লুকিয়ে। জঙ্গল থেকে ঘরে আশ্রয় দিয়েছিল পুরনো সাঙ্যাত প্রহ্লাদ। সেই আশ্রয়দাতা বন্ধুর স্ত্রীর প্রতি লালসা প্রমত্ততায় ধরা পড়ে বিতাড়িত হল। বারংবার আক্ষেপ করে গেছে ডান হাতের বদলে যদি তার বাঁ হাতটা

যেত। ডাকাতি করবার আর তার উপায় নেই ডানহাতটা পঙ্গু হয়ে গেছে, কাঁধের নিচ থেকে হাতটা শুকিয়ে শুকনো দড়ির মতো হয়ে আছে। সদর শহরে পালিয়ে এসে পথের পাশে আর কয়েকজন ভিখারির সঙ্গে বসে ভিখু এখন ভিক্ষা করে। পেটভর্তি খাবারে সুস্থ শরীরে আবার পুর্ণ জীবন কামনা করে। বিনু মাঝির চালাঘরের শীতের রাত্রে একাকী শুয়ে সে পৃথিবীর সমস্ত খাদ্য সমস্ত নারীকে ভোগ করতে চায়। কিন্তু তার সেই লালসার পূর্তি নেই। তার কামনা যুবতী নারীর তা সে যেমনই হোক। পথের অপরপ্রান্তে ভিখারি পাঁচিকে দেখে লোভ হয় ভিখুর। যুবতী মেয়ে কিন্তু পায়ে তার ঘা। ভিখু ভাবে ঘা যদি শুকিয়ে যেত পাঁচীকে নিয়ে নতুন করে ঘর বাঁধত সে। কিন্তু ঘা শুকাতে দিতে পাঁচী নারাজ। ওইটুকুই তার রোজগারের একমাত্র পুঁজি। পায়ের কাপড় সরিয়ে ওই দগদগে ঘা দেখিয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সে। সকলের চেয়ে বেশি তার রোজগার। এ পুঁজি সে নষ্ট করবে কোন বিশ্বাসে। তাই বলে তার মধুকর এর অভাব হয় না, বশির মিঞা ঘর বাঁধে পাঁচীকে নিয়ে। ঝাঁপ খোলা কুটিরে যখন অঘোরে ঘুমিয়ে ছিল বশির তার মাথায় বা হাতে লোহার শিক আমূল বিদ্ধ করে দেয় ভিখু। গলা টিপে শেষ নিঃশ্বাসটুকু সম্ভাবনাকেও দেয় স্তব্ধ করে। ভিখুর ভীতিপ্রদর্শনের পাঁচি চুপ করে। দেখিয়ে দেয় বশিরের সারা জীবনের সঞ্চিত গোপন অর্থের পুঁজি, গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে পাঁচী ভিখুর সঙ্গে নতুন জীবনের পথে। রাত থাকতে অনেক দূরের পথে এগিয়ে যেতে হবে কৃষ্ণা রজনীর ক্ষীণ চাঁদের আলোয়। কিন্তু পাঁচীর খোঁড়া পায়ে ব্যথা লাগে। কেবল বাঁহাতের জোরেই তাকে পিঠের উপরে তুলে নেয় ভিখু দ্রুত পায়ে চলতে থাকে এগিয়ে।

আপাতভাবে মনে হতে পারে ভিখু মানুষটা যেন সেই রবীন্দ্রনাথ বর্ণিত শিশ্নোদর সর্বস্ব মানব। তার পাশবিক প্রবৃত্তির হত্যা-লুণ্ঠন, যৌনজীবন আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি এবং জীবিকার জন্য সংগ্রাম তাকে বিকারগ্রস্থ করে বর্ণিত করে বলে মনে হবে। কিন্তু ফ্রয়েড কথিত ভাবনারই ফলশ্রুতি এই চরিত্র। ক্ষুধা এবং রিরংসা মানুষের আদিমতম দুটি প্রবৃত্তি। তার মধ্যে রিরংসাই যেন আরও প্রবলতর। পেটের ক্ষুধা এবং দেহের ক্ষুধা যুগপৎ ভিখুকে তাড়িত করেছে। বস্তুত দারিদ্র্যের অভাবজনিত ক্ষুধা এবং সচেতন যৌন কামনা ভিখু চরিত্রের অন্তিম নিয়তি।

এই গল্পে ভিখু অসন্তুষ্ট বিদ্রোহী নায়ক সে বীর্যবান কিন্তু অধঃপতিত সে নিঃসঙ্গ নয় কিন্তু নিরুপায়। ভিখুর আদিম অসভ্য জীবনের উল্লাস আজ ভিক্ষা করিবার হাতে খড়িতে পর্যবসিত। 'ভিক্ষার আবেদন এর ভঙ্গী ও ভাষা তাহার জন্ম ভিখারির মত আয়ত্ত হইয়া গেল।' ফলে নারী সঙ্গহীন এই নীরস জীবন আর ভালো লাগেনা। অতীতের উদ্দাম ঘটনাবহুল জীবনের জন্য তাহার মন হাহাকার করে। তাড়ির দোকানে ভাঁড়ে ভাঁড়ে তাড়ি গেলা, উন্মত্ত রাত্রিযাপন, গৃহস্থের গৃহে ডাকাতি এবং মায়ের সম্মুখে পুত্রকে রক্তস্নাত করার যে 'উন্মাদকর নেশা' এবং গ্রাম-গ্রামান্তরে বনে জঙ্গলে পলাতক জীবনের সুখ আজ তার শুধু 'একটি হাতে অভাবে মরিয়া আছে। তাই মানুষ খুন করিতে যাহার ভালো লাগিতো সে আজ ভিক্ষা না দিয়া চলিয়া গেলে পথচারীকে একটি টিটকারি দেওয়ার মধ্যে মনের জ্বালা নিঃশেষ করে। ফলে 'আপনার ভাগ্যের বিরুদ্ধে ভিখুর মন বিদ্রোহী হইয়া উঠে। তাহার চালার পাশে বিন্নু মাঝির সুখী পারিবারিক জীবনটি তাহাকে হিংসায় জর্জরিত করিয়া দেয়। তার মনে হয় পৃথিবীর যত খাদ্য ও নারী আছে একা সব দখল করিতে না পারিলে তাহার তৃপ্তি হইবে না।'

বলাবাহুল্য এই অসন্তোষ ও অতৃপ্তি ভিখুকে বিদ্রোহী করে তুলেছে, এই বিদ্রোহ তার নিরুপায় পরিস্থিতির বিরুদ্ধে। স্মরণীয় এই নিরুপায়ত্ব জগদীশ গুপ্তের বিষয়ীভূত মানুষের নিঃসহায়ত্ব অথবা কল্লোলের নৈঃসঙ্গ্য চেতনারই অপর পিঠ। তবে এদের তুলনায় মানিকের বিশেষত্ব এখানে যে তার চরিত্ররা এই নিরুপায় বোধের কাছে আত্মসমর্পন করে না, হেরে গেলেও। জীবনের অস্তিত্ব সম্পর্কে বরং তারা সজাগ করে। ভিখু ও পাঁচী তাই প্রাগৈতিহাসিক জীবনের অন্ধকার মাতৃগর্ভ থেকে অন্ধকার সংগ্রহ করেও নতুন জীবনের পথে পা বাড়ায়। মানিক

বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনদর্শনে আর এক ইতিহাস। মানুষের অন্ধকারময় অবচেতন জীবনের চিরন্তন ইতিহাস। এই প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকারের নাগাল পৃথিবীর আলো আজ পর্যন্ত পায়নি।

প্রকৃতি চেতনা - আলোচ্য গল্পের উদ্দেশ্য মুখ্যত ভিখুর মত অধঃপতিত মানব চরিত্র। হোলি প্রকৃতি চেতনা এখানে অনেকাংশে গৌণ হয়ে উঠেছে। বিভূতিভূষণের প্রকৃতির দৃষ্টির ভিতর যে শিশুর আনন্দ বিস্ময় ফুটে ওঠে মানিকবাবুর প্রকৃতি চেতনা সে আনন্দ বিস্ময়ের সঙ্গে সম্পর্কহীন। এ প্রকৃতি নিয়তির মতো নিষ্ঠুর বলে আমাদের মনে দাগ কাটে তা নয় এ বৈরাগীর মত অনাসক্ত নির্লিপ্ত বলে আমাদের তুচ্ছ আকাঙ্ক্ষাকে কোনো মূল্যই দেয় না। মানিকের প্রকৃতি চেতনা যে প্রতিপদে রূঢ় বাস্তবকে স্মরণ করিয়ে দেয় তার একটা উদাহরণ, 'এদিকে আকাশে চাঁদ ওঠে, নদীতে জোয়ার ভাঁটা হয়, শীতের আমেজে বায়ুস্তরে মাদকতা দেখা দেয়। ভিখুর চারপাশে কলাবাগানে চাঁপা কলার কাঁদি শেষ হইয়া আসে।'

বলাবাহুল্য এ বর্ণনায় রং নেই, শুধু আছে মোটাদাগের সরলরেখা। কিন্তু এই প্রকৃতির রূপ বোধহয় চরিত্রের নিরুপায় অবস্থাকে আঘাত করে। তাই পরবর্তী অংশের লেখক বলেন, 'বিন্নু মাঝি কলা বিক্রির পয়সায় বউকে রূপার ঘোট কিনিয়া দেয়। তালের রসের মধ্যে নেশা ক্রমেই ঘোরালো ও জমাট হইয়া ওঠে।' অনুরূপ একটি চিত্রে প্রকৃতি জগত জীবনযন্ত্রণার প্রতীক হয়ে উঠেছে, 'এমনি অবস্থায় সেই বনে জলে ভিজিয়া মশা ও পোকার উৎপাত সহিয়া দেহের কোন না কোন অংশ হইতে ঘন্টায় একটি করিয়া জোঁক ছাড়াইয়া জ্বরে ও ঘায়ের ব্যাথায় ধুঁকিতে ধুঁকিতে ভিখু দু'দিন দু'রাত এই সংকীর্ণ মাচার উপর কাটাইয়া দিল। বৃষ্টির সময় ছাট লাগিয়া সে ভিজিয়া গেল, রোদের সময় ভ্যাপসা গাঢ় গুমোটে সে হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া শ্বাস টানিল। পোকার অত্যাচারে দিবারাত্রি তাহার এক মুহূর্ত স্বস্তি রহিল না।' জীবলীলার প্রতি অনাসক্ত এই প্রকৃতির কথা মানিকের গল্পে বারবার ফিরে আসছে, 'পথের দুদিকে ধানের ক্ষেত আবছা আলোয় নিঃসাড়ে পড়িয়া আছে। দূরে গ্রামের গাছপালার পিছন হইতে নবমীর চাঁদ আকাশে উঠিয়া আসিয়াছে। ঈশ্বরের পৃথিবীতে শান্ত স্তব্ধতা। '

শিল্প রীতি - মানিকের ভাষারীতি অন্তত এই গল্পে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে এর প্রধান ও প্রথম লক্ষণ হলো এ ভাষা বেগবতী নয়। বেগবতী না হওয়াটাই মানিকের ভাষার প্রধান গুণ। বস্তুত বৈজ্ঞানিক নিরাসক্তির জন্যেই তার গতির বেগ বা আবেগ দুইয়ের এর কোনোটাই স্পন্দিত হয়ে ওঠেনি। এই ভাষিক মন্থরতার কারণ অবশ্যই বাক্যরীতি গত।

ক। সরল বাক্যে অতিরিক্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার। যেমন— 'সেই বনে জলে ভিজিয়া... পোকার উৎপাত সহিয়া... একটি করিয়া জোঁক ছাড়াইয়া...ঘায়ের ব্যথায় ধুঁকিতে ধুঁকিতে... কাটাইয়া দিল'।

খ। বিশেষণ মূলক দীর্ঘ পদগুচ্ছের ব্যবহার।

যেমন - 'তাহার মাথায় জটাবাঁধা চাপ চাপ রুক্ষ ধূসর চুল, কোমরে জড়ানো মাটির মতো ময়লা ছেড়া ন্যাকড়া, আর দড়ির মতো শীর্ণ দোদুল্যমান হাতটি দেখিয়া...'

গ। যৌগিক বাক্যে দুরন্বয়।

যেমন - 'মানুষ খুন করিতে যাহার ভালো লাগিতো সে আজ ভিক্ষা না দিয়া চলিয়া গেলে পথচারীকে একটি টিটকারি দেওয়ার মধ্যে মনের জ্বালা নিঃশেষ করে'।

মানিকবাবুর গদ্যরীতির দ্বিতীয় লক্ষণ হলো এই যে, এই ভাষা একেবারেই ঘটনা ভারবাহী বা সংবাদবাহক নয়।

নিখুঁত বর্ণনায় তার সহজাত দক্ষতা তর্কাতীত হলেও তিনি যেন বর্ণনায় আগ্রহী নন। হলে তার গদ্য ভঙ্গিতে একটা সংক্ষিপ্ত এসেছে। এই সংক্ষিপ্ত সরলোক্তি হয়ত তারাশঙ্করের মত হয়তো তথ্যনিষ্ঠ নয়, আবার বিভূতিভূষণের মতো আবেগমুগ্ধ নয়। লেখক এর দৃষ্টিভঙ্গির নিরাসক্তি ভাষা বয়ে চলে। বস্তুত তার প্রতিটি বাক্যের মাত্র একটি করে ঘটনা বিবৃত হতে থাকে। যেমন -- 'পাঁচী গাছের পাতা জ্বালাইয়া ভাত রাঁধে, বশির টানে তামাক, রাত্রে পাঁচী পায়ের ঘায়ে ন্যাকড়ার পট্টি জড়ায়।... ঘুমের ঘোরে বশির নাক ডাকায়, পাঁচী বিড় বিড় করিয়া বকে।'

গদ্যরীতির তৃতীয় লক্ষণ কিছু আলংকারিক বৈশিষ্ট্য। যথা -

১.। কথ্যরীতির সুলভ বিশেষণ প্রয়োগ। যেমন -'এত বড় বুকের পাটা আর এমন একটা জোরালো শরীর', 'নেশা ঘোরালো ও জমাট', 'জোয়ান দাড়িওয়ালা একখঞ্জ ভিখারি', 'কাটা কাটা কদর্য গল্প', 'ভ্যাপসা পচা দুর্গন্ধ'।

২.। তৎসম শব্দ যুক্ত বিশেষণ গুচ্ছের প্রয়োগেও লেখোকের শক্তিমত্তার পরিচয় মেলে। যেমন - 'নারীসঙ্গহীন এ নিরুৎসব জীবন', 'আজীবন একনিষ্ঠতার প্রতিজ্ঞা', 'মধ্যরাত্রির জনহীন জগতে মনের মধ্যে ভয়ানক একটা কল্পনা... অকথনীয় উল্লাস'।

৩.। উপমা প্রয়োগে কথ্যধর্মীতা। যেমন - 'অসহ্য বেদনা দমছুটানো তাড়ির নেশার মত', 'গাছের মরা ডালের মতো শুকনো হাত', 'শুকনো হাতখানি তাহার ব্যবসায়ের জোরালো বিজ্ঞাপন'।

৪.। ভাবের ক্রমিক বিশেষীকরণ। যেমন - 'তাহাদের নীড়, তাহাদের শয্যা ও তাহাদের দেহ হইতে...

দেশি বিদেশি ভাষার বহুল অনূদিত এই গল্পটিতে লেখক যথেষ্ট মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। ভিখু পাঁচীর মতো সাধারন চরিত্রের বাস্তবায়ন, তাদের দারিদ্র ও অবদমিত যৌনচেতনার বহিঃপ্রকাশ এবং সর্বোপরি জীবন সংগ্রামে পরাভূত না হওয়ার সংকল্প যেভাবে নিকষ কালো কঠিন অনুভবের নিটোল ভাবঘন গাঢ়তায় চিত্রিত হয়েছে, তাতে গল্পটির যথার্থ শৈল্পিক উত্তরণ ঘটেছে।

২২.৫ সারাংশ

'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান গল্প। এই গল্পে লেখক ভিখু ডাকাতের জীবনের কয়েকটি ধাপ দেখিয়েছেন। এক অনিবার্য পরিণামের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করেছেন। ভিখুর গল্পে সুন্দর নেই বীভৎস আছে। বসন্তপুরে ডাকাতি করতে গিয়ে কাঁধে বর্শার খোঁচা খেয়ে ভিখু ডাকাত রাতারাতি দশ মাইল দৌড়ে পালায়। সাকরেদ পেহ্লাদ বাড়িতে আশ্রয় না দিয়ে বনের মধ্যে ভিখুর জন্য মাঁচা বেঁধে দিল, সঙ্গে দিল চিড়ে গুড়। ভিখুর ছিল অসীম জীবনীশক্তি। কাঁধের পচা ঘা নিয়ে জনহীন বনের মধ্যে সাপ জোঁক তাড়িয়ে জ্বরাক্রান্ত ভিখুর জীবনধারণ। 'মরিবে না সে কিছুতেই মরিবেনা। বনের পশু যে অবস্থায় বাঁচেনা সেই অবস্থায় মানুষ সে বাঁচিবেই।'

প্রায় অজ্ঞান ভিখুকে বাড়িতে এনে পেহ্লাদ মাঁচায় শুইয়ে দিল। 'এমনই শক্ত প্রাণ ভিখুর যে শুধু আশ্রয়টুকু পাইয়াই বিনা চিকিৎসায় তো একরকম বিনা যত্নে এক মাস মুমূর্ষু অবস্থায় কাটাইয়া সে ক্রমে ক্রমে নিশ্চিত মরণকে জয় করিয়া ফেলিল। কিন্তু ডান হাতটি তাহার আর ভাল হইল না।'

প্রহ্লাদের বাড়ী থেকে বিতাড়িত ভিখুর 'আদিম অসভ্য জীবনের দ্বিতীয় পর্যায় আরম্ভ হল।' একটা জেলে ডিঙি চুরি করে স্রোতের মুখে ভেসে ভিখু চলে গেল মহকুমা শহরের ঘাটে। ভিখু ডাকাত সেদিন থেকে হল ভিখারি

ভিক্ষা। বাজারের ধারে সকাল থেকে সন্ধ্যে সে ভিক্ষা করে। দুদিনেই 'সে পৃথিবীর বহু পুরাতন ব্যবসাটির এই প্রকাশ্যতম বিভাগের আইন কানুন' শিখে ফেলল। নদীর ধারে বিনু মাঝির ভাঙ্গা চালায় থাকে। ভিখু সুখে থাকে, পেট ভরে খেতে পেয়ে স্বাস্থ্য ফিরে পায়। রাতে স্বরচিত শয্যায় সে ছটফট করে। নারী-সঙ্গহীন ভিখুর এখন নারী চাই। তাও জোগাড় হল। পাঁচী ভিখারিনীর প্রতি ভিখুর নজর পড়ল। পাঁচীর সঙ্গী ভিখারি বসির মিঞাকে ঘুমন্ত অবস্থায় খুন করে পাঁচীকে নিয়ে নতুন জীবন শুরু করার তাগিদে রাতারাতি দূরবর্তী শহর অভিমুখে রওনা দিল।

লেখক গল্পটি শেষ করেছেন দুটি ব্যঞ্জনা সমৃদ্ধ অনুচ্ছেদে। 'ভিখুর গলা জড়াইয়া ধরিয়া পাঁচী তাহার পিঠের উপর ঝুলিয়া রহিল। তাহার দেহের ভারে সামনে ঝুঁকিয়া ভিখু জোরে জোরে পথ চলিতে লাগিল। পথে দুদিকে ধানের ক্ষেত আবছা আলোয় নিঃসাড়ে পড়িয়া আছে। দূরে গ্রামের গাছপালার পিছন হইতে নবমীর চাঁদ আকাশে উঠিয়া আসিয়াছে। ঈশ্বরের পৃথিবীতে শান্ত স্তব্ধতা।

হয়তো ওই চাঁদ আর এই পৃথিবীর ইতিহাস আছে। কিন্তু যে ধারাবাহিক অন্ধকার মাতৃগর্ভ হইতে সংগ্রহ করিয়া দেহের অভ্যন্তরে লুকাইয়া ভিখুও পাঁচী পৃথিবীতে আসিয়াছিল এবং যে অন্ধকার তাহারা সন্তানের মাংসল আবেষ্টনীর মধ্যে গোপন রাখিয়া যাইবে তাহা প্রাগৈতিহাসিক, পৃথিবীর আলো আজ পর্যন্ত তাহার নাগাল পায় নাই, কোনদিন পাইবেও না।'

ভিখুর বলিষ্ঠ বীভৎস আদিম মানবরূপটি লেখক অসামান্য দক্ষতায় চিত্রিত করেছেন ও ভিখুর পরিণাম নির্ভুলভাবে দেখিয়েছেন। ভিখুর জীবনে সভ্যতার আলো পরেনি, প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকারে তার উত্থান বিলয়। তবু তার বেঁচে থাকার তীব্র অভিলাষ ও প্রচন্ড প্রাণশক্তিকে লেখক অভিনন্দন জানাচ্ছেন।

২২.৬ অনুশীলনী

ক। রচনাধর্মী প্রশ্ন

১। ভিখু আসলে কী — ডাকাত, ভিখারি না জীবনকে ভোগ করতে চাওয়া মানুষ — বিচার করুন?

২। গল্পের নাম প্রাগৈতিহাসিক কেন?

৩। ভিখু ও পাঁচীর সম্পর্ককে কীভাবে দেখাবেন ?

৪। গল্পের মধ্যে কীভাবে লেখক প্রকৃতি বর্ণনাকে নানা ঘটনার সাপেক্ষে দেখিয়েছেন?

৫। প্রাগৈতিহাসিক গল্পের শিল্পরূপ ও ভাষার সৌন্দর্য নিজের ভাষায় লিখুন।

খ। সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন

১। ''সমস্ত বর্ষাকালটা ভিখু ভয়ানক কষ্ট পাইয়াছে।' — কেন ভিখু বর্ষাকালে কষ্ট পেয়েছে?

২। ''ঘরকে আমার শনি আইছিল, হায় সব্বনাশ!" — কার ঘরে শনি হয়ে কে এসেছিল? তার পরিণাম কী হয়েছিল?

৩। ''সেই হইল তাহার ভিক্ষা করিবার হাতেখড়ি।" — কার কীভাবে ভিক্ষার হাতেখড়ি হল?

৪। ''কী জীবন তাহার ছিল, এখন কী হইয়াছে!।" — কেমন জীবন ছিল তার?

৫। "পৃথিবীর যত খাদ্য ও যত নারী আছে একা সব দখল করিতে না পারিলে তাহার তৃপ্তি হইবে না।" — তার

এমন কেন মনে হয়?

গ। অতি-সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন

(এখানে দেওয়া অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নগুলি আগে নিজে সমাধান করবেন, পরে উত্তর সংকেতের সাথে মিলিয়ে নেবেন।)

১। বসিরকে ভিখু খুন করেছিল যে অস্ত্র দিয়ে - (অ) দা, (আ) কাটারি, (ই) বল্লম, (ঈ) সুচাল লোহার শিক।

২। বসিরের সমস্ত জীবনের সঞ্চয় ছিল — (অ) একশত টাকার উপর, (আ) একশত টাকা (ই) একশত টাকার কম, (ঈ) দুইশত টাকা।

৩। ভিখু বসন্তপুরে ডাকাতি করেছিল — (অ) আষাঢ় মাসে, (আ) জৈষ্ঠ্য মাসে, (ই) শ্রাবণ মাসে, (ঈ) আশ্বিন মাসে।

৪। অসুস্থ ভিখুকে আশ্রয় দিয়েছিল — (অ) ভরত, (আ) পাঁচী, (ই) পেহ্লাদ, (ঈ) রাখু বাগদি।

৫। ভিখু ও পাঁচী সেই রাত্রে যেখানে যাওয়ার জন্য যাত্রা করল — (অ) নদীর ঘাটে, (আ) সদর শহরে, (ই) দূর গ্রামে, (ঈ) কলকাতায়।

উত্তর সংকেত :

গ। ১। - (ঈ)

গ। ২। - (অ)

গ। ৩। - (অ)

গ। ৪। - (ই)

গ। ৫। - (আ)

২২.৭ নির্বাচিত পাঠ্যগ্রন্থ

১। বন্দ্যোপাধ্যায় মানিক, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গল্প সমগ্র* (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড), শঙ্কর বুক হাউস, ২০১৭, কলকাতা।

২। মুখোপাধ্যায় অরুণকুমার, *কালের পুত্তলিকা,* বাংলা ছোটগল্পের একশ” বিশ বছর/১৮৯১ — ২০২১, দে’জ পাবলিশার্স, চতুর্থ সংস্করণ ২০১১, কলকাতা।

৩। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, *বাংলা গল্প বিচিত্রা*।

একক-২৩ □ ছোটগল্প : পুঁইমাচা—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

গঠন

২৩.১ উদ্দেশ্য

২৩.২ লেখক ও তার সাহিত্যরীতি পরিচয়

২৩.৩ প্রস্তাবনা

২৩.৪ গল্প বিশ্লেষণ

২৩.৫ সারাংশ

২৩.৬ অনুশীলনী

২৩.৭ নির্বাচিত পাঠ্যগ্রন্থ

২৩.১ উদ্দেশ্য

বিভূতিভূষণের গল্পগুলি খুঁটিয়ে পড়লে দেখা যাবে তিনি কেবল প্রকৃতি নিয়ে গল্প লেখেননি। প্রকৃতি তার গল্পের অন্যতম উপাদান মাত্র, প্রধান নয়। ''মানুষ'' বিভূতিভূষণের গল্পে প্রধান আকর্ষণ। বিভূতিভূষণ শিল্পী মানসের যে পরিচয় আমরা পাই, তাতে প্রমাণ হয় তিনি মানবজীবনের আগ্রহী রূপকার। এই গল্পটির বিশ্লেষণী পাঠে সেই বিষয়গুলি স্পষ্ট হবে।

২৩.২ লেখক ও তার সাহিত্যরীতি পরিচয়

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (জন্ম: ১২ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪, চব্বিশ পরগনা — মৃত্যু: ১ নভেম্বর ১৯৫০, ঘাটশিলা)

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাস পথের পাঁচালী ১৩৪০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। এর অনেক আগে তাঁর লেখা প্রথম গল্প 'উপেক্ষিতা' প্রকাশিত হয়েছিল প্রবাসী পত্রিকায় ১৯২২ এর জানুয়ারি সংখ্যায়, মাঘ ১৩২৮ বঙ্গাব্দে। গল্পের প্রধান চরিত্র বৌ-দিদি সাধারণ গ্রামের মেয়ে, দরিদ্র বা নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের বধূ ঘরোয়া প্রীতি স্নেহের ভান্ডার বিভূতিভূষণের নারী চরিত্রের প্রথম প্রতিনিধি স্থানীয়। তিনি কখনো কল্লোল পত্রিকায় লেখেন নি। তাঁর প্রায় ২২০ এর উপরে ছোটগল্প প্রকাশিত হয়েছে। তার প্রথম গল্পগ্রন্থ মেঘমল্লার প্রকাশিত হয় ১৯৩১ এ, আমাদের আলোচ্য পুঁইমাচা গল্পটি এই গ্রন্থের অন্তর্গত। বিভূতিভূষণ গ্রামজীবনের শিল্পী গ্রামের নারীর সঙ্গে তার শিল্প জীবনের যোগ কখনো ছিন্ন হয়নি। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে তাঁর লেখায় সমাজ ও কালের প্রধান লক্ষণ প্রকট নয়। একালের দুটি যুগ লক্ষণ তার গল্প-উপন্যাসে নেই শ্রমিক -ধনিক সংঘাত ও সর্বজনীন অসন্তোষ। এর উত্তর দিতে হয় প্রমথনাথ বিশীর কথায়, — 'বিভূতিভূষণের অধিকাংশ উপন্যাস ও ছোটগল্প অবলম্বনে কি? মানুষের প্রাত্যহিক জীবন। মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে ছোটখাটো সুখ-দুঃখের যে লীলা চাঞ্চল্য আছে, সুখের ভিতর যে দুঃখের আভাস আছে, দুঃখের মধ্যেও যে আনন্দের ইঙ্গিত আছে, বিভূতিভূষণ সাহিত্য রচনার জন্য

সেগুলিকে আশ্রয় করিয়াছেন। জীবনাড়ম্বর তার সাহিত্যের উপজীব্য নয়। কারণ এমন একটি নতুন উপাদান তার রচনায় আছে, জলে যেভাবে ছায়া মিশ্রিত হইয়া থাকে সেই ভাবে আছে। রবীন্দ্র পূর্ব গাহস্থ্ উপন্যাসের ছিল না, সেটি প্রকৃতি।... প্রকৃতিকে জীবনের উপাদান রূপে গ্রহণ ও স্বীকার নতুন যুগের লক্ষণ, সে যুগ এখনো পুরাতন হয় নাই।... সুন্দরতর কথাশিল্পী গণের মধ্যে বিভূতিভূষণ সবচেয়ে অধিক পরিমাণে গ্রহণ করিয়াছেন এখানেই বিভূতিবাবুর রচনায় নূতনত্ব দেশ-কালের চিহ্ন। এই উপাদানটি সবচেয়ে বেশি আধুনিক শ্রমিক ধনিক সংঘাত বা সর্বজনীন অসন্তোষ এর চেয়েও অনেক বেশি আধুনিক। প্রাচীন সাহিত্যের সঙ্গে নূতন সাহিত্যের এখানেই প্রভেদ।' (বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ রচনা, ষষ্ঠ মুদ্রণ ভূমিকা অংশ।)

২৩.৩ গল্পের প্রস্তাবনা

প্রকাশকাল: পুঁইমাচা (*মেঘমল্লার* গল্পগ্রন্থ, ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে)

মানুষ প্রকৃতি আর ঈশ্বর এই তিনে মিলে বিভূতিভুষণের সাহিত্যলোক গড়ে উঠেছে। সাহিত্যের কথা প্রবন্ধের বিভুতিভূষণ কয়েকটি প্রচলিত অভিমতের বিরোধিতা করেছেন, সাহিত্য শিল্পকে সর্বসাধারণের উপযুক্ত করে দাও - এই দাবি তিনি অগ্রাহ্য করেছেন। যে সাহিত্য টবের ফুল দেশের সত্যিকারের মাটিতে শিকড় চালিয়ে যাও রসসঞ্চার করছে না তাকে তিনি বর্জন করতে চেয়েছেন। 'বাংলাদেশের সাহিত্যের উপাদান বাংলা নর-নারী তাদের দুঃখ দারিদ্রময় জীবন তাদের আশা নিরাশা হাসি-কান্না পুলক -- অভির জগতের সঙ্গে তাদের রচিত ক্ষুদ্র জগত গুলির ঘাত-প্রতিঘাত বাংলার ঋতুচক্র বাংলার সন্ধ্যা সকাল আকাশ বাতাস - ফল ফুল বাঁশবনের আমবাগানের নিভৃত ছায়ায় ছড়ানো, সজনে ফুল বিছানো পথের ধারে যেসব জীবন অখ্যাতির আড়ালে আত্মগোপন করে আছে, তাদের কথাই বলতে হবে - হাসি-কান্না, গোপন সুখ-দুঃখকে রূপ দিতে হবে। (সাহিত্যের কথা, পরিশিষ্ট)

তিনি তিনি এই দৈনন্দিন মানব জীবনের অন্তরালে যে আরেকটি আনন্দযজ্ঞ রয়েছে তার অনুসন্ধান করেছেন, 'জগতে অসংখ্য আনন্দের ভান্ডার উন্মুক্ত আছে। গাছপালা ফুল-পাখি উদার মাঠ-ঘাট, সময়, নক্ষত্র, সন্ধ্যা, জ্যোৎস্নারাত্রি, অস্ত সূর্যের আলোয় রাঙা নদীতীর, আলোকময় উদার শূন্য - এসব থেকে এমন বিপুল অব্যক্ত আনন্দ অনন্তের উদার মহিমা প্রাণে আসতে পারে - সহস্র বৎসর ধরে তুচ্ছ জাগতিক বস্তু নিয়ে মত্ত থাকলেও সে বিরাট অসীম সামন্ত উল্লাসের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান পৌঁছায় না। জগতের শতকরা নিরানব্বই জন লোক এই আনন্দের অস্তিত্ব সম্বন্ধে মৃত্যু দিন পর্যন্ত অনভিজ্ঞ থেকে যায় - শতবর্ষজীবী হলেও পায় না। সাহিত্যকারের কাজ হচ্ছে এই আনন্দের বার্তা সর্বসাধারণের প্রাণে পৌঁছে দেওয়া। (*স্মৃতিলেখা,* ভাগলপুর)

২৩.৪ গল্প বিশ্লেষণ

বিভূতিভুষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পের গঠন নৈপুণ্য ঘটনা বিন্যাস প্লট পরিকল্পনা কাহিনীও চরিত্রের সংহতি সব সময় পাঠকের চোখে পড়ে না। তাঁর গল্পের শিল্পকৌশল তিনি আড়াল করে রাখতে পারেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় তিনি গল্পে প্রসাধনে কিছুটা উদাসীন। গল্পের বহিরঙ্গ উৎকর্ষে তার আগ্রহ ছিল না অন্তরঙ্গ সমৃদ্ধির দিকে তার নজর। তার গল্প গুলির মধ্যে তাই আমরা দেখি কিছু গল্পের চরিত্র কে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, কিছু গল্পের কাহিনি কে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে আর কোন গল্পে অলৌকিক রহস্য দেখা যায়। আমাদের আলোচ্য 'পুঁইমাচা' গল্পটিতে দেখব কাহিনী যেন প্রধান ভূমিকা নিচ্ছে। গল্পকার বিভূতিভূষণ মানবপ্রেমিক জীবন শিল্পী মানবজীবনের রূপসৃষ্টিতে

তার আগ্রহ অন্য কোন গল্পকারের চেয়ে কম নয়। বৃহৎ প্রকাণ্ড রোমাঞ্চকর কিছু অপেক্ষা সামান্য তুচ্ছ ক্ষুদ্রের মধ্যে তিনি মহৎ অসমান্য কে দেখতে পেরেছেন। তার হাতে ছিল এক আশ্চর্য দৃষ্টিপ্রদীপ যার আলোতে লেখক অন্তর্লোকের অনেক অনাবিষ্কৃত প্রদেশ দেখতে পেয়েছেন।

বিভূতিভূষণ অনেকগুলি কাহিনিনির্ভর গল্প লিখেছেন। ঘটনা বিন্যাসে, পরিবেশ রচনায়, সংলাপ সৃষ্টিতে ও উপযোগী ভাষা ব্যবহারে তার চেয়ে একটা সহজ নৈপুণ্য ছিল তার প্রমাণ এই কাহিনিনির্ভর বা ঘটনা নির্ভর গল্পে পাওয়া যায়। 'মেঘমল্লার' গল্পগ্রন্থের পুঁইমাচা গল্পটি সার্থক কাহিনীর গল্পের উদাহরণ। কাহিনিনির্ভর গল্পকে কিভাবে শিল্প সার্থকতায় উন্নত করা যায় তিনি তার প্রথম জীবনেই দেখিয়ে দিয়েছেন।

গল্পের শুরু হয় সেই পুরাতন গ্রাম্য দলাদলি, অল্প বয়সে বিবাহ কে কেন্দ্র করে। সহায় হরি চাটুজ্জে স্ত্রী অন্নপূর্ণা গম্ভীরভাবে ঘোষণা করেন, রামের মাতব্বরদের সিদ্ধান্ত, 'এক ঘরে করবে গো, তোমাকে এক ঘরে করবে, কাল চৌধুরীদের চণ্ডীমণ্ডপে এসব কথা হয়েছে। আমাদের হাতের ছোঁয়া জল আর কেউ খাবেনা।' সেকালের গ্রাম্য পরিবেশে বড় ভয়ানক বিপদ। বিশেষ করে সহায়হরির মত সহায়হীন মানুষের পক্ষে তো বটেই। সরাসরি তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে বলেন, 'সবাই এক ঘরে করেছেন এবার বাকি আছেন- কালীময় ঠাকুর।' সহায়হরির বড় মেয়ে ক্ষেন্তির বয়স হল ১৫ বছর। আর বিয়ে না দিয়ে তাকে বাড়িতে রাখা যায় না। কালীময়ের চণ্ডীমণ্ডপে সেদিন বিকেলেই তাই সহায়হরির ডাক পড়ে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, 'কিন্তু পাত্তর আশীর্বাদ হয়ে গেল, তুমি বেঁকে বসলে কি জন্য শুনি?' একটু পূর্ব ইতিহাস আছে, কালীময় ঠাকুর নিজেই উদ্যোগী হয়ে শ্রীমন্ত মজুমদারের ছেলের সঙ্গে ক্ষেন্তির বিবাহ ঠিক করে দিয়েছিলেন। তার কথায় ভালো ছেলে, 'দিব্যি বাড়ি বাগান পুকুর শুনলাম এবার নাকি কুড়ির জমিতে চারটি আমন ধান করেছে রাজার হাল।' এই বিবাহের পেছনে কালিময় ঠাকুরের স্বার্থ আছে, কালিময়ে ঠাকুর শ্রীমন্ত মজুমদারের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়েছিলেন। আসল ও সুদ পরিশোধ হয়নি। কিন্তু পাত্রপক্ষ আশীর্বাদ করে যাওয়ার পর সহায়হরি জানতে পারেন, এই পাত্রটিই নিজের গ্রামে চরিত্রগত দুর্বলতার কারণে লোকের হাতে মার খেয়েছে।

তাই শহরের এক দূরসম্পর্কের আত্মীয় ঘটকালিতে অন্য পাত্রের সঙ্গে ক্ষেন্তির বিবাহ স্থির হয়। এ বিবাহে ক্ষেন্তির মা অন্নপূর্ণার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। প্রথম স্ত্রী গত হওয়ায় পাত্রের এটি দ্বিতীয় পক্ষ। তবুও ৪০ বছরের পাত্রের সঙ্গে ১৫ বছরের ক্ষেন্তির বিবাহ হয়ে যায়। পাত্র সঙ্গতিপন্ন, শহরে বাড়ি, চুন ইটের ব্যবসা আছে। জামাইয়ের বয়স বেশি তাই অন্নপূর্ণা সংকোচ বোধ করছিলেন। থেকে বিদায় দিতে গিয়ে মায়ের মন আশঙ্কায় ভরে ওঠে, 'তার এই অত্যন্ত অগোছালো, নিতান্ত নিরীহ এবং একটু অধিকমাত্রায় ভজনপটু মেয়েটিকে পরের ঘরে অপরিচিত মহলে পাঠাইতে তাহার বুক উদ্বেল হইয়া উঠিতে ছিল। ক্ষেন্তিকে কি অপরে ঠিক বুঝিবে? ' মায়ের আশঙ্কা সত্যি করে দেখা যায় তাকে কেউ বোঝেনি। পণের জন্য আড়াইশো টাকা বাকি থাকায় ক্ষেন্তির আর বাড়িতে ফিরে আসা হয়নি। ক্ষেন্তির দুর্নাম হয়, 'ছোট লোকের মেয়ের মতন চলে, হাভাতে ঘরের মতন খায়...'

ক্ষেন্তি খেতে ভালোবাসতো, বিশেষ করে পুই ডাটা চচ্চড়ি খেতে আরো বেশি ভালোবাসতো। রায় কাকার ফেলে দেওয়া মোটা পেকে যাওয়া পুঁইডাটা সে চেয়েচিন্তে নিয়ে আসে বাড়িতে। পুঁইডাটা এর সাথে খাওয়ার জন্য চিংড়ি মাছ যোগাড় করে আনে। তার 'লম্বা গোলগাল চেহারা, মাথার চুলগুলো কৃষ্ণ ও আগোছালো — বাতাসে উড়িতেছে মুখখানা খুব বড়, চোখ দুটো ডাগর ডাগর ও শান্ত।' - এই হলো আমাদের ক্ষেন্তি। অন্যের ফেলে দেয়া পুইডাটা তার মা রাগ করে ফেলে দিতে বলে। পরের মেয়ের মুখ স্মরণ করে ডাটা তুলে এনে কুচো চিংড়ি দিয়ে আবার রান্না করে রাখে। মনে পড়ে যায়, গত অরন্ধনের আগের দিন বাড়িতে পুঁইশাক রান্নার সময় ক্ষেন্তি আবদার

করে বলেছিল আর্ধেকগুলো একা আমার। তাই দুপুর বেলাতে পাতে পুঁইশাকের চচ্চড়ি দেখে আনন্দপূর্ণ ডাগর চোখে মায়ের দিকে চেয়ে থাকল। 'পুঁইশাকের উপর তাহার এই মেয়েটির কিরূপ লোভ তাহা তিনি জানিতেন, 'জিজ্ঞাসা করিলেন - কিরে ক্ষেন্তি আরেকটু চচ্চড়ি দিই? ক্ষেন্তি তৎক্ষণাৎ মাথা নাড়িয়া আনন্দজনক প্রস্তাব সমর্থন করিল।'

শুধু পুঁইশাক নয় মাকে লুকিয়ে সহায় হরি ও ক্ষেন্তি দুজনে মিলে গোঁসাইদের বরজপোতার বন থেকে মেটে আলু চুরি করে নিয়ে আসে। কিন্তু খেতে ভালোবাসে কিন্তু সে মিথ্যেবাদী বা উপরচালাক নয়। তাই মায়ের কড়া সুরের জিজ্ঞাসার উত্তরে সে মিথ্যা বলতে পারে না। আসলে সে অত্যন্ত সরল। তাইতো ভাঙ্গা পাঁচিলের ধারে ছোট্ট খোলা জমিতে অসময়ের পুঁইচারা লাগিয়ে আরো অনেক সবজির ক্ষেত বানানোর কল্পনায় ডুবে যেতে পারে। শীতের সকালে ঠান্ডা কাঁপতে কাঁপতে মুখার্জি বাড়ি থেকে ক্ষেন্তি গোবর কুড়িয়ে আনা, পিঠে তৈরীর সময় নারকেল কুরিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব রাখা ইত্যাদির মধ্যে ক্ষেন্তির গৃহগত প্রাণ একটি অত্যন্ত নরম মেদুর স্বভাব বোঝা যায়। খেঁদির কথার প্রতিবাদ করে তাহার ক্ষিরের পুরের বদলে মায়ের বানানো নারকেলের পুর দিয়ে পাটিসাপটার প্রশংসা করে, মায়ের কাছ থেকে নারকেলের কোরা পিঠের গোলা আলাদা করে চেয়ে নেয় - তার প্রত্যাশা খুব বেশি কিছু নয়। কিন্তু পরিমাণটা একটু বেশি চায়, তার ছোট দুই বোনের খাওয়া শেষ হয়ে যাওয়ার পরও সে পিঠে খেতে থাকে। আঠারো-উনিশটা পিঠে খাওয়ার পরও যখন তার মা আবার পিঠে দেওয়ার প্রস্তাব করে তাতে সম্মতি জানায়। শান্ত নিরীহ একটু অধিকমাত্রায় ভজনপটু মেয়েটিকে নিয়ে মায়ের ভাবনা, 'ক্ষেন্তি আমার যার ঘরে যাবে তাদের অনেক সুখ দেবে। এমন ভালোমানুষ, কাজে-কর্মে বকো, মারো, গাল দাও, টুঁ শব্দটি নেই মুখে। উঁচু কথা কখনো কেউ শোনেনি।'

সেই টুঁ শব্দ না করা মেয়েটি যখন স্বামীর ঘরে যায় তখন, সমস্ত নিগ্রহ নির্বিচারে টুঁ-শব্দ না করেই সহ্য করে। সরল মেয়েটি ছিল স্নেহের কাঙাল। কিন্তু পণের টাকা, তত্ত্বের পরিমাণ, বাবার খালি হাতে পৌষ মাসে যাওয়া সমস্ত কিছুই - ক্ষেন্তির উপর বর্ষিত হতো। তার মায়ের কাছে তার একটু খেতে ভালোবাসা যে সমাদর পেয়েছিল পরের ঘরে তা ছিল নিন্দার। স্বামীর ঘর, পরের ঘর হয়ে রইল নিজের ঘর আর হয়নি। নিজের অধিকারে সেখানে বাস করে নি। তার অসুখ হওয়াটাও যেন ছিল বাহুল্য। বসন্ত অসুখে আক্রান্ত হলে তার গায়ের সমস্ত গহনা খুলে নিয়ে, টালায় দুঃসম্পর্কের পিসির বাড়ি ফেলে রেখে যায়। ক্ষেন্তির বাবাকেও খবর দেওয়া প্রয়োজন বোধ করেনি। চল্লিশোর্ধ সুপাত্র এবার একচল্লিশোর্ধ সুপাত্র হয়ে এবার তৃতীয় পক্ষের খোঁজ করবে।

শূন্যস্থান শুধু থেকে যায় বাবা-মা-দুই বোনের কাছে। আবার সেই পৌষ পার্বণের দিন এসেছে। ক্ষেন্তির দুই বোন পুঁটি ও রাধী আগুনের পাশে গিয়ে বসেছে মায়ের পিঠে তৈরি দেখতে। পিঠে খেতে বসার মুহূর্তেই মনে পড়ে যায় ক্ষেন্তির কথা, 'দুই বোনের খাইবার জন্য কলার পাতা চিরিতে চিরিতে পুঁটি অন্যমনস্কভাবে হঠাৎ বলিয়া উঠিল— দিদি বড় ভালোবাসতো... তিনজনই খানিকক্ষণ নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিল,' ক্ষেন্তি সবথেকে বেশি খেতে ভালোবাসতো পুঁইডাঁটার চচ্চড়ি। যাতে আর পরের কাছ থেকে পুইডাটা চেয়েচিন্তে আনতে না হয় তাই উঠোনের এক কোণে পুঁই গাছের চারা লাগিয়ে ছিল। ক্ষেন্তি আজ অনেকদূর চলে গেছে কিন্তু তার পুঁইগাছটি রয়ে গেছে, 'সেখানে বাড়ির সেই লোভী মেয়েটির লোভের স্মৃতি পাতায় পাতায় শিরায় শিরায় জড়াইয়া তাহার কত সাধের নিজের হাতে পোঁতা পুঁইগাছটি মাচা জুড়িয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে... বর্ষার জল ও কার্তিক মাসের শিশির লইয়া কচি-কচি সবুজ ডগাগুলি মাচাতে সব ধরে নাই, মাচা হইতে বাহির হইয়া দুলিতেছে... সুপুষ্ট, নধর, প্রবর্দ্ধমান জীবনের লাবণ্যে ভরপুর।'

যে সুপুষ্ট, নধর, প্রবর্দ্মান জীবনের লাবণ্য লোভী মেয়েটির পাওয়ার কথা ছিল তা সে পায়নি। কিন্তু তার প্রিয় পুঁই চারাটি পেয়েছে। নিজের হাতে লাগিয়ে রেখে যাওয়া চারাগাছটি আজ যেন জীবনের সমস্ত পূর্ণতা পেয়ে গোটা মাচা পূর্ণ করেছে।

২৩.৫ সারাংশ

গল্পের প্রধান চরিত্র একটি কিশোরী, নাম তার ক্ষেন্তি। সে সরল স্বল্প বুদ্ধি ও পেটুক। অবধারিত ভাবেই পথের পাঁচালীর দুর্গা চরিত্র কে আমাদের মনে পড়ে যায়। যদিও পথের পাঁচালী এই গল্পের অনেক পরে রচনা। গল্পের ঘটনা আছে। বাবার সঙ্গে যে মেয়েটি মেটে আলু চুরি করে আনে সেই সরল নির্বোধ লোভী মেয়েটির বিয়ে হয়ে যায় এক প্রৌঢ়ের সঙ্গে। শ্বশুরবাড়িতে নিগ্রহ, পরিণামে সন্দেহজনক অকাল মৃত্যু -- এই ঘটনাক্রম লেখক বিবৃত করেছেন অসাধারণ সহমর্মিতা ও মমতার সঙ্গে। ক্ষেন্তি গরিবের মেয়ে খেতে ভালোবাসতো। তার জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা বড় কিছু নয়, সাধারণ তুচ্ছ। ক্ষেন্তির মূল্য তার সারল্যে। সে মূল্য দেবার মানুষ সংসারে খুব বেশি নেই। তাই এই বৈষয়িক নিষ্ঠুর ইতর সংসার থেকে তাকে লাঞ্ছিত হয়ে চলে যেতে হয়, কেউ রক্ষা করতে পারে না, নিজেও নিজেকে রক্ষা করতে পারেনা।

ক্ষেন্তি নামের মেয়েটির জীবনের কোনো উচ্চ আদর্শ, বিষয় ভাবনা কিছুই ছিল না। সে তার মত করে জীবনটাকে ক্ষুদ্র পরিসরে ক্ষুদ্র উপকরণে উপভোগ করে নিতে চেয়েছিল। আজ চারিদিকে যখন দেখি বিষয় লোভে-লালসায় পাগলপারা মানুষ, অবাক হয়ে ভাবতে হয়, ক্ষুদ্র-তুচ্ছ-সামান্য লোভ নিয়েও এই মেয়েটির জীবন অপূর্ণ থেকে গেছে। তার এই ক্ষুদ্র লোভ, তার সরল জীবন উপভোগেরই নামান্তর। আমাদেরকে যা সামান্য উপকরণে সন্তুষ্টির পাঠ দিয়ে যায়। ভোগ ঐশ্বর্যের আড়ম্বর নয়, সন্তুষ্টি তৃপ্তি মানুষের কাছে পূর্ণতা এনে দিতে পারে।

২৩.৬ অনুশীলনী

ক। রচনাধর্মী প্রশ্ন

১। পুঁইমাচা গল্পে ক্ষেন্তি তার সামান্য-ক্ষুদ্র-তুচ্ছ লোভ নিয়েও জীবন অতৃপ্তি নিয়েই রইল — নিজের ভাষায় আলোচনা করুন?

২। ক্ষেন্তির এই পরিণতির জন্য কাকে আপনার দোষী বলে মনে হয়?

৩। ক্ষেন্তির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোভগুলির পরিচয় দিন ?

৪। এই গল্পে লেখকের মানুষ ও প্রকৃতি বর্ণনার মুন্সিয়ানা দেখতে পান তার পরিচয় দিন।

৫। '... তাহার কত সাধের নিজের হাতে পোঁতা পুঁইগাছটি মাচা জুড়িয়া বাড়িয়া উঠিয়াছেবর্ষার জল ও কার্তিক মাসের শিশির লইয়া কচি-কচি সবুজ ডগাগুলি মাচাতে সব ধরে নাই, মাচা হইতে বাহির হইয়া দুলিতেছেসুপুষ্ট, নধর, প্রবর্ধমান জীবনের লাবণ্যে ভরপুর।' — একদিকে মেয়েটি অন্যদিকে এই পুঁইমাচা — কীভাবে নামকরণে একাকার হয়ে গেছে তার বিস্তারিত আলোচনা করুন।

খ। সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন

১। "দুপুরবেলা ক্ষেন্তি পাতে পুঁইশাকের চচ্চড়ি দেখিয়া বিস্ময় ও আনন্দপূর্ণ ডাগর চোখে মায়ের দিকে ভয়ে ভয়ে চাহিল।" — মায়ের দিকে ভয়ে ভয়ে তাকানোর কারণ কী?

২। ‘‘সে মুখ বুজিয়া শান্তভাবে খায়, বড় একটা কথা কহে না।’’ — কার কথা হচ্ছে? তার খাওয়ার একটা নমুনা দেখাও।

৩। ‘‘আড়াইশো আন্দাজ টাকা বাকি ছিল, বললে, ও টাকা আগে দাও।’’ — কিসের টাকা বাকি? এর ফল কী হয়েছিল?

৪। ‘‘পুঁটি অন্যমনস্ক ভাবে হঠাৎ বলিয়া উঠিল দিদি বড় ভালবাসত।’’ — দিদি কে? এখানে তার কী ভালবাসার কথা বলা হচ্ছে?

৫। ‘‘চৌধুরীরা তোমায় একঘরে করবে তা আর এমন কঠিন কথা কি?’’ — কাকে কেন একঘরে করার কথা এখানে বলা হয়েছে?

গ. অতি-সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন

(এখানে দেওয়া অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নগুলি আগে নিজে সমাধান করবেন, পরে উত্তর সংকেতের সাথে মিলিয়ে নেবেন।)

১। সহায়হরি যার কাছ থেকে রস আনবে বলেছিল - (অ) নীলমণি মুখার্জি, (আ) চৌধুরীদের বাড়ি, (ই) রাখহরি, (ঈ) তারক খুড়ো

২। ক্ষেন্তির সবচেয়ে প্রিয় ছিল — (অ) পুঁইশাক, (আ) পিঠে, (ই) পান্তাভাত, (ঈ) আমসত্ত্ব।

৩। ক্ষেন্তির বিবাহ হল যে মাসে — (অ) ফাল্গুন মাসে, (আ) আষাঢ় মাসে, (ই) ভাদ্র মাসে, (ঈ) বৈশাখ মাসে।

৪। সহায়হরি ও ক্ষেন্তি যেখান থেকে মেটে আলু চুরি করে এনেছিল — (অ)বরোজপোতার জঙ্গল, (আ) বাঁশবাগান, (ই) জেলেদের পাড়া, (ঈ) চৌধুরীদের বাগান।

৫। যে অসুখে ক্ষেন্তি মারা যায় — (অ) কলেরা, (আ) বসন্ত, (ই) টাইফয়েড, (ঈ) নিউমোনিয়া।

উত্তর সংকেত

গ। ১। - (ঈ)

গ। ২। - (অ)

গ। ৩। - (ঈ)

গ। ৪। - (অ)

ঘ। ৫। - (আ)

২৩.৭ নির্বাচিত পাঠ্যগ্রন্থ

১। বন্দ্যোপাধ্যায় বিভূতিভূষণ, *বিভূতিভূষণ গল্পসমগ্র (দুই খণ্ড)*, মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স, ২০১১, কলকাতা।

২। মুখোপাধ্যায় অরুণকুমার, ‘‘*কালের পুত্তলিকা, বাংলা ছোটগল্পের একশ*’’ বিশ বছর/১৮৯১ — ২০২১, দে’জ পাবলিশার্স, চতুর্থ সংস্করণ ২০১১, কলকাতা।

৩। গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, *বিভূতিভূষণ মন ও শিল্প*

একক-২৪ ❑ ছোটগল্প : জলসাঘর — তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

গঠন

২৪.১ উদ্দেশ্য

২৪.২ লেখক ও তার সাহিত্যরীতি পরিচয়

২৪.৩ প্রস্তাবনা

২৪.৪ গল্প বিশ্লেষণ

২৪.৫ সারাংশ

২৪.৬ অনুশীলনী

২৪.৭ গ্রন্থপঞ্জী

২৪.১ উদ্দেশ্য

- পুরনো আমলের জাঁকজমক বিলাস বৈভবের কাহিনি নাট্যরস ও রোমান্টিক আবেগের আধারে পরিবেশিত হয়েছে।
- একদিকে পরিশীলিত বনেদিয়ানা আরেকদিকে কাঁচা টাকার স্থূল প্রদর্শনী এই সূক্ষ্ম দ্বন্দ্ব — যুগবদলের বাজনা বেজে চলেছে। বিদায়ী সামন্ততন্ত্র ও উদীয়মান নব্য পুঁজিবাদের লড়াইয়ে বনেদিয়ানার পরাজয় দেখান হয়েছে।

২৪.২ লেখক ও তার সাহিত্যরীতি পরিচয়

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় (জন্ম: ২৩ জুলাই ১৮৯৮, লাভপুর, বীরভূম — মৃত্যু: ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭১, কলকাতা)

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধায় পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যতম প্রধান কথাসাহিত্যিক। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'চৈতালি ঘূর্ণি' (১৯২৮) আঞ্চলিক উপন্যাসের এক বিস্ময়কর নবরূপ হিসাবে, জনপদ জীবনের আলেখ্যরূপে ব্যক্তি ও গোষ্ঠি অতিক্রমী মানবজীবনধারার কাহিনি রূপে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তারাশংকরের প্রথম প্রকাশিত গল্প 'রসকলি' (ফাল্গুন ১৩৩৪, ১৯২৮) ও তিনমাস পর 'হারানো সুর' গল্প (বৈশাখ ১৩৩৫, ১৯২৮) তারও তিনমাস পর 'স্থলপদ্ম' গল্প (শ্রাবণ ১৩৩৫, ১৯২৮) 'কল্লোল' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রথম তিনটি গল্প 'কল্লোল' পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও তিন কোনও মতেই কল্লোল গোষ্ঠিভুক্ত লেখক নন। কল্লোলের নাগরিক মানসিকতার সাথে এই গল্প তিনটির সহজিয়া বৈষ্ণবদের জীবন ও রসসাধনার মূল দেশজ সংস্কৃতির সঙ্গে কোন মিল নেই। এর পর পাঁচ বছর তিনি আর কোন লেখা প্রকাশ করছেন না। ১৯২৮ থেকে ১৯৩৩ এই সময়ে তিনি নিজের গ্রামের ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি হওয়া, আইন-অমান্য আন্দোলনে জেলে যাওয়া, গ্রামে গ্রামে মহামারীর জনে সেবাব্রত গ্রহণ তাঁকে গ্রাম জীবনকে চিনতে সাহায্য করল। তিনি গ্রামজীবনের শিল্পী, গ্রামের নাড়ির সাথে তাঁর শিল্পজীবনের যোগ কখনো ছিন্ন হয়নি।

২৪.৩ গল্পের প্রস্তাবনা

প্রথম প্রকাশ - জলসাঘর (*বঙ্গশ্রী* পত্রিকা, ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দে)

পাঁচ বছরে (১৯৩৩ — ৩৮) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা পাঁচটি উপন্যাস ও তিনটি গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। পরপর প্রকাশিত হয়েছিল — নীলকণ্ঠ, পাষানপুরী, রাইকমল, ছলনাময়ী, প্রেম ও প্রয়োজন, আগুন, জলসাঘর, ও রসকলি। জমিদার শ্রেণীভুক্ত চরিত্রের দম্ভ, গর্ব ও প্রতিষ্ঠার ছবি এবং তার থেকে বিচ্যুতি জনিত দুঃখ এই সবই দেখালেন প্রথমে 'জলসাঘর' গল্পে, এখানে যার সূচনা; পরে 'রায়বাড়ি' গল্পে তারই পরিণতি। 'জলসাঘর' গল্প প্রথম প্রকাশ বঙ্গশ্রী পত্রিকা বৈশাখ সংখ্যা ১৩৪১ বঙ্গাব্দ, ১৯৩৪ খ্রীঃ। আর 'রায়বাড়ি' গল্প প্রথম প্রকাশ *ভারতবর্ষ* পত্রিকা অগ্রহায়ণ সংখ্যা ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ, ১৯৩৬ খ্রীঃ।

জমিদার চরিত্র ও জমিদারি আভিজাত্য সম্পর্কে তারাশংকরের দৃষ্টিভঙ্গি দ্বিধাগ্রস্থ। তিনি জ্ঞানে জানেন এই ধরণের চরিত্র ও সমাজ কাঠামো সমর্থন করা যায় না, কংগ্রেসকর্মী তারাশংকর তা করেননি, কিন্তু মানবতাবাদী তারাশংকর রায়বাড়ির মানুষদের মহিমার অবসানে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। 'রায়বাড়ি' গল্পের রাবণেশ্বর রায় ও 'জলসাঘর' গল্পের বিশ্বম্ভর রায়কে লেখক অন্তগত মহিমার প্রতিমারূপে গড়ে তুলেছেন। রাবণেশ্বর রায় দীর্ঘাকার পুরুষ, খঙ্গের মত তীক্ষ্ম দীর্ঘ নাসিকা, আয়ত চোখ, সর্বাঙ্গের মধ্যে স্থূলতার এতটুকু চিহ্নমাত্র নেই; সিংহের মত প্রশস্ত বক্ষ, ক্ষীণ কটি। আর বিশ্বম্ভর রায় — বাদশাহী সড়কের উপর প্রকাণ্ড সাদা ঘোড়ার পিঠে মাথায় পাগড়ি বাঁধা গৌরবর্ণ বীরবপু আরোহীকে দেখে পথিকরা বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকত। বিশ্বম্ভর রায় সপ্তম পুরুষ। তার আমলেই রায় বাড়ির লক্ষ্মী ঋণসমুদ্রে তলিয়ে গেলেন। লক্ষ্মীহীন দেবরাজ ইন্দ্রের মত বিশ্বম্ভর কেবল তাকিয়ে দেখলেন। সাতদিনের উৎসব শেষে বাড়িতে দেখা দিল কলেরা — বিশ্বম্ভর রায় নির্বংশ হলেন। এখন কেবল মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা।

তারাশংকর সমাজসচেতন লেখক। তিনি অতীতের পুজারী নন। তাই নতুন ও পুরাতনের দ্বন্দ্বে পুরনো জমিদারতন্ত্রের পরাজয় দেখিয়েছেন। সেই সঙ্গে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন। একালের ব্যবসাদার নতুন ধনী মহিম গাঙ্গুলীর সঙ্গে সংঘর্ষে অতীত-আভিজাত্য-দম্ভ-গর্ব-বাহী বিশ্বম্ভর রায়ের পরাজয় এই গল্পে বর্ণিত। মহিম গাঙ্গুলীর পাঠানো তওয়াইফকে ফেরৎ দিতে না পেরে বিশ্বম্ভর রায় বহুদিন বাদে জলসাঘরের দরজা খুললেন। বহুদিন বাদে আবার সংগীতের ঝড় তুললেন। তারপর প্রমত্ত রাতের অবসানে ভোরে আদরের ঘোড়া তুফানের পিঠে সওয়ার হলেন অনেকদিন বাদে। এলেন সেই কীর্তিহাটে যা একদিন রায়েদের ছিল, বিক্রি হয়ে গেছে। ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে ফিরে এলেন। হাতের চাবুকটা আছড়ে পড়ল জলসাঘরের দরজায়। তারাশংকর এই অস্তমিত মহিমার পরাজয়কে শিল্পরূপের স্থায়িত্ব দিয়েছেন। গল্পের নাটকীয় বিন্যাস, রোমান্টিক পরিবেশ, নিপুন বর্ণনাভঙ্গী — সবটা মিলিয়ে এক অখণ্ড শিল্পরূপ।

২৪.৪ গল্প বিশ্লেষণ

'জলসাঘর' নতুন ও পুরাতনের দ্বন্দ্ব - 'জলসাঘর' গল্প তারাশংকরের সৃজনীপ্রতিভার ঐশ্বর্যের সমুচ্চ শিখর প্রদর্শন করে। গল্পটি বাংলা সাহিত্যে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শিল্পসার্থক ছোটগল্প। গল্পের মধ্যেই দেখা যায়, গল্পটির রচনাকালে লেখকের একটি পূর্বপরিকল্পনা ছিল। গল্পটির মধ্যেই দেখা যাচ্ছে গল্পের নায়ক বিশ্বম্ভর রায় রায়

বংশের সপ্তম পুরুষ। রায়েরা তিনপুরুষ ধরে করেছিলেন সঞ্চয়, চতুর্থ পুরুষ করে রাজত্ব, পঞ্চম ও ষষ্ঠ পুরুষ করলেন ভোগ ও ঋণ, সপ্তম পুরুষে রায়বংশ লুপ্ত হতে বসেছে। রায়বংশের চতুর্থ পুরুষ 'রাবণেশ্বর রায়'এর পরিচয় আছে 'রায়বাড়ি' গল্পে। প্রকাশকালের দিক থেকে গল্পটি পরে প্রকাশিত হলেও কাহিনির দিক থেকে "রায়বাড়ি"র কাহিনি আগের ঘটনা। 'রায়বাড়ি'র সাথে 'জলসাঘর' গল্পের তাই একটি ঐতিহাসিক ও আত্মিক যোগ আছে। একই সূত্রে বাঁধা এই দুই গল্পের প্রধান মিল একটি জায়গায় — দুই গল্পেরই বিষয় গ্রামীণ সামন্ততন্ত্রের শাসন-পালন-শোষনের ভাল-মন্দ দিক। দুটি গল্পের চরিত্রের মধ্যেই আছে প্রতাপশালী জমিদারসুলভ ঔদার্যের সাথে নির্মমতার বিচিত্র মিশ্রণ। রাবণেশ্বর রায়ের অকপট বীরত্ব, ভোগরতি, ঈশ্বরভক্তি, প্রজাদের জন্য দান বাৎসল্য। সেই সঙ্গে প্রতিস্পর্ধী মনোভাবের প্রতাপ ও প্রতিহিংসাবৃত্তি — এসব মিলেমিশে যৌবনের মদমত্ত দিক চিত্ররূপ পেয়েছে 'রায়বাড়ি' গল্পে। পরবর্তী 'জলসাঘর' গল্পে সেই সামন্ততন্ত্রেরই অস্তমিত মহিমা এবং বিষাদাচ্ছন্ন অবক্ষয়ের চিত্র ঘরা পড়েছে জীবনক্লান্ত বৃদ্ধ বিশ্বম্ভর রায়ের জীবনচর্যায়।

'জলসাঘর' শুধু গল্পের নাম নয়, একটা ক্ষয়িষ্ণু সময়ের প্রতীক। দুটি গল্পেই জলসাঘর, যেখানে নাচগানের আসর বসে জমিদারের মনোরঞ্জনের জন্য, তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে। দুটি গল্পেই জলসাঘর বিলাসমত্ত আভিজাত্যের প্রতীক হয়ে উঠেছে। রাবণেশ্বর রায় নির্মীয়মান জলসাঘরকে মনে করেছেন রায় বংশের সমাধিগৃহ। তিনি তা পরিত্যাগ করার সংকল্প নিয়ে গৃহত্যাগ করলেও আবার ফিরে এসেছেন জলসাঘরের আকস্মিক আলোকমালার উজ্জ্বল আকর্ষণে। জলসাঘরের প্রলম্বিত পূর্বপুরুষের প্রতিকৃতিগুলি যেন তাঁকে ডেকে আবার ফিরিয়ে এনেছে। রাবণেশ্বরের কাছে জীবনের আকর্ষণ ফুরিয়ে যায়নি। কিন্তু বিশ্বম্ভরের কাছে এই জলসাঘর যেন অতীত স্বপ্নমোহের ক্ষণিক আকর্ষণ। জলসাঘরের বৈচিত্রময় অতীতজীবন উৎসবের আমন্ত্রণে বিশ্বম্ভর রায় আজ আর সাড়া দিতে পারেন না। বর্তমান রূঢ় কঠিন বাস্তবতার চাবুক দিয়ে তিনি ঐতিহ্যের স্বপ্নসৌধকে গুঁড়িয়ে ফেলতে চান।

'জলসাঘর' গল্পে আরো প্রতীকী তাৎপর্য রয়েছে। বিশ্বম্ভর রায়ের কাছে জলসাঘর জমিদার শ্রেণির দীর্ঘদিন আচরিত বিলাসবহুল জীবনচর্চার প্রতীক। যা অর্থাভাবে জমিদারি আভিজাত্য ও অহমিকার শেষ পান্ডুর দিনগুলিতে প্রায় পরিত্যক্ত। এই জলসাঘর এখন জমিদারদের মোহকে লালন-পালন করার বংশানুক্রমিক এক আশ্রয়। শুধু তাই নয় এই জলসাঘর সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অভিজ্ঞান। এমন জলসা ঘরের পাশে মহিম গাঙ্গুলীর হালফিল জলসার হালকা চটুল রস-রসিকতা আয়োজন এক বৈপরীত্য সৃষ্টি করেছে। মহিমের বাড়ির জলসা ও মহিমের রস-রসিকতা এবং বিশ্বম্ভরের জলসাঘরের জলসা ও তার নিত্য গীত এর প্রতি সংযত আকর্ষণ নূতন পুরাতনের প্রচ্ছন্ন সংঘর্ষ তুলে ধরেছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন, নতুন ও পুরাতন এর দ্বন্দ্ব পুরাতনের পরাজয়ের ওপর তারাশঙ্করের যে দীর্ঘশ্বাস বর্ষিত হয়েছে এই গল্পের সেইটি মূল সূত্র। বাংলা গল্প বিচিত্রা।

বিশ্বম্ভর রায় চরিত্রটি যেন এক গ্রিক ট্র্যাজেডির নায়ক। গ্রিক ট্র্যাজেডির নায়কের মতোই তিনি নিয়তির অনিবার্য শিকার। পতন সুনিশ্চিত জেনেও শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি মাথা উঁচু করে রেখে যেতে চান। পতন ও পরিবর্তন মেনে নিয়েই বিশ্বম্ভর রায় নিজের গণ্ডির মধ্যে নিঃস্ব গতানুগতিক জীবন যাপন করেন। লেখক বিশ্বম্ভরের ব্যক্তিত্বের গভীর যন্ত্রণা এবং অনির্বাণ অন্তর্দ্বন্দ্বের তীব্রতা বোঝানোর জন্য ধাপে ধাপে একটির পর একটি করে ঘটনা সাজিয়েছেন।

বিশ্বম্ভর এর পুত্রের উপনয়ন উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী বিপুল উৎসবে রায়বাড়ি একদিন মুখরিত হয়ে উঠেছিল। সপ্তম দিনে বিলাস হল হলাহল। বাড়িতে কলেরা দেখা দেওয়ায় সাত দিনের মধ্যে বিশ্বম্ভরের সংসার শূন্য হয়ে গেল। তবে স্ত্রী-পুত্র-কন্যার মৃত্যুর পরও জলসা ঘরের বাতি জ্বলছে। সে তার সারেঙ্গী ঘুমুর সহ বাইজির নৃত্যে নিশীথ রাত্রির বিলাসিনী হয়ে উঠেছে। আভিজাত্যের শেষ প্রতীক হিসেবে ছিল ছোট গিন্নি হাতি আর তুফান

ঘোড়া। ছোটগিন্নী হস্তিনী বিশ্বম্ভরের মায়ের বিবাহ যৌতুক আর তুফান ছিল দীপ্ত যৌবন বিশ্বম্ভরের রাজকীয় বাহন।

অতীতের ঐশ্বর্য দীপাবলি স্তিমিত হয়ে এসেছে। বিশাল শূন্য বাড়িতে প্রবীণ বিশ্বম্ভর একা। গ্রামের যুগান্তরের নতুন হাওয়া এসেছে। বিত্তশালী গাঙ্গুলীর পরিবার হয়েছেন হঠাৎ বড়লোক। গাঙ্গুলি বংশ চিরদিন রায় দপ্তরের এলাকায় মহাজনী করেছেন এখন তারা সোনার দেউল তুলেছেন মরা পাহাড়ের আড়ালে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হলো বনেদি আভিজাত্যের সঙ্গে একালের অর্থ গরিমার। এককালে রায় বাড়িতে ভোরের নহবতের সঙ্গে তুফান ঘাড় বেঁকিয়ে তালে তালে নাচত ছোট গিন্নির পায়ের শিকল নুপুরের মত বাজতো। হঠাৎ একদিন গাঙ্গুলী বাড়িতে মহিম বাবুর ছেলের অন্নপ্রাশনে বিচিত্র সংগীতে বিলিতি ব্যান্ড বেজে উঠলো। ছোটগিন্নী আর তুফান তারি তালে তালে নাচতে শুরু করে দিলো। বিশ্বম্ভরের আভিজাত্য বোধে আঘাত লাগলো। কিন্তু কিছু করার ছিলনা। লক্ষ্মী ছেড়ে গিয়েছেন তবুও সবাই তাকে সসম্ভ্রমে বলে রায় হুজুর। গাঙ্গুলীর দামি মোটর এর চেয়ে রায় হুজুরের বৃদ্ধা হস্তিনীর মর্যাদা তাদের কাছে অনেক বেশি। তাই মহিম গাঙ্গুলীর সংকল্প ওই মরা পাহাড়ের চূড়া ভাঙতেই হবে। ছেলের অন্নপ্রাশনে লখনৌ থেকে বাইজি আনিয়েছেন। নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে বিশ্বম্ভর নিজে জান নি। ছোট গিন্নির পিঠে চড়ে নায়েব গিয়েছিলেন একটি মোহর নিয়ে।

পাঁচ দিন ধরে চলল বাইজি নাচ। বিদায়ের দিন কুটিল মহিম কূটচাল চলে তাদের রাজবাড়ি পাঠালো। কারণ বিশ্বম্ভর রায় সমঝদার আমির লোক। বাইজির রূপ দেখে বিশ্বম্ভর মোহিত হলেন। মনে পড়ে গেল তার যৌবনের দিনের কথা বাইজি চন্দ্রার কথা। অথচ ভান্ডার শুন্য রায় বংশের মাঙ্গলিক সিঁথি খানি তুলে দিলেন নায়েবের হাতে। জলসা ঘরের দরজা শেষবারের মতো অর্গলমুক্ত হলো। শুরু হলো বাইজির নাচ। বাইজি প্রজাপতির মত। বিশ্বম্ভরের স্মৃতিপটে জেগে উঠল লখনৌ এর জোহরার কথা, দিল্লিওয়ালি চন্দ্রার কথা। উত্তেজনায় সুরার উগ্রতায় বিশ্বম্ভরের দেহের রক্ত যেন ফুটছিল। বৃদ্ধ বিশ্বম্ভর যেন হঠাৎ ফিরে পেলেন তার ভুলে যাওয়া যৌবনকে। হাতে তুলে নিলেন এসরাজ।

জলসাঘর গল্পের সুর সপ্তমে চলেছে যেখানে কৃষ্ণা বাঈ চন্দ্রাবাঈতে বদলে গেছে। গান শুনতে শুনতে বিশ্বম্ভর অনেক উজান ঠেলে চলেছিলেন স্মৃতির অতীতে, যেখানে জলসা শেষ হবার পর ঘটে গোপন প্রিয় মিলন। আজও তারই আমন্ত্রণ জানিয়ে রায় এসরাজে ঝংকার তুললেন। এসরাজের ছড়ির টানে চন্দ্রার স্মৃতি গুঞ্জরণ করে উঠলো এবং এই গানই কৃষ্ণার মধ্য থেকে বের করে আনল চন্দ্রাকে।

কৃষ্ণা গাহিতে গাহিতে নাচিতে আরম্ভ করিল সে গাহিলো হে প্রিয় জোড়া ফুলের মালা গাঁথি না;... রায় এসরাজ ফেলিয়া টপ করিয়া হাতের মুঠোতে কৃষ্ণার পা দুইটি ধরিয়া উচ্ছলিয়া তালে তালে তাহাকে নাচাইয়া দিলেন।... সুরামত্ত রায় আদর করিয়া ডাকিলেন -- চন্দ্রা চন্দ্রা পিয়ারী। বিশ্বম্ভর জলসাঘরের প্রণয় দান শুধু একটি রাত্রি নয় হারানো যৌবন ফিরে পেয়েছিল। রাত্রের প্রিয় মিলনের গভীর আশ্লেষের সে তুফানের পিঠে চড়ে ঝড়ের গতিতে বেরিয়ে পড়েছিল। আসলে বিশ্বম্ভর তার হারিয়ে যাওয়া ফুরিয়ে যাওয়া অতীতের সব মহিমা সব চেয়েছিল। কিন্তু স্বপ্ন তো আর বাস্তব নয় অতীত তো ফিরে আসে না আর এ সবই সুখকল্পনা।

রাত্রির শেষ বিশ্বম্ভরের শিরায় শিরায় সুরার নেশা টগবগ করে ফুটছে। ভৃত্য অনন্তকে বললেন পাগড়ী চাদর আর পোশাক দিতে। কিছুক্ষণ পরেই তুফানের হর্ষ পূর্ণ হ্রেস্বা শব্দে শেষ রাত্রির বুক ভরে উঠলো। তারাপ্রসন্ন দেখলেন তুফানের পিঠে বিশ্বম্ভর রায়। পরনে চোস্ত পায়জামা গায়ে আচকান মাথায় সাদা পাগড়ি পায়ে জরিদার নাগরা হাতে চামর দেওয়া চাবুক। তারপর এক স্বপ্নে-পাওয়া ঝঞ্ঝাপ্রতিম অশ্বারোহণ লীলা।

তাই মায়ালোক দ্রুত বিলীন হয়ে গেল। মামলায় হেরে যাওয়া লাট কীর্তিহাটের সীমানায় পা দিতেই সত্যির কঠিন আঘাতে চূর্ণ হয়ে গেল সেই কল্পলোক। বিশ্বম্ভর ঘোড়ার মুখ ফেরাল। পিছন ফিরে এই ছোটা তো পালিয়ে বাঁচার চেষ্টা। ঘোড়সওয়ারের এই সৌখিন বেশ এই দুরন্ত উদ্দাম গতি সবই যেন তাকে ব্যঙ্গ করতে লাগলো। তুফানের পিঠে নয় যেন নিজের মনের ওপর এই সুতীব্র কষাঘাত করলেন তিনি।' লাগাম টানিয়া তুফানকে ফিরাইয়া সজোরে কষাঘাত করিলেন আবার কষাঘাত,... লাগামের টানে তুফানের মুখ কাটিয়া গিয়াছে। তাহার সমস্ত মুখটা রক্তাক্ত'

ব্রাহ্ম-মুহূর্তে অস্পষ্ট আলোয় সম্বিত ফিরে পেলেন তিনি। রাজপুরীতে ফিরে গিয়ে তাকালেন জলসাঘরের দিকে। তারাশঙ্করের গল্পের মূল প্রকৃতি ধাতু প্রবৃত্তির জয়গান। কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ মাৎসর্য এর যেকোনো একটা হল ধাতু প্রবৃত্তি। তবে ধাতু প্রবৃত্তি থেকে উত্তরণের একটা ইঙ্গিত দেওয়া থাকে গল্পের মধ্যে। জলসাঘর গল্পের শেষে বিশ্বম্ভর তাই বলেন, ভুল বেটা তোরও ভুল আমারও ভুল। এই ভুলটাই তো জমে আছে পুরুষানুক্রমে রায় বাড়ির মধ্যে। ঝাড়লণ্ঠন এর বাতিদানে তখনও আলো জ্বলছে। সেই আলোয় তিনি দেখলেন দেওয়ালের গায়ে দৃপ্ত রায় বংশধরদের, মুখে মত্ত হাসি। সভয়ে বিশ্বম্ভর রায় পিছিয়ে এলেন। সহসা মনে হলো দর্পণে নিজের প্রতিবিম্ব দেখছেন তিনি। তাই শূণ্য জলসা ঘরের মধ্যে বিশ্বম্ভর দেখেন —

'দেওয়ালের গায়ে দৃপ্ত রায় বংশধরগণ, মুখে মত্ত হাসি। রায় সভয়ে পিছাইয়া আসিলেন। সহসা মনে হইল দর্পণে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়াছেন — মোহ! কেবল তাহার নহে, সাত রায়ের মোহ ঐ ঘরে জমিয়া আছে। আর তাই বিশ্বম্ভরের আর্তচিৎকার, বাতি নিভিয়ে দে, বাতি নিভিয়ে দে— জলসাঘরের দরজা বন্ধ কর — জলসাঘরের -- আর কথা শোনা গেল না। হাতের চাবুকটা শুধু সশব্দে আসিয়া জলসাঘরের দরজায় আছড়াইয়া পড়িল।'

মোহ কেবল তার নয়, সাতপুরুষের মোহ ওই ঘরে জমে আছে। ভীত কণ্ঠে তিনি ভৃত্যকে আদেশ দিলেন বাতি নিভিয়ে দে, জলসা ঘরের দরজা বন্ধ কর।

জলসাঘরের দরজা বন্ধ থাকত তাই তুফানের হ্রেস্বারবে রায় সাড়া দিতেন না। মুচকুন্দ ফুল পেকে পড়ে যেত। বড়জোর লৌকিকতা করার জন্য হাওড়া চাপত ছোট গিন্নির পিঠে। সব গোলমাল করে দিলো জলসাঘর। কারণ জলসাঘর বিশ্বম্ভরের মধ্যেও ঘুমন্ত ছিল। জেগে উঠে শান্ত-সুপ্ত অস্তিত্বকে বেসামাল করে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল। তাই জলসাঘরের উপর বিশ্বম্ভরের এই আঘাত তো নিজের উপরেও।

বস্তুত এই গল্পে শুধু রায়বাড়ির জলসাঘরের দরজাই বন্ধ হয়নি, অতীতের আভিজাত্য মন্ডিত ঐশ্বর্যে রত্নভাণ্ডার যেন একবার উন্মুক্ত হয়েই চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে গেল। বিংশ শতাব্দীর দুই এর দশকে বিশেষত ইউরোপের আকাশে প্রথম মহাযুদ্ধের যে অশনিসংকেত দেখা গিয়েছিল তার মারাত্মক প্রভাব বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং এই রেশ অবিলম্বে আছড়ে পড়েছিল ভারত মহাসাগরের তীরেও। ভারতবর্ষের রাজনীতি সমাজ বিশেষত অর্থনীতির চালচিত্রতে আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। ভারতবর্ষের সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয় যদিও আগেই শুরু হয়েছিল তবুও এ সমস্যা আরও প্রকট হয়ে উঠলো এবং ব্যবসা ও শিল্পের দিকে মানুষের ঝোঁক বৃদ্ধি পেল। এই সময়ই বড় হয়ে উঠেছেন তারাশংকর এবং কোন ধর্মে তিনি ছিলেন ক্ষয়িষ্ণু জমিদার বংশের সন্তান। এই জমিদারি প্রথা ও সামন্ততান্ত্রিক সমাজ কাঠামো আশ্রিত ভূস্বামীদের প্রতি তার ছিল দ্বিধা মিশ্রিত দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি জ্ঞানে জানতেন কাঠামো ভেঙে ফেলাই উচিত অথচ এর প্রতি ছিল তাঁর মমতা। এর মধ্যেই তিনি জীবনের অনেক গভীর মুহূর্ত কে পেয়েছিলেন। তার সময়ে জমিদারি ভগ্নদশা হলেও জমিদারি প্রথা ও সংস্কারের ঐতিহ্য তখনও অটুট এবং

জমিদারি ব্যবস্থার পুরাতন কীর্তি ও গৌরব কাহিনীর সজীবতার মধ্যেই তিনি লালিত ও বিকশিত হয়েছেন।

জলসাঘর গল্পে তারাশঙ্কর ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে নব্য ধনতন্ত্রের প্রত্যক্ষ বিরোধ দেখালেন এবং এটা ঐতিহাসিক সত্য। অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সামন্ততন্ত্র কে ধনতন্ত্র-এর সঙ্গে এই অসম সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়েছিল। এই দ্বন্দ্ব তারাশঙ্কর নিজ গ্রাম লাভপুরে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সামন্ততন্ত্রের আয় কমে এলেও তারা তাদের পুরাতন বিলাসব্যসন ত্যাগ করতে পারছিলো না এবং সর্বোপরি মাটির উপর তাদের প্রভুত্ব কামিতা ও অধিকারবোধ ছাড়তে পারছিল না। দীর্ঘদিনের প্রচলিত জমিদারি ব্যবস্থার প্রতি সাধারণ মানুষেরও একটা প্রীতি বোধ জন্মে যায়। কিন্তু নব্য ধনতন্ত্র যতই ধনের মালিক হোক না কেন বিত্তের দিক দিয়ে তারা যতই বড় হোক না কেন পুরাতন জমিদারি ব্যবস্থার প্রতি মানুষের যে সম্মান ও আস্থা বোধটুকু তারা অর্জন করতে পারছিল না। তারাশঙ্কর জমিদারি ও ধনতন্ত্রের বিরোধের এই জায়গাটিকেই চিহ্নিত করেছেন। টাইপ কীর্তিহাটের জনৈক প্রজার মুখে শুনি। গাঙ্গুলী বাবুরা কিনে থেকে খাজনা দিয়ে লাভ কিছু আর থাকে না, সুখ ছিল রায় রাজাদের আমলে।

অর্থাৎ গাঙ্গুলীর ধনবান হোন না কেন মানুষের চোখে তিনি বাবুই থেকে যাবেন আর বিত্তহীন বিশ্বম্ভরকে সাধারণ মানুষের চোখে রায় রাজা বলেই অভিহিত করবে। কিন্তু সমকালকে চেনেন বলেই তারাশঙ্কর স্পষ্ট জানেন সিংহ দুয়ারে হাতি বাধার দিন চলে গেছে। বিলাসবহুল মোটরগাড়ির গতির কাছে হার মানতে বাধ্য ছোট গিন্নির গজেন্দ্র গমন। সময় ও সমাজ সচেতন লেখক মনের কোণে দুর্বলতা রূপে জমিদারি ব্যবস্থা ভালোবাসায় সিক্ত হলেও কালের অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তনের বাস্তব ছবি আঁকতে দ্বিধা করেননি তিনি। আর এখানেই তারাশঙ্করের শিল্পীর সততা ব্যক্ত হয়েছে।

২৪.৫ সারাংশ

জলসাঘর গল্পে বিশ্বম্ভর যেন জমিদারি গৌরব আভিজাত্য বিলাসিতা সম্পদের পতনের প্রতিনিধি হয়ে ওঠে। জমিদারি গৌরবের মধ্যাহ্ন আর নেই অপরাহ্ন ঢলে পড়েছে রাক্ষসী বেলায়। সমাজ প্রাধান্য ও আধিপত্য জমিদারদের হাত থেকে ধনতন্ত্রের প্রতিভূ ব্যবসায়ী মহাজনদের হাতে চলে যাচ্ছে। তবু তারাশঙ্কর নিরস সমাজ বিশ্লেষণ এর কাজ করেননি। বিশ্বম্ভর সাত পুরুষের জমিদার জমিদার বনেদিয়ানা তার মজ্জায় মেশা। মহিমেরা মহাজনী করে পয়সা করেছে এটা নব্য পুঁজিবাদের লক্ষণ। কিন্তু তাদের লক্ষ্য জমিদার হয়ে ওঠা। পুরুষানুক্রমে রায়বাড়ির যে দাপট ও সম্পদ দেখেছে তার তুল্য হতে পারাটাই তাদের জীবনের সার্থক বলে মনে করে। তাই মহিম গ্রামে জমিদারি কেনে, অট্টালিকা বানায়, মোটর চালায়, বাইজি আনায় লখনৌ থেকে। এই আধা ব্যবসায়ী আধা জমিদার মহিম অনেকক্ষেত্রে বনেদি জমিদারদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছিল। কিন্তু বিশ্বম্ভর রায় ব্যক্তিত্বের মন্ত্রে তাকে ডিঙিয়ে গেছে। গল্পের চূড়ান্ত আলোকপাত এখানেই। এই আভিজাত্যের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয় ধণতন্ত্র কে? মহিম বিশ্বম্ভর হতে চায় কিন্তু ধনের আড়ম্বরের বিশ্বম্ভর হওয়া যায় না। তাই মহিম তার আচরনে কথাবার্তায় বিশ্বম্ভরকে কাঁটায় বিদ্ধ করতে চায়। মহিমের বাবা পর্যন্ত বিশ্বম্ভর কে হুজুর বলে সম্বোধন করলেও মহিম আজ ধনের অহংকারে বিশ্বম্ভর কে ঠাকুরদা বলে এই অভিযোগ করে যে বাড়িটা করে রেখেছেন কি ঠাকুরদা মেরামত করানো দরকার যে। বিশ্বম্ভর রায় রায় বংশের অধঃস্তন সপ্তম পুরুষ অস্তমিত অভিজাত্যের শেষ বংশধর। তার পূর্ব পুরুষেরা —তিন পুরুষ ধরিয়া রায়রা করিয়াছিল সঞ্চয়, চতুর্থ পুরুষ করিয়াছিলেন রাজত্ব। পঞ্চম ও ষষ্ঠ পুরুষ করিলেন ভোগ ও ঋণ। সপ্তম পুরুষ বিশ্বম্ভরের আমলেই রায় বাড়ির লক্ষ্মী সে ঋণ সমুদ্রে তলাইয়া গেলেন।

লক্ষ্মীহীন বিষ্ণুর মতো বিশ্বম্ভর সাত পুরুষের তৈরি ঐশ্বর্যের ধ্বংসাবশেষের সাক্ষী হয়ে থাকলেন। তবু ছেলের উপনয়ন অনুষ্ঠান চলেছিল সাতদিন ধরে। উৎসবের শেষ দিনে কলেরায় স্ত্রী-পুত্রকে হারিয়ে রায় নির্বংশ হলেন। সব হারিয়েও কিন্তু বিশ্বম্ভর সেই পুরাতন কালের জাঁকজমক বিলাসবহুল আভিজাত্যের দম্ভ ছাড়তে পারেননি। নতুন ধনি মহিম গাঙ্গুলীর শ্রেষ্ঠত্ব তিনি কিছুতেই স্বীকার করে নিতে রাজি নন। তাই প্রয়োজন স্থানীয় মহিমের বাড়িতে নিমন্ত্রিত হয়ে বিত্তহীন জমিদার বিশ্বম্ভর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে অসম্মত হন। যদিও পূর্বের সমৃদ্ধিও প্রতিষ্ঠা থেকে নির্বাসিত বিশ্বম্ভর নিজের বিশাল জমিদারি প্রাসাদের এককোণে আত্মগোপন করে থাকেন। তবু মাঝে মাঝে ছোটগিন্নী ডাক ও তুফানের উচ্চহ্রেস্বারব তাকে অতীতের গৌরবময় দিনগুলির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

কিন্তু মহিমের আচরণে বারবার আত্মসম্মানে আঘাত লাগার ফলে একদিন বিশ্বম্ভর তার নির্বাসিত জীবনের কোন থেকে বাইরে বেরিয়ে আসেন। মহিম নিজেকে জমিদার শ্রেণীর মতো অভিজাত ও রুচিসম্মত প্রমাণ করতে পুত্রের অন্নপ্রাশনের লখনৌ থেকে বাইজি আনেন। মহিম গাঙ্গুলী বিশ্বম্ভর রায় কে মজলিস দেখতে যাবার জন্য সকুণ্ঠ অনুরোধ নয় বরং আহ্বান জানান। কিন্তু বিশ্বম্ভর রায় সেখানেও যান না। বিশ্বম্ভর রায় নিজেকে অপমানিত বোধ করেন। মহিম গাঙ্গুলী চায় বিশ্বম্ভরের এই শুষ্ক আভিজাত্যের মুখোশ খুলে দিতে। তাই উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই বাইজিদের বিশ্বম্ভরের বাড়িতে পাঠায়। কিন্তু মহিমের কাছে পরাজয় স্বীকার করবেন না বিশ্বম্ভর কিছুতেই। গল্পের এই অংশটি প্রণিধানযোগ্য — 'বাইজি বলিল সবার মুখে শুনেছি এখানকার বড় ভারি সমঝদার হুজুর বাহাদুর। গাঙ্গুলী বাবু ও বললেন- এখানকার রাজা আপনি। রায়ের নলের ডাক বন্ধ হইয়া গেল। মৃদু হাসিয়া বাইজির মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, হবে মজলিস সন্ধ্যের সময়।'

এক অসম প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে দীর্ঘ দিন বাদে আবার জলসাঘরে বাঈজির আসর বসালেন বিশ্বম্ভর রায়বাড়ির লক্ষ্মীর ঝাঁপির শেষ কড়িটির বিনিময়। যেন ভস্ম-শেষ সমাপ্তি নয় বরং লেলিহান শিখায় দিগ্বিদিক রঙিন করে এক অসাধারণ চরিত্রের বিনষ্টি। রুগ্ন প্রাণের নিরব প্রস্থান নয় একটা মর্যাদাসম্পন্ন যবনিকাপতন।

২৪.৬ অনুশীলনী

ক। রচনাধর্মী প্রশ্ন

১। জলসাঘর গল্পে 'জলসাঘর' নিজেই যেন এক চরিত্র হয়ে উঠেছে — কীভাবে তা আলোচনা করুন?

২। বিশ্বম্ভর রায় ও মহিম গাঙ্গুলীর বিরোধ গল্পের মধ্যে কীভাবে উঠে এসেছে দেখান?

৩। পুরাতন আভিজাত্য, বনেদিয়ানার প্রতি লেখকের যে অপরিসীম মমত্ব এই গল্পে প্রকাশ পেয়েছে তার পরিচয় দিন?

৪। গল্পে ধনতন্ত্রের সাথে অসম লড়াইতে জমিদারী বনেদিয়ানার পরাজয়ের মধ্যে দিয়ে লেখক যে সমকাল সচেতনতার পরিচয় রেখেছেন তার বিস্তৃত আলোচনা করুন।

৫। একদিকে সামন্ততন্ত্র অন্যদিকে নব্য পুঁজিবাদ উভয়ের মধ্যে কাকে লেখক কেন মহিমান্বিত করে দেখিয়েছেন?

খ। সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন

১। "লোকে বলিত, আমাদের রাজা উনি — বিশ্বম্ভর রায়।" — "বলিত" - এখন আর বলে না কেন?

২। "নায়েব যাবেন গাঙুলী বাড়ি লৌকুতো দিতে।" — কীভাবে মহিম গাঙ্গুলীর বাড়িতে উপহার পাঠানো হয়েছিল?

৩। "মহিম কহিল, ঠাকুরদা কোথায় দেখা করব যে!" — কাকে "ঠাকুরদা" সম্বোধন? এর কারণ কী?

৪। "বিশ্বম্ভর রায় সমঝদার আমীর লোক। গাওনা হয়ত হতে পারে।" — "গাওনা" কেমন হয়েছিল?

৫। "জলসাঘরের দরজা বন্ধ কর — জলসাঘরের - " — বিশ্বম্ভর রায় কেন জলসাঘর বন্ধ করতে বলেছিলেন?

গ। অতি-সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন

(এখানে দেওয়া অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নগুলি আগে নিজে সমাধান করবেন, পরে উত্তর সংকেতের সাথে মিলিয়ে নেবেন।)

১। বিশ্বম্ভর রায় হলেন রায়বংশের - (অ) তৃতীয়, (আ) চতুর্থ, (ই) ষষ্ঠ, (ঈ) সপ্তম পুরুষ।

২। বিশ্বম্ভর রায়ের খাস চাকর হলেন — (অ) অনন্ত, (আ) তারাপ্রসন্ন, (ই) নিতাই, (ঈ) মহিম।

৩। ছোটগিন্নী হল বা হলেন — (অ) ঘোড়া, (আ) হাতি, (ই) ধনেশ্বর রায়ের স্ত্রী, (ঈ) বিশ্বম্ভর রায়ের স্ত্রী।

৪। বাইজী এসেছিলেন — (অ) লক্ষ্ণৌ, (আ) বেনারস, (ই) এলাহাবাদ, (ঈ) দিল্লী।

৫। বিশ্বম্ভর রায় তুফানের পিঠে চেপে সেই ব্রাহ্মমুহূর্তে পৌছে গিয়েছিলেন — (অ) কুসুমডিহিতে, (আ) লাট কীর্তিহাটে, (ই) লাট ১০২, (ঈ) শ্যামপুর।

উত্তর সংকেত

গ। ১। - (ঈ)

গ। ২। - (অ)

গ। ৩। - (আ)

গ। ৪। - (অ)

ঘ। ৫। - (আ)

২৪.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১। বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর, *তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ*, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৬, কলকাতা।

২। মুখোপাধ্যায় অরুণকুমার, "*কালের পুত্তলিকা, বাংলা ছোটগল্পের একশ*" বিশ বছর/১৮৯১ — ২০২১, দে'জ পাবলিশার্স, চতুর্থ সংস্করণ ২০১১, কলকাতা।

৩। নিতাই বসু, *তারাশঙ্করের শিল্পিমানস*

৪। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, *বাংলা গল্প বিচিত্রা*

একক-২৫ ❑ ছোটগল্প : ফসিল — সুবোধ ঘোষ

গঠন

২৫.১ উদ্দেশ্য
২৫.২ লেখক ও তার সাহিত্যরীতি পরিচয়
২৫.৩ প্রস্তাবনা
২৫.৪ গল্প বিশ্লেষণ
২৫.৫ সারাংশ
২৫.৬ অনুশীলনী
২৫.৭ নির্বাচিত পাঠ্যগ্রন্থ

২৫.১ উদ্দেশ্য

- এই গল্পে ব্যক্তিমানুষ ও সমাজ-অর্থনীতির বাধার বিরুদ্ধে লড়াই কীভাবে আবর্তিত হয় তার পরিচয় পাবেন।
- জীবনের অভিজ্ঞতা, সামাজিক পরিবেশ, অর্থনীতির চাপ ব্যক্তিমানুষের মূল্যবোধকে ভেঙে চুরমার করে দেয়।
- মানুষের লোভ-লালসা না তার আদর্শ ও মুল্যবোধ জীবনের প্রধান পাথেয় এই গল্পে লেখক তার অনুসন্ধান করেছেন।

২৫.২ লেখক ও তার সাহিত্যরীতি পরিচয়

সুবোধ ঘোষ (জন্ম: ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯০৯, হাজারিবাগ — মৃত্যু: ১০ই মার্চ ১৯৮০, কলকাতা)

বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা নিয়ে বাংলা সাহিত্যে সুবোধ ঘোষ এলেন যুদ্ধের সময়। ১৯১০ এ হাজারীবাগে তার জন্ম, এখানেই ছেলেবেলায় তিনি বিখ্যাত দার্শনিক ও বহুভাষাবিদ ঋষিতুল্য মহেশ চন্দ্র ঘোষের সাক্ষাৎ লাভ করেন। তার সহায়তায় তার গ্রন্থাগারে পড়াশোনার সুযোগ পেয়ে তিনি নিজেকে তৈরি করে নিয়েছিলেন। প্রথম জীবনে নানা রকমের পেশার সাথে যুক্ত থেকেছেন। কখনো কখনো সার্কাসে কখনো বাসের কন্ডাকটর। এই মানুষটি দেশ-বিদেশের বহু জায়গা ঘুরেছেন। ১৯৪০ সালে আনন্দবাজার পত্রিকার কর্ণধার সুরেশচন্দ্র মজুমদার বাবুর আমন্ত্রণে আনন্দবাজার পত্রিকায় এসে যোগ দেন।

সনতারিখ মিলিয়ে তাঁর পূর্ণাঙ্গ জীবনপঞ্জি রচিত হয়নি। হাজারিবাগের সেন্ট কলম্বাস কলেজের ছাত্র ছিলেন তিনি। বিশিষ্ট দার্শনিক ও গবেষক মহেশ ঘোষের লাইব্রেরিতে পড়াশোনা করতে করতে তার বিদ্যাচর্চা বহুমাত্রিক বিকাশ লাভ করে। প্রত্নতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, এমনকী সামরিক বিদ্যায়ও তাঁর যথেষ্ট দক্ষতা ছিল। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাশ করে হাজারিবাগ সেন্ট কলম্বাস কলেজে ভর্তি হয়েও অভাব অনটনের জন্য পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে জীবন

জীবিকার তাগিদে কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়েছিল। বিচিত্র জীবিকার সঙ্গে যুক্ত ছিল তাঁর জীবন। হেন কাজ নেই তাঁকে করতে হয়নি সংসারের ঘানি টানার প্রয়োজনে। পড়াশোনা ছেড়ে কলেরা মহামারির আকার নিলে বস্তিতে টিকা দেওয়ার কাজ নেন। কর্মজীবন শুরু করেন বিহারের আদিবাসী অঞ্চলে 'লাল মোটর কোম্পানির' বাসের কন্ডাক্টর হিসেবে। এর পর সার্কাসের ক্লাউন, বোম্বাই পৌরসভার চতুর্থ শ্রেণির কাজ, চায়ের ব্যবসা, বেকারির ব্যবসা, মালগুদামের স্টোর কিপার ইত্যাদি কাজে তিনি তাঁর প্রথম জীবনের অনেকটা অংশ ব্যয় করেন। বহু পথ ঘুরে ত্রিশ দশকের শেষে আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয় বিভাগে সহকারী পদে যোগ দেন। ১৯৪৬ এর ১৬ আগস্ট উত্তর দাঙ্গা বিধ্বস্ত নোয়াখালি থেকে তিনি গান্ধীজির সহচর থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন দাঙ্গা এবং দাঙ্গা-উত্তর কালপর্বে সাম্প্রদায়িকতার হিংস্রতাকে। ১৯৪০-এ অনামী সঙ্ঘ (বা চক্র) নামে তরুণ সাহিত্যিকদের বৈঠকে বন্ধুদের অনুরোধে সুবোধ ঘোষ পর পর দু'টি গল্প 'অযান্ত্রিক', এবং 'ফসিল' লেখেন যা বাংলা সাহিত্যে অসাধারণ আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। সুবোধ ঘোষের প্রথম গল্প অযান্ত্রিক, এর পর ফসিল। তাঁর আর একটি বিখ্যাত গল্প 'থির বিজুরি'। শুধুমাত্র গল্পকার হিসাবেই সুবোধ ঘোষ অন্বেষু শিল্পী ছিলেন না। সুবোধ ঘোষ যে উপন্যাস রচনাতেও ঋদ্ধ তার যথার্থ প্রমাণ 'তিলাঞ্জলি' (১৯৪৪)। সুবোধ ঘোষের ঔপন্যাসিক হিসাবে প্রথম প্রভিজ্ঞার স্বাক্ষর 'তিলাঞ্জলি'। এ উপন্যাসে তিনি রাজনৈতিক মতাদর্শকে উপস্থাপনে প্রয়াসী হয়েছেন। কংগ্রেস সাহিত্য সংঘের মতাদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে এই উপন্যাসে। মনান্তরের পটভূমিকায় রচিত এ উপন্যাসে তৎকালীন কংগ্রেসের প্রতিপক্ষ 'জাগৃতি সংঘ'র জাতীয়তা বিরোধী চরিত্রের মতবিরোধের রূপরেখা অঙ্কনে সচেষ্ট হয়েছেন তিনি এই উপন্যাসে।

২৫.৩ গল্পপাঠের প্রস্তাবনা

গল্পের প্রথম প্রকাশ : ফসিল (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ)

সুবোধ ঘোষ বাংলা ছোটগল্পধারায় নিয়ে এলেন অর্থনীতি ও রাজনৈতিক চেতনা, প্রখর বাস্তব জ্ঞান ও অভ্রান্ত জীবনবোধ। আনন্দবাজার পত্রিকা বার্ষিক দোল সংখ্যা ১৯৪০এ প্রথম প্রকাশিত হয় 'অযান্ত্রিক' গল্প। আনন্দবাজারেই তারপরের গল্প 'ফসিল' প্রকাশিত হয় ওই একই বছরে। এই গল্প পড়ে সেদিনের পাঠক চমকে উঠেছিল। গল্প দুটির গ্রন্থণ নৈপুণ্য ও শিল্পরীতি পাঠককে অবাক করে দেয়।

গল্পে লেখক প্রত্যক্ষের আড়ালে জীবনের যে জটিলতা, রহস্যময়তা, স্ববিরোধিতা থাকে তা জানতে চেয়েছিলেন। গল্পকার হিসেবে তিনি চরিত্রের প্রতি পক্ষপাত শূন্য, আবেগ বিষয়ে নির্বিকার, শিল্পী হিসেবে নিরাসক্ত, পরিবেশ সচেতন, বিজ্ঞান বুদ্ধি সচেতন। তিনি তাৎক্ষনিক থেকে চিরায়ত সমস্ত বিষয়ে প্রত্যক্ষের অন্তরালে জটিলতার আবিষ্কারে ও তার স্বরূপ সন্ধানে ব্যাগ্র। তিনি হৃদয়াবেগ নির্ভর করে গল্প লেখেন নি, শহুরে মধ্যবিত্ত মানসিকতায় মূলধন করেও গল্প লেখেন নি। কুচক্রী অন্ধ নিয়তির লীলা ও শয়তানি শক্তি সম্বন্ধে অবহিত। তার গল্পগুলিকে সামাজিক বিশ্লেষণ সচেতন ও তার ক্রমবিবর্তন ঘটে। লেখক তার চরিত্রের সামাজিক পটভূমি ও অর্থনীতির ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন, সামাজিক-অর্থনৈতিক শ্রেণীচরিত্র সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। জীবনের বিকৃতির ও ভণ্ডামীর মূলে যে সামাজিক ব্যবস্থা সক্রিয় সক্রিয় তার সম্পর্কে সচেতন। ব্যক্তিমানুষ ও সমাজ-অর্থনীতির বাধার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রয়াসকে তিনি অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। অবশ্যই তার সবথেকে বড় বৈশিষ্ট্য মধ্যবিত্ত সুলভ রোমান্টিকতা থেকে মুক্ত। লেখক নিজের অভিজ্ঞতায় জানেন — জীবনের অভিজ্ঞতা, সামাজিক পরিবেশ, অর্থনীতির চাপ

ব্যক্তিমানুষের মূল্যবোধকে ভেঙে চুরমার করে দেয়। তাই শরৎচন্দ্রের মত সে মূল্যবোধে ব্যক্তির অটল প্রতিষ্ঠায় তার আস্থা নেই।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর সাহিত্যিকেরা আর রোমান্টিক নয় বরং দলিত-পিষ্ট মানুষের নিত্যদিনের লড়াইকে সাহিত্যে তুলে আনছিলেন। এই সময়ের লেখক-বুদ্ধিজীবী-দার্শনিক-অর্থনীতিক সকলে বিশ্বাস করতে চাইছিলেন পুরনো সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার রাজা-মহারাজা-সম্রাট এদের দিন অস্তমিত। এরা সাধারণ মানুষের পাশে থাকেনি বরং তাদের মাথার উপর পা রেখে শোষন করেছে। সমাজ-অর্থনীতির বিশ্লেষণের অন্যতম বিজ্ঞানমনস্ক মতাদর্শ হল সমাজতান্ত্রিক মতবাদ। পৃথিবীর একের পর দেশ এই আদর্শ গ্রহণ করেছে। যেখানে সাম্যের কথা বলেন কার্ল মার্কস। তিনিই প্রথম দেখান আমাদের সমাজ-অর্থনীতি ব্যবস্থা সময়ের সাথে পাল্টেছে। তার দেখান যুক্তি অনুসারে আমরা বুঝি, সামন্ততান্ত্রিক রাজা-মহারাজা ব্যবস্থা যতই লর্ড কর্নওয়ালিসের ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুসারে হোক না কেন — পুঁজিবাদের উত্থানকে রোধ করতে পারবে না। খনি মালিকের সেই নব্য পুঁজিবাদের প্রতিভূ। রাজ্যের প্রজারা কার অধীন — রাজার কৃষক-বেগার খাটা মুনিষ — না কি খনি মালিকের খাদান শ্রমিক — দুইয়ের কাছেই মুনাফা বৃদ্ধিতে এরা অপরিহার্য। সংঘাত বেঁধেছে — সামন্ততন্ত্র ও পুঁজিবাদের মধ্যে। গত শতাব্দীতে পৃথিবীর নানা প্রান্তে এই সংঘাত আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। তবে একটা ক্ষেত্রে এই দুই ক্ষমতাধর সহমত — কৃষক-শ্রমিক পীড়ন। এই একটি ক্ষেত্রে তারা প্রয়োজনে একজোট হয়ে একে অপরের স্বার্থ দেখেছে। আমদের পাঠ্যগল্প 'ফসিল' এমনই এক বেদনাদীর্ণ নিস্ফল লড়াইয়ের দলিল।

২৫.৪ গল্প বিশ্লেষণ

নেটিভ স্টেট অঞ্জনগড়ের পরিচয় দানের মধ্যে দিয়ে গল্পের সূত্রপাত, 'নেটিভ স্টেট অঞ্জনগড়; আয়তন কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে -আট বর্গমাইল। তবুও নেটিভ স্টেট, বাঘের বাচ্চা বাঘই।' অঞ্জনগরে যে শাসন চলে তাহলে লাঠিতন্ত্র, মহারাজ অরাতিদমন, আগে বিশুদ্ধ শাস্ত্রীয় প্রথায় অপরাধীকে শূলে চড়ানো হত এখন সেটা আর সম্ভব নয়। রাজ্যে প্রজার থেকে শাসনতন্ত্রের লোক যেন বেশি, সরকার, আমলা, পাইক, বরকন্দাজ, লাঠিয়াল, জমাদার, মন্ত্রী-সান্ত্রি যত, তার তুলনায় মনে হয় এই রাজ্যে প্রজারাই কম। যারা আছে তারাও প্রতিনিয়ত রাজার ভয়েই অস্থির। অঞ্জনগড় রাজ্যের কুর্মি ও ভিল প্রজারা মোটেও সুখে ছিল না। সামন্তব্যবস্থার অত্যাচারে অনেকেই অন্য রাজ্যে পাড়ি দিয়েছে। হয় কয়লা খনি অথবা চা-বাগানের মজুর হিসাবে অথবা মরিশাসের চিনির কাজে চলে গেছে। যারা গেছে তারা আর কখনো ফিরে আসতেও রাজি নয়। একদিকে ব্রিটিশ শাসকের প্রতাপ আর আরেকদিকে প্রজাদের রাজ্য ছেড়ে চলে যাওয়া সামন্তব্যবস্থা এমনিতেই ভেঙ্গে পড়েছিল। রাজ্য চলছিল লাঠিতন্ত্রের উপরেই। প্রজাদের চিড়ে বিলি হোক বা জঙ্গলের কাঠ কাটা বা ফসল জোর করে কেড়ে নেওয়া সবই হত লাঠির ঘায়ে। মহারাজের নেশা ছিল পোলো খেলা, খেলার জন্য বিদেশ থেকে আমদানি করা ঘোড়ার প্রয়োজন হতো খোরাক। বিদেশি ঘোড়াদের জন্য রুক্ষ ঊষর জমিতে প্রাণপাত করে ফলানো ফসল লাঠির জোরে কেড়ে আনা হতো।

তখন এলেন মুখার্জীবাবু ল'এজেন্ট হয়ে। তরুণ আদর্শবাদী মুখার্জি কুর্মি প্রজাদের উপর অত্যাচার বন্ধ করলো। কেমনভাবে রাজ্যের সমৃদ্ধি ও আর্থিক স্থিতাবস্থা বজায় থাকে তার সন্ধান করতে চেষ্টা করল। তার মধ্যে তখনো, 'ছেলেবেলার হিস্ট্রি পড়া মার্কিনী ডেমোক্রেসির স্বপ্নটা আজও তার চিন্তার মধ্যে পাকে পাকে জড়িয়ে আছে বয়সে অপ্রবীণ হলেও সে অত্যন্ত শান্ত বুদ্ধি।' মুখার্জি তার সমস্ত প্রতিভা দিয়ে স্টেটের উন্নতি করার চেষ্টা করলো,

মানুষেরা বুঝতে পারল যে তাদের এই নতুন ল'এজেন্ট তিনি যেমন কড়া তেমনি দরদি। তার নির্দেশে লাঠিবাজি বন্ধ হল। একদিন ভূতাত্ত্বিক এনে আবিষ্কার করলেন অঞ্জনগড়ের গ্রানাইটের মাটির নিচে রয়েছে অ্যাসবেস্টস আর অভ্র। রাতারাতি অঞ্জনগড়ের হাল বদলে গেল। খনি মার্চেন্টদের অঞ্জনগড়ের জমি ইজারা দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা এল অঞ্জনগড়ের হাতে। পুরনো ধসেপড়া কেল্লার পাশে তৈরি হল হালফ্যাশনের নতুন প্যালেস, মহারাজার গ্যারেজে এল দামি দামি বিদেশী গাড়ি ও আস্তাবলে এল দামি দামি ঘোড়া। আস্তে আস্তে খনি অঞ্চলের চেহারাই পাল্টে গেল। বসল কুলিদের বস্তি, তৈরি হলো রাস্তা, এল বিজলী বাতি। মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্রের প্রতিস্পর্ধী হিসাবে গড়ে উঠলো আধুনিক যুগের শিল্প সভ্যতার প্রতিভূ খনি অঞ্চল। এতদিন যে কুর্মি প্রজারা জমি আঁকড়ে ধরে চাষ করত তারাই এখন হল খনির মজুর। তারা এখন, 'নগদ মজুরি পায়, শুয়োর বলি দেয়, হাড়িয়া খায়, আর নিত্য সন্ধ্যায় মাদল ঢোল পিটিয়ে খনি অঞ্চল সরগরম করে রাখে।'

শিল্পবিপ্লবের আদিযুগে ইংল্যান্ডে যেমন বেঁধেছিল হুইগ ও টোরি দলের লড়াই এখানেও তেমনি দেখা দিল। একদিকে ছিল প্রাচীন লর্ড ও ব্যারন, যারা ছিল জমির মালিক। আর অন্যদিকে শিল্পপতিরা যাদের প্রয়োজন ছিল মজদুর। সাধারণ প্রজা যারা তারা সার্ফ বা ভূমিদাস থাকবে নাকি শিল্পপতিদের মজদুর হবে এই বিরোধ দেখা দিয়েছিল। অঞ্জনগড়ে সে ইতিহাসের ব্যতিক্রম ঘটলো না। কুর্মি চাষিরা রাজার পোলো গ্রাউন্ড, প্রাসাদ, বাগানে বেগার দেওয়ার থেকে কুলি লাইনে মজুরি করাকে বেশি শ্রেয় বলে মনে করল। দলে দলে জমি ছেড়ে দিয়ে গিয়ে উঠল মাইনিং সিন্ডিকেটের কুলি ধাওড়ায়। অন্যদিকে মুখার্জীও রয়েছে তাঁর বিখ্যাত ইরিগেশন স্কিমের পরিকল্পনায় বুঁদ হয়ে। বরাকর নদীর জল দিয়ে গোটা অঞ্জনগড়কে করে তুলবে শস্য শ্যামল সবুজ।

সিন্ডিকেটের মালিকেরা চায়না যে রাজ্যের কৃষি কাজের অগ্রগতি হোক তাহলে তাদের মজদুর টান পড়বে যে। ইতিমধ্যে মরিশাস থেকে ফিরে এসেছে বৃদ্ধ দুলাল মাহাতো। সে একদিকে রাজা আর একদিকে সিন্ডিকেট এই দুইয়ের সঙ্গে কুর্মিদের হয়ে সমানে দাবিদাওয়া জানায়। দুলালের বক্তব্য, 'ভাইসব এই বুড়োর মাথায় যটা সাদা চুল দেখছ, ঠিক ততবার সে বিশ্বাস করে ঠকেছে। এবার আর কাউকে বিশ্বাস নয়। সব নগদ নগদ। এক হাতে নেবে তবে অন্য হাতে সেলাম করবে।' সে কুর্মিদের হয়ে খনির মালিকের সাথে মজুরির রেট, পেমেন্ট পাওয়া, ছুটি, ভাতা, ওষুধ এসবের ব্যবস্থা করত। আবার অন্যদিকে মহারাজের কাছে জানাত কুর্মিরা আর ফসল নয় এবার থেকে নগদে ন্যায্য খাজনা দেবে, আর এবারের জন্য জঙ্গল থেকে বিনা পারমিটে কাঠ কাটার অনুমতি চাইতো। দুলাল মাহাতো তৈরি করেছিল কর্মী-শ্রমিক মানুষদের মণ্ডল। আর কোনো কুর্মি রাজার বাগান, পোলো লনে বেগার খাটতে আসবে না। মহারাজা নির্দেশ দিলেন প্রজাদের কেউ যেন আর খনিতে কাজ করতে না যায়। মহারাজা নির্দেশ দিলেন সিন্ডিকেটকে তার অনুমতি ছাড়া যেন কাউকে মজুর হিসেবে না নেওয়া হয়। দুলাল মাহাতো জানাল বিনা মজুরিতে তারা কাজ করবে না আর নগদ মজুরি পেলে খনিতে কাজ করবে। সিন্ডিকেট একই রকম উত্তর দিলো নিরানব্বই বছর বাদে যখন চুক্তি শেষ হবে তখন তারা রাজার কথা মেনে নেবে। বংশপরম্পরায় সামন্ততন্ত্রের রাজা মহারাজা, তাদের কাছে এ অপমান অসহ্য। 'মুখার্জি এরই মধ্যে দেখে ফেলেছে মহারাজার চোখ ভেজা ভেজা। সিংহের চোখে জল। এর পিছনে কতখানি অন্তর্দাহ লুকিয়ে আছে তা স্বভাবত শশক হলেও মুখার্জি আন্দাজ করে নিল।' মহারাজার উক্তিতে খেয়াল করার মত, 'তবে পলিসি বদলাতেই হবে, একটু কড়া হতে হবে। ব্যাঙের লাথি আর সহ্য হয়না মুখার্জি।'

মহারাজা বনাম সিন্ডিকেটের লড়াইটা হঠাৎ থেমে যায়। চৌদ্দ নম্বর পিটছে নব্বই জন পুরুষ আর মেয়ে কুর্মি মজদুর চাপা পড়েছে। আর অন্যদিকে মহারাজার সম্মান রক্ষা করতে গিয়ে রিজার্ভ ফরেস্টে বিনা টিকিটে কুর্মিরা

লাকরি কাটছিল বলে ফৌজদার গুলি চালিয়েছে - ঘোড়া নিমের জঙ্গলে পড়ে আছে বাইশটা লাশ। মাইনিং সিন্ডিকেট আর মহারাজা উভয়েরই মহা সঙ্কট। এই সঙ্কট মুহূর্তে দুই শত্রু হাত মেলালো। মুখার্জির পরামর্শে সবার আগে গিয়ে দুলাল মাহাতো কে বন্দি করা হলো। প্যালেসের ঘরে বসল মহারাজা-গিবসন-ফৌজদার-ম্যাককেনার গভীর পরামর্শসভা। কুর্মিদের নেতা দুলাল মাহাতোকে খুন করা হয়। ঘোড়ানিমের জঙ্গলে থাকা বাইশটা লাশ ও দুলাল মাহাতোর মৃতদেহ গভীর রাত্রে গাড়িতে করে নিয়ে গিয়ে 'ক্ষুধার্ত খনির গহ্বরের মুখে লাশগুলি তুলে নিয়ে দারোয়ানরা ভুজ্যি চড়িয়ে দিল।' গরিব চাষি আর মজুরের বিরুদ্ধে সামন্ততন্ত্র আর ধনতন্ত্রের বাহকেরা একজোট হয়ে জিতে গেল।

তরুণ আদর্শবাদী ল'এজেন্ট মুখার্জি সজ্ঞানে এই চক্রান্তের অংশীদার। গরিব চাষি ও মজুর বনাম ব্যবসায়ী ও জমিদারের লড়াইয়ে অনেক ক্ষেত্রেই মধ্যবিত্তরা শেষোক্ত পক্ষ নেয়। মুখার্জী ও নিয়েছে সে প্রতিবাদ করেনি মহারাজার চাকরি ছেড়ে চলে যায় নি। তবে লেখক শুধু অর্থনীতি রাজনীতি সচেতন বাস্তব লেখক নন তিনি আদর্শবাদী স্বপ্নদ্রষ্টা। তার দৃষ্টি বর্তমানকে ছাড়িয়ে চলে গেছে ভবিষ্যতের দিকে। গল্পের শেষ দুটি পরিচ্ছেদ দেখি, 'শ্যাম্পেনের পাতলা নেশা আর চুরুটের ধোঁয়ায় ছল ছল করছিল মুখার্জির চোখ দুটো।... লক্ষ বছর পরে এই পৃথিবীর কোন একটা জাদুঘরে কেন বৃদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিকের দল উগ্র কৌতুহলে স্থির দৃষ্টি মেলে দেখছে কতকগুলি ফসিল।... তারা দেখছে শুধু কতগুলি সাদা সাদা ফশিল তাতে আজকের এই এত লাল রক্তের কোন দাগ নেই।'

হতভাগ্য মজুরদের প্রতি লেখককে প্রচ্ছন্ন মমতা আমরা দেখি আত্মপ্রতারক মধ্যবিত্ত মুখার্জির লক্ষ বছর পরেকার স্বপ্নের আড়ালে। মানুষের জ্ঞানের প্রতি প্রচ্ছন্ন পরিহাস আর হতভাগ্য অত্যাচারিতের প্রতীক প্রচ্ছন্ন করুণা। তিনি এই আত্ম প্রতারক মধ্যবিত্তের দ্বিধাদীর্ণ মানসিকতার তীক্ষ্ণ সমালোচক। মধ্যবিত্তের ভন্ডামি, আত্মপ্রতারণা, গর্ব, অসূয়া, আত্মাভিমান, ভীরুতা, নীচতা, অন্যায়ের সঙ্গে আপোষের সুবিধাবাদী প্রবণতা তার লেখনীর মুখে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে।

২৫.৫ সারাংশ

বাঙালী ল-এজেন্ট মুখার্জি দেশীয় রাজ্য অঞ্জনগড় স্টেটের উন্নতির জন্য এখানে খনিজ সম্পদ উত্তোলনের ব্যবস্থা করেছিলেন। এর আগে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির এই ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্য স্থানীয় কৃষক কুর্মী ও ভিল প্রজাদের শোষন করত। এখন ব্রিটিশ খনি মালিক তাদের শোষন করে। এই দরিদ্র মানুষেরা সর্বত্রই প্রতারিত। তাদের পরিশ্রমের ফসল রাজা লাঠির জোরে কেড়ে নেয়, অথবা খনি মালিক শ্রমের বিনিময়ে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেয় না। তাই তারা বৃদ্ধ অভিজ্ঞ মাহাতোর নেতৃত্বে চেষ্টা করে নিজের ন্যায্য দাবি প্রতিষ্ঠা করতে। তারা বুঝতে পারে রাজা বা খনি মালিক কেউই তাদের বন্ধু নয়। ক্ষমতাবানের বিরুদ্ধে এই অসম লড়াইয়ের পরিণতি হয় ভয়ানক। লাকড়ি কাটতে গিয়ে ঘোড়ানিমের জঙ্গলে ফৌজদারের গুলিতে অনেকের প্রাণ যায়, আর ওদিকে খনিতে ন্যূনতম সুরক্ষা ব্যবস্থা না থাকায় ধ্বস নেমে আরও অনেকে প্রাণ হারায়। এইসবের বিরুদ্ধে যাতে প্রতিবাদ না হয় তাই মুখার্জির পরামর্শে বৃদ্ধ মাহাতোকে আটক করা হয়। পরে জঙ্গলে গুলিতে হতদের লাশ সাথে কম্বলে মোড়ান বৃদ্ধ দুলাল মাহাতোর লাশ দারোয়ানেরা খনির অতল গহ্বরে ফেলে দিয়ে সব চিহ্ন মুছে ফেলে। রাজা ও খনি মালিক এক স্বার্থে মিলে যায়। মাঝখান থেকে অহেতুক মারা গেল এই দরিদ্র মানুষেরা। অনেক অনেক বছর বাদে কোনো নৃতাত্ত্বিক এই মানুষদের ফসিল হয়ে যাওয়া করোটিতে আজকের রক্তের কোনো দাগ খুঁজে পাবে না।

২৫.৬ অনুশীলনী

ক। রচনাধর্মী প্রশ্ন

১। খনিমালিক গিবসন ও মহারাজার মধ্যে বিরোধের কারণ কী?

২। এই গল্পে বৃদ্ধ দুলাল মাহাতোর ভূমিকা কোথায়?

৩। ল'এজেন্ট মুখার্জিকে কী মহারাজা ও খনিমালিকের দলে ফেলা যায়?

৪। নেটিভ স্টেট অঞ্জনগড়ের প্রজাদের অবস্থার বর্ণনা দাও।

৫। একদিকে সামন্ততন্ত্র ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থা, তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল সাধারণ প্রজারা —এর ফলাফল কী ঘটেছিল তা গল্প অনুসারে আলোচনা করো।

খ। সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন

১। "সেই অপূর্ব অদ্ভুত শাসনের তাপে উত্যক্ত" — সেই শাসন কেমন গল্প অনুসারে তার পরিচয় দাও।

২। "আমাদের মুখার্জী আদর্শবাদী।" — তার আদর্শের একটা নমুনা দেখাও।

৩। "ব্যাঙের লাথি আর সহ্য হয় না মুখার্জী।" — মহারাজার এমন খেদোক্তি কেন?

৪। "মহারাজার কানে পৌঁছে গেছে সব।" — খনি মালিকের এমন আশঙ্কার কারণ কী?

৫। "এইবার তোমার বাঙালী ইলম দেখাও একটা রাস্তা বাতলাও।" — মুখার্জির দেখান রাস্তার ফলাফল কী হয়েছিল?

গ। অতি-সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন

(এখানে দেওয়া অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নগুলি আগে নিজে সমাধান করবেন, পরে উত্তর সংকেতের সাথে মিলিয়ে নেবেন।)

১। কুর্মিদের মণ্ডল প্রতিষ্ঠা করেছিল - (অ) মুখার্জি, (আ) মহারাজা, (ই) দুলাল মাহাতো, (ঈ) দুলাল মাহাতোর সাথে সব কুর্মি প্রজারা।

২। দুলাল মাহাতো যেখান থেকে ফিরেছে — (অ) মরিসাস, (আ) মাদাগাস্কার, (ই) কলকাতা, (ঈ) দিল্লি থেকে।

৩। নেটিভ স্টেট অঞ্জনগড়ের প্রজারা হল — (অ) কোল-ভীল, (আ) সাঁওতাল, (ই) কুর্মি, (ঈ) কুর্মি-ভীল।

৪। রাজ্য জুড়ে ইরিগেশন স্কিম করেছিল — (অ) মুখার্জি, (আ) মহারাজা, (ই) গিবসন, (ঈ) দুলাল মাহাতো।

৫। মহারাজার সাথে মাইনিং সিন্ডিকেটের চুক্তি শেষ হবে — (অ) একশ বছর বাদে, (আ) নিরানব্বই বছর বাদে, (ই) একশ দশ বছর বাদে, (ঈ) নব্বই বছর বাদে।

উত্তর সংকেত :

গ। ১। - (ঈ)

গ। ২। - (অ)

গ। ৩। - (ঈ)

গ। ৪। - (অ)

ঘ। ৫। - (আ)

২৫.৭ নির্বাচিত পাঠ্যগ্রন্থ

১। ঘোষ সুবোধ, সুবোধ ঘোষ শ্রেষ্ঠ গল্প, করুণা প্রকাশনী, ২০১৮, কলকাতা।

২। মুখোপাধ্যায় অরুণকুমার, ‘‘কালের পুত্তলিকা, বাংলা ছোটগল্পের একশ” বিশ বছর/১৮৯১ — ২০২১, দে'জ পাবলিশার্স, চতুর্থ সংস্করণ ২০১১, কলকাতা।

৩। বাংলা ছোটগল্প ও ছোটগল্পকার — ভূদেব চৌধুরী।

৪। বাংলা গল্প বিচিত্রা — নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

৫। সুবোধ ঘোষ : অযান্ত্রিক শিল্পী, উজাগর প্রকাশনা।

মডিউল-৪ (খ)

বাংলা ছোটগল্প-২

একক-২৬ ❑ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা ছোটগল্পের প্রেক্ষাপট

গঠন

২৬.১ উদ্দেশ্য

২৬.২ পটভূমি

২৬.৩ প্রশ্নাবলী

২৬.৪ গ্রন্থপঞ্জি

২৬.১ উদ্দেশ্য

বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে তিরিশ থেকে সত্তরের দশকের গল্পগুলিকে পড়তে গেলে আগে জানা প্রয়োজন তার প্রেক্ষিত, তার চালচিত্র। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বাঁক বদলগুলোকে সঠিক ভাবে চিহ্নিত না করলে সাহিত্যিক বদলগুলোকে নির্ণয় করা যাবে না কিছুতেই। সমাজ মানসে ধর্মীয় ক্রীড়ার আলো আঁধারটুকুকে না দেখতে পেলে সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা ও তা থেকে উত্তরণের প্রচেষ্টাগুলো অহেতুক বলে বোধ হবে। আন্দোলন, প্রচেষ্টা ও তার পৈশাচিক প্রতিরোধগুলোর খবর না রাখলে গল্পের বাস্তব আমাদের কাছে অর্ধসত্য হয়ে থেকে যাবে। তাই পরবর্তী এককগুলোর গল্পপাঠের সলতে পাকানো হয়েছে এই এককে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'মহানগর', সমরেশ বসুর 'আদাব' আর মহাশ্বেতা দেবীর 'দ্রৌপদী' গল্পের এবং এককথায় তিরিশ থেকে সত্তরের দশকের বাংলা গল্পসাহিত্যের পটভূমিটি নির্মাণ করাই আলোচ্য এককের মূল উদ্দেশ্য। এই এককে বাংলা ছোটগল্প-২ গুচ্ছের অন্তর্ভুক্ত গল্পগুলির একটি সাধারণ পরিপ্রেক্ষিত তুলে ধরা হয়েছে। এই প্রেক্ষাপট সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হলে আধুনিক বাংলা গল্পের পাঠগ্রহণ সুবিধা হবে।

২৬.২ পটভূমি

''বড় রকমের যুদ্ধ যেমন অনেক কিছু ধ্বংস করে, ভাঙচুর ঘটায়, তেমনি আবার নতুন ভাবনাচিন্তারও জন্ম দেয়।। পুরনো ব্যবস্থার জীর্ণ ভিত চূর্ণ হয়ে যায়, নতুন আশা আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর এইরকম একটা অবস্থার জন্ম হয়েছিল। ইউরোপের দীর্ঘকালের নৈতিক একাধিপত্যে বড় রকমের চিড় ধরল। জাপানের মর্যাদা বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি পেল। মহাযুদ্ধের ক্ষেত্র প্রশান্ত মাহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়ায় এক নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হল।

ব্রিটিশ শাসকরা কখনওই চায় নি যে, ভারত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিজস্ব সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করুক। কিন্তু মহাযুদ্ধের ফলে অনেক কিছু ওলট পালট হয়ে গেল। যুদ্ধের শরিক হিসেবে ভারত ভার্সাইয়ের সন্ধির অন্যতম স্বাক্ষরকারীর মর্যাদা পেল এবং সদ্য স্থাপিত জাতিসঙ্ঘের (লিগ অব নেশনস) এক আদি সদস্যরূপে পরিগণিত হল। জাতিসঙ্ঘের অধিবেশনে ভারত নিয়মিত প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার লাভ করল। ওয়াশিংটন

কনফারেন্স এবং বিশ্ব আর্থিক কনাফারেন্সের মতো আন্তর্জাতিক সভায় ব্রিটিশ ভারতের প্রতিনিধির উপস্থিতি তাৎপর্যপূর্ণ ছিল সন্দেহ নেই। মহাযুদ্ধের পর সরকারি এবং বেসরকারি ভাবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র হলেও ভারতের একটা ভূমিকা তৈরি হল, ১৯১৪ সালের আগে যা ছিল অকল্পনীয়।" (প্রবন্ধ- 'শুরু হল গণ আন্দোলনের যুগ' , প্রাবন্ধিক - নীলমণি মুখোপাধ্যায়, গ্রন্থ- সাত দশক সমকাল ও আনন্দবাজার)

তবে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিধ্বংসী প্রভাব অন্য বিপর্যয়ও ডেকে আনে। তার পরোক্ষ প্রতিক্রিয়ায় বাংলার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে কালান্তরের আভাস দেখা যায়। দীর্ঘদিনের প্রচলিত জীবস্রোতে হঠাৎ ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়। আর সেই আবর্তে পড়ে পুরনো মূল্যবোধ যত ঘাসের টুকরোর মত ভেসে যায়। সংশয়, জিজ্ঞাসা ও অর্থনৈতিক হতাশা উদ্যত হয়ে ওঠে মনের মধ্যে। কথাসাহিত্যে আসে নতুন যুগ। উল্লেখ্য প্রাবন্ধিক প্রমথ চৌধুরীর মন্তব্য- গত যুদ্ধের প্রবল ধাক্কায় সামাজের কি আর্থিক, কি রাজনৈতিক সকল ব্যবস্থারই গোড়া আলগা হয়ে গেছে। ('রায়তের কথা'র টীকা , ১৯২৬)

যুদ্ধ শেষ হলে এল আরেক অভিঘাত — মন্টেগু চেমসফোর্ড সংস্কার পরিকল্পনা (১৯১৯)। প্রত্যেক প্রদেশকে নিজের ভার নিজে বহন করতে হবে। তাছাড়া, প্রাদেশিক আয়ের একটা বিরাট অংশ ভারতের ঔপনিবেশিক সরকারকেও দিতে হবে। ফলে অর্থনৈতিক চাপে পিষ্ট হবার জোগাড়। এই আর্থ — রাজনৈতিক হতাশার পটভূমিতে চালু হল — নিষ্ঠুর দমননীতি মূলক রাওলাট আইন। তারই প্রতিবাদে জালিওয়ালাবাগের প্রতিবাদী জনতার বিক্ষুব্ধ সমাবেশ এবং পরিণতিতে শাসকের হাতে বীভৎস হত্যাকাণ্ড।

অন্যদিকে গান্ধীজী খিলাফত আন্দোলন সর্বান্তকরণে মেনে নিলেন। ভারতের ইতিহাসে সূচিত হল নতুন অধ্যায়। ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দের ২২ জুন খিলাফত কমিটি বড়লাটকে লিখিত ভাবে জানাল - ১ আগস্টের মধ্যে তুরস্ক সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান না পেলে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করবে। একই দিনে গান্ধীজীও বড়লাটকে খিলাফতের যৌক্তিকতা সমর্থন করে একটা চিঠি লেখেন। জুলাইয়ের এক তারিখে হিন্দু মুসলমানের তরফ থেকে এক চরমপত্র পাঠালেন বড়লাটকে। কলকাতাতে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হওয়ার আগেই খিলাফতিরা অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা করে দেন। রাজনীতির সঙ্গে ধর্মীয় ব্যাপারের এই সংযোগ অনেকের কাছেই সেদিন দুর্বোধ্য ছিল। অধিকাংশ মানুষই এর সরল অর্থটা ধরে নিয়েছিল — খিলাফত সরকার বিরোধী আন্দোলন। ওদিকে গান্ধীজী অনুভব করেছিলেন — খিলাফত আন্দোলনই পারে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ঐক্যের সেতু নির্মাণ করতে। বাস্তবিকই হিন্দু- মুসলমান ঐক্য প্রচেষ্টা ছিল এই পর্বের সবচেয়ে বড় ঘটনা। ১৯২০-র সেপ্টেম্বরে কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে কংগ্রেস আনুষ্ঠানিক ভাবে খিলাফত কমিটির অসহযোগ নীতি মেনে নিল। মেনে নিল গান্ধীজীর অবিসংবাদী নেতৃত্ব।

ধারাবাহিক শ্রমিক ধর্মঘট ছিল এই পর্বের আরেক বিশিষ্টতা। ১৯২১-এ অসহযোগ আন্দোলনের ফলস্বরূপ দেশের বিভিন্ন জায়গায় চারশো হরতাল অনুষ্ঠিত হল। জড়িত ছিলেন প্রায় পাঁচ লাখ শ্রমিক। অসমের চা-বাগানের শ্রমিকেরা, অসম-বেঙ্গল রেলওয়ে এবং স্টীমার কোম্পানীর কর্মচারীরা এরকম বহু উদাহরণ টানা যায়।

১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে দেশ যখন অসহযোগ আন্দোলন নিয়ে উচ্ছ্বসিত রবীন্দ্রনাথ ইউরোপ আমেরিকা ভ্রমণ থেকে ফিরে এসে লিখলেন 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধ — গান্ধীজীর অসহযোগ নীতির প্রথম উল্লেখযোগ্য সমালোচনা। অসহযোগের উৎসাহী সমর্থক শরৎচন্দ্র 'শিক্ষার বিরোধ' প্রবন্ধ লিখে রবীন্দ্র বক্তব্যের প্রতিবাদ করলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর মতামত আরো স্পষ্ট ভাবে জানালেন 'সত্যের আহ্বান' প্রবন্ধে। ১৯২১-এর অক্টোবরে 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় 'সত্যের আহ্বান'-এর অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ১৩ অক্টোবর 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'তে 'মহাপ্রহরী' শিরোনামের

সম্পাদকীয় প্রবন্ধে তার আবেগময় উত্তর দিলেন। উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথ তাঁর সত্যের আহ্বান' প্রবন্ধে গান্ধীজীর অসহযোগ নীতি, চরকা চালানো, কাপড় পোড়ানো ইত্যাদির তীব্র সমালোচনা করেছিলেন ঠিকই কিন্তু একই সঙ্গে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধার পরিচয় রাখেন। সমকালীন সাহিত্যে অবশ্য চরকা এবং খদ্দরের প্রতি বাঙালির কপটতার পরিচয়ও পাওয়া যায়। ভারতী গোষ্ঠীর এক বিশিষ্ট কবির 'বাঙলার খদ্দর' শীর্ষক কবিতায় কিছুটা দেখা যেতে পারে-

" ঘর ঘর ঘর ঘোরাও চরকা
ছেয়ে ফেল দেশ খদ্দরে
বিলাতী পণ্য অশুচি ঘৃণ্য
ছুঁয়ো না ইতরে ভদ্দরে
সবাই মিলে এই কথা বলে
নাচরে বাঙালী ধিনতাধিনচালাকিতে কর কার্য হাসিল,
কথা কয়ে কর দেশ স্বাধীন"

প্রথম মহাযুদ্ধের আগে থেকেই মননে সৃজনে পালা বদলের হাওয়া বইতে শুরু করে। মনে পড়ে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসভায় ভার্জিনিয়া উলফের সেই বিখ্যাত উক্তি — "On or about December ১৯১০, Human character changed."। ডিসেম্বর ১৯১০ থেকেই পশ্চিমি চিত্রকলায় বস্তুনিষ্ঠতার বদলে আত্মপ্রকাশ করল Post- impressionism এর মন্ময়ী প্রবণতা। 'যুদ্ধকালীন চেতনার ছায়া' নিয়ে যুদ্ধের আগেই হাজির হল — মার্সেল প্রুস্তের ফরাসি উপন্যাস 'Du Cote de Chez Swann' (১৯১৩)। ১৯১৫তে প্রকাশ পেল ডরোথি রিচার্ডসনের 'Pointed Roofs', ১৯১৬-তে জেমস জয়েসের 'The Portrait of the Artist as a Young Man'। ওদিকে ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্ব সংক্রান্ত বিখ্যাত বইগুলোর ইংরেজি অনুবাদ শুরু হল। ১৯১৩-তে 'The Interpretation of Dreams', ১৯১৪-তে 'The Psychology of Everyday Life'। সাধারণ মানুষের যৌন সংক্রান্ত নৈতিকতার বোধে ভাঙন দেখা দিল। ব্যক্তির খণ্ডিত বিচ্ছিন্ন সত্তার উপলব্ধি উঠে এল পদার্থ বিদ্যার অনু-পরমাণু সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনের প্রভাবে। দর্শন ও নৃতত্ত্বের জগতেও গুরুতর পরিবর্তন হল।

১৯১৭-র রুশ বিপ্লব কেবল বাংলা নয়, সারা পৃথিবীর যুবসমাজে এক আলোড়ন তৈরি করে। মার্কসের সাম্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শ মধ্যবিত্ত নেতিবাদী মানসে নতুন প্রত্যয়ের আভাস এনে দেয়। সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা দানা বাঁধতে থাকে। ১৯১৯ থকেই এদেশে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের নেতৃত্বে সাম্যবাদ প্রচার লাভ শুরু করে। ১৯২৯-এ কমিউনিস্ট বিরোধী মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় পার্টির প্রভাব দেশের ভিতরে আরো ছড়িয়ে পড়ে। শ্রমিক- কৃষক জীবনের সমস্যাকেন্দ্রিক পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে- যেমন- 'সংহতি', 'লাঙল', 'গণবাণী', 'গণশক্তি' ইত্যাদি।

১৯২৯-এর অক্টোবর মাসে হঠাৎ বিণা মেঘে বজ্রপাতের মত নেমে এল মন্দা। মুহূর্তের মধ্যে আঘাত ছড়িয়ে পড়ল নিউইয়র্ক থেকে টোকিয়োর বাজারে। খাজনা, কর, সুদের হার বাড়ল ভারতে। পাট, তুলো, তৈলবীজ, প্রভৃতি কৃষিপণ্য মার খেল। শিল্পের আভ্যন্তরীণ চাহিদা কমল। আর ক্রমাগত শ্রমিক আন্দোলনে জোগানও ব্যাহত হল। মধ্যবিত্তের আর্থিক অস্তিত্ব বিপন্ন হল। এই বছরেই ৩১ ডিসেম্বর, পূর্ণ স্বরাজের প্রতিজ্ঞা নেয় কংগ্রেস। ১৯৩০-এর ১২ মার্চ সারা ভারত জুড়ে শুরু হল বৃহত্তর অহিংস গণ সংগ্রাম। গান্ধীজীর নেতৃত্বে আইন অমান্য

আন্দোলনে উত্তাল হয়ে ওঠে সমস্ত দেশ। রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেতে মরিয়া তখন সকলেই। পাশাপাশি উল্লেখ্য, ১৯৩০-এর এপ্রিলে চট্টগ্রামের দুঃসাহসিক সশস্ত্র অভিযান। নেতৃত্বে মাস্টারদা সূর্য সেন। ত্রিমুখী অভিযানের লক্ষ্য- অস্ত্রাগার, পুলিশ ব্যারাক, ও টেলিগ্রাফ অফিস। সংকল্প এবং দুর্জয় সাহসিকতায় নিউ ভায়োলেন্স পার্টি ও চট্টগ্রাম উজ্জ্বল হয়ে ওঠে ইতিহাসের পাতায়।

আর্থ-রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার পাশাপাশি ভারতীয় সংস্কৃতির তটে আছড়ে পড়ল আরো অনেক ঢেউ — একের পর এক বহু পশ্চিমি মতবাদ — ''প্রায় এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করতে হয় জড়বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আইনস্টাইনের সাধারণ ও বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ, ও জীব বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বের্গসঁর সৃষ্টিশীল অভিব্যক্তিবাদ; ফ্রেজার মর্গ্যান প্রভৃতির নৃতত্ত্ব; ফ্রয়েড, অ্যাডলার ও ইয়ুং-এর মনস্তত্ত্ব; শেষে সার্ত্র —র মাধ্যমে অস্তিত্ববাদ। এসব তত্ত্ব একসঙ্গে এসেছিল তা নয়, কিন্তু গোটা তিরিশের দশক জুড়ে নানা সময় ধরে এসব দর্শন ভারতীয় ঐতিহ্যের মুল ধরে নাড়া দিয়েছিল।

মার্কস, লেনিনবাদ যাঁদের কাছে দুর্বোধ্য, তারা তার মর্মবাণী শুনতে পেলেন ম্যাক্সিম গোর্কি ও মিখাইল শলোকভের উপন্যাস, স্পেণ্ডার, ডে লুইস, এলুয়ার ও লোরকার কাব্যে। টি. এস. এলিয়ট একই সঙ্গে বয়ে আনলেন ডানের মতো আধ্যাত্মিক কবির বুদ্ধিদীপ্ত সেন্সিবিলিটি ও লাফর্গের মতো ফরাসি প্রতীক কবির দুর্বোধ্য শৈলী। বিদ্রোহটা সবচেয়ে বেশি হল রবীন্দ্রনাথের জীবন দর্শন ও রচনারীতির বিরুদ্ধে, কারণ তিনিই ছিলেন ভারতীয় ঐতিহ্য ও পশ্চিমি রোমান্টিসিজমের প্রতিভূ, এমনকি প্রতীক। সুধীন্দ্রনাথ 'কাব্যের মুক্তি' (পরিচয়, ১ম সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩৩৮) যেন এই বিদ্রোহের মেনিফেস্টো। তিনি ঘোষণা করলেন — রবীন্দ্রনাথের দেশ যেন পরীর দেশ, তাঁর যুগ শেষ হয়ে গেছে, 'কাব্যের মুক্তি পরিগ্রহণে' (অবশ্যই পশ্চিম থেকে)। এলিয়টের মধ্যে আধুনিক কবিরা পেলেন আত্মসচেতনতা, নৈর্ব্যক্তিকতা, বিশ শতকের বন্ধ্যা সমাজের অপূর্ব কাব্যরূপ — দ্য ওয়েস্টল্যাণ্ড"।- (''৩০ দশক 'একের পর এক ঢেউ" - অমলেশ ত্রিপাঠী, *সাত দশক সমকাল ও আনন্দবাজার*)

বিশ্বজোড়া অর্থনৈতিক সংঘাত, রাজনৈতিক ব্যর্থতা, সামাজিক সংকট ও মানসিক বিভ্রান্তির ফলেই আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির আরো অবনমন ঘটে। এই অবনতির অনিবার্য ফলশ্রুতি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। চল্লিশের দশকে, বিশ্বযুদ্ধের সমকালে ভারতের আর্থ — রাজনৈতিক অবস্থা ক্রমে আরো জটিল হয়ে ওঠে। কারণ- প্রথমত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ কারী অন্যতম প্রধান রাষ্ট্র ব্রিটেন। আর ভারত ব্রিটেনের একটি ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র। দ্বিতীয়ত, প্রথম মহাযুদ্ধের পরে পরেই সোভিয়েত রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সূচনা হয়। সেই সূত্র ধরে ১৯২৯-এ ভারতে গঠিত হয় কমিউনিস্ট পার্টি। এই পার্টিই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্বে একটি অন্যতম অস্তিত্ব হয়ে দাঁড়ায়। চতুর্থত, যুদ্ধের কারণে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় খাদ্যকে অনৈতিক ও অমানবিক ভাবে সৈন্যদের রসদ হিসেবে যথেচ্ছ ব্যবহার করে। ফলে খাদ্যাভাব তীব্রতম হয়ে ওঠে।

১৯৩৯-এর ১ সেপ্টেম্বর ভোরবেলায় হিটলারের সেনাবাহিনি স্বাধীন পোল্যাণ্ডের সীমা অতিক্রম করে অকস্মাৎ আক্রমণ করে বসে। ৩ সেপ্টেম্বর, পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে, ব্রিটেন জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। শুরু হয়ে যায় নরমেধ যজ্ঞ। ১৯৪১-এর মাঝামাঝি সময়ে সোভিয়েত রাশিয়া সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বযুদ্ধের পথ বদলে যায়। ভারতের নবগঠিত কমিউনিস্ট পার্টি আদর্শ নিয়ে চরম বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে। প্রথমে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ছিল সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর পারস্পরিক যুদ্ধ। পরে স্ট্যালিনের রাশিয়ার সঙ্গে হিটলারের অনাক্রমণ চুক্তি হয়। হিটলারি যুদ্ধের প্রকৃতি ক্রমশ সাম্রাজ্যবাদ থেকে ফ্যাসিবাদে রূপান্তরিত হয়। শেষে ১৯৪১-এর ২২ জুন হিটলার সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণ করে বসে। এই সব পরস্পর বিরোধী ঘটনা ভারতের রাজনৈতিক

পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তোলে। ওদিকে যুদ্ধের শুরুতেই বড়লাট লর্ড লিনলিথগো ভারতকে যুদ্ধরত হিসেবে ঘোষণা করে দেয়। কিন্তু তার সঙ্গে ভারতের জনতা ও জননেতাদের মতামত ও মতাদর্শের কোনও সংযোগ ছিল না। ব্রিটিশ সরকার এক্ষেত্রে বেপরোয়া উদ্ধত মনোভাব দেখাতে শুরু করে- "আর এই সূত্রেই ঔপনিবেশিক ভারতবাসীর উৎপীড়িত মানসিকতা আরও বিদ্রোহী হয়ে ওঠে শাসনের বিরুদ্ধে। এই বিদ্রোহে ইন্ধন জোগায় শাসক চক্রের অনমনীয় মনোভাব যেমন, তেমনি 'ডিভাইড এণ্ড রুল' নীতি যার ফলে একদিকে হিন্দু মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা , অন্যদিকে যথেচ্ছ শাসন, দমন, পীড়ন অবাধে চলতে থাকে। এরি মধ্যে ভারতীয় রাজনীতিতে আমলাতন্ত্র পায় সর্বাধিক প্রাধান্য।" (ড. মীরা ঘোষ, *দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালীন বাংলা কথাসাহিত্য)*

সুবোধ ঘোষের 'কর্ণফুলীর ডাকে' গল্পটির শুরুতেই আছে যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ছবি —

"বোমা পড়ছে দেড় হাজার মাইল দূরে জোহার বারুর জাঙ্গাল আর সিঙ্গাপুরের জাহাজঘাটায়। হাজার লোকের জীবন্ত ধড় ছিটকে পড়লো হাওড়া আর শেয়ালদা স্টেশনে। পাল্টাচ্ছে সবাই — ছেলে, মেয়ে, জোয়ান, বুড়ো, সবাই, সব জাতের লোক। আধমরা, উদ্ভ্রান্ত , ফ্যাকাশে সব চেহারা, চোখ ঠিকরে পড়ছে, হিসেবের ঠিক নেই — কাশছে, হাঁপাচ্ছে, চীৎকার করছে"। 'কর্ণফুলীর ডাকে', (সুবোধ ঘোষ, পরশুরামের কুঠার)

নবেন্দু ঘোষের 'পলাতক' গল্পেও যুদ্ধের ভয়াবহতা- "মাথার ওপর ইতালীয় বোমারু বিমানগুলো অতিকায় ক্রুদ্ধ চিলের মতো গর্জন করে ঘুরপাক খাচ্ছে, বোমা ফাটছে, মেশিনগানের গুলি বাঁকে বাঁকে ছিটকে পড়ছে বালুর ওপর, ধোঁয়ায় চারদিক অন্ধকার হয়ে উঠছে আর সঙ্গী সৈনিকেরা একের পর এক আর্তনাদ করে পড়ে যাচ্ছে।" ('পলাতক', নবেন্দু ঘোষ, এই সীমান্ত)

গোপাল হালদারের 'পঞ্চাশের পথ' উপন্যাসে পাই "জমি-জমা বাড়ি-ঘর সবই নিলে ফৌজের দরবারে। কেরোসিন নেই, লবণ নেই, কাপড় নেই পড়ি কি? সব যুদ্ধে গেছে এখন কুইনাইনও আমাদের দেবে না। ছেলে-পিলে আছে — মাগীরা যায় কোথায়? ফৌজ এলেই তো বে-ইজ্জত করবে মেয়েদের। মা-মেয়ে কিছু মানে তারা? না, মানত বয়স, ধর্ম"। (গোপাল হালদার, *পঞ্চাশের পথ পরিচ্ছেদ* -২)

ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের আরেক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় ১৯৪২-এর আগাস্ট আন্দোলন। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামের চরমপত্র। ব্রিটিশ সরকারের মতে এটা ছিল অরাজকতা সৃষ্টির প্রয়াস। অথচ ব্রিটিশদের সন্ত্রাস তার তুলনায় ছিল অনেক বেশি নৃশংস। গান্ধীজীর ভাষায় — 'Leonine Violence'। প্রস্তাব ছিল - "Withdrawal of the British power from India"। এই প্রস্তাবকেই বি. বি. সি.র সংবাদে 'Quit India' বা 'ভারত ছাড়ো' নামে প্রচার করা হত। কিন্তু সাধারণ মানুষের কণ্ঠেও উচ্চারিত হত — 'ইংরেজ ভারত ছাড়ো' ওদিকে তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। একদিকে জার্মানি —ইতালি-জাপানের ফ্যাসিস্ত অক্ষশক্তি অন্যদিকে ব্রিটেন—আমেরিকা-ফ্রান্স প্রমুখ পাশ্চাত্যের ফ্যাসিবিরোধী দেশসমূহ। এই মিত্রশক্তির সঙ্গে মহামৈত্রী বা গ্র্যাণ্ড অ্যালায়েন্সে আবদ্ধ হয় নাৎসীদের দ্বারা আক্রান্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন। মিত্রশক্তির অপর মিত্র ছিল কুও মিন্টাং শাসিত চীন যার ওপর জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা দীর্ঘদিন ধরে আগ্রাসন চালাচ্ছিল। ফ্যাসিবিরোধী যুদ্ধকে মিত্রশক্তি গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা রক্ষার যুদ্ধ বলে প্রচার করলেও উপনিবেশগুলির স্বাধীনতার কথা ব্রিটেন বা ফ্রান্স বা ডাচ ঔপনিবেশিক শক্তিসমূহ ঘুণাক্ষরেও উচ্চারণ করতা না, এমনকি রুজভেল্ট-চার্চিল স্বাক্ষরিত ও প্রচারিত আটলান্টিক চার্টার (১৯৪২) বা অতলান্তিক সনদেও পরাধীন উপনিবেশগুলির স্বাধীনতার কথা উল্লেখিত হয় নি।

বিশ্বযুদ্ধের এই পরিস্থিতিতেই কংগ্রেসের ঐতিহাসিক অধিবেশন বসে মুম্বাই শহরে। যুদ্ধ তখন ভারতের দোরগোড়ায়,

কলকাতায় জাপানীরা বোমাবর্ষণ করছে। সিঙ্গাপুর, মালয়, বার্মা একের পর এক ব্রিটিশ উপনিবেশ জাপানের দখলে চলে যায়। ... এসব সংবাদ কংগ্রেস নেতারা জানতেন। ব্রিটিশ সরকারকে তারা পরিস্কার ভাষায় জানান যে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি যত ঘোরালোই হোক ভারতের স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি ছাড়া অন্য কোনও শর্তেই মিত্রশক্তির পক্ষে ভারত যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সমর্থন বা সহযোগিতা দিতে পারে না। স্বাধীনতার জন্য চূড়ান্ত সংগ্রামের এখনই সেই সময়। ডিকেন্সের ভাষায় বলা যায় — "It was the best of times– it was the worst of times.". (*প্রসঙ্গকথা*, কৃষ্ণ ধর, বিজিত কুমার দত্ত (সম্পাদনা) *সংবাদ- সাময়িক পত্রে ভারত ছাড়ো আন্দোলন*)

ওদিকে এই সময় পর্বেই দু দুবার নির্বাচিত কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট সুভাষচন্দ্র বসু দেশত্যাগ করেন। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে বার্লিনে গিয়ে সেখানে যুদ্ধবন্দি ভারতীয় সেনাদের নিয়ে স্বাধীন ভারতের সেনাবাহিনী গড়ে তুলতে থাকেন। বার্লিন থেকে সুভাষচন্দ্র নিয়মিত বেতার ভবনে বলতেন- গান্ধীজী ও কংগ্রেস যেন ব্রিটিশ সরকারের আলোচনার ফাঁদে পা না দেন। তিনি, অবশ্য আগে, ১৯৪০-এ যুদ্ধ শুরুর পরই ব্রিটিশ সরকারকে চরমপত্র দেবার প্রস্তাব রেখেছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস তা গ্রহণ করেন নি, উলটে তাঁকেই কংগ্রেস ছাড়তে হয়।

এইদিকে বাংলায় তখন বিপন্ন অবস্থা। জাপানী আক্রমণের আশঙ্কায় শত্রুকে আটকাবার জন্য ব্রিটিশ সরকার বঞ্চনার নীতি গ্রহণ করে। জাপানীরা যাতে চলাচলের সুবিধা পায় তাই দেশী নৌকাগুলো ডুবিয়ে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। মজুতদারেরা খাদ্যশস্য লুকিয়ে ফেলে। দেখা দেয় চরম খাদ্যসংকট। সংবাদ পত্রের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হওয়ায় অনাহারে মৃত্যুর কোনও সংবাদ বা ছবি পাওয়া গেল না। মেদিনীপুরে ভয়ঙ্কর ঝড়ে প্রচুরমানুষের মৃত্যু হল। কোয়ালিশন মন্ত্রীসভায় মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক স্বীকার করলেন যে প্রাদেশিক সরকার কার্যত ঠুঁটো জগন্নাথ। পুতুল নাচের দড়ি টানত আসলে ইংরেজ গভর্নর। এই সময়েই ফজলুল হককে পদত্যাগে বাধ্য করেন গভর্নর হার্বার্ট। দমন করার জন্য নাগরিকদের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয় ভারতরক্ষা আইন জারি করে। সরকার নিজেই ভারতের বিভিন্ন সংবাদ পত্রে ভারত ছাড়ো আন্দোলন বিরোধী প্রচারকার্য শুরু করে। সংবাদ পত্রের ওপর বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়। ঝড়ের খয়খতি ও সরকারি উদাসীনতা নিয়ে মন্তব্য প্রকাশের জন্য 'যুগান্তর' পত্রিকার প্রকাশ পাঁচ দিন বন্ধ করে দেওয়া হয়। সেনাবাহিণী ও পুলিশি নির্যাতন উত্তোরত্তর বাড়তে থাকে। বিক্ষোভ দেখাতে গিয়ে বহু মানুষ আহত নিহত হয়। তবু চলতে থাকে ইস্তেহার, প্রচারপত্র ও প্রতিবাদ। কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতাদের জেলবন্দি করা হয়। কংগ্রেস ও অন্যান্য বামপন্থী দলের নেতা কর্মীরা পুলিশের নজর বাঁচিয়ে আত্মগোপন করে। ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয় পুলিশ মিলিটারি। এই বিক্ষোভ সংগঠনে কংগ্রেস, কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী, ফরওয়ার্ড ব্লক, বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী প্রভৃতি বামপন্থী দলের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। ভারত ছাড়ো আন্দোলনে কমিউনিস্টদের ভূমিকা প্রসঙ্গে বলা যায় —

"আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে বিশ্বযুদ্ধের প্রথমপর্বে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ফ্যাসিবাদের বিরোধিতা পরিত্যাগ করে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু তা সর্বাংশে সত্য নয়। আসলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের আহ্বান জানানো হলেও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে প্রচার অভিযানও অব্যাহত থাকে। "(অমলেন্দু দে - *বাংলায় ভারত ছাড়ো আন্দোলন*)

উল্লেখ্য, বিয়াল্লিশের আন্দোলন মোটেই অহিংস ছিল না। ব্রিটিশ সরকারের সরকারি হিসেব নিকেশ অনুযায়ী গণবিক্ষোভে জড়িত থাকার অপরাধে গ্রেফতার করা হয় ৯২ হাজার মানুষকে, বিক্ষুব্ধ জনতার হাতে আক্রান্ত হয় ২০৮ টা থানা, ৩৩২টি রেল স্টেশন ও ৯৪৫টি ডাকঘর। বোমা বিস্ফোরণের সংখ্যা — ৬৬৪টি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সৈন্যদের রসদ, খাদ্য সংগ্রহ অভিযান, চোরাবাজারি, কন্টোল ব্যস্থার ব্যর্থতা , প্রাকৃতিক দুর্যোগ , মুদ্রাস্ফীতি, প্রভৃতি নানা কারণে ৪৩-এর মন্বন্তর ঘনিয়ে আসে। 'দেশ' পত্রিকায় 'দেশের অন্ন সমস্যা' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায় — ''অন্ন সমস্যা উত্তরোত্তর গুরুতর আকার ধারণ করিতেছে। চাউলের মুল্য দিনের পর দিন বাড়িয়াই চলিতেছে। অন্নের অভাবে দেশের নানা স্থান হইতে ধান লুঠ এবং চাউল লুঠের খবর আসিতেছে"। ('সাময়িক প্রসঙ্গ ', 'দেশ', ৬ মার্চ, ১৯৪৩)

একই সঙ্গে তৈরি হল বস্ত্র সংকট। 'প্রবাসী'তে পাওয়া যায় —

''বস্ত্রের মূল্য প্রতি সপ্তাহে চড়িতেছে এমনই এখনই উহা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়েরও ক্রয়ক্ষমতার সর্বোচ্চ সীমা অতিক্রম করিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না"। (বিবিধ প্রসঙ্গ, 'প্রবাসি, জৈষ্ঠ্য, ১৩৫০,)

গ্রামে, শহরে সর্বত্র শুরু হল লুঠতরাজ। অনাহারে গ্রামবাসীরা গ্রামশূন্য করে শহরে এল খাদ্যের খোঁজে। শহরে মানুষের তুলনায় লঙ্গরখানাও কম। বুভুক্ষু মানুষের লাইন ক্রমশ দীর্ঘতর হল। অভাবে, অনাহারে এবং কুখাদ্য খেয়ে বহু মানুষের মৃত্যু হল। সমস্ত বাংলায় মন্বন্তর ছড়িয়ে পড়ল। মৃত্যুর কোনও হিসেব থাকল না। মন্বন্তরের সর্বনাশের স্রোতে তৃণখণ্ডের মতো ভেসে যাওয়া মানুষের কথা উঠে এল সাহিত্যে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'আজ কাল পরশুর গল্পে' খাদ্য বস্ত্রের চরম সংকটের কালে শুধুমাত্র জীবনের তাগিদে নিহত হয়ে যায় স্বাভাবিক সম্পর্কের নিবিড়তা। দেহে হয়তো বেঁচে ফেরে, কিন্তু সামাজিক নৈতিকতার অহেতুক অপঘাতে মানস মৃত্যু হয় বহু জনের, বিশেষত নারীর। পেটের তাগিদে বাধ্য হয়ে দেহোপজীবিনীর জীবিকা একবার নিলে আর কিছুতেই নাকি ফেরা যায় না। ফিরতে দেয় না সমাজপতিদের শাসন্তান্ত্রিক নিষ্ঠুরতা। আবার, তাঁর 'দুঃশাসন' গল্পে দেখা যায়- অন্নাভাবের পাশাপাশি, গ্রামীণ চোরা ব্যবসাদার এবং নির্লজ্জ প্রশাসনের পারস্পরিক মিথোজীবিতায় বস্ত্রসংকট চূড়ান্ত হয়ে ওঠে। পরিস্থিতি এমনই হয়ে ওঠে যে, দুঃশাসনের নির্মম বস্ত্রহরণে উলঙ্গিনী দ্রৌপদীদের আর কোনও গত্যন্তর থাকে না। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পে মন্বন্তরের আরেক রূপ। বিভিন্ন সমাজ শ্রেণিতে দুর্ভিক্ষ , যুদ্ধ যে চরম বৈপরীত্যে প্রতিফলিত তারই ইঙ্গিতপূর্ণ ব্যঙ্গাত্মক চিত্র পাওয়া যায় তাঁর 'হাড়' গল্পে। তাঁর 'পুষ্করা' গল্পে চিত্রিত মহাশ্মশান আসলে মন্বন্তরে, মহামারিতে ক্লিষ্ট , অর্ধমৃত ৪৩-এর বাংলাকেই প্রতীকায়িত করেছে। এছাড়াও উল্লেখ করতে হয় — বিভুতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভিড়', তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বোবাকান্না', অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'কেরোসিন', প্রবোধ কুমার সান্যালের 'অঙ্গার', গজেন্দ্র কুমার মিত্রের 'ম্যায় ভুখা হুঁ' নবেন্দু ঘোষের 'বস্ত্রং দেহি' প্রভৃতি গল্পের কথা। যুদ্ধ, ফ্যাসিজম এভাবেই মারী-মড়কের বীভৎস আতঙ্ক নিয়ে মানুষের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আরেক সংকট — সাম্প্রদায়িক রাজনীতি। ১৯৪১-৪৬ হিন্দু-মুসলমান বিবাদ তবু একরকম স্থিতিশীল ছিল। কিন্তু ১৯৪৪-এর সেপ্টেম্বরে গান্ধী ও জিন্নাহর সাক্ষাৎকারকে কেন্দ্র করে আপামর ভারতবাসীর স্বপ্নভঙ্গ, ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর কেন্দ্রিক সিমলা সম্মেলনের ব্যর্থতা, নির্বাচনের প্রচারে সাম্প্রদায়িক প্ররোচনা সামগ্রিক ভাবে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের দ্রুত অবনতি ঘটায়। ক্ষমতা প্রাপ্তির দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে কলকাতা, নোয়াখালি, বিহার, পাঞ্জাব সর্বত্র দাঙ্গা বাধে, বলা ভালো বাধানো হয়। শোচনীয় দাঙ্গায় ছারখার হয়ে যায় বহু জীবন। শেষে , ১৯৪৭-এ সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে দেশভাগ ও স্বাধীনতা। অবশ্য, পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার পরে পরেই পশ্চিম পাকিস্তান তার শোষণ ক্রিয়া চালু করে দেয় পূর্ব পাকিস্তানের ওপর। ভাষিক, বাচিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ চালাতে থাকে পশ্চিম পাকিস্তান। যার অনিবার্য পরিণাম ৫২-র ভাষা আন্দোলন,

৬৮-৬৯-এর গণ অভ্যুথান এবং ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ। নিয়ন্ত্রণের লাগাম থেকে বেড়িয়ে এসে পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন বাংলাদেশ রূপে আত্মপ্রকাশ করে।

১৯৫০ এর শুরুর দিকেই 'ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভারত' ও পশ্চিমবঙ্গকে গুরুতর সমস্যার সম্মুখীণ হতে হয়। বন্যার স্রোতের মতো উদ্বাস্তুর ঢল আস্তে থাকায় এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতির জন্ম হয়। তার ওপর পূর্ব পাকিস্তানে বিভিন্ন জায়গায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা , পশ্চিমবঙ্গের দাঙ্গা পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তোলে। 'বঙ্গীয় পুনর্বসতি প্রতিষ্ঠানের' সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৫০-এর ২৭ জুলাই পর্যন্ত ৬১,৬৭,৬৯৭ জন উদ্বাস্তু পূর্ববঙ্গ ছেড়ে ভারতে আসে। শিয়ালদা স্টেশন থেকে উদ্বাস্তুদের পাঠানো হয় রাণাঘাট কুপার্স ক্যাম্প, ধুবুলিয়া আশ্রয় শিবির, কাশীপুর ক্যাম্প প্রভৃতি নানা জায়গায়। কলকাতা ও কলকাতার আশেপাশে কলোনি তৈরি করে তারা থাকতে শুরু করে। তৈরি হয় 'নিখিলবঙ্গ বাস্তুহারা কর্ম পরিষদ'। সি. পি. আই. কমিউনিস্ট পার্টি , ফরওয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি বামপন্থী দলগুলোও কলোনি স্থাপন করে। ১৯৫০এর আগস্টের মধ্যে বহু পতিত জমিতে কলোনি গড়ে ওঠে। প্রধানমন্ত্রী নেহেরু এক বিবৃতিতে জানান, দেশভাগের ফলে পশ্চিমবঙ্গই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ তীব্র সংকটের মুখোমুখি হয়- '' অতিজনতা , ভূমির উপর প্রচণ্ড চাপ , ভাগচাষীর ক্রমবর্ধমান , অনুপাত, জীবনধারণের উপযোগী অর্থ উপার্জনে অক্ষম কৃষিমজুরের সংখ্যা বৃদ্ধি , ভূমির উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস, সংকীর্ণ অঞ্চলে শিল্পের সীমাবদ্ধতা, বিপুলসংখ্যক বহিরাগত ও উদ্বাস্তুর ভিড় , কর্মহীন লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং কৃষিও শিল্পের মধ্যে নতুন করে সমন্বয় সাধনের অভাবে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের দুঃখ-দুর্দশা প্রকট হয়।" (প্রবন্ধ- 'এবার নতুন পথে ,নতুন লক্ষ্যের দিকে' প্রাবন্ধিক - অমলেন্দু দে, *সাত দশক সমকাল ও আনন্দবাজার)*

১৯৫২-৫৭ পর্যন্ত কংগ্রেস সরকার 'পুরো নিয়ন্ত্রণ' চালায়। রাজ্যের শহর ও শিল্পাঞ্চলে বিধিবদ্ধ রেশনিং, ধান চালের দাম বেঁধে দেওয়া, মিল মালিক ও জমির মালিকের ওপর লেভি, জেলায় জেলায় কর্ডনিং ইত্যাদি চালু করা হয়। কিন্তু ক্রমে চালের দাম আরো বেড়ে যায়। কালোবাজারি শুরু হয়। ৫২-তে খাদ্য সংকট তীব্র উদ্বিগ্নতা সৃষ্টি করে। ৫২-র শেষ দিকে সরকারের 'নিয়ন্ত্রন নীতি' ব্যর্থ হওয়ায় চালু করা হল 'বিনয়ন্ত্রণ নীতি। বিধিবদ্ধ রেশনিং, লেভি, কর্ডনিং সব তুলে দেওয়া হল। ৫৬-তে খাদ্য সংকট আরো বিকট হয়ে ওঠে। ৫৭-তে এই খাদ্যকেন্দ্রিক ব্যবসায় ফাটকাবাজি মুনাফাখোরি অত্যন্ত বেড়ে যাওয়ায় সরকার ফের 'আংশিক নিয়ন্ত্রণ' চালু করে। 'খাদ্য আইন'ও জারি করা হয়। কিন্তু তবু ১৯৫৮-তে খাদ্য সংকট তীব্র আকার ধারণ করায় সামাজিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়। খাদ্যের দাবিতে আন্দোলন সংগঠিত হয়। চতুর্দিকে হরতাল, অনশন, ভুখামিছিলের বন্যা বয়ে যায়। অন্যদিকে উদ্বাস্তু কলোনি গুলোও স্বীকৃতির দাবীতে একের পর এক আন্দোলন করে চলে। পঞ্চাশের দশকে, শ্রমিকদের ধর্মঘটের পাশাপাশি ছাত্র আন্দোলনেরও ব্যাপ্তি ঘটে। ছাত্র-শিক্ষক ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনও দেখা যায়।

ষাটের দশকে সীমান্তে ভারত — পাকিস্তান এবং ভারত-চীনের যুদ্ধের পাশাপাশি বিভিন্ন সময়ে জব্বলপুর, আলিগড়, মোরাদাবাদ, আমেদাবাদে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও হয়েছে। ১৯৬৪-তে উত্তরবঙ্গে মালদায় ও সীমান্তের ওপারে রাজশাহীতেও গোলযোগ বেধে যায়। তারই সূত্র ধরে পাকিস্তানে হিন্দু নিধনের প্রতিবাদে কলকাতার ছাত্রবিক্ষোভ শুরু হয়ে যায়। ওদিকে পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যসমস্যাও সমানে চলেছে। ১৯৬৬তে তা ব্যাপক খাদ্য আন্দোলনের রূপ নেয়। কলকাতার কালোবাজারিতে চালের দাম হু হু করে বেড়ে গেল। ১৯৬৬তে আবার কেরোসিন সংকটে ৩৮ হাজার গ্রামের আলো নিভে গেল। পাশাপাশি শুরু হয় নির্বাচনকে ঘিরে রাজনৈতিক ভাগাভাগি, একদিকে চরমপন্থা মিলিয়ে যাচ্ছে ব্যক্তিহত্যা আর সন্ত্রাসের চোরাবালিতে , অন্যদিকে রাজ্যে দীর্ঘায়ু হল না যুক্তফ্রন্ট সরকার। ষাটের দশকের রাজনৈতিক আবর্তে অস্থিরতা কিছু বেশি।

৬৮-র 'ফরাসি বিপ্লবে' ছাত্রশক্তির অভ্যুত্থান, চীনে সাংস্কৃতিক বিপ্লব ও পশ্চিম ইউরোপে ধারাবাহিক ছাত্রবিক্ষোভে চতুর্দিকে একটা বৈপ্লবিক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। জাতীয় ক্ষেত্রে নকশালপন্থী আন্দোলনও এই বিশ্বজোড়া দুঃসাহসিক অভিযানেরই অঙ্গ। ১৯৬৭-তে নকশালবাড়িতে আন্দোলনের সূত্রপাত। ভারতের সমাজ পরিবর্তনের আন্দলনে গ্রামীণ কৃষকদের ঐতিহ্যবাহী সমাজতন্ত্র —বিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চরিত্রকে উপযুক্ত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করাই ছিল এর মূল উদ্দেশ্য। রণকৌশল হিসেবে নির্ধারিত হল- সশস্ত্র কৃষক গেরিলা দল সংগঠিত করে গ্রামে গ্রামে অঞ্চল ভিত্তিক ক্ষমতা দখল। স্থির হল — সংগ্রামের ছোট ছোট ঘাঁটিগুলোকে বিস্তৃত করে জনযুদ্ধের প্রচণ্ড ঢেউ সৃষ্টি করা হবে। গড়ে তোলা হবে গণফৌজ। প্রতিক্রিয়াশীল শাসক উচ্ছেদ করে শহরগুলোকে দখল করে নেওয়া হবে। এইভাবে সমস্ত দেশে গণতান্ত্রিক একনায়ক তন্ত্র কায়েম করে সর্বহারার একনায়কতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। ১৯৬৭-৬৯ নকশালবাড়ি আন্দোলনের এই ছিল তাত্ত্বিক চেহারা। গণশিল্পী, সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট, লেখকদের থেকেও আসতে লাগল নকশাল বাড়ি আন্দোলনের স্বপক্ষে বিপুল সমর্থন। কলকাতা ও শহরাঞ্চলের নাট্য প্রযোজনা গুলোতে নতুন ধারার একটা ঝোঁক লক্ষ করা গেল। সাহিত্যও তার ব্যতিক্রম নয়। এই পর্বের সাহিত্য হিসেবে উল্লেখ করতে হয়- মহাশ্বেতা দেবীর 'অগ্নিগর্ভ' , সমরেশ বসুর 'শেকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে' , সুধাংশু রঞ্জন ঘোষের 'নকশালবাড়ি', কিন্নর রায়ের 'মৃত্যুকুসুম' , অসীম চট্টোপাধ্যায়ের 'পুব আকাশ লাল' ইত্যাদি।

১৯৭২-এ চারু মজুমদারের মৃত্যু পরবর্তী অধ্যায়ে নকশাল আন্দোলনের একটা পর্যায়ের শেষ হয়। কলকাতা শহরাঞ্চলে ছাত্র ও যুবকদের কালোপাহাড়ি বিক্ষোভের অবসান ঘটে। পরবর্তী বছর গুলোতে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে আন্দোলন বিভক্ত হয়ে যায়। তবে, সঠিক রণনীতি অনুসন্ধানের একটা আন্তরিক প্রচেষ্টাও দেখা যায়। ওদিকে, জরুরি অবস্থার ঘোষণা, ৭৭-এর নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধীর হেরে যাওয়া, জনতা পার্টির আবির্ভাব, ভারতীয় শাসক শ্রেণির রাজনৈতিক কোন্দল — অবস্থানগত পুনর্বিন্যাস আরো নানা মাত্রিক অস্থিরতার জন্ম দেয়।

পারিপার্শ্বিক এই অস্থিরতা , বিপন্নতা ছোটগল্প নামক সাহিত্য সংরূপটির ক্ষেত্রেও নানা পরিবর্তন ঘটায়। তৃতীয় দশক থেকেই বাংলা ছোটগল্পে শুরু হয় নানামুখী প্রবর্তনা। তরুণ লেখক গোষ্ঠী পুরনো ধারাকে অতিক্রম করে নতুন প্রবাহ শুরু করতে চাইলেন। যুগগত কারণেই বিষয় ও আঙ্গিকের একটা অস্পষ্ট বন্ধন বেদনা তাদের প্রতি মুহূর্তে পীড়িত করছিল। 'কল্লোল', 'কালিকলম', ;প্রগতি' 'ধূপছায়া' 'উত্তরা' , 'আত্মশক্তি' প্রভৃতি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে শুরু হল ছোটগল্পের নতুন অধ্যায়। এদের মধ্যে পুরোধা ছিল 'কল্লোল'। তাই তার নামানুসারেই 'কল্লোলগোষ্ঠী' ও 'কল্লোলযুগের' নামকরণ করা হয়। সমাজ- রাজনীতি ও ধর্মনৈতিক চেতনার ব্যাপক বিপর্যয়ে ছোটগল্পের পরিসরেও দেখা দিল সংশয় পীড়িত মূল্যবোধ। গল্পের বিষয়ে, পরিণতিতে অনিশ্চয়তা, নৈরাশ্য বোধ ও নেতিবাদের সুর প্রবল হয়ে উঠল। পাশ্চাত্য ভাবধারার সংযোগে গল্পে একদিকে এল মার্কসবাদের প্রভাব, অন্যদিকে ফ্রয়েড, ইয়ুং, হ্যাভলক এলিসের হাত ধরে এল দেহবাদী যৌনতা মূলক চেতনা ও ব্যাখ্যা। পাশাপাশি, জীবনের প্রতি কোনও সংবেদনশীল দৃষ্টি নয় , বরং বস্তুনিষ্ঠা বা বাস্তব বিশয়ের প্রতি প্রবল আকর্ষণে গল্পে ন্যাচারালিজমের প্রতি একটা ঝোঁক লক্ষ করা যায়। ১৯৫৮-৫৯ খ্রিষ্টাব্দে বিমল কর 'ছোটগল্প ঃ নূতন রীতি' শিরোনামে একটা সিরিজ প্রকাশ করেন। তাতে বাংলা গল্প নিয়ে চলতে থাকে দুরূহ পরীক্ষা নিরীক্ষা। ছোটগল্পের ভাষা উপস্থাপনার নতুন রীতির সন্ধান পাওয়া যায় অমিয়ভূষণ মজুমদার, কমলকুমার মজুমদার প্রভৃতি অনেকের গল্পে। ষাট ও সত্তরের দশকে চলতে থাকে একের পর এক ছোটগল্প কেন্দ্রিক আন্দোলন , যেমন- হাংরি জেনারেশন, শাস্ত্রবিরোধী, নিমসাহিত্য, গণতন্ত্র ও চাকর সাহিত্য বিরোধী আন্দোলন ইত্যাদি। রীতিমতো ইস্তেহার সামনে রেখে চলতে থাকে

ছোটগল্পের বিষয় ও আঙ্গিক কেন্দ্রিক আন্দোলন। ফলে পরিবর্তন হয়ে ওঠে অবশ্যম্ভাবী।

২৬.৩ প্রশ্নাবলী

বিস্তৃত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। তিরিশ থেকে পঞ্চাশের দশকের গল্পের রাজনৈতিক পটভূমি সম্পর্কে আলোচনা করো।

২। চল্লিশের দশকের অর্থনৈতিক পটভূমি সম্পর্কে আলোচনা করো।

৩। ষাট ও সত্তরের দশকের উত্তাল দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ওপর আলোকপাত করো।

৪। তিরিশ থেকে সত্তরের দশক জুড়ে অস্থির পরিস্থিতিতে সাহিত্যে বিশেষত ছোটগল্পে কীরকম পরিবর্তন আসে তা নিয়ে আলোচনা করো।

৫। বিশ ও তিরিশের দশকের ঔপনিবেশিক আমল ও দেশীয় রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি চিহ্নিত করো।

সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন

১। অসহযোগ আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্যে তার প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা করো।

২। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করো।

৩। মন্বন্তর ও বাংলা ছোটগল্প নিয়ে আলোচনা করো।

৪। চল্লিশের দশকের পটভূমি হিসেবে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের গুরুত্ব আলোচনা করো।

৫। নকশাল আমল ও সেই পর্বের সাহিত্যের কিছু উদাহরণ দাও।

৬। তিরিশ থেকে সত্তরের দশকের সময় পর্বে সাহিত্যে পাশ্চাত্য প্রভাবগুলিকে চিহ্নিত করো।

৭। সমকালীন সাময়িক পত্রিকা ও কিছু গল্প আন্দোলনের উল্লেখ করো।

৮। তিরিশ থেকে সত্তরের দশক জুড়ে বিভিন্ন দাঙ্গা ও বিক্ষোভের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৯। চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে আলোচনা করো।

১০। সমকালীন সাহিত্যের পটভূমি হিসেবে প্রথম মহাযুদ্ধ ও রুশ বিপ্লবের গুরুত্ব আলোচনা করো।

২৬.৪ গ্রন্থপঞ্জি

১। অনিল আচার্য (সম্পাদনা), *সত্তর দশক*, খণ্ড দুই, অনুষ্টুপ, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ , নভেম্বর ২০১৪

২। অমর ভট্টাচার্য, *লাল তমসুক নকশালবাড়ি আন্দোলনের প্রামাণ্য তথ্য সংকলন*, গাঙচিল,কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ মার্চ ২০১৪

৩। অমলেন্দু দে, *বাংলায় ভারত ছাড়ো আন্দোলন*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০০৩

৪। আসরফী খাতুন, *বাংলা কথাসাহিত্য চল্লিশের সময় ও সমাজ*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা

৫। গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, *দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, সেপ্টেম্বর, ১৯৮৬

৬। ড.মীরা ঘোষ, *দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালীন বাংলা কথাসাহিত্য*, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৮৪

৭। বিজিত কুমার দত্ত (সম্পাদনা) *সংবাদ- সাময়িক পত্রে ভারত ছাড়ো আন্দোলন*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অ্যাকাডেমি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, মে ২০০৪

৮। বিনতা রায়চৌধুরি, *পঞ্চাশের মন্বন্তর ও বাংলা সাহিত্য*, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৯৭

৯। মানস মজুমদার, *পঞ্চাশের মহামন্বন্তর ও বাংলা ছোটগল্প*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯৪

১০। *সাত দশক সমকাল ও আনন্দবাজার*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ জানু-১৯৯৯, পঞ্চম মুদ্রণ — মে, ২০১৭

১১। *উত্তাল চল্লিশ : অসমাপ্ত বিপ্লব*, অমলেন্দু সেনগুপ্ত

১২। *জোয়ার ভাটায় ষাট-সত্তর*, অমলেন্দু সেনগুপ্ত

১৩। *কালের পত্তলিকা*, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

একক-২৭ ❑ মহানগর — প্রেমেন্দ্র মিত্র

গঠন

২৭.১ প্রস্তাবনা

২৭.২ গল্পকার পরিচিতি

২৭.৩ 'কল্লোল' ও প্রেমেন্দ্র মিত্র

২৭.৪ 'মহানগর' গল্পে নাগরিক জটিলতা ও অস্থিরতা

২৭.৫ পতিতা জীবন

২৭.৬ 'মহানগর' ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিসত্তা

২৭.৭ গল্পের নামকরণ

২৭.৮ প্রশ্নাবলী

২৭.৯ গ্রন্থপঞ্জি

২৭.১ প্রস্তাবনা

নাগরিক জীবনের শিল্পি প্রেমেন্দ্র মিত্র। অর্থহীন সময়ের নিরর্থকতার কাব্য অনুচ্ছ্বসিত গদ্যে প্রকাশিত তাঁর গল্পে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তিনি ব্যবচ্ছেদ করেছেন দুঃসহ যন্ত্রণার। অনায়াস ভঙ্গিতে তুলে ধরেছেন মহানাগরিক পাঁকের যাবতীয় কদর্যতাকে। যন্ত্র সভ্যতার অন্ধ অভিঘাত আঁধার তরঙ্গের মতো এক জটিল চালচিত্র বুনেছে তার চারপাশে। 'একরাত্রি' গল্পে স্পষ্টতই বলছেন—

"এ যুগে আমরা সবাই অল্পবিস্তর অভিশপ্ত, পতিত। আমাদের আকাশ শূন্য হয়ে গেছে, পৃথিবী যান্ত্রিক প্রাত্যহিকতায় কঠিন।"

অদ্ভুত রূপকথার জন্ম নিয়েছে 'মহানগর', 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে', 'পোনাঘাট পেরিয়ে', 'পুন্নাম', 'স্টোভ' প্রভৃতি একের পর এক গল্পে। ভঙ্গুর হতভাগ্য মানুষের ভাঙাচোরা জীবন ও বিপন্ন যাপনই এখানে গল্পের প্রধান বিষয়। বিকলাঙ্গ সম্পর্কের তীব্র আত্মিক আর্তনাদই এখানে মূল সুর। সময় ও সমাজের বিক্ষুব্ধ এক শূন্যতাই আস্ফালন করে গেছে গল্পের চরাচরে। যন্ত্র সভ্যতায় আচ্ছন্ন 'মহানগর' —এর অন্ধকার স্রোতের আড়ালে আবডালে অবক্ষয়ের এই ঘুনধরা চেহারাটাকে তুলে ধরাই আলোচ্য গল্পের মূল উদ্দেশ্য—

"আজ এই রাস্তার গান গাইব এই নগরের শিরা উপশিরার

এই রাস্তার ধূলির গান।

তার কাঁকর, তার খোয়া আর পাথরের"

২৭.২ গল্পকার পরিচিতি

কথাসাহিত্যিকের সাহিত্যকে চিনতে গেলে তাঁর ব্যক্তিজীবন জানাটা বড় জরুরি। বাস্তব জীবনের বিচিত্রতম অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ে গল্পের শরীরে। গল্পের প্রকরণরীতি, যুগচেতনার উদ্ভাস এসব কিছু জানার জন্যও তাঁর ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে পরিচিতি আবশ্যক।

লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্রের জন্ম ১৯০২ থেকে ১৯০৫ এর কোনও এক সময়ে। তাঁর নিজের বক্তব্যই সেরূপ। তবু, হিসেব নিকেশ বলে ১৯০৩ এর আগাস্ট মাসে বারাণসীতে তাঁর জন্ম। বাড়ি- হুগলি জেলার কোন্নগরে। পরিবার- শিক্ষিত, অভিজাত, প্রতিপত্তিশালী। পিতার দ্বিতীয় বিবাহ ও সেই সূত্রে দাদামশায়ের বাড়িতে লালিত প্রেমেন্দ্র মিত্র আশৈশব বইপাঠের অবাধ স্বাধীনতা পেয়েছেন। মাত্র তিন চার বছর বয়স থেকেই বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি তিন ভাষাতেই পড়তে থাকেন একের পর এক গ্রন্থ। 'যতীন্দ্রযামিনী'র দুঃখের জগত, 'মাস্টারম্যান রেডি'র দুঃসাহসিক সমুদ্র অভিযান, শৈশবে মায়ের মুখে শোনা রামায়ণ মহাভারতের কাহিনি তাঁর চেতনা ও অনুভূতির ক্ষেত্রকে আলোড়িত করতে থাকে। বালক বয়সে মাতৃমৃত্যুর অভিঘাত তার মধ্যে তৈরি করে এক নির্জন নিঃসঙ্গতা। অভিভাবক দিদিমার সঙ্গে গঙ্গাসাগর যাত্রা, সেখানে বারবণিতাদের সংলাপ, কলহ সমস্ত সঞ্চিত হতে থাকে স্মৃতিতে।

কলকাতায় স্কুলজীবনে স্কুলের গ্রন্থাগারের পাশাপাশি নাগরিক ফুটপাত থেকেও সংগ্রহ করতেন বিপুল বই। ডিকেন্স, জুল ভার্ণ থেকে শুরু করে নানান বই। মার্কিনবাসী নাস্তিক লেখক রবার্ট গ্রিন ইঙ্গারসলের গ্রন্থ পাঠের পর ঈশ্বর সম্পর্কে তৈরি হয় ঘোর সংশয়। পড়ে ফেলেন ম্যাক্সিম গোর্কির 'ইন দি ওয়ার্ল্ড'।

নলহাটি থেকে কলকাতায় যে ভাড়াবাড়িতে তিনি উঠেছিলেন সেটা ছিল 'আদি গঙ্গা' বা টালির নালার পাশে, সরু গলির মধ্যে একতলা একটা বাড়ি। এখানে উঠতি নিম্নবিত্ত মানুষের ভিড়, গঙ্গার ঘাটে ডিঙিতে মালপত্র বোঝাই করা এ সমস্তই তিনি দেখেছেন নিজের অভিজ্ঞতার চোখে। এই অঞ্চলের রূপটিই ফুটে উঠেছে 'পোনাঘাট পেরিয়ে' গল্পে। মাত্র ১৪ বছর বয়সে বস্তি জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখলেন 'পাঁক' উপন্যাস। প্রেমেন্দ্র কৈশোরে সবুজপত্র পত্রিকার সঙ্গেও যুক্ত হন। অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাবে ১৯২১-এ শ্রীনিকেতনে চলে আসেন, কৃষিবিদ্যা পড়ার আশা নিয়ে। মন না টেকায় , ফের কলকাতায় আসেন। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ও আরো দুই বন্ধুকে নিয়ে 'অভ্যুদায়িক' নামে একটা সাহিত্যিক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেন। ক্রমে এই আসর থেকেই পূর্ণতা পেতে থাকে তাঁর সাহিত্যিক চেতনা। এরপর কলকাতা ছেড়ে চলে যান ঢাকায়। উদ্দেশ্য— জগন্নাথ কলেজে পড়াশোনা। ঢাকার স্টীমারযাত্রা, গ্যান্ডেরিয়া যাবার পথে অসমাপ্ত পুল — নির্মাণ করে যথাক্রমে 'অরণ্যপথ', 'হয়তো' গল্পের পটভূমি। মেসের অভিজ্ঞতার সূত্র উঠে আসে 'শুধু কেরাণী', 'গোপনচারিণী '। পাঠিয়ে দেন 'প্রবাসী'র দপ্তরে। প্রথমটি প্রকাশিত হয় ১৩৩০, চৈত্র, 'প্রবাসী', দ্বিতীয়টি ১৩৩১, বৈশাখে, প্রবাসীতে। এভাবেই বাংলা সাহিত্যে যথার্থ গল্পকার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। 'ভারতী' তে প্রকাশিত হয় 'শিকলির দাম'। ১৯২৩-৩০ কল্লোল পত্রিকার অধিকাংশ সময় জুড়েই ছিলেন তিনি। মাঝে দু এক বছর কালিকলম পত্রিকার সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯২৬-এর এপ্রিলে কল্লোলেরই কয়েকজন মুরলীধর বসু, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, ও প্রেমেন্দ্র মিত্র এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। এ সমস্ত ছাড়া 'উত্তরা', 'প্রগতি' , 'সংহতি' , 'ধূপছায়া' , 'বিজলি' প্রভৃতি পত্র পত্রিকাতেও প্রেমেন্দ্রের গল্প প্রকাশিত হত।

১৯২৭-এ কলকাতায় ফিরে দিনেশচন্দ্র সেনের প্রস্তাব মতো কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রামতনু লাহিড়ী রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট ' পদে যোগদানও করেন। কিন্তু কোথাও বাধা থাকতে পারতেন না তিনি। কর্মজীবনে তাই বারবার স্থান বদল করেছেন। অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন জীবনের পাঠশালা থেকে। 'বঙ্গবাণী'তে সহকারী সম্পাদকের কাজও করেছেন। 'বঙ্গশ্রী; ;সংবাদ', 'খবর' প্রভৃতি কাগজগুলোতে সাংবাদিকতার কাজও করেছেন। স্ত্রী-পুত্র পরিবারের কথা মাথায় রেখে বারবার উপার্জনের চেষ্টা করেছেন। বিজ্ঞাপন লেখার কাজও গ্রহণ করেছেন।

বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে যুগ্ম সম্পাদনা করেছেন 'কবিতা' পত্রিকা; স্থায়ী হন নি বেশি দিন। আবার, ১৯৪০-এ সঞ্জয় ভট্টাচার্যের সঙ্গে 'নিরুক্ত' পত্রিকাও সম্পাদনা করেছেন। ১৯৩৩-এর মধ্যেই তিনি গল্পকার হিসেবে স্বতন্ত্র শিল্পি হয়ে ওঠেন। ১৯৩৭-৫৪ চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গেও প্রেমেন্দ্রের ঘনিষ্ঠ যোগাযাগ তৈরি হয়। ১৯৪২ থেকে তিনি 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পি সঙ্ঘের' সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৭৬-এ 'ভারতীয় প্রগতি লেখক সঙ্ঘ 'নতুন করে প্রতিষ্ঠিত হলে তার প্রাদেশিক শাখার সভাপতি পদে নির্বাচিত হন তিনি। প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পগন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল : বেনামী বন্দর (৭টি গল্প, ১৯৩০); পুতুল ও প্রতিমা (৯টি গল্প, ১৯৩২); মৃত্তিকা (৭টি গল্প, ১৯৩৫); অফুরন্ত (১০টি গল্প, ১৯৩৬); মহানগর (৬টি গল্প, ১৯৩৭); নিশীথ নগরী (৭টি গল্প, ১৯৩৮); ধূলিধূসর (১৩টি গল্প, ১৯৩৮); কুড়িয়ে ছড়িয়ে (৮টি গল্প, ১৯৪৬), সামনে চড়াই (৭টি গল্প, ১৯৪৭)।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প (১৮টি গল্পের সংকলন) নাভানা প্রকাশনা থেকে ১৯৫২ সালে প্রকাশিত হয়।

সপ্তপদী (৭টি গল্প, ১৯৫৫); প্রেমই ধন্বন্তরী (৮টি গল্প, ১৯৫৯); যখন বাতাসে নেশা (৪টি গল্প, ১৯৬২); শ্রাবণে ফাল্গুনে (১২টি গল্প, ১৯৬৫); সালঙ্করা (৮টি গল্প, ১৯৬৬); হাতে হাত রেখো (২টি দীর্ঘ গল্পের সংকলন, ১৯৬৭); অষ্টপ্রহর (৮টি গল্প, ১৯৭৩); সবুজে সোনায় (৫টি গল্প, ১৯৭৫); সংসার সীমান্তে (১২টি গল্প, ১৯৭৭)।

ওরিয়েন্ট লংম্যান প্রকাশনা ৩টি খণ্ডে ১৯৮৭ সালে প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্প সমগ্র প্রকাশ করে।

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাডেমি থেকে সুমিতা চক্রবর্তী প্রেমেন্দ্র মিত্রের জীবনীগ্রন্থা প্রকাশিত হয়।

প্রায় সুদীর্ঘ ৬৪ বছরের সাহিত্যচর্চায় পেয়েছেন একের পর এক পুরস্কার ও সম্মান। ১৯২৯ থেকে জীবনের শেষ পর্যন্ত প্রায় ২৮টি গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এছাড়াও আছে — প্রবন্ধ, কাব্য, অনুবাদ, নাটক, উপন্যাস, কিশোর গল্পগ্রন্থ ইত্যাদি। ১৯৮৮-র ৩ মে দুরারোগ্য ব্যাধিতে তাঁর জীবনাবসান ঘটে।

২৭.৩ 'কল্লোল' ও প্রেমেন্দ্র মিত্র

গল্পকার প্রেমেন্দ্র মিত্রের আবির্ভাব প্রবাসী পত্রিকার হাত ধরে ১৯২৩-২৪ খ্রিষ্টাব্দে। সেইসময় বাংলা সাহিত্যে স্বমহিমায় বিরাজ করছেন রবীন্দ্রনাথ , চলিত ভাষায় 'সবুজ পত্র' হাতে আলোড়ন সৃষ্টি করে চলেছেন প্রমথ চৌধুরী। সাধারণের ঘরের সামান্য কথাকে আবেগে ভিজিয়ে সাহিত্যের পাতায় স্থান দিচ্ছিলেন শরৎচন্দ্র। সৌরীন্দ্রমোহন, মনিলাল, হেমেন্দ্র কুমার ইত্যাদি 'ভারতী'র শেষ পর্বের অনেকের রচনায় এবং বিশেষ করে মনীন্দ্রলাল বসুর রচনায় চলছে একধরণের সৌখীণ রোমান্টিক প্রেমের প্রবাহ। অন্যদিকে যুদ্ধ পরবর্তী হতাশা, মার্কসের আর্থ-রাজনৈতিক চিন্তা, উদ্ভ্রান্ত রোমান্টিকতা, ফ্রয়েডের মনোবিশ্লেষণ আর নিম্নবর্গীয়দের নিরাবরণ বেদনা নিয়ে 'কল্লোল গোষ্ঠী' নিজেদের স্বতন্ত্র পথ প্রস্তুত করছিলেন।

'কল্লোল' পত্রিকার প্রথম প্রকাশ ১৩৩০ বৈশাখে। 'কল্লোলে'র দ্বিতীয় বছর শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় তাঁর

গল্প 'সংক্রান্তি', সপ্তম বছরের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যায় বের হয় 'মিছিল' এবং চতুর্থ সংখ্যায় কৃত্তিবাস ছদ্মনামে প্রকাশ পায় 'অসংলগ্ন' নামে আলোচনা। 'কল্লোলে'র নিয়মিত লেখক থাকা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতভেদের কারনে তিনি সরে আসেন। কিন্তু, 'কল্লোলে'র মৌল চেতনা ও তাঁর মৌল প্রবণতার মধ্যে পার্থক্য বিশেষ নেই। 'কল্লোল' গোষ্ঠীর অন্যান্য লেখকদের মতো তাঁর রচনাতেও সংশয় হতাশায় ছিন্ন ভিন্ন 'গোটা মানুষের' বিপর্যস্ত রূপটাই ফুটে উঠেছে। গতানুগতিকতার সুখী গড্ডলিকায় না ভেসে তিনিও নষ্ট সময় ও স্থবির সমাজের দাগ ক্ষত গুলোর অন্বেষণ করে গেছেন। শ্লীল অশ্লীলের প্রচলিত বেড়াজালকে নস্যাৎ করে তুলে এনেছেন মুটে, মজুর, খালাসী, কুলি, পতিতা এবং বস্তিবাসীদের নির্মম বেঁচে থাকা। কল্লোলের আসল রূপ সম্বন্ধে নিজে লিখছেন—

"আদর্শ নয়, অসামান্য নয়, কি ছিল তবে 'কল্লোল' ? ছিল, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর, বস্তু ও ভাব জগতের বিশ্বব্যাপী এক ক্ষুব্ধ শূন্যতা থেকে উথলে ওঠা একটা বিদ্রোহী তরঙ্গ, জীবন ও সভ্যতার সব কিছুর জড়ত্ব আর জীর্ণতা। যা পরীক্ষা করার জন্য দুর্বার"। ('কল্লোলের কাল', প্রেমেন্দ্র মিত্র, সাহিত্য সংখ্যা, দেশ, ১৩৮১, পৃ-৮৬)

তবে উল্লেখ্য, 'কল্লোলে'র রোমান্টিক ভাববিলাসের কোনও চিহ্ন তাঁর রচনায় দেখা যায় না। দুঃসহ বাস্তবতাই সেখানে অনিবার্য আবহ সঙ্গীত। জীবনের কদাকার ক্ষতগুলোর উপর আরোপিত মায়া অঞ্জন বুলিয়ে আত্মপ্রবঞ্চনা করতে চান নি তিনি। বরং নিরাবেগ বুদ্ধির আলোকে নিখুঁত ভাবে যাচাই করে নিতে চেয়েছেন। মানুষের মানে খুঁজতে বেড়িয়ে 'রক্ত, মাংস, হাড়মেদ মজ্জা,/ ক্ষুধা, তৃষ্ণা, লোভ, কাম, হিংসা —'('মানে'/ প্রথমা) স্থুল কুৎসিত প্রবৃত্তি কোনও কিছুই বাদ দেন নি। 'কল্লোল যুগ' গ্রন্থে প্রকাশিত অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্তকে লেখা কয়েকটি চিঠিতে সেই জীবনের অর্থ সন্ধানের আন্তরিক যন্ত্রণার ছবিটা জীবন্ত হয়ে উঠেছে —

'আসল কথা কি জানিস অচিন, ভালো লাগে না।' বন্ধুর প্রেমে আনন্দ নেই, নারীর মুখেও আনন্দ নেই, নিখিল বিশ্বে প্রাণের সমারোহ চলছে তাতেও পাইনা কোনও আনন্দ। (*কল্লোল যুগ,* অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত)

"জীবন নিয়ে কি করতে চাই ভালো করে বুঝি না, যা বুঝি তাও করতে পারি না। জীবনটাকে যে বেঁকিয়ে দুমড়ে বিকৃত করে ছেড়ে গেল, আর যে প্রাণপণ শক্তিতে জীবনকে বিকৃত করার চেষ্টা করলে, দুজনেই বাজে কাজে হয়রান হল সমানই। (*কল্লোল যুগ,* অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত,)

'কেন লিখি' প্রবন্ধে তিনি স্পষ্ট জানাচ্ছেন- "লেখাটা শুধু অবসর বিনোদন নয়, মানসিক বিলাস নয়। সামনে ও পেছনের এই দুর্ভেদ্য অন্ধকারে দুর্জয়ে পণ্যময় জীবনের কথা জীবনের ভাষায় বলার বিরাট বিপুল এক দায়। আমি লেখার একটি কারণই বুঝি, — বুঝি যে সত্যিকার লেখা শুধু প্রাণের দায়েই লেখা যায় — জীবনের বিরাট বিপুল দায়।"

মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের অসহায়তা, নিরুপায় রিক্ততা, নৈতিক ভ্রষ্টতা, মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা, যুগের বিকৃতি ও যন্ত্রণা, নগরের কলুষ ভাঙন, পতিতার বীভৎস বাস্তব এককথায় এক সর্বাত্মক বিনষ্টির চিত্র এক স্বতন্ত্র সুরে বেজে উঠেছে তাঁর সমস্ত গল্প জুড়ে।

২৭.৪ 'মহানগর' গল্পে নাগরিক জটিলতা ও অস্থিরতা

প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পে মহানগর যন্ত্রের শিকলে বাঁধা বীভৎস যন্ত্রণার অস্থির কবিতা। কখনও তা আকাশের নীচে ব্যাপ্ত হয়ে শুয়ে থাকা বিশাল কোনও ক্ষতের মতো। আবার কখনও তা মিনারে, মন্দির চূড়ায় অথবা প্রাসাদ

শিখরে মানুষের আত্মিক প্রার্থনার মতো। আলো-আঁধারির সহবাসে তার চেতনা যেন কোনও ধূসর অরণ্য।

নাগরিক চৈতন্যের নিজস্ব প্রবাহের জটিল চলনটি নিজেই হয়ে উঠেছে এক বিস্ময়কর সঙ্গীত। ধাতুর সঙ্গে ধাতুর সংঘাত, যন্ত্রের সঙ্গে যন্ত্রের সংঘর্ষ আর শব্দে শব্দে বিস্ফারিত আর্তনাদ কেবল। সুর চলেছে আঁকাবাঁকা সর্পিল পথে। মিশে যাচ্ছে জলের ঢেউয়ের সুর, কোমল রোম্যান্টিক স্বর , উত্তেজিত জনতার সম্মিলিত পদধ্বনি, মধ্যরাতের নির্জন অবসাদ আর অনির্দিষ্ট একাকিত্বের কানাকানি। গন্তব্যহীন এক বিচিত্র সুরহীন অথচ সুরেলা কাব্যিকতা। যেন ইট কাঠ পাথরের ফ্রেমে ঘেরা কোনও সুচিশিল্প। সুঁচ দিয়ে গেথে গেথে বুনে তোলা হচ্ছে যাপনের টুকরো টুকরো খণ্ড খণ্ড চিত্র —

"লক্ষ জীবনের সূত্র নিয়ে মহানগর বুনছে যে বিশাল সূচীচিত্র, যেখানে খেই যাচ্ছে নিশ্চিহ্ন হয়ে হারিয়ে, উঠছে জড়িয়ে নতুন সুতোর সঙ্গে অকস্মাৎ — সহসা যাচ্ছে ছিঁড়ে, সেই বিশাল দুর্বোধ্য চিত্রের অনুবাদ থাকবে সে-সঙ্গীতে।"

এই মহানাগরিক মহাকাব্যের কিংবা মহাসঙ্গীতের একটা বিক্ষিপ্ত কাহিনী উঠে এসেছে 'মহানগর' গল্পে। শিশুর অনাবিল কৌতূহলী দৃষ্টির প্রেক্ষিতে নগর জীবনের কলুষ ও ভাঙনের 'পাঁক'চিত্র উঠে এসেছে গল্পটিতে। এখানে তাঁর 'উপনয়ন' উপন্যাসের মতো অর্থনৈতিক ও নৈতিক বিপন্নতার বিশদ কোনও ছবি নেই। আছে বালকের আচ্ছন্ন চোখে দেখা নাগরিক বিকৃতির সাঙ্কেতিক ব্যঞ্জনা।

২৭.৫ পতিতা জীবন

'আজ
বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে বন্দী মোর ভগবান কাঁদে,
কাঁদে কোটি মার কোলে অন্নহীন ভগবান মোর;
আর কাঁদে পাতকীর বুকে
ভগবান প্রেমের কাঙাল !' ('দেবতার জন্ম হ'ল' / প্রথমা)

কল্লোলীয়দের মতই তিনিও সাহিত্যের অহেতুক আভিজাত্যে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর বক্তব্য-

"সবচেয়ে বড় অপরাধ, তারা নাকি সাহিত্যে অভিজাত্য মানে না। মুটে, মজুর কুলি খালাসী , দারিদ্র্য বস্তি ইত্যাদি যে সব অস্বস্তিকর সত্যকে সর্দি বাত স্থূলতা ইত্যাদির মতন অনাবশ্যক অথচ আপাত অপরিহার্য বলে জীবনেই কোনরকমে ক্ষমা করা যায়, সাহিত্যের স্বপ্ন বিলাসের মধ্যেও এই আধুনিকেরা নাকি টেনে আনতে চায়। শুধু তাই! বস্তির অন্তরের জীবন্ধারাকে তারা প্রায় প্রাসাদের অন্তরালের জীবনধারার মত সমান পঙ্কিল মনে করে। "(প্রেমেন্দ্র মিত্র, 'কল্লোলের কাল', সাহিত্য সংখ্যা, দেশ, ১৩৮১)

পতিতা জীবনের কদর্য বীভৎসতা ও নির্জন প্রান্তিকতা প্রেমেন্দ্র মিত্রের বেশ কিছু গল্পে উঠে এসেছে। 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে', 'সংসার সীমান্তে' , 'লজ্জা' 'মহানগর' তারই বিভিন্ন মাত্রাভেদ। পূর্ববর্তী সাহিত্যিকদের সঙ্গে এ বিষয়ে তাঁর পার্থক্যের জায়গাটা স্পষ্ট —

"ভারতী গোষ্ঠী'র গল্পে ও শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে পতিতা নারীর চিত্র বিরল নয়। কিন্তু সর্বত্রই পতিতাকে নারীত্বের দুর্লভ মহিমায় আদর্শায়িত করার প্রয়াস চোখে পড়ে। তাদের একদা-কলুষিত জীবনের চারিদিক ঘিরে লেখক

যেন ধীরে ধীরে এক জ্যোতির্বলয় রচনা করে তোলেন। কিন্তু বাঙলা দেশের অধিকাংশ পতিতা জীবনের বাস্তব সমস্যা হল দুঃসহ দারিদ্র্য ও চরম আর্থিক অনিশ্চয়তার। কোন আদর্শের অবাস্তব আলোয় এই পতিতা নারীকে মহিমময়ী রূপে প্রতিভাত করতে চাননি।'' (গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাঙলা কথাসাহিত্য)

পতিতার অনুচ্চারিত আত্মিক আর্তনাদ শোনা যায় 'মহানগর' গল্পে । ছোট ছোট রেখায় নেহাত নিরাবেগ ভাবে আঁকা হয় পতিতার একটা স্কেচ। বালক রতনের চেতনা প্রবাহে সময় ও স্মৃতির হাত ধরে তৈরি হয় দিদি চপলার এক আবছা রেখচিত্র। রূপকথার শহরে তার গোপন অথচ মরিয়া অভিযানের কারণও দিদি চপলা। মহানগরের জটিল অরণ্যে মানুষ আসে যশ অর্থ উত্তেজনা বিস্মৃতি কত কিছুর খোঁজে। সেখানে গ্রামের ছেলে রতন এসেছে এক হারিয়ে যাওয়া মানুষ , এক হারিয়ে যাওয়া সম্পর্কের খোঁজে। সে শুনেছিল মহানগরে গেলেই তার দিদিকে পাওয়া যাবে। মহানগরীর বুকে উল্টোডিঙিতে নাকি তার নিষিদ্ধ অবস্থান। নিষিদ্ধ কারণ—

'' দিদিকে খোঁজার কথা তো কাউকে বলতে নেই । দিদির নাম করাও যে বাড়িতে মানা তা কি সে জানে না। অনুচ্চারিত কোনো নিষেধ তার শিশু মনের ব্যাকুলতাকে মূক ক'রে রেখে দেয়।''

কিংবা,

''কেউ যে তাকে দিদির কথা বলে না। দিদির কথাই যে বলতে নেই''।

নিষিদ্ধতার বেড়ায় জোর করে আটকে দেওয়া দিদি চপলার কাহিনী অস্পষ্ট ভাবে পাওয়া যায় ফ্ল্যাশব্যাক পদ্ধতিতে। পতিতা বানিয়ে তোলার সামাজিক ষড়যন্ত্রের খোলস খুলে যায়। পারিবারিক রাজনীতির ইতিহাসটিও গোপন থাকে না। গ্রামের মেয়ে চপলা একসময় বধূ হয়ে যায় পাশের এক গ্রামে। বালক রতনও মাঝেমধ্যেই সেখানে যেত দিদির টানে। মাতৃহীন বালক রতনের কাছে দিদিই ছিল সব কিছু। একসময় সেখানেও বাধা আসে। দিদির শ্বশুর বাড়ির লোকেরা এবং থানার চৌকিদার তাদের বাড়িতে এসে বলে দিদিকে নাকি কারা ধরে নিয়ে গেছে। রতনের ইচ্ছে হয় বলে, কেন কেউ কেড়ে নিয়ে আসছে না তাহলে? আরো কিছুদিন পরে শোনে দিদিকে নাকি উদ্ধার করা হয়েছে কোন এক দূরদেশ থেকে। ভাবে, এইবার তাহলে দিদি আসবে। অপেক্ষা করতে করতে একসময় নিজেই যায় দিদির শ্বশুর বাড়ি। কিন্তু এবাড়ির মতো ওবাড়িতেও নিরেট নীরবতা। অদ্ভুত ভাবে নিশ্চুপ এবং উদাসীন সকলেই। এমনকি তার বাবাও। উপরন্তু বাবা তাকে জানিয়ে দেন, দিদি নাকি আর কোনও দিনই আসবে না। দিদির খোঁজ, দিদির নাম সবের ওপরই নিষিদ্ধতার লেবেল সেঁটে দেওয়া হয়।

যে মহানগরে মানুষ নিজের আত্মাকে হারিয়ে ফেললে আর খুঁজে পায় না সেখানে রতন আসে হারানো দিদিকে খুঁজতে। উল্টোডিঙি নামটুকু শুধু সম্বল করে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়ায় সে। শেষমেষ দিদির সহগামী এক নারীর হাত ধরে পৌঁছে যায় দিদির কাছে। বিস্মিত চপলার বিস্ফারিত আবেগ আর একটুকরো সংলাপেই তার ভিতরের হাহাকারটা বেড়িয়ে আসে —

''উত্তর না দিয়ে চপলা হঠাৎ ছুটে এসে রতনকে বুকে চেপে ধরে, তারপর এদিক-ওদিকে চেয়ে অবাক হ'য়ে ধরা গলায় বলে, 'তুই একা এসেছিস?''

তার গলায় প্রান্তিক হয়ে থাকার যন্ত্রণাটা গোপন থাকে না। তার মাটির ঘরের দামি দামি জিনিস, বস্তুর জৌলুস আরো একবার তার পেশার পরিচয় দিয়ে যায়। ভাইয়ের বারবার বাড়ি ফেরার অনুরোধে তাকে শেষমেষ কাতরকণ্ঠে জানিয়ে দিতে হয়, তার বাড়ি ফেরা হবে না। কারণটা সে না বললেও পরিস্কার - সমাজ এবং পরিবার তাকে ঘরে

ফিরতে দেবে না। একটা আকস্মিক দুর্ঘটনা, যেখানে সম্ভবত তার নিজস্ব কোনও দায়িত্ব ছিল না, তবু তাকেই নির্বাসনে পাঠানো হয়। তার অস্তিত্বকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয় পরিবার থেকে। বিপর্যয়ের সমস্ত দায় মাথায় দিয়ে তাকে ছুঁড়ে ফেলা হয় আস্তাকুঁড়ে। অপাঙক্তেয় এক নির্জনতায়। সেখানে সে নির্মম ভাবে একা। তাই ভাই রতন যখন তাকে সঙ্গে নিয়ে না যেতে পেরে তার কাছেই থেকে যাওয়ার আবদার করে, তখন—

''দিদির মুখের দিকে চেয়ে সে কিন্তু থমকে যায়! দিদির চোখে জল।

মাথা নীচু ক'রে চপলা ধরা-গলায় বলে, 'এখানে যে তোমার থাকতে নেই ভাই!' ''

বিমূঢ় রতন বেদনায় স্তব্ধ হয়ে যায়। চপলা তার হাতে অর্থ গুঁজে দেয়। কিন্তু বালকের অনুভূতি তখন অসাড় হয়ে গেছে। তবু, সর্বাত্মক বিনষ্টিতে গল্প শেষ হয় না। কিছু দূর চলে আসার পরেও আবার একবার ফিরে যায় রতন দিদির কাছে। বড় হয়ে দিদিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার স্বপ্ন শুনিয়ে যায় সে। কিন্তু সেটাও যে অনির্দেশ্য এবং নৈরাশ্যময়, যবনিকা পতনেই তার ইঙ্গিত স্পষ্ট —

'' মহানগরের ওপর সন্ধ্যা নামে বিস্মৃতির মতো গাঢ়''।

২৭.৬ 'মহানগর' ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিসত্তা

বিপন্ন জীবনের অনবদ্য কাব্য 'মহানগর' গল্প। নাগরিক জটিলতা, ও নগর-মানসের আঁধার-আচ্ছন্ন দিকগুলি প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতাতেও বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে। তাঁর 'প্রথমা'র 'নগর-প্রার্থনা' কবিতায় 'লৌহ-কাষ্ঠ', লোভ আর চক্রান্তে আকণ্ঠ কলুষিত 'পতিতা'-রূপী মহানগরকে কালিমামুক্ত করার জন্য তিনি ''সৌম্যশুচি কুমার সন্ন্যাসী''-কে আহ্বান করেছেন। 'মহানগরে'ও চূড়ান্ত অনিশ্চয়তার মাঝে নির্জন রতন তার পতিতা দিদিকে শোনায় সম্ভাবনার কথা—

'বড়ো হয়ে আমি তোমায় নিয়ে যাব দিদি। কারুর কথা শুনব না!'

ব'লেই সে সোজা দরজার দিকে এগিয়ে যায়। তার মুখে আর নেই বেদনার ছায়া, তার চলার ভঙ্গি পর্যন্ত সবল; এতটুকু ক্লান্ত যেন আর নেই।'

'শহর' কবিতায় কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র (বিষ্ণু দে সম্পাদিত 'একালের কবিতা সঙ্কলনে' প্রকাশিত) লিখছেন —

'চিমনি তোলা ঊর্ধমুখে আকাশ পানে চেয়ে
কি ভাবে সে-ই জানে!
ভেবে-ভেবে পায় কি নিজের মানে
পোল বেঁধেছে কল ফেঁদেছে
বসিয়ে বাজার হাট
রাস্তা পেতে মেলেছে ঢের রং- বেরং-এর ঠাট
তবু যেন জংলা আদিম জলা
জুড়ে আছে আজো বুকের তলা'
''এই শহরে' উঠে এসেছে কবির আক্ষেপ

"যাদের তুমি চিনতে, তারাও
হারিয়ে যাবে
এই শহরে"।

আলোচ্য "মহানগর" গল্পেও আছে এই হারিয়ে যাওয়ার কথা। রতন নামে এক বালকের মহানগরে হারিয়ে-যাওয়া দিদিকে খুঁজে বের করবার কাহিনি— "যেখানে মানুষ তার নিজের আত্মাকে হারিয়ে খুঁজে পায় না, সেই মহানগর থেকে সে তার দিদিকে খুঁজে বের করবে"।

অথবা,

"মহানগরে অনেকেই আসে অনেক-কিছুর খোঁজে, কেউ অর্থ, কেউ যশ, কেউ উত্তেজনা, কেউ বিস্মৃতি, কেউ আরো বড় কিছু। সবাই কি পায়? পথের অরণ্যে হারিয়ে যায়। মহানগর তাদের চিহ্ন দেয় মুছে।"

বালকের অভিজ্ঞতার চোখে দেখানো হলেও "মহানগর" আসলে নগর জীবনের জটিলতার গল্প। উপরন্তু মহানগর বিষয়ে অভিমত প্রকাশের ক্ষেত্রে গল্পকার প্রেমেন্দ্র মিত্রের জীবন-সম্পর্কিত গভীর দার্শনিকতা কাব্যিক সুরে অভিব্যক্ত হয়েছে এ-গল্পে।

বালক রতন তার দিদিকে হারিয়েছে। গ্রামের এই সরল প্রাণবন্ত নারীকে অবস্থা বিপাকে আশ্রয় নিতে হয়েছে কলকাতার কানাগলিতে, পতিতা পল্লিতে। এই আন্তরিক বিষণ্ণতার পরিসরটি বালকের পক্ষে প্রথমেই প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তাই লেখক স্বয়ং দায়িত্ব গ্রহণ করে 'আমি' থেকে 'আমরা'র দিকে যাত্রা করেছেন। গল্পের সূচনায় তিনি মহানগরের পরিচয় দিতে গিয়ে অনবদ্য কাব্যিক উপমার ব্যবহার করেছেন— "যে মহানগর ছড়িয়ে আছে আকাশের তলায় পৃথিবীর ক্ষতের মতো, আবার যে-মহানগর উঠেছে মিনারে মন্দিরচূড়ায়, আর অভ্রভেদী প্রাসাদ-শিখরে তারাদের দিকে প্রার্থনার মতো মানবাত্মার।" লেখক পাঠকের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন মহানগরের পথে নামার জন্য - আর সেই পথের বর্ণনার ক্ষেত্রে পুনরায় আশ্রয় নিয়েছেন কাব্যিক উপমার'যে-পথ জটিল, দুর্বল মানুষের জীবনধারার মতো, যে-পথ অন্ধকার, মানুষের মনের অরণ্যের মতো, আর যে-পথ প্রশস্ত, আলোকোজ্জ্বল, মানুষের বুদ্ধি, মানুষের উৎসাহের মতো।' এই আলো আঁধারি ধূসরতা বর্ণনার পরেই লেখকের মন্তব্য "এ-মহানগরের সংগীত রচনা করা উচিৎভয়াবহ, বিস্ময়কর সংগীত।" সঙ্গীত, চেতনা এবং কাব্যিকতা সমস্ত মিলেমিশে গেছে গল্পে।

২৭.৭ গল্পের নামকরণ

মহানগরের সঙ্গে পাঠকের সাক্ষাৎকারে গল্পকার এবং গল্প শুধু সূত্রধর মাত্র। শুরুতেই লেখকের ডাকে পুনরাবৃত্তি - 'আমার সঙ্গে চলো মহানগরে' এবং 'আমার সঙ্গে এসো মহানগরের পথে'। তারপর যন্ত্রের আর্তনাদ, ধাতব শঙ্খনাদ এবং আতুর রোমান্টিকতার অস্ফুট শব্দের আলো আঁধারি পথ বেয়ে নগরের জটিল চৈতন্যের কিছু টুকরো ছবি উঠে আসে গল্পে। নৈরাশ্য অনিশ্চয়তা ও উল্লাসে ঘেরা নাগরিক প্রবাহের সঙ্গে ক্রমশ পরিচিত হয় পাঠক। তারপর শেষমেষ ,'আমি' ও 'আমরা' "সংকুচিত আড়ষ্টভাবে নদীর যে-শাখাটি ঢুকেছে নগরের ভেতর, তারই অগভীর জলের মন্থর স্রোতে ভেসে আমরা গিয়ে উঠব নড়ালের পোলের তলায় সেই পুরনো পোনাঘাটে"।

ধনতন্ত্রের আপাত ঔজ্জ্বল্য সত্ত্বেও তার নিঃসঙ্গ ও অনিকেত মানসচিত্রটি ক্রমে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। খেই হারিয়ে

যাওয়া ছেঁড়া তারের ভয়াবহ সাঙ্গীতিক মূর্ছনা আছড়ে পড়ে পাঠকের কানে এবং মনে। ইতিবাচকতার কাব্যিক কুয়াশা ক্যামোফ্লেজের মত ঘিরে থাকলেও আন্তরিক নেতির সুরটি আড়াল ভেঙে আস্তে আস্তে প্রকট হয়ে ওঠে। আর এই অন্ধকার দিকটিকে গন্তব্য হিসেবে নির্বাচন করার জন্যই বর্ষাকালের পটভূমিকে বেছে নেওয়া হয়েছে 'আষাঢ় মাসের ভোরবেলা। বৃষ্টি নেই কিন্তু আকাশ মেঘে ঢাকা', 'বাদলা রাতে আকাশে ছিল না তারা'। ধীরে ধীরে নাগরিক চালচিত্র জুড়ে দেখা যায় স্তিমিত আলো, আঁধার আর শূন্যতা। চেতনার কালো নদী শেষপর্যন্ত পৌঁছায় মাহানগরে। গল্পের ক্যানভাস জুড়ে রঙে বেরঙে তখন শুধুই মহানগর। বালক রতনের বিস্ময়কে পুঁজি করে পাঠকও অভিভূত হয়ে দেখে রূপকথার শহরকে - ''কল-কারখানার বিশাল সব দেহ উঠল জেগে নদীর দু-পারে। জলের ওপর তাদের লৌহ- বাহু তারা বাড়িয়ে দিয়েছে। বাঁধানো পাড় থেকে বড়ো-বড়ো ক্রেন উঠেছে গলা বাড়িয়ে; দুই তীরে সদাগরী জাহাজের আশেপাশে জেলে- ডিঙি আর খেয়া-নৌকা, স্টিমার আর লঞ্চ ভিড় করে আছে। এই মহানগর!'' গল্পের শেষও হয় মহানগরের ওপর গাঢ় বিস্মৃতির যবনিকা পতনে।

দ্বিতীয়ত, মহানগর স্বয়ং কেবল চরিত্র হিসেবে নয়, অন্যান্য চরিত্রের প্রেক্ষিত নির্মাণেও গল্পে তার ভূমিকা অনিবার্য। বালক রতন ও দিদি চপলার প্রায় নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পর্কের পটভূমিতেও সেই মহানগর। মহানগরই তৈরি করে দেয় বিচ্ছিন্নতার ব-দ্বীপ। গ্রামের নৌকা তাই শহরে 'উল্টোডিঙি', যোগাযোগ ছিন্নপ্রায়। শুধু তাই নয়, চপলার পতিতা হয়ে ওঠার পিছনেও পুঁজিবাদের আঁতুর ঘর নগরের অবদান অস্বীকার করা যায় না।

তৃতীয়ত, নগরে যন্ত্র সভ্যতার ঔদ্ধত্য জীবন যাপনকে ক্রমশ যান্ত্রিক ও ক্লান্তিকর তোলে। মানুষের চেতনায় বাসা বাঁধে তৃপ্তিহীনতার অ-সুখ। জৌলুষের বিষ বাতাস বিষাক্ত করে দেয় সহজ সরল বেঁচে থাকার রূপকথাকে। জন্ম হয় এক দুর্বোধ্য জটিলতার। নৈরাশ্য ও নিষ্ফলতা তার মূল সুর। নগরের এই ধূসর মহাকাব্য যথযথ ভাবে প্রকাশের জন্যও মহানগরের প্রাসঙ্গিকতা অনস্বীকার্য। আর গল্পকার সেই বিস্তৃত মহাকাব্যের কিংবা কিংবা মহাসঙ্গীতের একটুখানি ভগ্নাংশ তুলে এনেছেন গল্পটিতে।

সুতরাং, 'মহানগর' গল্পের নামকরণ সার্থক এবং উপযুক্ত এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

২৭.৮ প্রশ্নাবলী

১। 'মহানগর' গল্পে নামকরণের সার্থকতা বিচার করো।

২। 'মহানগর' গল্পে কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিসত্তার যে পরিচয় ফুটে উঠেছে তার আলোচনা করো।

৩। যে নাগরিক জটিলতা ও অস্থিরতা 'মহানগর' গল্পের জন্ম দিয়েছে তার পরিচয় দাও।

৪। পতিতার আর্তি মহানগর গল্পে যেভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে তার পরিচয় দাও।

৫। গল্পকার প্রেমেন্দ্র মিত্র ও গল্প 'মহানগর'-এর আত্মিক যোগসূত্রটি নির্মাণ করো।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১। গল্পে রতন চরিত্রটির পরিচয় দাও।

২। রতন ও তার দিদির সম্পর্কগত নিষ্ফলতার জায়গাটি চিহ্নিত করো।

৩। বালকের গ্রামের সরল বেঁচে থাকার রূপকথা সময়ের জটিলতায় কীভাবে বিপন্ন বোধ করেছিল তার পরিচয় দাও।

৪। কল্লোলের যুগ ও 'মহানগর' গল্পের মূলভারে অঙ্গাঙ্গী যোগসূত্রটির পরিচয় দাও।

৫। ' মহানগর' গল্পে বারবার আছড়ে পড়েছে যে যান্ত্রিক আর্তনাদ তার পরিচয় দাও।

৬। গল্পটিতে মহানগরের পরিচয় যেভাবে বর্ণিত হয়েছে তার পরিচয় দাও।

৭। গল্পটির ভাষায় মাঝে মাঝেই যে সাঙ্গীতিক মূর্ছনার প্রসঙ্গ আছে , সংক্ষেপে তার উল্লেখ করো।

৮। বালক রতনের অভিজ্ঞতায় মহানগর কীভাবে উঠে এসেছে তার বর্ণনা দাও।

৯। চপলা চরিত্রটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

১০। চপলাকে কেন্দ্র করে গ্রামীণ সমাজ জীবনে নারীর অসহায় অবস্থানটিকে চিহ্নিত করো।

২৭.৯ গ্রন্থপঞ্জি

১। অনিন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, *প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্প* — মননে সৃজনে, পুস্তক বিপণি, কলকাতা , ২০০৫

২। ড. রামরঞ্জন রায়, *প্রেমেন্দ্র মিত্রের বিচিত্র জগৎ*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা ১৯৮৯

৩। ড. রামরঞ্জন রায়, *প্রসঙ্গ ঃ প্রেমেন্দ্র মিত্র*, মান্না পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৪০৪ বঙ্গাব্দ

৪। ড. রামরঞ্জন রায়, *গল্পের ভুবনঃ প্রেমেন্দ্র মিত্র*, প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা, ২০১০

৫। সুমিতা চক্রবর্তী, *প্রেমেন্দ্র মিত্র*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি

৬। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *কালের পুত্তলিকা*

একক-২৮ ❑ আদাব — সমরেশ বসু

গঠন

২৮.১ প্রস্তাবনা

২৮.২ গল্পকার পরিচিতি

২৮.৩ দাঙ্গার পটভূমি ও খতিয়ান

২৮.৪ নিম্নবর্গীয় জীবনচিত্র

২৮.৫ মানবিকতায় উত্তরণের গল্প

২৮.৬ গল্পের নামকরণ

২৮.৭ শৈলী ও আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্য

২৮.৮ প্রশ্নাবলী

২৮.৯ গ্রন্থপঞ্জি

২৮.১ প্রস্তাবনা

রাজনীতির মধ্যে ছুঁচের মতো প্রবেশ করানো হয় ধর্মকে। ধর্মের আফিম ও ধর্মের বিষের যুগপৎ ক্রিয়াকে। ধর্মই হয়ে ওঠে বিভাজনের ফুসমন্তর। ঔপনিবেশিক প্রভুর খেলার পুতুল হয়ে ওঠে কলোনি রাষ্ট্র। 'অনুশাসন পর্ব' দীর্ঘ ও নিশ্চিত করে তোলার জন্যই তৈরি করা হয় সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ। বিনষ্ট করে দেওয়া হয় পারস্পরিক সৌহার্দ্য। ধর্মীয় ঘৃণা ও পরস্পরের দোষের সন্ধানে শাসকের ইন্ধন ও কলকাঠি কার্যত আগুন ধরিয়ে দেয়। দাঙ্গার হুজুগে মেতে ওঠে সমস্ত দেশ। অসহায়ের মতো তীব্র অনিশ্চিত হয়ে যায় প্রান্তিক জীবন গুলোও। বেঁচে থাকা , টিকে থাকা ও স্বাধীনতার স্বপ্ন ক্রমশ ম্লান হয়ে যায়। শাসক ক্রমাগত টান মারে পুতুল নাচের সুতোয়। আর অদ্ভুত এক গণ উন্মাদনায় বীভৎস দাঙ্গার নটরাজ নৃত্যে চলতে থাকে ধ্বংসের লীলা। দেশী- বিদেশি প্রশাসন যন্ত্রও এই প্রলয় খেলায় নিষ্ক্রিয় থাকে না। রক্ত , সংশয় আর সন্দেহে জন্ম নেয় এক নিথর মৃত্যু উপত্যকা। বিপন্ন খেটে খাওয়া মানুষগুলো অন্ধকারের আড়ালে প্রাণটুকু বাঁচাতে মরিয়া হয়ে ওঠে। কিন্তু অনিবার্য হননের হাত থেকে ছাড় পায় না কিছুতেই। মৃত্যুর গহ্বরে দাঁড়িয়ে 'আদাব' জানাতে হয় প্রিয়জনকে ও জীবনকে।

৪৬-এর দাঙ্গার এই তীব্র বিভীষিকাও সাহিত্যের ক্ষেত্রকে বন্ধ্যা করে তুলতে পারেনি। বিনাশ ও অবক্ষয়কে চৈতন্যে ধারণ করেই রচিত হয়েছে একের পর এক উপন্যাস, ছোটগল্প এবং আরো অনেক কিছু। ৪৬-৪৭ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা , নোয়াখালি বিহারের দাঙ্গায় হাজারে হাজারে মৃত্যু ও গৃহচ্যুতি, স্বজন হারানোর যন্ত্রণা লিপিবদ্ধ হয়ে আছে সাহিত্যের পাতায়। দলিলের মতো। নবেন্দু ঘোষের 'ফিয়ার্স লেন' শুরুই হয়েছে অজগরের মতো এঁকেবেঁকে যাওয়া থমথমে একটা গলি দিয়ে। এছাড়া আছে ১৬ আগাস্ট মুসলিম লিগের 'ডাইরেক্ট অ্যাকশনে'র ঘোষণা, শহরের নানান মিছিল শ্লোগান আর সতর্কতা, আর শেষমেষ পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'স্বাধীনতার স্বাদ' উপন্যাসেও '৪৭- এর ১৫ আগাস্টের ঠিক আগের সময়ের প্রায় শব ব্যবচ্ছেদ করা হয়েছে। দাঙ্গার বাইরের বিবরণ নয়, আছে মনের বিবরণ। বহির্বাস্তব কীভাবে মানুষের অবচেতনকে দুমড়ে মুচড়ে ভয়ে সংশয়ে বিকৃত করে তুলেছে — তার বিশ্লেষণ আছে। বিভূতিভূষণের 'কলিকাতা-নোয়াখালি-বিহার' আপাত ভাবে

তিনটে ভিন্ন ভিন্ন গল্প হলেও মনে হয় যেন একটা কাহিনির তিনটে স্তর। আবার জ্যোতির্ময়ী দেবীর 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' উপন্যাসে স্বাধীনতা পূর্ববর্তী দাঙ্গার আরেক চিত্র। একটি রাত্রির ভয়াবহ ধ্বংসকাণ্ড, মুহূর্তের মধ্যে কিশোরীর পরিবার শূন্য হয়ে যাওয়া এবং সমস্ত জীবন ধরে বিচ্ছিন্নতায় বন্দী হয়ে তার ক্ষত বয়ে বেড়ানো - এ সমস্তই লিখিত হয়েছে নারীর জবানবন্দীতে নারীর কলমে। প্রসঙ্গত উঠে এসেছে নোয়াখালি , বিহারের দাঙ্গাও। গৌরকিশোর ঘোষের 'দেশ মাটি মানুষ' নামক এপিক ট্রিলজির তৃতীয় খণ্ড 'প্রতিবেশী'তেও দেখি বাংলায় হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক এবং তার বিবর্তন। গোড়াতে যা ছিল ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সংঘাত, ক্রমশ তা গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্বে এবং শেষ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে পরিণত হয়ে দেশকে টুকরো টুকরো করেছে।

আবু রূশদএর 'হাড়' গল্পে সদ্য বিগতাযৌবনা নারীর আত্মরতির জটিল মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষিত হয়েছে কলকাতা-ঢাকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং বিদ্বেষের পরিপ্রেক্ষিতে। উল্লেখ করতে হয় তাঁর 'উস্তাদ মেহেরা খাঁ' গল্পটির কথা। কলকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রেক্ষিতে লিখিত গল্পটিতে সম্প্রাদায়গত বিদ্বেষ বিষাক্ততায় শিল্পির হত্যাই কেন্দ্রীয় বিষয় হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে দাঙ্গায় প্রিয় মৃত্যুর স্মৃতি, দেশভাগ, দেশত্যাগে ছিন্নমূল উদ্বাস্তু জীবন, নারীর পণ্যায়ন ও একটি প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরই মূল প্রতিপাদ্য হয়ে উঠেছে আলাউদ্দিন আল আজাদের 'একটি কথার জন্ম' গল্পে। হিন্দু- মুসলমান দাঙ্গার প্রেক্ষাপটে চেতনাপ্রবাহ রীতিতে লিখিত দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যাএর 'ডাক' গল্পে 'পরীস্থান' (সম্ভবত পাকিস্তান নামটি না নিয়ে লেখক সচেতন ভাবে এই নামটি গ্রহণ করেছেন) নামক মুসলিম রাষ্ট্রে প্রাণভয়ে ভীত মুসলিমদের পলায়নের কাহিনী বর্ণিত। হাসান আজিজুল হকের 'পরবাসী' গল্পে দেখা যায় পাকিস্তান নামক ধর্মীয় রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে বাংলার খণ্ডিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামীণ জীবনের সহজ সুখ বিনষ্ট হয়ে শুরু হয় দাঙ্গা ও হত্যার লীলা। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পে ৪৬-এর দাঙ্গার কোনও প্রত্যক্ষ চিত্র না থাকলেও, আছে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে বিষাক্ত হুজুগের চিত্র। অবশ্য প্রান্তজনেরা শেষমেষ সেই আরোপ করা হুজুগকে ঝেড়ে ফেলে টিকে থাকার ধর্মে তৈরি করে ফেলে এক অপূর্ব সম্প্রীতির বোধ। সমরেশ বসুর 'আদাব' গল্পেও ৪৬-এর দাঙ্গা ও সাধারণ শ্রমিক মানুষের জীবনকে টিকিয়ে রাখার মর্মন্তুদ কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। এইভাবে, সাহিত্য কীভাবে, সমকালের আর্থ —রাজনৈতিক দলিল হয়ে উঠতে পারে, যন্ত্রণার্ত সময়ের যথার্থ প্রসব হয়ে উঠতে পারে সেটা চিহ্নিত করাই আলোচ্য গল্পপাঠের মূল উদ্দেশ্য।

২৮.২ গল্পকার পরিচিতি

মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষ হয়েও সমরেশ বসু (জন্ম ১৯২৪, ডিসেম্বর ১১, ঢাকা মুন্সীগঞ্জ মহকুমার পৈতৃক ভিটেয়) চরম দারিদ্র্যকেই তিনি নির্বাচন করেছিলেন। তাঁর এই প্রথা উল্লঙ্ঘনের অনিবার্য পরিণতি ছিল দারিদ্র্য। অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য কখনও তিনি ডিম বিক্রেতার ভূমিকায়, কখনও চটকলের মজদুরিতে আট আনা রোজে, কখনও ইছাপুরের অস্ত্র কারখানার কাজে - কোনও কিছুই তাঁর শিল্পিসত্তাকে ম্লান করতে পারেনি। বরং নিম্নবর্গীয় মানুষের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, সমাজের হাতে মার খাওয়া বিপর্যস্ত মানুষের প্রতিরোধের আশ্চর্য ক্ষমতা , তাঁর গল্পে দীপ্যমান হয়েছে বারবার। 'ন-নম্বর গলির' খলিফা, 'কিমলিসে'র বেচন, 'মানুষ রতন' গল্পের ত্যাবডা, এরা প্রত্যেকেই সমাজতলানির যাবতীয় ক্লিন্নতা থেকে সহজ মানবিকতায় উঠে আসে তাঁর গল্পে। মনুষ্যত্বের আঁধার বেদনা সমরেশ বসু এঁকেছেন গাঢ় রঙ দিয়ে। না তা কেবল কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে আসার জন্য নয়। তাঁর মতে- ''আমার কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদানের মধ্যে কোনো মার্ক্সীয় তত্ত্বজ্ঞান কাজ করে নি। বস্তুত পক্ষে,

১৯৪২ সালের আগেই কার্ল মার্ক বা এঙ্গেলস-এর নাম শুনলেও তাঁদের কোনো রচনাই তখনও আমি পড়িনি। এবং আমার দিক থেকে অকপটে স্বীকার করতেও কোনো বাধা নেই , আজ পর্যন্ত মার্কসবাদ সম্পর্কে তেমন কোনো গভীর অনুশীলনও আমার দ্বারা হয়নি"। (সমরেশ বসু 'ভারতের কমিউনিস্ট (অখণ্ড) পার্টি ও আমি', 'দেশ', ২২ নভেম্বর, ১৯৮৬,)। তবে, তিনি 'দেশ' পত্রিকাতে একথাও স্বীকার করেছেন, কমিউনিস্ট পার্টিতে আসার ফলেই চারপাশের মানুষ সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টি সজাগ হয়। অভিজ্ঞতার ব্যাপক প্রসার ঘটে।

সমরেশ বসু কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে আসেন তখন তিনি চটকল এলাকার এক শ্রমিক। যুক্ত হলেন চটকল শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনে। পার্টির কাজের সঙ্গে সঙ্গে হাতে লেখা পত্রিকাতে চলছিল নিয়মিত সাহিত্য চর্চা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখন জোরকদমে চলছে। ওদিকে, ১৯৩৯ এর ২৩ আগাস্ট সোভিয়েত জার্মান সম্পাদিত অনাক্রমণ চুক্তি ভঙ্গ করে ৮১-এর ২২ জুন সোভিয়েত দেশ আক্রমণ করে জার্মান নাৎসীরা।

১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সমরেশ বসু কমিউনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের ক্রিয়াকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেননি। কেননা তিনি তখনও প্রতিষ্ঠা পাননি। ৮৬-এ 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রথম গল্প প্রকাশিত হওয়ার পরে পরেই স্বীকৃতি লাভ ঘটে যায়। অনেকের মতে , তার আগেই 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় 'শেষ সর্দার ' নামে তাঁর একটি গল্প প্রকাশিত হয়। এসময় নাটক রচনার সূত্র ধরে গণনাট্য সঙ্ঘের সঙ্গেও তাঁর সংযোগ ঘটে। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে দলীয় রাজনৈতিক কাজের সঙ্গে সঙ্গে পাঠাগারে গিয়ে দেশি বিদেশি বহু গ্রন্থের পাঠ শুরু করেন। সাহিত্য পাঠের সঙ্গে সাহিত্য বিশ্লেষণ ও সাহিত্য তত্ত্ব বিচারও চলত। ১৯৪৯-এ কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনি ঘোষিত হয়। গ্রেপ্তার হন তিনি। জেলে লেখেন 'লেবার অফিসার নাটক' এবং 'উত্তরঙ্গ' উপন্যাস। তিনি কালকূট ছদ্মনাম প্রথম ব্যবহার করেন ' ভোটদর্পণ' নামে একটি রচনায় প্রবাহ পত্রিকায়, ১৯৫২ তে। ১৯৬২-৬৩ সাল নাগাদ তিনি আরো কয়েকজনের সঙ্গে নৈহাটি থেকে 'উত্তরঙ্গ' নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা শুরু করেন। এখানে প্রকাশিত 'স্বীকারোক্তি' গল্পের জন্য তাঁকে সাম্রাজ্যবাদের অনুচর, সি-আই-এর দালাল বলা হয়। তাঁর উপন্যাস 'বিবর' , 'প্রাজাপতি' , 'যুগ যুগ জীয়ো' ও বারবার তির্যক মন্তব্য ও সমালোচনার শিকার হয়েছে।। ১৯৮২তে 'মহানগর' পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে যুক্ত হন। ১৯৮৬ পর্যন্ত 'মহানগরের' সম্পাদক পদে থাকেন। তাঁর বিভিন্ন গল্পগ্রন্থের মধ্যে 'মরশুমের একদিন' (১৯৫৩), অকালবৃষ্টি (১৯৫৩), বনলতা (১৯৬৩), ছেঁড়া তমসুক (১৯৭১), চেতনার অন্ধকারে (১৯৭২) তাঁর প্রকাশিত গল্পসংখ্যা প্রায় ২০০টি। ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দে ১২ মার্চ তাঁর প্রয়াণ ঘটে।

২৮.৩ দাঙ্গার পটভূমি ও খতিয়ান

ভারতবর্ষে এত জাতি, এত সম্প্রদায় তবু সাম্প্রদায়িকতার ভাগ দুটি— হিন্দু ও মুসলমান। মানুষের সম্মিলিত বাস্তব জীবনযাপনে এই বিভাজন যত কৃত্তিম যত মিথ্যাই হোক না, সাম্প্রদায়িকতা বলতে হিন্দু - মুসলমানের বিভেদ- বিভাজন ছাড়া আর তেমন কিছু বোঝায় না"। - (প্রবন্ধ- 'মানুষের জীবনযাপন ঃ সাম্প্রদায়িক দেশভাগ দাঙ্গা' প্রাবন্ধিক —হাসান আজিজুল হক , গ্রন্থ- দেশভাগ, দাঙ্গা ও হিন্দু —মুসলমান সম্পর্ক, সঙ্কলন, সম্পাদনা ও অনুবাদ- অর্জুন গোস্বামী)

অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ায় ভারতে হিন্দু —মুসলিম দাঙ্গার প্রথম বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া যায়। ইংরেজ আমলে তার পৌনঃপুনিকতা বাড়তে থাকে। ১৮০৬-এ উত্তর প্রদেশের আজমগড় জেলায় বয়নশিল্পিদের গ্রামে, ১৮২০-তে কলকাতার বিভিন্ন জায়গায়, রোহিলখণ্ডের বেরিলি শহরে ১৮১৬ থেকে ১৮৭২ এর মধ্যে বিভিন্ন

সময়ে রামনবমী ও মহরমের শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে , ১৮৫৭তে হিন্দুজেলার বাকুট গ্রামে, ১৮৩০ ও ১৮৫০ এর দশকে উত্তর ভারতের অনেক শহরে, ১৮৫৫তে অযোধ্যায়, ১৮৮০-র দশকে উত্তর ভারতে, ১৮৮১-তে কলকাতায়, এরকম একের পর এক দাঙ্গার অভিঘাত নেমে আসে। ১৮৯৪ ও ৯৭ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ কলকাতার শিল্পাঞ্চলেও শুরু হয়ে যায় দাঙ্গা। এ প্রসঙ্গে ইতিহাসবিদ দীপেশ চক্রবর্তীর বক্তব্য— "এই গুরুতর দাঙ্গা ও অশান্তির ঘটনাগুলি বঙ্গের পাটকলশ্রমিকদের মধ্যে অকস্মাৎ ১৮৯৪ থেকে ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে সংঘটিত হয়। আশ্চর্যের কথা হল এই যে , ওই সব দাঙ্গায় অধিকাংশই ধর্মীয় ও সম্প্রদায়গত (Community) ভাবধারাকে কেন্দ্র করে ঘটেছিল, নিছক আর্থিক প্রশ্নকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হয়নি"। (*দাঙ্গার ইতিহাস,* শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)

ভারতের সার্বিক রাজনীতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ বাংলার রাজনীতি। এই বাংলায় ধর্মনৈতিক কারণে রাষ্ট্রনৈতিক বিভাজনের সূত্রপাত ঘটে ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গের সময় থেকেই। জন্ম নেয় মুসলমান ও হিন্দু নেতৃত্বাধীন দুট রাজনৈতিক দল - 'সারা ভারত মুসলিম লিগ' এবং 'সারা ভারত হিন্দু মহাসভা'। ১৯০৭-এ 'ব্যাধি ও প্রতিকার' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন —

" আমরা দুশত বৎসর পাশে পাশে থাকিয়া এক খেতের ফল, এক নদীর জল, এক সূর্যের আলোক ভোগ করিয়া আসিয়াছি তবু একত্রে মিলিয়াও আমরা বিচ্ছেদকে ঠেকাইয়া পারি নাই"।

এই বিচ্ছেদের অনুভূতি থেকেই তৈরি হয় ঘৃণার রাজনীতি।

মুসলিম লিগ প্রতিষ্ঠার পরে পরেই মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে সঞ্চারিত হতে থাকে নতুন রাজনৈতিক চেতনা। রাজনীতিতে মুসলিম অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায়। খিলাফত আন্দোলনে ধর্ম আর রাজনীতির একটা সম্মিলিত জায়গা তৈরি হয়। ওদিকে, কংগ্রেস চিত্তরঞ্জন দাশের হিন্দু-মুসলমান চুক্তি বাতিল করে। ১৯২৬-এর মাঝামাঝি নাগাদ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তীব্র আকার ধারণ করে। ১৯৩৫-এ 'কৃষক প্রজা পার্টি' গঠন করেন এ. কে. ফজলুল হক। ১৯৩৭থেকে ৪৭-এ বাংলার রাজনীতিতে মুসলিম নিয়ন্ত্রণ আরো বৃদ্ধি পায়। আর এরই অনিবার্য পরিণতি পাকিস্তান আন্দোলন। এই সময় পর্বে বাংলার চার চারটে মন্ত্রীসভা ক্ষমতাসীন হয়—

ক) ফজলুল হকের প্রথম মন্ত্রীসভা (১৯৩৭-৪১)

খ) ফজলুল হকের দ্বিতীয় মন্ত্রীসভা (১৯৪১-৪৩)

গ) নাজিমুদ্দিন মন্ত্রীসভা (১৯৪৩-৪৫)

ঘ) সোহরাওয়ার্দির মন্ত্রিসভা (১৯৪৬-৪৭)

কৃষক প্রজা পার্টির অভ্যন্তরীণ অসন্তোষে বিপর্যস্ত ফজলুল হক ১৯৩৭-এর ১৫ অক্টোবর প্রত্যক্ষ ভাবে মুসলিম লিগে যোগ দেন। তিনি একই সময়ে এক দিকে কৃষকপ্রজা পার্টির বিভক্ত অংশ অন্যদিকে বঙ্গীয় মুসলিম লিগে সভাপতিত্ব করে যান। এই বিভান্তিকর দ্বৈতবাদের ফল আরো মারাত্মক হয়ে উঠল। ওদিকে, মুসলিম লিগের সঙ্গে তেমন কোনও সৌহার্দ্যও কোনও দিন ছিল না। তার ওপর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা যখন জটিল হয়ে উঠছে তখন তিনি জিন্নাহর সম্মতির অপেক্ষা না করেই বাংলায় পাকিস্তান দিবস উদযাপন স্থগিত করে দেন। বাংলার লিগ হাই কম্যাণ্ডের অতিরিক্ত হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন ভাবে হিন্দু সম্প্রদায়ের সঙ্গে সমঝোতা করার চেষ্টাও করেন। যুদ্ধকালীন সংকটে কংগ্রেস ও অন্যান্য দলকে সঙ্গে নিয়ে কোয়ালিশন সরকার গঠনেরও প্রস্তুতি নেন। কিন্তু জিন্নাহ তাতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। শেষমেষ জাতীয় প্রতিরক্ষা কাউন্সিলের ঘটনাকে নিয়ে হক-জিন্নাহ

বিরোধ চরমে ওঠে। ফজলুল হক জিন্নাহকে 'রাজনৈতিক একনায়ক' আখ্যায় ভূষিত করে নিজে মুসলিম লিগ ওয়ার্কিং কমিটি থেকে পদত্যাগ করার কথা ঘোষণা করেন। বাংলার প্রতি মুসলিম লিগের অবজ্ঞার কথাও তীব্র ভাষায় ব্যক্ত করেন।

ফজলুল হক তাঁর দ্বিতীয় মন্ত্রীসভায় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মাধ্যমে সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ইতিমিধ্যেই 'কায়েদে আজমে'র অভ্যুত্থান এবং মুসলিম লিগের পাকিস্তান পরিকল্পনা তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেয়। উপরন্তু, নাজিমুদ্দিন, তমিজউদ্দিন ও সোহরাওয়ার্দির নেতৃত্বে বাংলার গদিচ্যুত মুসলিম লিগের ভালো মতো জনসংযোগ গড়ে ওঠে। 'স্টার অফ ইণ্ডিয়া', 'দৈনিক আজাদ' প্রভৃতি বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় হকের বিরুদ্ধে তীব্র প্রচার শুরু হয়ে যায়। মুসলম লিগের তীব্র বিরোধিতায় ক্ষমতাচ্যুত হন ফজলুল হক।

নাজিমুদ্দিন মন্ত্রীসভা গঠনের পরে পরেই ভয়াবহ মন্বন্তরের সম্মুখীণ হন। পাশাপাশি তাঁকে সোহরাওয়ার্দি ও আবুল হাশিমের বিরূপতারও মুখোমুখি হতে হয়। তাঁর ক্ষমতাচ্যুতির বছর খানেকের মধ্যে ৪৬-এর মার্চে বাংলা ও সমস্ত প্রাদেশিক পরিষদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গীয় আইনসভায় সোহরাওয়ার্দি ও আবুল হাশিমের নেতৃত্বে প্রাদেশিক মুসলিম লিগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু প্রশাসনিক সূত্রে অংশগ্রহণ করতে না পারায় কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিসন মন্ত্রীসভা গঠনের উদ্যোগ নেন সোহরাওয়ার্দি। তিনিও হিন্দু মুসলমান ঐক্যবদ্ধতার মাধ্যমে সামগ্রিক কল্যান সাধন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু প্রচেষ্টা সফল হয় নি। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও প্রতিরোধ করতে পারেন নি। উল্লেখ্য, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় তাঁর ভূমিকা নিয়ে নানা বিরুদ্ধ মতও পাওয়া যায়।

১৯৪১-এর শেষ থেকে ১৯৪৬ এর গোড়ার দিক পর্যন্ত হিন্দু মুসলিম সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ কিছুটা কম ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, খাদ্যাভাব, ভারত ছাড়ো আন্দোলন, মন্বন্তর এই সব কারণে দাঙ্গার প্রকোপ কিছুটা কম ছিল। ১৯৪৬-এর ২৯ জুলাইও সর্বধর্ম নির্বিশেষে ডাক — তার কর্মীরা ধর্মঘট স্থাপন করে ঐতিহাসিক ধর্মঘট পালন করে। ৩১ জুলাই লিগপন্থী দৈনিক 'মর্নিং নিউজ'-এর প্রথম সংবাদ শিরোনাম হিসেবে দেখা যায় — 'ধর্মঘট নয় প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সিদ্ধান্ত'। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কারণ হিসেবে মুসলিম লিগ কংগ্রেসের একগুঁয়েমি ও ব্রিটিশ সরকারের বেইমানিকে দায়ী করে। বলা হয়, মুসলিমদের প্রতি বৈষম্যের প্রতিবাদ ও স্বাধীন সার্বভৌম পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দেওয়া হয়েছে। আসন্ন সংগ্রামের জন্য তৈরি থাকতে বলা হল মুসলিমদের। জিন্নাহর বিবৃতিতে হুমকিও স্পষ্ট। ৩১ জুলাই থেকে ১৬ আগাস্ট 'মর্নিং নিউজ' পত্রিকার পাতায় বারবার এই দাঙ্গার চালচিত্র নির্মাণের প্রসঙ্গগুলো পাওয়া যায়। ১৬ আগাস্ট , শুক্রবার পাকিস্তান দাবীতে অঙ্গীকার বদ্ধ মুসলম লিগ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের আহ্বান জানায়। এই প্রথম ভারতে দাঙ্গার কর্মসূচি গৃহীত হয়, তাও আবার সেই দিনটিকে ছুটি ঘোষণা করে।

৪৬-এর ১৬ আগাস্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রামের উদযাপন শুরু হয়ে যায়, হত্যা, লুঠ, আগুন লাগানো ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে। কয়েকদিন ধরে চলে নারকীয় উন্মত্ততা। কলকাতার ইতিহাসে এই বীভৎসতাই 'The Great Calcutta Killing' নামে পরিচিত। প্রথমে বিচ্ছিন্ন ভাবে উত্তর কলকাতায় পরে অন্যান্য অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ে। কলকাতার দাঙ্গার প্রতিক্রিয়ায় বরিশাল, পাবনা, চট্টগ্রাম, মৈমনসিংহ , নোয়াখালি প্রভৃতি নানা জেলায় শুরু হয়ে যায় ছোট ছোট দাঙ্গা।

এই সামগ্রিক হত্যাকাণ্ডের মূল কলকাঠি যারা নেড়েছিলেন তারা না মুসলিম লিগ, না কংগ্রেস, তারা ভারতের

ঔপনিবেশিক সরকার। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ধর্মকে ব্যবহার করে , ধর্মের নামে মানুষের আগ্রাসী চেতনাকে উস্কে দিয়ে তারা খণ্ড খণ্ড করতে চেয়েছিলেন অখণ্ড ভারত রাষ্ট্রকে। ব্রিটিশ প্রভুরা নিছক নিজেদের সুবিধার্থে ধর্মের সুতোয় মেরেছিলেন টান। 'আদাব' গল্পের পটভূমি ও চরিত্রের চালচিত্র নির্মাণ করেছে এই দাঙ্গার প্রেক্ষাপট।

২৮.৪ আদাব গল্পের নিম্নবর্গীয় জীবনচিত্র

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ , আর্থিক অবক্ষয়, সংশয় ও নৈরাশ্যের বোধ এবং সর্বোপরি রুশ সাহিত্যের প্রভাবে সাহিত্য ক্রমে অবহেলিত 'নিম্নবর্গের' প্রতি তার দৃষ্টি ফেরায়। লোকায়ত জীবন ও সমাজের নীচুতলার মানুষদের সামান্য সুখ দুঃখ ও টিকে থাকার ইতিবৃত্ত সাহিত্যের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। 'কল্লোল', 'কালিকলম', 'প্রগতি' প্রভৃতি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে সেই সময়ের লেখকেরা নিম্নবিত্ত ও নিম্নবর্গের মানুষের কথা ভাবতে শুরু করেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র লেখেন 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে', অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত লেখেন 'কাঠ-খড়-কেরোসিন' , 'ধ্বন্বন্তরি' ; শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় লিখলেন 'কয়লাকুঠি', তারাশঙ্কর লিখলেন 'বেদেনী', 'ডাইনী' ; মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে উঠে এল 'প্রাগৈতিহাসিক' চিত্র। আপাতভাবে মনে হবে তৎকালীন এই গল্প গল্পকারের মধ্যে মিশে আছে মধ্যবিত্ত ভাবালুতা, রোম্যান্টিক আবেগ, বোহেমিয়ানিজম ও বাস্তবতা বর্জিত নিম্নবর্গীয় ছবি। কিন্তু সেই সময়ের চোখ দিয়ে দেখলে অনুমানের অসত্যতা সহজেই প্রমাণিত হয়।

চল্লিশের দশকের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অবশ্য বিলাসিতা কিংবা মোহের অবকাশটুকু দিল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, আগস্ট আন্দোলন, মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যা জনজীবনে যেভাবে একের পর এক বিপর্যয় ডেকে আনে, তারই চেহারা উঠে আসে গল্পকারদের গল্পে। সাম্যবাদী আন্দোলন ও শ্রেণীদ্বন্দ্বের ভাবনা নিয়ে সুবোধ ঘোষ লিখলেন 'ফসিল', 'গোত্রান্তর' ; তেভাগা আন্দোলনের প্রেক্ষিতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখলেন 'হারানের নাতজামাই', 'ছোটবকুলপুরের যাত্রী' সমরেশ বসু লিখলেন 'প্রতিরোধ' ; সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ লিখলেন 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী'। গল্পের আবহ ও আবহাওয়ায় ক্রমে নিম্নবর্গ মানুষের প্রান্তিক পৃথিবী সংক্রামক ব্যাধির মতো ছড়িয়ে পড়ল।

যাপিত জীবনের সূত্র ধরেই গল্পকার সমরেশ বসু বিশেষ শিল্পাঞ্চল এবং শিল্পাঞ্চল সংলগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকার কুলি কামিন মজুর ও বিভিন্ন পেশার নিচুতলার মানুষদের সঙ্গে ব্যক্তিগত মেলামেশার সুযোগ পান। তাদের জীবনের অন্ধিসন্ধি ও শ্রেণিগত ব্যবধানের প্রকৃত স্বরূপ তাঁর কাছে স্পষ্ট ছিল প্রথম থেকেই। সমাজের অবতলের এইসব মানুষদের জীবন যাপন, ভাষা , বলিষ্ঠ জীবনাবেগ ও অকৃত্তিম মানবিকতা বোধ তাঁকে গভীর ভাবে টানত। তার সঙ্গে যুক্ত হয় মার্কসীয় বিশ্বাস। প্রথম গল্প 'আদাব-এ ('পরিচয়', শারদীয়, ১৯৪৬) পাওয়া যায় নৌকার মাঝি আর সুতা মজুরের কথকতা, দ্বিতীয় (প্রকাশের দিক থেকে) গল্প 'নতুন খোকা' ('পরিচয়' , ১৯৪৬) রচনার পিছনেও সেই শ্রমিক চেতনা। গ্রামীণ কৃষকদের জোট বাঁধা নিয়ে লেখেন 'প্রতিরোধ' (পরিচয়, ১৯৪৭) , এরপর শ্রমজীবী সহজিয়া মানুষজনদের নিয়ে একের পর এক লেখেন ' মৃত্যুঞ্জয়', 'জলসা', 'একশ চারজন' 'একটি মুখ', 'অভিযাত্রী' ইত্যাদি। নদীর সঙ্গে লড়াই করা নিম্নবর্গীয় মানুষের জীবনযাত্রার ধরণ ও লড়াই উঠে আসে 'জোয়ার ভাঁটা', 'উজান' ও 'পাড়ি' গল্পে। তাঁর 'পশারিনী' গল্পের মূল চরিত্রগুলো বৃত্তিতে হকার। এভাবে তাঁর সমস্ত গল্প লেখায় ইতিহাসের শিকড় সন্ধান করলে দেখা যাবে — শহর ও গ্রামের এই নিম্নবর্গীয় মানুষেরা বারবার ফিরে এসেছে নিজস্ব তাগিদে।

'আদাব' গল্পে রাষ্ট্রীয় দুর্যোগের সমান্তরালে নিম্নবর্গীয় মানুষের প্রান্তিক দুনিয়াটি অনায়াসে উন্মোচিত হয়েছে। বৃত্তের কেন্দ্র যেমন থাকে তেমনি থাকে পরিধির অস্তিত্বও। ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দু যেমন থাকে তেমনি থাকে পাদদেশও। সমাজের পরিধিবাসী 'প্রান্তিক মানুষেরাই 'নিম্নবর্গ'। নিম্নবর্গীয় মানুষের রাজনৈতিক চৈতন্য, সমাজ-মানস , এবং আর্থিক বিপন্নতা অনেক সময়েই আলোচিত আলোকবৃত্তের বাইরে থেকে যায়। সমাজের উপরিস্তর বা সারফেস লেভেলের আর্থ —সামাজিক — রাজনৈতিক অবস্থান নিয়েই সমাজ ও রাষ্ট্রের যাবতীয় মাথা ব্যাথা। 'আদাব; গল্পে ঠিক তার বিপরীত ও ব্যতিক্রমী অংশটির চিত্র পাওয়া যায়।

'বুড়িগঙ্গার —হেইপারে-সুবইডায়' থাকা মুসলমান নায়ের মাঝি আর 'চাষাড় —নারাইনঞ্জের'কাছে থাকা নারায়ণগঞ্জের সুতাকলে কাজ করা হিন্দু মজুরের সংলাপের ভেতর থেকে উঠে আসে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার এক অন্যতর চিত্র। ধর্মীয় বিদ্বেষের আঁধার রাতে অন্ধকার দুই গলির মাঝখানে উলটে পড়া ডাস্টবিনটার দুপাশে আড়াল খোঁজে মাঝি আর মজুর। ধর্মীয় পরিচিতি নিয়ে তাদের অস্থিরতা , আতঙ্ক ও উদ্বেগ দেখে পরিস্থিতির বীভৎসতা দিব্যি টের পাওয়া যায়। একে পেট চলে না, পরিবারে চূড়ান্ত আর্থিক অনটন , তার ওপর এই দাঙ্গা। যুদ্ধ, মন্বন্তর, রায়ট এইসব অনেকাংশে তৈরি করা সংকটগুলো এমনিতেই তাদের আধমরা করে রেখেছিল। অর্থগত বিপন্নতা তাদের প্রায় খাদের কিনারে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। তার ওপর শুরু হয় এই হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা। ধর্ম এব ধর্ম পরিচিতি নিয়ে ভাববার কিংবা লড়াই করার কোনও বাসনা কিংবা অবকাশ কোনওটাই তাদের ছিল না। এমনকি কেন একে অপরের ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ ভাব দেখাবে, কেন প্রতিবেশির রক্তপাত ঘটাবে — তা তাদের কাছে অজ্ঞাতই ছিল। মুসলিম লিগ না কংগ্রেস কাদের জন্য এমন দাঙ্গা চলছে — তা তারা ভাবতেও চায় না। কেবল প্রশ্ন- এতে শুধু মৃতের সংখ্যা বৃদ্ধি ছাড়া দেশের কোন কাজে লাগবে? অর্থাৎ এতে না হবে দেশের উন্নতি বা স্বাধীনতা অর্জন না হবে অন্নের সংস্থান। কেন দেশের নেতৃস্থানীয়েরা এমন অযৌক্তিক হুজুগে ধনী দরিদ্র সকলকে উন্মত্ত করতে চাইছেন — তারা সেটা বোঝে না। শুধু অভিজ্ঞতা দিয়ে টের পায় —

"আরে আমিও তো হেই কথাই কই আর কী, হইব আমার এই কলাটা — হাতের বুড়ো আঙুল দেখায় সে — তুমি মরবা, আমি মরুম, আর আমাগো পোলামাইয়াগুলি ভিক্ষা কইরা বেড়াইবা। এই গেল সনে রায়টে আমার ভগ্নীপতিকে কাইটা চার টুকরো কইরা মারল। ফলে বইন হইল বিধবা ন্যাতারা সেই সাততলার উপুড় পায়ের উপুড় পা দিয়া হুকুম জারী কইরা বইয়া রইল আর হালার মরতে মরলাম আমরাই।

মানুষ না আমরা যান কুত্তার বাচ্চা হইয়া গেছি নইলে এমন কামড়া —কামড়িটা লাগে কেমবায়?"

বোঝা যায়, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী'-র মতোই এখানেও প্রান্তজনের মধ্যে ধর্মীয় বিদ্বেষটা বাইরে থেকে আরোপিত। রাষ্ট্রযন্ত্র ও শাসকেরা প্রয়োজন বুঝে এই বিষাক্ত বিষকে চাপিয়ে দিয়েছেন মাত্র। ধর্ম নিয়ে এই দাঙ্গা ও রক্তপাত তাদের কল্পনারও অতীত। হুজুগে কিংবা চাপে পড়ে সকলের সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে তারাও এই নারকীয় আক্রমণে সামিল হয়েছে সত্যি। কিন্তু তাদের প্রাণে কোনও বিষ বিদ্বেষ ছিল না। বরং একে অপরের প্রতি সহানুভূতি উদ্বেল হয়ে উঠতে দেখা যায় 'আদাব' গল্পের শেষাংশে। ইদের আগের রাতে বাড়ি ফিরতে মরিয়া হয়ে ওঠে মুসলমান মাঝি। প্রথমে দুজনে একসঙ্গে প্রাণভয়ে ছুট দিলেও পরে মাঝি একাই এগিয়ে যায় বাদামতলি ঘাটের দিকে। সুতাকলের হিন্দু মজুরকে নির্ভাবনায় থেকে যেতে বলে সেই হিন্দুপ্রধান এলাকায়। মাঝিকে ছাড়তে প্রাণ চায় না মজুরের। উদ্বিগ্নতায় অস্থির হয় হিন্দু মজুর। তবু ছাড়তে হয়। মুসলমানের মাঝির মুখে আদাব শুনে হিন্দু মজুরও তাকে আদাব জানায়। সুতাকলের মজুর একা বসে ভাবে মাঝির কথা — তার পরিবারের কথা। সবে যখন নিশ্চিন্তি হতে শুরু করেছে , তখনই বন্দুকের আওয়াজে টুকরো হয়ে যায় সব।

চূড়ান্ত বিষাদে মুসলিম মাঝির অন্তিম মুহূর্ত ও সংলাপ সে অনুভব করে মনে মনে যেন। আসলে দারিদ্র্য ও টিকে থাকার ধর্মে তারা দুজনে একই ভুমিতে দাঁড়িয়ে। সেখানে ধর্মগত কোনও বিভাজন নেই, কোনও বিদ্বেষ নেই। তাই নিম্নবর্গীয় মানুষের নিজস্ব বৃত্তে সমানুভুতির কোনও অভাব নেই।

২৮.৫ মানবিকতায় উত্তরণের গল্প

১৯৪৬-এর শারদীয় 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় সমরেশ বসুর প্রথম গল্প 'আদাব'। তখন তাঁর বয়স মাত্র বাইশ। ১৯৫৩-তে 'মরসুমের একদিন' গল্পসংকলনে গ্রন্থভুক্ত হয় 'আদাব'। আদাব' বিদ্বেষ থেকে মানবিকতায় উত্তরণের গল্প। দরিদ্র শ্রমজীবি মানুষই তার পথ প্রদর্শক।

গল্পের আরম্ভেই দেখা যায় এক বীভৎস পরিস্থিতি। নিস্তব্ধ রাত্রি কেঁপে ওঠে টহলদারি গাড়ীর চক্কর খাওয়ার আওয়াজে। শহর জুড়ে ১৪৪ ধারা আর কারফিউ জারি। চলছে হিন্দু —মুসলিম দাঙ্গা। অন্ধকারকে ঢাল করে লুঠেরারা বেড়িয়েছে তাদের অভিযানে। চারপাশে মৃত্যুর উল্লাস। বস্তিতে বস্তিতে জ্বলছে আগুন, ভেসে আসছে মৃত্যুকাতর মানুষের চিৎকার। উপরন্তু প্রশাসনও নিয়ন্ত্রণের তকমা আটকে গুলি গোলা নিয়ে আরেক তাণ্ডব চালাচ্ছে।

এমনই এক দাঙ্গামুখর রাতে অবিশ্বাসের দমবন্ধ আবহে দেখা হয় হিন্দু সুতামজুরের সঙ্গে মুসলমান মাঝির। দেখা হওয়ার শুরুতে থাকে কেবল অস্বস্তি — আতঙ্ক আর আক্রমণের প্রতীক্ষা। সংশয় আর সন্দেহ ঘুচতে চায় না কিছুতেই। জীবনানন্দ দাশের '১৯৪৬-৪৭' - কবিতার মতো —

"সকলেই আড়চোখে সকলকে দেখে
সৃষ্টির মনের কথা মনে হয় — দ্বেষ
সৃষ্টির মনের কথা : আমাদেরই আন্তরিকতাতে
আমাদেরই সন্দেহের ছায়াপাত টেনে এনে ব্যাথা"।

দুজনেই প্রথমে আটকে থাকে অবিশ্বাসের শৃঙ্খলে। আস্তে আস্তে ক্রমে বোঝে একে অপরের অসহায়তাকে। নিজেদের অবক্ষয়িত অবস্থা ও ক্ষীণ অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়। রাষ্ট্রনীতি ও প্রাশাসনের সমালোচনায় তারা পরস্পরের প্রতি আর মানবিক নৈকট্য অনুভব করে। টের পায় তাদের মতো উলুখাগড়ার প্রাণ গেলে রাজা —রাজড়ার কিছু যায় আসবে না।

দ্বিতীয়ত, 'বন্দেমাতরম' কিংবা 'আল্লাহ আকবর' শ্লোগান নিয়ে পৃথকীকরণের রাজনীতি তাদের ত্রস্ত করে। আতঙ্কিত করে। কিন্তু আলাদা করতে পারে না। বরং এই ধর্মীয় —রাজনৈতিক-সন্ত্রাস ও তার উদ্বিগ্নতাই তাদের আরো নিকট করে তোলে। ভয়ের আবহে খসে যায় ধর্মীয় পরিচিতি। কেবল বেঁচে থাকে টিকে থাকার লড়াই আর পারস্পরিক মানবিকতা।। তাই হিন্দুদের আস্তানায় পৌঁছেও হিন্দু সুতা মজুরের ভয় কাটে না। মুসলমান মাঝিকে এই এলাকায় একা ছাড়তে আবেগে উৎকণ্ঠায় কেঁপে ওঠে সে। নির্মিত হয়ে যায় 'আমি' থেকে 'আমরা'র যৌথভুমি। বিদায়কালে মুসলমান মাঝি আদাব জানায়। - ''ভুলুম না ভাই এই রাত্রের কথা। নসিবে থাকলে আবার তোমার লগে মোলাকাত হইব — আদাব।"

সুতামাঝিও জানায় — ''আমি ভুলুম না ভাই — আদাব"। মানবিকতায় উত্তরণ এখানেই।

তৃতীয়ত, সাম্প্রদায়িক ভেদ-বিভেদের মাঝে 'আদাব' শব্দটি সম্প্রীতির চিহ্নবাহক। 'আদাব' সম্ভাষণের মধ্যেই আছে শ্রদ্ধা ও প্রীতি। 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পে তুলসীগাছ যেমন সম্প্রীতি বোধের প্রতীক। ওই গাছের প্রতি মমত্ববোধের আড়ালেই মোদাব্বের, ইউনুস প্রভৃতি প্রান্তিক মুসলমান চরিত্রগুলোর দেশ — ধর্ম — নির্বিশেষে সহানুভূতির চিত্র পাওয়া যায়। তারা মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও ধর্মের নিরিখে দেশভাগের সময়ে দখল করা বাড়িতে হিন্দু ধর্মের প্রতীক তুলসী গাছটিকে নির্মূল করতে পারে না। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের প্রচলিত প্রবাহের প্রেক্ষিতে তাদের এই অসাম্প্রদায়িক আচরণ নিজেদের কাছেই বিসদৃশ লাগে। 'দেশভঙ্গের হুজুগে' অপরাধবোধ জাগে। তাই সান্ধ্য আড্ডায় বিপরীত ধর্ম সম্পর্কে তুমুল বিষোদ্গার করে। কিন্তু তবুও তুলসী গাছ কাটতে পারে না। তুলসী গাছটাকে কেন্দ্র করেই দেশচ্যুত হিন্দু নারীদের বাস্তুহীন জীবনের প্রতি সহমর্মিতা বোধ করে কেউ কেউ। মনে মনে একটা প্রান্তিক উদ্বাস্তু মানুষের যৌথ ভূগোল তথা সমভূমি নির্মিত হয়। সেখানে হিন্দু-মুসলিম কারোর কোনও পৃথক ধর্মীয় অস্তিত্ব নেই। সকলেই দেশছাড়া — সকলেই উদ্বাস্তু ও অনিশ্চিত জীবনের মুখোমুখি। এই গল্পেও 'আদাব' শব্দটি তাদের পারস্পরিক সৌহার্দ্য, শ্রদ্ধা ও বিপন্নতার সমভূমির প্রতি অঙ্গুলিসঙ্কেত করে।

গল্পের শেষেও, মুসলমান মাঝির বাড়িতে ইদ, তার সোহাগী বিবি, পোলাপান এসমস্ত আকাঙ্ক্ষিত দৃশ্যের কথা কল্পনা করছিল সুতা মজুর। কল্পনার আহ্লাদে সে তখন আপ্লুত। এমন সময় পুলিশি আক্রমণ, গুলির শব্দ, নীলচে আগুন সুতামজুরকে আপাদমস্তক আতঙ্কিত করে তোলে। একান্ত প্রিয়জনের সম্ভাব্য মৃত্যুতে " সুতা মজুরের বিহ্বল চোখে ভেসে উঠল মাঝির — বুকের রক্তে তার পোলামাইয়ার, তার বিবির জামা শাড়ি রাঙা হয়ে উঠেছে। মাঝি বলছে পারলাম না ভাই আমার ছাওয়ালরা আর বিবি চোখের পানিতে ভাসব পরবের দিনে দুশমনরা আমারে যাইতে দিল না তাগো কাছে"। মানবিকতা ছাড়া সহানুভুতির এই স্তরে পৌঁছানো সম্ভবই নয়। সুতরাং 'আদাব' যথার্থ অর্থেই মানবিকতায় উত্তীর্ণ একটি গল্প।

২৮.৬ গল্পের নামকরণ

'আদাব' শব্দের আক্ষরিক অর্থ সালাম, নমস্কার, অভিবাদন যেখানে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও প্রীতি থাকে, সেখানেই এমন সম্ভাষণ করা যায়। বিদ্বেষ ও বিভেদের আবহে এমন শব্দের ব্যবহার আশ্চর্য। পারিপার্শ্বিক অন্ধকারের মাঝে এমন একটা ইতিবাচক শব্দের ব্যবহার অদ্ভুত স্ফুলিঙ্গের নির্মাণ করে। নেতির কাঠিন্যতে ধাক্কা লাগে, ধ্বস লাগে, ক্রমে অস্ত্যর্থক শুভবোধ ছড়িয়ে পড়ে। বিষাক্ততার নাশ ঘটে। 'আদাব' শব্দটি এমনই শক্তিশালী।

সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের রক্তাক্ত পটভূমি দিয়েই গল্পের শুরু। নাগরিক জীবনে দাঙ্গার বিভৎসতা তখন তুঙ্গে। সন্দেহ আর আতঙ্কের বিষে বাতাস তখন ভারি। ধর্মীয় পরিচিতিই তখন মানুষের একমাত্র পরিচিতি। তার নিরিখেই বন্ধু আর শত্রুর লেবেল আটকানো হচ্ছে। ধর্ম ব্যতিরেকে যেন মানুষের আর কোনও বিশিষ্টতা কিংবা মূল্য নেই। এমনই এক পরিবেশে দেখা হয় দুই ধর্মের দুই খেটে খাওয়া মানুষের। প্রাথমিক ভাবে তাদের মধ্যে থাকে কেবল আশঙ্কা আর বিচ্ছিন্নতার চরাচর। একজন অন্যজনের কাছে যেন বিস্ফোরক দ্রব্য। বিশেষ করে তাদের সংকট ধর্মীয় অস্তিত্ব নিয়ে।

সুতামজুর হিন্দু আর নায়ের মাঝি মুসলমান। বিড়ি ধরাতে গিয়ে দেশলাইয়ের আগুনে একে অপরকে দেখে তারা প্রায় আঁতকে অঠে। ধর্মীয় পরিচয়গত ভিন্নতা তাদের কারোর কাছে আর অজানা থাকে না। কিন্তু ক্রমে বাহ্যিক পরিস্থিতির বিভীষিকা থেকে প্রতি মুহূর্তে আত্মগোপন করতে করতে কখন যেন তারা কাছাকাছি এসে

পড়ে। টের পায় — আরো এক ধর্মের কথা। বুঝতে পারে তাদের বিচ্ছিন্নতা আর বেশি করে বিপন্নতার দিকেই নিয়ে যাবে। অনুভব করে রাষ্ট্রযন্ত্র চলে তার স্বার্থে , রাষ্ট্রনীতি চলে নেতৃবৃন্দের ইচ্ছে ও সুবিধার্থে , আর প্রশাসন কেবল সঙ্গত রক্ষা করে মাত্র। বোঝে যুদ্ধের পরিকল্পনা করে দেশের ওপরমহলের মানুষেরা। আর তাদের মতো সাধারণ মানুষেরা অকারণ হুজুগে পড়ে একে অপরের প্রাণ নিয়ে কাড়াকাড়ি করে। কুকুরের মতো কামরা কামড়ি করে। অভিজ্ঞতা থেকে তৈরি সহজ দৃষ্টিতে তারা দেখতে পায় — এতে সামাজিক আর্থিক মানবিক অবক্ষয় হয় শুধু — কেবলই দেশের মানুষের জীবন নষ্ট হয়। পরাধীন দেশের কোনও উপকার হয় না। বিশেষ করে তাদের মতো নিম্নবিত্ত মানুষেরা কেবলই হারাতে থাকে আর হেরে যেতে থাকে।

সুতা মজুর আর নায়ের মাজি নিজেদের মতো করে একটা সমভূমি, একটা সমধর্ম খুঁজে পায়। তাই মাঝি ইদের জন্য বাড়ির কথা ভেবে উতলা হলেও , তাকে বিপদের মাঝে ছাড়তে আতকে ওঠে সুতা মজুর। বিদায়ের কালে, মাঝি বলে ওঠে সে কোনও দিন ভুলবে না এই রাতের কথা, ভাগ্যে থাকলে নিশ্চ্যই দেখা হবে আবার। তারপর সে আদাব জানায়। প্রত্যুত্তরে সুতামজুরও স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে তাকে আদাব জানায়।

এই একটি শব্দই দুই ধর্মের বিভেদের মাঝে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সম্প্রীতির এক বীজ বপন করে। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের আঁধারে যখন সমাজ, রাষ্ট্র সমস্ত কিছু আচ্ছন্ন তখন সুতা মজুর ও নায়েব মাজির পারস্পরিক সম্পর্ক ও প্রীতিকর এই সম্ভাষণ কার্যত গল্পটিকে অন্যমাত্রায় উন্নীত করে। 'আদাব' গল্পের নামকরণের সার্থকতা এখানেই।

২৮.৭ গল্পের শৈলী ও আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্য

'আদাব' গল্পের শৈল্পিক নিপুণতা বাস্তবিকই অভাবনীয়। ভাষায়, শব্দচয়নে, সংলাপের আঞ্চলিকতায়, বর্ণনার তীক্ষ্ণ তির্যকতায় সময়ের একটা স্ফুলিঙ্গ মূর্ত হয়ে উঠেছে সাহিত্যের সংরূপে। শাব্দিক স্কেচে কেবল সময় নয় চরিত্র দুটিও হয়ে উঠেছে জীবন্ত। চরিত্রের সংলাপ এতই স্বতঃস্ফূর্ত যে তা কখনই আলাদা করে আরোপিত বলে মনে হয় না। এছাড়াও আছে আরো কিছু উল্লেখযোগ্য বিশিষ্টতা—

প্রথমত, দাঙ্গার পরিবেশ বর্ণনায় নাটকীয়তা অনবদ্য। তবে কোথাও তা মাত্রা ছাড়িয়ে যায় নি। আবার কল্পনারও কোনও অবকাশ দেওয়া হয়নি।

দ্বিতীয়ত, সংলাপের ভাষায় আঞ্চলিকতার ব্যবহার চরিত্র দুটোকে আর জ্যান্ত করে তুলেছে।

তৃতীয়ত, চরিত্র ও স্থানের নামকরণ অত্যন্ত বাস্তবানুগ হওয়ায় কাহিনিটিকেও বাস্তব বলে মানতে কোনও অসুবিধা হয় না।

চতুর্থত, নির্ভার ও নির্মেদ কাহিনি দ্রুতগতিতে পরিণতির দিকে এগিয়ে গেছে।

পঞ্চমত, গল্পের বর্ণনা অংশের ভাষাও যথেষ্ট সংযত, তীক্ষ্ণ এবং লক্ষ্যাভিমুখী।

ষষ্ঠত, গল্পের ক্লাইম্যাক্স নির্মাণেও লেখকের নিখুঁত দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। মিয়াসাহেবকে নিয়ে সুতামজুরের কাল্পনিক মুহূর্তের নির্মাণ ভেঙে চুরমার হয়ে যায় 'হলট' শব্দে। একটা ছোট্ট শব্দ। অথচ কী অনিবার্য বাস্তব। স্বপ্নিল আকাঙ্ক্ষা ও বাস্তবতার সংঘর্ষে যেন একটা বিস্ফারিত মুহূর্ত —

"সুতা —মজুর একটা নিঃশ্বাস ফেলে। সোহাগে আর কান্নায় বিবি ভেঙে পরবে মিয়াসাহেবের বুকে।

'মরণের মুখ থেইকা তুমি বাঁইচা আইছ?' সুতা-মজুরের ঠোঁটের কোণে একটু হাসি ফুটে উঠল, আর মাঝি

তখন কী করবে? মাঝি তখন —

হল্‌ট

ধ্বক করে উঠল সুতা —মজুরের বুক''।

সপ্তমত, ছোটগল্পের স্বল্প পরিসরেও চরিত্র দুটির বিবর্তন গুরুত্বপূর্ণ। সংশয় সন্দেহ থেকে ক্রমে পারস্পরিক সহানুভূতিতে উত্তীর্ণ হওয়া অনবদ্য শৈল্পিকতায় চিত্রিত হয়েছে গল্পটিতে।

অষ্টমত, ছোটগল্প সাধারণত দুভাবে শুরু হয়- আকস্মিক ভাবে আর পূর্ব পরিকল্পিত পরিস্থিতির বর্ণনা দিয়ে। গল্পটি শুরু হয়েছে আকস্মিক ভাবে। গল্পের বিষয়, আবহ ও মেজাজ মেনে এই রীতিই এখানে স্বাভাবিক ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। -

"রাত্রির নিস্তব্ধতাকে কাঁপিয়ে দিয়ে মিলিটারি টহলদার গাড়িটা একবার ভিক্টোরিয়া পার্কের পাশ দিয়ে একতা পাক খেয়ে গেল। শহরে ১৪৪ ধারা আর কারফিউ জারী হয়েছে।''

নবমত, ছোটগল্পটির সমাপ্তিতে আছে অতৃপ্তি , আর তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে কিছুটা হতাশ্বাস ও বিষাদের ব্যঞ্জনা।

দশমত, গল্পের মধ্যে ১৪৪ ধারা, কারফিউ, রায়ট, লিগের নেতার মতো রাজনৈতিক প্রসঙ্গের পরিমিত ও সংযত মিশ্রণ লেখকের শৈল্পিক পরিণতির দিকে ইঙ্গিত করে।

২৯.৮ প্রশ্নাবলী

বিস্তৃত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১। 'আদাব' গল্পের শরীরে দাঙ্গার ক্ষত কীভাবে লেগে আছে তার পরিচয় দাও।

২। 'আদাব' গল্পের প্রেক্ষিত হিসেবে ৪৬-এর দাঙ্গার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত লেখ।

৩। 'আদাব; গল্পে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বিষাক্ত আবহের পরিচয় দাও।

৪। 'আদাব' গল্পটি কি শেষমেষ মানবিকতায় উত্তীর্ণ হতে পরেছে , মতামত জানাও।

৫। 'আদাব' গল্পে দাঙ্গা পরিস্থিতে নিম্নবর্গের যে চিত্র উদ্ঘাটিত হয়েছে তার পরিচয় দাও।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১। আদাব গল্পের নামকরণের সার্থকতা বিচার কর।

২। 'আদাব' গল্পে শৈলী ও আঙ্গিক গত বিশিষ্টতার পরিচয় দাও।

৩। গল্পে বর্ণিত সুতা মজুর ও নায়ের মাঝির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৪। গল্পের মধ্যে দাঙ্গার যে বীভৎসতার পরিচয় পাওয়া যায় তার উল্লেখ করো।

৫। রাষ্ট্র ও প্রসাসনের প্রতি নিম্নবর্গের মানুষ দুটির দৃষতিভঙ্গীর পরিচয় দাও।

৬। গল্পটি অবলম্বনে ধর্ম ও রাজনীতির যৌথ ক্রীড়ার পরিচয় দাও।

৭। গল্পে যে সমস্ত রাজনৈতিক প্রসঙ্গ উথথাপিত হয়েছে তার উল্লেখ করো।

৮। দারিদ্র্য কীভাবে দুই ভিন্ন ধর্মী নিম্নবরগীয় মানুষের মধ্যে সমভূমির নির্মাণ করেছে তার পরিচয় দাও।

৯। 'আদাব' গল্পের বরণিত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে উত্তরণের সঙ্গে 'একটি তুলসী গাছের কাহিনি' গল্পের যে সাদৃশ্য পাওয়া যায় তা নিয়ে আলোচনা করো।

১০। 'আদাব' গল্প রসঙ্গে দাঙ্গা ভিত্তিক আরো কয়েকটি গল্পের অতি সংক্ষিপ্ত পরচয় দাও।

২৮.৯ গ্রন্থপঞ্জি

সহায়ক গ্রন্থ-

১। ড. অজয় কুমার দোলুই, গল্পের শৈলী ঃ সমরেশ বসু ও অন্যান্য , পাণ্ডুলিপি , ২০০০

২। শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দাঙ্গার ইতিহাস, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স,কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, তৃতীয় মুদ্রণ ১৪০৫

২। সত্যজিৎ চৌধুরী, নিখিলেশ সেনগুপ্ত, বিজলি সরকার (সম্পাদনা), সমরেশ বসু ঃ স্মরণ — সমীক্ষণ, চয়নিকা, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৪

সহায়ক পত্র-পত্রিকা —

১। অশোকনগর, একাদশ বর্ষ, দশম সংখ্যা ১৪২৩, সমরেশ বসু সংখ্যা

২। এবং জলার্ক, জানুয়ারি- মার্চ, সমরেশ বসু সংখ্যা, ১৯৯৯

একক-২৯ □ দ্রৌপদী — মহাশ্বেতা দেবী

গঠন

২৯.১ প্রস্তাবনা
২৯.২ গল্পকার পরিচিতি
২৯.৩ নকশাল আন্দোলন ও 'দ্রৌপদী'
২৯.৪ অন্ত্যজ জীবনের ছবি
২৯.৫ পুরাণ
২৯.৬ শিল্প ও বাস্তবের মেল বন্ধন
২৯.৭ প্রশ্নাবলী
২৯.৮ গ্রন্থপঞ্জি

২৯.১ প্রস্তাবনা

বাংলা তথা ভারতে সত্তরের দশক সন্ত্রাসে সংগ্রামে মুখর এক ঐতিহাসিক অধ্যায়। একদিকে নিরবিচ্ছিন্ন রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস অন্যদিকে প্রতিবাদ প্রতিরোধ সশস্ত্র লড়াই। বিশেষত নকশালবাড়ি অভ্যুথান এ দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে একটি অন্যতম মাইলস্টোন। অর্থনৈতিক , সামাজিক , সাংস্কৃতিক সমস্ত পরিসরেই তার তীক্ষ্ণ অনুরণন দীর্ঘকাল বাজতে থাকে।

নকশালবাড়ি কৃষক অভ্যুত্থানের সলতে পাকানো শুরু হয়ে যায় উনিশশো পঁয়ষট্টি থেকেই। কৃষক আন্দোলন, ঘাঁটি এলাকা গঠন, লড়াইইয়ের পথ এই সমস্ত নিয়ে লিখতে শুরু করেন কমরেড চারু মজুমদার। লেখাগুলো গোপনে বিলি হতে থাকে উত্তরবঙ্গের কৃষক কর্মীদের মধ্যে, ছড়িয়ে পড়ে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কর্মীদের মধ্যেও। এই একই সময়ে লিন পিয়াও-এর 'জনজুদ্ধ দীর্ঘজীবী হোক' প্রবন্ধটি হাতে এসে পৌঁছায়। ক্রমে হুবুহু চীনের অনুকরণে স্থির হতে থাকে সশস্ত্র বিপ্লবের রূপরেখা। নকশাল বাড়ি, খড়িবাড়ি ও ফাঁসিদেওয়া এলাকায় কৃষকদের জঙ্গি লড়াই করার সাহস জোগায় চারু মজুমদারের দলিল ও কৃষকদের সশস্ত্র ইউনিট। ধানের গোলা লুঠ, বন্দুক দখল, জোতদারের আক্রমণের সমবেত প্রতিরোধ প্রভৃতি শুরু হয়ে যায় বছর খানেক আগেই। রননীতি হিসেবে গেরিলা যুদ্ধকেই সঙ্গত বলে মনে করা হয়। শুরু হয়ে যায় 'শ্রেণীশত্রু খতম অভিযান'। পাশাপাশি চলতে থাকে দমননীতি ও গ্রেফতার। ওদিকে, ১৯৬৭সালের মার্চ থেকে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে পশ্চিমবঙ্গে ২৬৯টি কলকারাখানায় লকআউট ঘোষিত হয়, ১২০০০লোক বেকার হয়ে পড়ে, পাশাপাশি, সুরমা টি এস্টেট, সিংবুলি, টিংলিং টি এস্টেট প্রভৃতি এলাকায় কৃষকেরা জমি দখল করা শুরু করে। ভারত জুড়ে বামপন্থীদের মধ্যে তখন শুরু হয়েছে তীব্র মতাদর্শগত বিভেদ। চীন ভারত সীমান্ত সংঘর্ষকে কেন্দ্র করেই এর সূত্রপাত। পার্টির অভ্যন্তরের বুর্জোয়া দালালদের চিহ্নিত করল কমিউনিস্ট কর্মীরা। শ্রমিক শ্রেণিকে বুর্জোয়া শ্রেণীর লেজুড়ে পরিণত করার হীন ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত করার চেষ্টা চলল। ওদিকে কৃষক আন্দোলন ক্রমশ উত্তাল হয়ে ওঠে। নকশালবাড়িতে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয় আদিবাসী নারী পুরুষ ও শিশুকে। প্রসাদজোতের মাটি লাল হয়ে যায় শহীদের রক্তে। প্রতিবাদ ও

প্রতিরোধের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ল গ্রামে শহরে সর্বত্র। কৃষকদের সঙ্গে শিক্ষিত তরুণদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে বাংলা, বিহার, অসম, ত্রিপুরা, ওড়িষ্যা, পাঞ্জাব, হিমাচলপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যে। চরম হিংস্র হয়ে ওঠে আদোলন। রাষ্ট্রও সমস্ত শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পৈশাচিক দমন নীতিতে জেরবার হয় দলে দলে মানুষ। দুই বা ততোধিক গ্রামে মুক্তাঞ্চল করে টিকে থাকা যে সম্ভব নয় তা ক্রমশ বুঝতে পারে কর্মীরা। চম্পারণ, কোরাপুটের মত বিস্তীর্ণ অঞ্চলও শাসকশ্রেণীর আক্রমণের মুখে মুখ থুবড়ে পড়ল। বহু কর্মীকে শহীদ হতে হল। গেরিলা ইউনিট গঠনের নীতি ও কৌশল ও ব্যক্তিগত হত্যার রাজনীতি যে কী মারাত্মক তা টের পেল। শহরে নগরে স্কুল কলেজ পোড়ানোর রীতিতেও বলি হল বহু তরুণ। জেলখানায় পাল্লা দিয়ে চলল নির্বিশেষ অত্যাচার আর হত্যা।

নকশালবাড়ি আন্দোলনের সমসাময়িক কয়েকটি পত্রিকা হল- 'নন্দন', 'দেশহিতৈষী', 'কালপুরুষ' 'ক্রান্তিকাল' 'লোকায়ন' 'আবাদ' ইত্যাদি। এই পর্যায়ের রাজনৈতিক আবহ আবেগ ও দৃষ্টিভঙ্গী ছাপ ফেলেছে গল্পে, কবিতায়, উপন্যাসে, নাটকে। উল্লেখ করতে হয় স্বর্ণ মিত্রের 'বাঘ শিকার', 'গ্রামে চলো', অমল চক্রবর্তীর 'বাঘ' , শঙ্কর বসুর 'অকাল বোধন' ও 'বাদার গল্প' প্রভৃতির কথা। জলন্ত অঙ্গারের মতো ধিকিধিকি ক্রোধ জ্বলে উঠল সাধন চট্টোপাধ্যায় , মিহির আচার্য ও শৈলেন চৌধুরীর গল্পে। আর এই নকশালবাড়ি রাজনীতির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত না থেকেও যারা এই আন্দোলনের ওপর সহমর্মী দৃষ্টি রেখেছিলেন তাঁদের অন্যতম মহাশ্বেতা দেবী। তাঁর লেখনীতে নকশালবাড়ি আন্দোলনের প্রভাব কী , কেন তিনি এ নিয়ে লিখছেন সে সব নিয়ে তাঁর স্পষ্ট স্বীকারোক্তি- ''নকশালবাড়ির ঘটনাবলি এবং তার প্রেক্ষাপটের উল্লেখ এখানে মুখ্যত আমার কাহিনিগুলির পটভূমিতে প্রয়োজন হলেও , অনস্বীকার্য যে এ-দেশের কয়েক দশকের জীবনযাত্রায় সেটাই ছিল সর্বাধিক উল্লেখ্য এবং প্রাণিত হবার মতো ঘটনা। বসাই টুডু- দ্রৌপদীরা এসব ঘটনারই আপাত ফললাভ, যদিও সংগ্রামে তারাই সমাজ-বদল ঘটায় এবং পরিণামে নাম ও স্থানিক অবস্থান ছাড়িয়ে হয়ে ওঠে কাল ও দেশের প্রতীক"। (ভূমিকা, অগ্নিগর্ভ, মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র, ৮)

সুতরাং ইতিহাসের প্রেক্ষিত কীভাবে সাহিত্যেও প্রতিবাদী চৈতন্যে মুখর হয়ে ওঠে তার বিচার বিশ্লেষণই আলোচ্য গল্পপাঠের মূল উদ্দেশ্য। তিনি লিখলেন-

'' স্বাধীনতার একত্রিশ বছরে আমি অন্ন, জল, জমি, ঋণ, বেঠবেগারী কোনোটি থেকে দেশের মানুষকে মুক্তি পেতে দেখলাম না। যে ব্যবস্থা এই মুক্তি দিল না, তার বিরুদ্ধে নিরঞ্জন, শুভ্র ও সূর্যসমান ক্রোধই আমার সকল লেখার প্রেরণা। তাই সাধ্য মতো মানুষের নিজের কথাই লিখে গেলাম, নিজের মুখোমুখি হতে যেন লজ্জা না পাই সে জন্য। কেননা লেখক জীবনকালেই শেষ বিচারে উপনীত হন এবং উত্তর দেবার দায় থেকে যায়। (ভূমিকা, অগ্নিগর্ভ, মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র)

২৯.২ গল্পকার পরিচিতি

জন্ম ১৪ জানুয়ারি, ১৯২৬। পিতা — মনীশ ঘটক তথা খ্যাতনামা যুবনাশ্ব। ভাঙনধরা সমাজ ও রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে আত্মঘাতী সম্পর্কের কালবেলায় লেখালেখি শুরু করেন তিনি। ছেলেবেলা থেকেই বড় হয়েছেন বইয়ের সাম্রাজ্যে। পাশাপাশি অর্জন করেছেন মাটির মানুষের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। উল্লেখ্য, ১৯২৬-এই ভারতে প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন অ্যাক্ট পাশ হয়। প্রতিষ্ঠা হয় অল ইণ্ডিয়া কনফারেন্সের। ১৯৩৬-এ রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে পড়তে যান। এই একই বছরে ফৈজাবাদে সারা ভারত কিষাণ সভার প্রতিষ্ঠা ও প্রথম অধিবেশন হয়। শান্তিনিকেতন পর্বেই তিনি সাঁওতাল জীবনকে ঘনিষ্ঠ ভাবে দেখবার সুযোগ পান। শান্তিনিকেতনের কলম চালাবার অভ্যাস পরবর্তীকালে

দায়িত্ববোধ ও আরো পরে লেখকের দায়িত্ববোধে বর্তায়। ১৯৩৯-এ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরুর সময় শান্তিনিকেতনের গ্রামীণ পরিবেশ ছেড়ে তিনি এলেন কলকাতার স্কুলে। সাক্ষী থাকলেন ৪২-এর আগাস্ট আন্দোলন, পঞ্চাশের মন্বন্তরের এবং নারী মাংস পণ্যায়ণের। মন্বন্তরের কালে কলেজ ছাত্রী মহাশ্বেতার যোগ দেন কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্রী সংগঠন 'Girlsó Student Association' এ এবং দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে নিজেকে নিয়োগ করেন। পার্টির মুখপাত্র 'Peopleós War' , 'জনযুদ্ধ' প্রভৃতির বিক্রিবাটা থেকে শুরু করে কমিউনিস্ট পার্টির বিভিন্ন ক্রিয়াকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টির সূত্রেই 'নবান্ন' খ্যাত বিজন ভট্টাচার্যের সঙ্গে আলাপ ও বিবাহ। যদিও পরে বিচ্ছেদ হয়ে যায়। তিনি গননাট্য আন্দোলনের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। উল্লেখ্য ১৯৫২-তে, তেলেঙ্গানায় নয়টি জেলা জুড়ে কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে কৃষকরা তাদের সংগ্রাম চালায়। যা, প্রকৃতপক্ষে, সামন্ততান্ত্রিক শাসনের অবসানের জন্য জনগণের রাজনৈতিক লড়াই হয়ে ওঠে। ইতিমধ্যে ৫৬-তে প্রকাশিত হয় 'ঝাঁসির রাণী', এবং ১৯৫৭তে প্রথম উপন্যাস 'নটী' প্রকাশিত হয়। তাঁর লেখায় একের পর এক উঠে আসতে থেকে শ্রমজীবী মানুষের, প্রান্তিক মানুষের আন্দোলনের কথা। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সূত্রে অথবা ইতিহাসের পথ বেয়ে তাঁর সাহিত্যে ঠাঁই পায় সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, ওয়াহাবী আন্দোলন, নকশালবাড়ি আন্দোলন এবং আরো অনেক বিদ্রোহ, বিপ্লবের কথা। ১৯৮২-৮৪তে 'যুগান্তরে' তিনি ভ্রাম্যমান সাংবাদিক রূপে যোগদান করেন। আদিবাসী মানুষের শোষণ বঞ্চনার নিত্যদিনের কাহিনি লিখে চলেন। সাংবাদিকতাকে গ্রহণ করেন সামাজিক দায়িত্ব হিসেবে। চালাতেন 'বর্তিকা' পত্রিকা। গ্রামোন্নয়ন ও তথ্য বেতার মন্ত্রকের প্রকাশনা বিভাগের হয়েও প্রচুর ফিলড ওয়ার্ক ও লেখালেখি করেছেন। গড়ে তুলেছেন অথবা যুক্ত থেকেছেন 'পশ্চিমবঙ্গ লোধাশবর কল্যাণ সমিতি,' 'মাঝাগেড়িয়া আদিবাসী গাওতা সুসার বাইসি' (মুর্শিদাবাদ), 'কিরিবুরু আদিবাসী মহিলা সমাজ' (সিংভূম), ' মুণ্ডা সমাকজ সাঁওয়ার জামদা' (ওড়িশা) প্রভৃতি বহু সংগঠনের সঙ্গে। এই সমস্ত কাজের জন্যই ১৯৯৭তে লাভ করেন র্যামন ম্যাগসাইসাই পুরস্কার। লাগাতার প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠা করেন 'আদিম জাতি ঐক্য পরিষদ'- আদিবাসীদের মিলন মঞ্চ। তাঁর চরিত গল্প গ্রন্থের মধ্যে 'সপ্তপর্ণী' (১৯৬২), 'স্তনদায়িনী ও অন্যান্য গল্প' (১৯৭৯), 'নৈর্ঋতে মেঘ' (১৯৮২), 'ইটের পর ইট' (১৯৮২), 'চোট্টি মুণ্ডা এবং তার তীর' (১৯৮০); 'অগ্নিগর্ভ' (১৯৭৮), 'মূর্তি' (২০১৬) ইত্যাদি উল্লেখাযোগ্য। ২৩ জুলাই মহাশ্বেতা দেবীর প্রয়াণ ঘটে।

২৯.৩ নকশাল আন্দোলন ও 'দ্রৌপদী'

১৯৭৮-এ প্রকাশিত 'অগ্নিগর্ভ' গল্প সংকলনের অন্যতম গল্প দ্রৌপদী। নকশাল আন্দোলনের আবহ ও প্রান্তিক মানুষদের প্রতি গভীর সহানুভূতির যথার্থ সমন্বয় ঘটেছে গল্পগুলোতে। গ্রন্থটিতে স্থান পেয়েছে 'অপারেশন ? বসাই টুডু', 'দ্রৌপদী' , 'জল' এবং 'এম . ডব্লু . বনাম লখিন্দ' এই চারটি গল্প। একমাত্র 'দ্রৌপদী' গল্পেই প্রত্যক্ষ ভাবে নকশাল আন্দোলনের উল্লেখ আছে। ১৯৮৭-তে মিহির সেন ও ধনঞ্জয় দাশ সম্পাদিত 'প্রতিবাদের গল্প' সংকলনে ঠাঁই পায় গল্পটি। পরে আরো কয়েকটি সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়। গল্পটির প্রথম প্রকাশ ১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দে শারদীয় পরিচয় পত্রিকায়।

'দ্রৌপদী'র পূর্বসূত্র নিহিত আছে 'অপারেশন? বসাই টুডু' গল্পে। বসাইয়ের বিশ্বস্ত সহযোগী হিসেবে দোপদী মেঝেন ও তার স্বামী দুলনা মাঝির নাম পাওয়া যায়। এই সাঁওতাল দম্পতিই ১৯৭১-এ অপারেশন বাকুলিতে জোতদার সূর্য সাহুকে হত্যার অন্যতম দুই কারিগর। আলোচ্য গল্পের প্রথম অংশেই পাওয়া যায় - দ্রৌপদীর

চেহারার বিজ্ঞাপন ও তার নামে হুলিয়া। জানা যায় দুলন ও দোপদী দাওয়ালী কাজ করত। তারা 'বিটুইন বীরভুম-বর্ধমান- মুর্শিদাবাদ- বাঁকুড়া রোটেট করে ঘুরত।' ১৯৭১-এ অপারেশন বাকুলিতে তিনটে গ্রাম যখন হেভি কর্ডন করে মেশিনগান করা হয় , তখন এই সাঁওতাল দম্পতি নিহতের ভান করে পড়ে থাকে। বস্তুত এরাই নাকি আসল অপরাধী, তারাই সপুত্র সূর্য সাহুকে খুন করে, জলের তীব্র সংকটে উচ্চবর্গের ইঁদারা দখল করে এবং আরো অনেক কিছু। অরণ্যের অন্ধকারে আত্মগুপ্তিতে অসামান্য দক্ষ এই দুজন মানুষ কিছুতেই ধরা পড়ে না প্রশাসনের ফাঁদে। প্রশাসনিক হত্তাকত্তাদের ফাঁদ কেটে বারবার পালিয়ে বেড়ায় এই যুগল। একের পর এক রাষ্ট্রীয় বাহিনি সশস্ত্র অনুসন্ধান চালায়, বিদ্ধ হয় বিপন্ন হয় অস্ট্রো-এশিয়াটিক গোষ্ঠীর অন্য অন্য সন্তানের দল। দুলন — দোপদী এবং তার দলবল এবং তাদের মতো অন্যান্যরাও লড়াই চালাতে থাকে, জোতদার- জমিদার- কাগুজে বাবু- পুলিশ —প্রশাসন — শান্তিরক্ষক এবং খোঁচড়দের বিরুদ্ধে। চূড়ান্ত হিংস্রতায় তারা একের পর এক নিধন কার্য্য চালায় , থানা আক্রমণ করে, বন্দুক হরণ করে। তাদের অস্ত্র টাঙ্গি, হেঁসো, তীর, ধনুক। শুধু তাই নয় নিধন যজ্ঞের পর শুরু হয় মুণ্ডা ভাষায় উল্লাস সঙ্গীত। দ্রৌপদীর চৈতন্য প্রবাহের পথ ধরে পাওয়া যায় জোতদার সূর্য সাহুর নির্মম অত্যাচার, তার মতো খেটে খাওয়া নারীর দেহের প্রতি প্রচণ্ড লালসা, উচ্চবর্গীয় ঔদ্ধত্য আর প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বেগার খাটানোর প্রাচীন শোষণ পদ্ধতি। তাই অভুক্ত চেতনায় তীব্র প্রতিশোধ স্পৃহায় হত্যা ছাড়া আর কোনও পথ থাকে না দুলন ও দোপদীর। হত্যা পদ্ধতির ডিটেইলে সেই জ্বলন্ত কয়লার মতো তীক্ষ্ণ রোষের পরিচয় উঠে এসেছে ছত্রে ছত্রে। একজন নকশাল কর্মীর সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার যন্ত্রণা, তার অবদমিত ক্রোধ, এবং তার বিস্ফারিত হিংসাত্মক মানস গঠন অনায়াস দক্ষতায় চিত্রিত করেছেন গল্পকার।

পাশাপাশি উঠে এসেছে নকশালপন্থী নাগরিক কর্মীদের কথাও। অরণ্যের মানুষদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে গোপনে সংগঠিত করার কথা। উপী মেঝেন নাম নিয়ে অর্থাৎ নাম ভাড়িয়ে ত্রস্ত পথ চলতে চলতে দ্রৌপদীর চেতনায় বারবার উঠে আসে অরিজিতের কণ্ঠস্বর — তার লড়াইয়ের দিগনির্দেশ - তার সংগ্রামী বোধ- -" অরিজিতের গলা-, যদি কেউ ধরা পড়ে টাইম বুঝে অন্যরা হাইড আউট চেঞ্জ করবে। কমরেড দোপদী যদি দেরি করে আসে , আমরা এখানে থাকছি না। কোথায় যাচ্ছি নিশানী থাকছে। কোনো কমরেড নিজের জন্য আমাদের ডেসট্রয়েড হতে দেবে না।"

"অরিজিতের গলা, যখন জিতছ, তা যেমন জানবে, যখন হারলে, তা মানবে এবং পরের স্টেজ থেকে কাজ করবে"।

নকশাল কর্মীদের চিত্রের পাশাপাশি আছে রাষ্ট্রের ক্ষমতাধারীদের 'অপর' অস্তিত্ব। 'অ্যাপ্রিহেনসন ও অ্যালিমিনেসনে' তরুণ নিধনে দক্ষ সেনানায়ক অর্জন সিং-এর বিড়ালচরিত , একদিকে রাষ্ট্রের তাঁবেদারি অন্যদিকে নিজের আখের গোছানো, ঝাড়খানী জঙ্গল চিরে ফেলে পুলিশ ও প্রশাসনের মরিয়া অনুসন্ধান , বিচিত্র ক্যামোফ্লেজে কখনো অর্থ দিয়ে কখনো ভয় দেখিয়ে আবার কখনো মৃতদেহ দিয়ে ফাঁদ পাতার চেষ্টা এবং পশুসুলভ দমননীতির নানা টুকরো কথা ও চিত্র উঠে এসেছে গল্প জুড়ে। প্রচলিত ইংরাজি ও বাংলা স্ল্যাং-এর কৌশলী প্রয়োগে ও যথাযথ ব্যবহারে দমন ও সন্ত্রাসের নিষ্ঠুরতাটি অনবদ্য হয়ে উঠেছে —

" তারপর সিউড়ি থেকে টেলিগ্রাফিক মেসেজ। স্পেশাল ট্রেন। আর্মি। জিপ বাকুলি অব্দি আসেনি। মার্চ — মার্চ — মার্চ। নালপরা বুটের নীচে ক্রাঁচ —ক্রাঁচ —ক্রাঁচ। কর্ডন আপ। মাইকে আদেশ। যুগল মণ্ডল — সতীশ মন্ডল — রানা অ্যালায়াস — প্রবীর অ্যালায়াস — দীপক- দুলনা মাঝি- দোপদী মেঝেন সারেণ্ডার সারেণ্ডার। নো,

সারেঙার সারেঙার। মো- মো- মো ডাউন দি ভিলেজ। খটাখট খটাখট - বাতাসে করডাইট — খটখট — রাউণ্ড দি ক্লক- খটখট। ফ্লেম থ্রোআর। বাকুলি জ্বলছে। মোর মেন অ্যাণ্ড উইমেন — চিলড্রেন ফায়ার ফায়ার।"

দুলনকেও হত্যা করা হয় আকস্মিকভাবে, গোপনে, গুলি করে, পাথরের ওপর চ্যাটাল হয়ে শুয়ে জল খাওয়ার সময়। মুসাইয়ের বউয়ের দেওয়া ভাত কোঁচড়ে নিয়ে এগোতে এগোতে সোমাই আর বুধনাদের গুপ্তচরবৃত্তিতে ধরা পড়ে যায় দ্রৌপদীও। ধরা পড়ে সূর্য সাহুর ভাই রোতোনি সাহুর হাতে। তারপর শুরু হয় সেনাছাউনির নৃশংসতা। দ্রৌপদী আগেও জানত-মারধোর ও যৌন অত্যাচারে ক্ষত বিক্ষত করে কাউন্টার করে দেওয়ার কথা। তাই মানসিক প্রতিরোধ হয়তো তৈরিই ছিল। সেনানায়কের নির্দেশেই তাকে উপর্যুপরি ধর্ষণে ও নৃশংস শরীরী আক্রমণে রক্তাক্ত করে ফেলা হয়। খুবলে খাওয়া হয় স্তন, ছিঁড়ে ফেলা হয় বৃন্ত, রক্তে ভিজে যায় যৌনাঙ্গ। তবু, সেই বিবস্ত্র শরীরকেই হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে সশস্ত্র সেনানায়কের সামনে গিয়ে দাঁড়ায় নিরস্ত্র উলঙ্গ দ্রৌপদী। ভীত সেনানায়ক বারবার তাকে কাপড় পড়িয়ে আনতে বললেও, তীব্র শ্লেষে কাপড় পরতে অস্বীকার করে দ্রৌপদী। নগ্ন শরীর নিয়ে দৃপ্ত ভঙ্গীতে আরো কাছে এগিয়ে যায় সেনানায়কের। সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন স্বয়ং সেনানায়ক। অকারণে আক্রান্ত হন প্রচণ্ড ভয়ে। ক্ষমতার বৃন্তে দাঁড়িয়ে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ক্ষমতাকে নিশ্চিহ্ন করার এই আত্মপ্রত্যয়ী ভঙ্গিমা যথার্থই চিনিয়ে দেয় একজন নকশাল কর্মীকে।

২৯.৪ অন্ত্যজ জীবনের ছবি

"লেখালেখির কথা। আমার লেখার মধ্যে নিশ্চয় বারবার ফিরে আসে সমাজের সেই অংশ, যাকে আমি বলি The Voiceless Section of Indian Society : এই অংশ এখনো শুধু নিরক্ষর, স্বল্পস্বাক্ষর ও অনুন্নতই শুধু নয়, মূল স্রোতের থেকে এরা বড়োই বিচ্ছিন্ন। অথচ ভারতীয় সমাজের এই অংশকে না জানলে ভারতকে জানা যায় না"। - (মহাশ্বেতা দেবী, 'মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্পের ভূমিকা', পত্রিকা- 'অক্ষরেখা')

অবহেলা ও অবহেলিতের পরিসর বহু প্রাচীন। আর্থ-সামাজিক কিংবা ধর্মীয় সকল ক্ষেত্রেই উপেক্ষার রাজনীতির ধারাবাহিকতাটি আজো বহমান। চিরকালই বেশ কিছু মানুষকে প্রান্তিক বানিয়ে তুলে রাখা হয় সভ্যতার চিলেকোঠায়। অভিজন আর অভাজনের সীমারেখাটিকে বিনিদ্র পাহারায় আগলে রাখে ইতিহাস ও রাষ্ট্রনীতি। চর্যাপদ থেকে শুরু করে আজকের সাহিত্যে অন্ত্যজ মানুষজনের অনিবার্য পদচারণা অস্বীকার করা যায় না কিছুতেই।

মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন মানুষেরা মহাশ্বেতা দেবীর কথাসাহিত্যে অবিচ্ছিন্ন এক ধারার মতো প্রবাহিত। তাঁর গল্পে বারবার উঠে এসেছে প্রান্তিক ভারতবর্ষ। তারা জাতিগত নিরিখে অধিকাংশই 'আদিবাসী' আর বর্গের সাপেক্ষে 'নিম্নবর্গ'। তাদের লড়াকু জীবন খুব কাছ থেকে দেখেছেন গল্পকার। টের পেয়েছেন — ভারতীয় সমাজের এই অংশকে না জানলে ভারতকে চেনা অসম্ভব। তাই 'শিল্পের জন্য শিল্প করার সাধ বা ক্ষমতা' শিকেয় তুলে রাখেন তিনি। প্রবল দায়বদ্ধতায় তৈরি করেন প্রান্তবাসীর এক নিরাবেগ দুনিয়া। উঠে আসে তাদের বেঁচেবর্তে থাকার লড়াকু বারোমাস্যা। 'শবরতীর্থ' রচনায় মহাশ্বেতা দেবী উল্লেখ করছেন—

" মানুষ যেভাবে তীর্থে যায় আমি সেভাবেই ভারতের কিছু জায়গায় আদিবাসী ও অন্যান্য ব্রাত্য মানুষদের কাছে দীর্ঘদিন ধরে যাচ্ছি। মূলস্রোত এই ব্রাত্যজনেদর ব্রাত্য রেখে নানাভাবে শোষণ করছে বহু দিন ধরে। যত পাপ আমার মূল স্রোত করেছে ও করছে তার জন্য আমি আমার জীবন-চিন্তা-কর্ম সাধ্য মতো উৎসর্গ করি পাপস্খালন করতে। আমি ওদের কাছে শিখতে যাই , শেখাতে যাই না। মানব সমাজ ওদের কিছুই দেয় না, তবু

ওরা বেঁচে থাকে এটাই তো শেখার। (শবরতীর্থ', 'খেড়িয়া-শবরদের জীবনকর্ম ও সমাজ', পত্রিকা- 'বর্তিকা', পুরুলিয়া, জুলাই-ডিসেম্বর, ১৯৯৬) অন্ত্যজ আদিবাসীদের জীবন তাঁর গল্পে চিত্রিত হয় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সূত্র ধরে। যাদের সঙ্গে ঘোরেন, যাদের দেখেন, তাদের কথাই লেখেন। আবার কখনও তার সঙ্গে যুক্ত হয় ইতিহাস চেতনা। মূল ইতিহাসের পাশাপাশি নির্মিত হয় জনবৃত্ত নির্মাণের এক বিকল্প ইতিহাস। 'বান' গল্পের প্রেক্ষাপট ১৫১৩ খ্রিষ্টাব্দ। 'বানে' পাই বাগদি ছেলে চিনিবাস আর বাগদি বোউ রূপসীর গল্প। সমাজ ইতিহাসে চৈতন্যদেবের বর্গ বর্ণ নির্বিযেষে ভক্তিপ্রেমের বন্যায় বাগদির ছেলের স্বপ্ন দেখা ও স্বপ্ন ভাঙার কাহিনিই এখানে বর্ণিত। অন্যদিকে , মাত্রাহীন শোষণে অভিশপ্ত জনজাতির অভাবনীয় লড়াইয়ের চিত্র পাওয়া যায় 'হুলমাহার মা' কিংবা ' ফারকাটি' গল্পে। এ যেন সাঁওতাল বিদ্রোহের পটভূমির জীবন্ত সমাজ ইতিহাস। তাঁর 'সংরক্ষণ' গল্পে লোধা- হো — শবরের মতো জনজাতিগুলো সংরক্ষণের দাবি নিয়ে এগিয়ে আসে। 'মাহাদুর' গল্পে পাওয়া যায় বিলুপ্তপ্রায় কোরকুদের কথা। ডোমদের অসহায় করুণ জীবনছবি চিত্রিত 'পিন্ডদান', 'গতিগঙ্গা', 'যুগীদাস নাইয়া' কিংবা 'বাঁয়েন' গল্পে। পাশাপাশি, 'সাঁঝসকালের মা' গল্পে পাখমারা সম্প্রদায়, 'শিকার' গল্পে ওঁরাও সম্প্রদায়, 'বিছন' গল্পে গঞ্জু, 'বেহুলা' গল্পে ওঝা বা মাল , 'দ্রৌপদী' গল্পে সাঁওতাল প্রভৃতি নানা জনজাতির অন্ত্যজ জীবনচর্যা ও সংগ্রামের কথা বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে উঠে এসেছে একের পরেক বহু গল্পে। শুধু তাই নয় নিজের সম্পাদিত পত্রিকা ও অন্যান্য পত্রিকায় 'লোধা সংখ্যা', 'মুন্ডা সংখ্যা', 'ওঁরাও সংখ্যা' ইত্যদি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে নিজের বার্তাটিকে সুস্পষ্ট করে দিতে চেয়েছেন।

মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্পে অন্ত্যজ মানুষের কণ্ঠস্বর বারবার সোচ্চার হয়েছে। ' দ্রৌপদী' এমনই একটি গল্প। এক অন্ত্যজ নারীর আকণ্ঠ লড়াইয়ের কাহিনি। নকশাল আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত। অন্তেবাসী নারী দোপদী মেঝেন তার ব্যবহৃত বিক্ষত নগ্নতাকেই প্রতিবাদী আধার হিসেবে তুলে ধরেছে। সাঁওতালদের মধ্যে এমন পুরাণ-ঘেঁষা নাম ও নামের সঙ্গে বস্ত্রহরণের অনুষঙ্গ গল্পের প্রথমেই তার পরিচিতিকে কিছুটা ব্যতিক্রমী করে তোলে।

গল্পের প্রেক্ষাপটে আছে সত্তরের অস্থির রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্ত, শাসক শ্রেনীর কূটনৈতিক শোষণ, জোতদার-জমিদার-মহাজনদের বিরুদ্ধে সাঁওতাল শ্রেণির সশস্ত্র লড়াই এবং অপারেশন বাকুলিতে সন্ত্রাস দমনের বেনামে পুলিশি নির্যাতন। তিনটে গ্রামকে হেভি কর্ডন করে মেশিনগান চালানো হয়। অপরাধ-- সপুত্র জোতদার সূর্য সাহুকে হত্যা, হত্যার অন্যতম দুই কারিগর- দোপদী মেঝেন এবং তার স্বামী দুলন মাঝি। সূর্য সাহু পিতৃঋণের অপরাধে দুলনকে বেগার খাটায় আর দোপদীর যুবতী শরীরটাকে গিলে খেতে চায়। তার ওপর খরায় ডোম চাঁড়াল জল পায় না। নিরুপায় হয়েই তাদের দখল করতে হয় — 'আপার কাস্টের ইঁদারা ও টিউবোয়েল'। এ কোনও একক বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এই নির্মম অত্যাচারের সঙ্গেই দৈনন্দিন যাপনে বাধ্য হয় সাঁওতাল জনজাতি। সংগ্রাম চেতনার পাশাপাশি সোমাই-বুধনের বিশ্বাসঘাতকতা সমকালীন সুবিধাভোগী শ্রেণীবৈষম্যের দিকটিকেও চিহ্নিত করে।

সাম্য কিংবা মৌলিক অধিকারের দাবী করলে তাদের মতো প্রান্তবাসীদের গুলিবিদ্ধ হয়ে মরতে হয়। আর কোনও ক্রমে কৌশলে প্রাণরক্ষা করতে পারলে গভীর থেকে গভীরতর অরণ্যে নাম ভাঁড়িয়ে লুকিয়ে থাকতে হয়। অভুক্ত অথবা অর্ধভুক্ত হয়ে থাকা ছাড়া কোনও গত্যন্তর থাকে না। আর এই মানুষগুলোকেই মারার জন্য শাসক ও পুলিশের কী সুনিপুণ ছক ! কত খোঁচড় নিয়োগ! কত জাল! কত অর্থব্যায়! দোপদীর স্বামী দুলনকে এভাবেই চ্যাটাল পাথরে উপুড় হয়ে জল খাওয়ার সময় গুলি করে মেরে ফেলা হয়। আর মৃতদেহকেই ফাঁদ

বানিয়ে ফের দোপদীকে জালে ফেলার চক্রান্ত করা হয়। দোপদী অবশ্য কোনও দুঃখেই বিচলিত নয় আর। সে জানে নির্যাতনে শরীর মন ভেঙে পড়লে দাঁত দিয়ে নিজের জিভ কেটে ফেলতে হয়। 'কাঁউটার'-এ হত্যা তার কাছে ব্যতিক্রমী কোনও ভয় কিংবা উত্তেজনা বহন করে না। নকশাল কর্মী রূপে দুলনের মতো সে-ও টাঙি, হেঁসো, তীর ধনুক নিয়ে অনায়াসে চালায় থানা আক্রমণ, বন্দুক অপহরণ ও নিধনকার্য। প্রয়োজন বুঝে সাইরেন চিৎকারে বিকট কুলকুলি দেয়। আর নিহতদের ঘিরে গায় পাশবিক উল্লাস সঙ্গীত -

'হেনদে রামব্রা কেচে কেচে

পুনডি রামব্রা কেচে কেচে'

তাদের শত্রু — জোতদার, জমিদার, গোলদার, পুলিশ, শান্তিরক্ষক, কাগুজেবাবু ও খোঁচড়। বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে লড়তে থাকে অস্ট্রো- এশিয়াটিক মুণ্ডা গোষ্ঠীর অন্ত্যজ সন্তানের দল।

চম্পাভূমির পবিত্র নির্ভেজাল কালো রক্তের অধিকারী দ্রৌপদী রাষ্ট্র প্রশাসন উভয়ের কাছেই আশ্চর্য ত্রাস হয়ে ওঠে। নকশাল কর্মী ও রাষ্ট্র — দুয়ের কাছেই সে তখন অমূল্য। গল্পের প্রথম অংশে শোষণের বিরুদ্ধে তার ও তার মতো অন্ত্যজদের যৌথ লড়াই দেখা যায়। ধরা পড়ার আগের মুহূর্তে সে যখন ভয়াবহ কুল্কুলি দিয়ে সহকর্মীদের বিপদ বার্তা পৌঁছে দেয় , তখনো সে সমষ্টির লড়াইয়ের অংশ। তারপর শুরু হয় তার একক লড়াই। পুলিশি শাসনব্যবস্থার প্রতি অন্ত্যজ নারীর তীব্র শ্লেষ তীক্ষ্ণ বিস্ফারে স্রেফ ফেটে পড়ে। অপারেশন বাকুলির মূল হোতা পাঞ্জাবের বীরপুত্র ক্যাপ্টেন অর্জন সিং তার চিরাচরিত রীতি 'অ্যাপ্রিহেনশন অ্যাণ্ড অ্যানিমিলেশন' করেই প্রতিবাদী প্রাণগুলোকে নিকেশ করতে চায়। লাশের সংখ্যা মেলাতে না পারলে তিনি নাকি'বারোভাতারী বহুমূত্র' রোগের শিকার হন। পলাতক নকশাল লাশেরা আত্মগোপন করে ফের অন্য জায়গায় নৃত্যশীল হয়ে উঠলে তিনি নাকি ভয়ানক অবসাদে আক্রান্ত হন। 'ইউনিফর্ম' অথবা ধর্মগ্রন্থের ক্ষমতাও তখন তাঁকে নাকি উদ্ধার করতে পারে না। তাঁর মগজে আদর্শবাদী চিন্তার বিকাশ। ভবিষ্যতে লেখালেখির মাধ্যমে 'বাবু'দের বক্তব্যটাকে খণ্ডন করে অন্ত্যজ দাওয়ালীদের বক্তব্যটিকে হাইলাইট করে সসম্মানে টিকে থাকার টিকিটপত্তর পাওয়ার ব্যবস্থা করতে চান। কিন্তু আপাতত তিনি শত্রুদমনে সিদ্ধহস্ত। সুবিধাবাদী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি এই সেনানায়ক চরিত্রটি শাসনব্যবস্থার দ্বিচারিতা ও ক্ষমতাসীন শিক্ষিত সমাজের ভন্ড রূপকে প্রকাশ করে ফেলে। আবহ জুড়ে তৈরি হয় ক্ষমতার এক জটিল বিন্যাস। তাকেও ছিন্নভিন্ন করে ফেলে সর্বহারা দ্রৌপদীর প্রবল 'অপর' অস্তিত্ব। ক্ষমতার নির্দেশে ক্ষমতার বহু হাতে গণধর্ষিতা ক্ষত বিক্ষত বিবস্ত্রা দ্রৌপদীকে ফের কাপড় পরানোর চেষ্টা কার্যত পণ্ড করে দেয় স্বয়ং দ্রৌপদীই। সেনানায়কের প্রতি তার অন্ত্যজ কণ্ঠস্বর তীব্র ঘৃণায় আর বীভৎস ব্যঙ্গে বেজে ওঠে- ''হেথায় কেও পুরুষ নাই যে লাজ করব। কাপড় মোরে পরাতে দিব না। আর কী করবি? লেঃ কাঁউটার কর — 'দ্রৌপদীর মিথ আর প্রান্তবাসী এক নারীর উলঙ্গ প্রতিবাদী শরীর অদ্ভুত বৈপরীত্যে ভেঙে ফেলে প্রশাসন ও পুরুষ নামক প্রথম লিঙ্গের সমস্ত ক্ষমতার যাবতীয় আধিপত্য ও ঔদ্ধত্য। দাবার ছক উলটে স্বয়ং দোপদী মেঝেনই হয়ে যায় ভয়ের বিষয়। বাওয় হয়ে ওঠে প্রান্তজন।

২৮.৫ গল্পে পুরাণ প্রসঙ্গ

সময়ের পথ ধরে গল্পকার মহাশ্বেতা দেবীর পরিক্রমা ইতিহাসের পথে পথে। পুরাণ, লোককথা, রূপকথা অনায়াসে আশ্রয় নেয় তাঁর গল্প শরীরে। অথবা গল্প দেহ গড়ে ওঠে পুরাণের অপৌরাণিক নির্মাণকে অবলম্বন

করে। তৈরি হয় ইতিহাস আর পুরাণের নতুন ভাষ্য। অতীত আর বর্তমান বাধা পড়ে বিচিত্র এক গ্রন্থিতে। সমাজ ইতিহাস ও পুরাণকথার চেতনার স্ফুরণে 'দ্রৌপদী' গল্পে যথার্থই নির্মিত হয়েছে নবপুরাণ। ১৯৮৪তে প্রকাশিত তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্পের ভূমিকায় সঠিক অর্থেই লিখেছিলেন —

''সাহিত্যকে শুধু ভাষা, শৈলী, আঙ্গিক নিরিখে বিচার করার মানদণ্ডটি ভুল। সাহিত্য বিচার ইতিহাসের প্রেক্ষিতে হওয়া দরকার। লেখকের লেখার সময় ও ইতিহাসের প্রেক্ষিত মাথায় না রাখলে কোনো লেখককেই মূল্যায়ন করা যায় না। পুরাকথাকে, পৌরাণিক চরিত্র ও ঘটনাকে আমি বর্তমানের প্রেক্ষিতে ফিরিয়ে এনে ব্যবহার করি অতীত ও বর্তমান যে লোকবৃত্তে আসলে অবিচ্ছিন্ন ধারায় গ্রথিত তাই বলার জন্য।'

আলোচ্য গল্পে নামে ও নামকরণে দ্রৌপদীর মিথিক্যাল ক্ল্যামোফ্লেজের আড়ালে আসলে সত্তরের দশকের রাজনীতি, পীড়ন ও ক্ষমতার প্রতিস্পর্ধী এক প্রতিরোধী রোষ মূর্ত হয়ে উঠেছে। ধর্ষিত রক্তাক্ত, নগ্ন নারী শরীরই তার মূল হাতিয়ার। বস্ত্রহরণের বিলাপ এখানে নেই। বরং বিবস্ত্র দেহই কখন যেন ভয়ের উৎসে বিবর্তিত হয়ে যায়।

দ্রৌপদী প্রসঙ্গে মহাশ্বেতা দেবী গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাককে বলেছিলেন- ''মনে রেখো, মহাভারতের দ্রৌপদী কৃষ্ণাঙ্গী, নিশ্চয় আদিবাসী কন্যা''।- (নির্মল ঘোষ, *মহাশ্বেতা দেবী অপরাজেয় প্রতিবাদী মুখ*)

মহাভারতের দ্রৌপদী রাজসভায় রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে লালসার শিকার হয়। আর এখানে দোপদী মেঝেন রাষ্ট্রের অনুসন্ধানী বৃত্তিতে 'লং ওয়ান্টেড ইন মেনি' এক 'নোটোরিয়াস মেয়েছেলে'। সে-ও শেষমেষ রাষ্ট্রিক নিষ্ঠুরতার শিকার। কিন্তু, ''সাঁওতালীর নাম দোপদী ক্যান''? উচ্চবর্গীয় সূর্য সাহুর বউ নাম রেখেছিল বলেই তার নাম দ্রৌপদী। আর ঘটনাচক্রে সেই দ্রৌপদীই জমিদার-জোতদার শ্রেণীর প্রতিনিধি সপুত্র সূর্য সাহুর হত্যার অন্যতম কারিগর হয়ে দাঁড়ায়, সঙ্গে থাকে স্বামী দুলন। পুরাণ অনুযায়ী দ্রৌপদী ,-

''পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের যজ্ঞ-বেদী উদ্ভূত কন্যা। দ্রোণ বধের জন্য পুত্রলাভেচ্ছায় দ্রুপদ যখন গঙ্গা ও যমুনার তীরে যাজ ও উপযাজ নামে দুই ব্রাহ্মণের সহায়তায় পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেন, তখন যজ্ঞাগ্নি হতে বর্ম-মুকুট-খড়্গ-ধনুর্ধারী দ্রোণহন্তা ধৃষ্টদ্যুম্ন ও যজ্ঞবেদী হতে শ্যামবর্ণা সুন্দরী যাজ্ঞসেনী উত্থিতা হন। দ্রৌপদী আজন্ম যুবতী, শ্যামবর্ণা, পদ্মপলাশলোচনা, নীল ও কুঞ্চিত কেশকলাপভূষিতা। এঁদের জন্মকালে আকাশবাণী হয় যে, ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণ বধ করবেন ও যাজ্ঞসেনী ক্ষত্রিয়গণের কুলক্ষয় ও দেবতাদের মহৎ কর্ম সাধন করবেন ও এঁর দ্বারা কৌরবকূল বিনষ্ট হবে।''— (সুধীরচন্দ্র সরকার সঙ্কলিত, *পৌরাণিক অভিধান*)

অর্থাৎ কালগত ব্যাবধান থাকলেও ইতিবাচক ধ্বংস ও নিধনের যোগসূত্রে দুই নারীই সমভূমিতে দাঁড়িয়ে। দ্রৌপদী নামের মধ্য দিয়ে গল্পকার এই দুর্জয় তেজ ও শক্তিকেই যেন সঞ্চারিত করে দিতে চেয়েছেন অত্যাচারিত জনজাতির গোষ্ঠী চৈতন্যে। দৌপদী মাঝির স্বামী ও সহগামী দুলন মাঝিকে আগেই মেরে ফেলা হয়। মহাভারতের রাজা রাজড়ার গুপ্তচরেরা এখানে 'খোঁচড়' বৃত্তিতে সামিল। তাদের গোপন সহায়তাতে প্রশাসনিক ফাঁদে গুলিবিদ্ধ হয় দুলন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধশেষে মাঠে পড়ে থাকা মৃতদেহের মতোই নেহাত অনাদরে পড়ে থাকে দুলনের প্রাণহীন দেহ। কেউ এমনকি দোপদী মেঝেন নিজেও আসতে পারে না মৃতদেহের ধারেপাশে। কেননা মৃত্যুকে দিয়ে মৃত্যুর ফাঁদ বানানো হয়। পাশাখেলার ঘুঁটি সাজানো হয়।

যুদ্ধের জারজ ফসল সোনাই আর বুধাইয়ের বিশ্বাসঘাতকতায় ধরা পরে যায় দ্রৌপদী। রাষ্ট্রের বিশেষ বাহিণীর হাতে তুলে দেওয়া হয় তাকে। সেনানায়কের 'বানিয়ে নিয়ে এস' ও 'ডু দি নীডফুল' নির্দেশ পেয়ে সেনাছাউনিতে

ধর্ষণের হিড়িক পড়ে যায়। মহাভারতে পরিবারপ্রধান কুন্তীর আদেশে বহুবল্লভা হতে হয় দ্রৌপদীকে। আর এখানে রাষ্ট্রযন্ত্রের লীলায় শুরু হয় 'নীডফুল' করার পালা- ''তারপর এক নিযুত চাঁদ কেটে যায়। এক নিযুত চান্দ্র বৎসর। লক্ষ আলোকবর্ষ পরে দ্রৌপদী চোখ খুলে, কী বিস্ময়, আকাশ ও চাঁদকেই দেখে। ... পাছা ও কোমরের নীচে চটচটে কী যেন। ওরই রক্ত। বুঝতে পারে যোনিদ্বারে রক্তস্রাব। কয়েকজন ওকে বানিয়ে নিয়ে এসছিল? ওকে লজ্জা দিয়ে চোখের কোল থেকে জল গড়ায়। ঘোলাটে চাঁদের আলোয় বিবর্ণ চোখ নীচের দিকে নামাতে নিজের স্তন দুটি চোখে পড়ে, এবং ও বোঝে, হ্যাঁ, ওকে ঠিকমত বানানো হয়েছে। ''কামড়ে ক্ষত বিক্ষত তার স্তন। ছিন্ন ভিন্ন বৃন্ত। চাঁদেরও যেন বিবমিষা জেগেছিল দেখে, সে তাই কিছু জ্যোৎস্না বমি করে ঘুমোতে গেছে। থকথকে অন্ধকারে একটা পা বাধ্যত ফাঁক করে চিত হয়ে পড়ে থাকে তার বিবস্ত্র নিশ্চল দেহ। যান্ত্রিক উল্লাসে চলতে থাকে ধর্ষণ পর্ব। রাষ্ট্রীয় বস্ত্রহরণ পালা পৈশাচিক উৎসবে উন্মত্ত হয়ে ওঠে। কৌরবদের নির্লজ্জতাও যেন লজ্জা পায়। পার্থক্য একটাই মহাভারতের দ্রৌপদী বস্ত্রহরণ পর্বে নগ্ন হওয়ার আশঙ্কায় সাহায্য প্রার্থনা করে কৃষ্ণের কাছে। সাহায্য পায়ও। কিন্তু মহাশ্বেতার দ্রৌপদী মেঝেন উলঙ্গ হয়েই হেঁটে আসে সেনানায়কের দিকে। ক্ষমতার বৃন্তে প্রবল স্পর্ধায় প্রতি আক্রমণ করে দ্রৌপদীর নগ্ন শরীর। সেনানায়ক কাপড়ের খোঁজ করলেও, কাপড় পরতে পরিস্কার অস্বীকার করে দ্রৌপদী। তার কালো শরীর রক্তাক্ত চেহারা নিয়েই এগিয়ে আসে আরো কাছে। আক্রমণ করে প্রশাসনের লৈঙ্গিক অস্তিত্বকেও— ''আকাশ-চেরা তীক্ষ্ণ গলায় বলে, কাপড় কী হবে, কাপড়? লেংটা করতে পারিস, কাপড় পরাবি কেমন করে? মরদ তু? চারদিকে চেয়ে দ্রৌপদী রক্তমাখা থুতু ফেলতে সেনানায়কের সাদা বুশ শার্টটি বেছে নেয় এবং সেখানে থুতু ফেলে বলে, হেথা কেও পুরুষ নাই যে লাজ করব। কাপড় মোরে পরাতে দিব না। ''ক্ষমতার প্রতাপকে ছিন্ন করে উচ্চারিত হয় দ্রৌপদীর ভাষা- 'লেঃ কাঁউটার কর" প্রশাসনিক ভাষা শাসিতের অন্ত্যজ উচ্চারণে তৈরি করে তীব্র প্রতিরোধী রোষ। ভাষা প্রসারিত হয়ে যায় সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক বাস্তবতার বহুবিধ মাত্রায়। নগ্ন দ্রৌপদী দুই মর্দিত স্তন নিয়ে ঠেলতে থাকে সেনানায়ককে। আর এই প্রথম, প্রথমবার এমন নিরস্ত্র টার্গেটের সামনেও দাঁড়াতেও ভীষণ ভয় পান স্বয়ং সেনানায়ক। নগ্ন শরীরের তীব্র প্রতিবাদী আর্তনাদে চৌচির হয়ে যায় ক্ষমতার দুর্গ। নির্মিত হয় নকশাল আমলের নব পুরাণ আর নতুন প্রতিমা।

২৯.৬ শিল্প ও বাস্তবের মেল বন্ধন

শিল্পের জন্য শিল্প করার ক্ষমতা বা সাধ দুটোকেই অস্বীকার করেছেন গল্পকার। বরং সত্যকে তুলে ধরবার জন্য, ইতিহাসের পথ বেয়ে সময়কে তুলে ধরার জন্য আর কিছু প্রতিবাদ রেখে যাওয়ার জন্যই মহাশ্বেতার যাবতীয় লেখালেখি। অবিচার ও শোষণের বিরুদ্ধে কণ্ঠস্বরগুলোকে যথাযথ দলিলীকরণের যোগ্যতম মাধ্যম বলে মনে করেছেন সাহিত্যকেই। নিজের দেশকালের বাস্তবতাকে তুলে ধরতে গিয়েই তিনি তাঁর সাহিত্যে আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ক্ষতগুলোকে সপাটে তুলে ধরতে চেয়েছেন। তাঁর গল্প তাই উঠে আসে জীবনের নাভিমূল থেকে। টেনে নিয়ে যায় দহনের কেন্দ্রে। অস্তিত্ত্বের আগুনের গনগনে আঁচ টের পাওয়া যায় তাঁর গল্পে।

নিরাপদ জীবনযাপনের অভ্যস্ত রূপ তাঁর গল্পে সাধারণত চিত্রিত হয়নি। তাঁর গল্পে উঠে এসেছে দীর্ণ মানুষের জোড়াতালি দেওয়া জীবন আর তার মহোল্লাস। সংঘর্ষ আর সংগ্রামই তার সহজাত কবচকুণ্ডল। তিনি পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দেন — মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন ভাষাহীন মূক মানুষগুলোর প্রতিই তিনি বিশেষভাবে দায়বদ্ধ। তাই তাঁর গল্প কখনও দোপদী মেঝেনকে নিয়ে, কখনও যশোদাকে নিয়ে, কখনো মঘাই ডোমকে নিয়ে। এই সব

মানুষরা তাদের নিজস্ব ভাষায় নিজের দুনিয়ায় নিশ্চিন্তে পদচারণা করে তাঁর ছোটগল্পে। জীবনের সত্য আর মানুষের সত্যি জীবনই হয়ে ওঠে তাঁর লেখার উপাদান। তিনি স্পষ্ট জানান — অনেক গল্পেরই কে, কী কেন কবে সব বলে দেওয়া যায়। তার থেকেও বড় কথা- "আমি যে কাহিনি লিখেছি, তার মধ্যে আর যা থাক, যা ঘটেনি তা নেই"।- (ভূমিকা, *মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্প*, প্রতিক্ষণ)।

বাস্তবতার রূপকার ও একজন শিল্পী হিসেবে তিনি মনে করেন — সাহিত্য বিচারের মানদণ্ড কেবল ভাষা, শৈলী কিংবা আঙ্গিক হতে পারে না। সাহিত্য বিচার হওয়া দরকার ইতিহাসের প্রেক্ষিতে। লেখকের মুল্যায়নের জন্য লেখার সময় ও ইতিহাসের প্রেক্ষিত মাথায় রাখাটা খুব জরুরি। প্রশ্ন ওঠে যে গল্পকার বাস্তবকে এতটা গুরুত্ব দেন, তিনি শিল্পের অবয়বগত দাবিকে কীভাবে মেটান? জীবন আর শিল্প কি সেখানে দুই বিপ্রতীপ বিন্দু? ঐতিহাসিকের নিষ্ঠায় সময় ও তার নিষ্ঠুর সত্যকে সাহিত্যে তুলে আনতে গিয়ে কাহিনি কী কোথাও রিপোর্টাজ হয়ে গেছে? যদিও উল্লেখ্য এসবের কোনও প্রথাগত ছক নেই, কোনও প্রচল মাপ নেই।

তাঁর 'দ্রৌপদী' গল্পটি পড়লেও মনে হয় সত্তরের দশকের 'অগ্নিগর্ভ' সময়কেই তিনি বেশি গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন। শিল্পরূপ কিংবা আঙ্গিকের প্রতি কোনও আরোপিত সচেতনতা গল্পে নেই। উত্তাল সত্তর ও তার সংগ্রাম নিজের মতো করে অনায়াসে গল্পটা নিজেই যেন বলেছে। সাঁওতাল নকশাল কর্মী দোপদী চরিত্রটি আস্তে আস্তে কখন যেন বিস্তারিত হতে হতে ছুঁয়ে ফেলে দ্রৌপদীর মহাকাব্যিক মিথকে। আর তারপর মিথের পরিধিকে চূর্ণ করে প্রবল প্রতিবাদী চৈতন্যে নির্মাণ করে সেই সময়ের নতুন পুরাণ। একইভাবে অর্জন সিং চরিত্রটিও তার নিজস্ব শঠতায় , উচ্চবর্গীয় ঔদ্ধত্যে ও মধ্যবিত্তের নির্লজ্জ ছদ্মবেশে বানিয়ে ফেলে ক্ষমতার কৌরব দুর্গ। প্রশাসনিক লেবেল গায়ে আটকে অত্যাচারে অনাচারে স্পর্ধিত দুঃশাসনের মহাকাব্যিক প্রতিনিধি হয়ে ওঠে। আবার ভয়ের প্রবল ত্রাসে সে ইমেজ ভেঙেও যায়। পাশাপাশি জীবন্ত ও শিল্পিত হয়ে ওঠে মৃত সূর্য সাহু, নিহত দুলন মাঝি চরিত্র দুটিও। অরিজিতের মত নাগরিক নকশাল কর্মী, সোমাই, বুধনার মতো খোঁচড়, মুসাই টুডুর বউ, ভূপতি, তপা, লক্ষী বেরা, নারাণ বেরা, ক্যাম্পের জলবাহী সাঁওতাল চমরু, সেনা ছাউনির সেনারা প্রত্যেকেই কলমের নিখুত আঁচড়ে নিজের নিজের বাস্তব আবহ সমেত প্রাণ পায়। গৌণ চরিত্ররা কখনো আসে প্রত্যক্ষ ক্রিয়ায়, যৌথ অথবা একক ভাবে, আবার কখনো পরোক্ষে কেবল চেতনার প্রবাহের পথ ধরে।

চরিত্র তাদের যাপিত জীবন সহ আরো জ্যান্ত হয়ে উঠেছে ভাষার হাত ধরে। শ্রেণি চৈতন্যের ফারাকটা আরো দুর্ভেদ্য করে তোলা হয়েছে ভাষার কৌশলী প্রয়োগে। সেনানায়ক অর্জন সিং-এর জন্য বর্ণনা ও সংলাপের ভাষায় এসেছে ইংরেজি ও বাংলার এবং মাঝেমাঝে হিন্দির মিশ্রণ — "তাঁর মনের এ সকল প্রসেসকে আপাতজটিল মনে হতে পারে কিন্তু আসলে তিনি খুবই সরল এভং কাউঠার মাংস খেয়ে তাঁর সেজ ঠাকুরদার মতই তিনিও আনন্দ পান। আসলে তিনি জানেন প্রাচীন গননাট্যরীতির মতো করভোটে বদল হোগা জমানা।"

আবার দোপদী মেঝেনের সংলাপে, বর্ণনায় এবং ভাবনার সংলাপে অনায়াসে উঠে আসে তার নিজস্ব ভাষা, ও স্বাভাবিক স্ল্যাং- "চলতে চলতে ও মাথার চুলে আঙুল চালিয়ে ডাঙর বের করে মারছিল। একটু কেরোসিন পেলে মাথায় ঘসে দিলে উকুন নিকেশ হয়। কিন্তু হারামিরা ঝরণার বাঁকে বাঁকে খেপ মারে। জলে কেরোসিনের বাস পেলে ওরা গন্ধে গন্ধে চলে আসবে।"

নকশালপন্থী নাগরিক অরিজিতের কণ্ঠস্বরে আবার ভাষার মার্জিত রূপ- "যখন জিতছ, তা যেমন জানবে, যখন হারলে, তা মানবে, এবং পরের স্টেজ থেকে কাজ করবে"।

আবার কখনও ভাষার কাব্যিকতা দিয়েই পারিপার্শিক নির্মমতার চিত্র আঁকা হয়েছে। বৈপরীত্যের আঘাতে বাস্তবতা আশ্চর্য শিল্পরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে — ''আবার বানিয়ে নেবার প্রক্রিয়া শুরু হয়। চলতে থাকে। চাঁদ কিছু জ্যোৎস্না বমি করে ঘুমোতে যায়। থাকে শুধু অন্ধকার। একটি বাধ্য হয়ে পা ফাঁক করে চিতিয়ে থাকা নিশ্চল দেহ। তার ওপর সক্রিয় মাংসের পিস্টন ওঠে ও নামে, ওঠে ও নামে"।

গল্পের শেষে প্রতি আক্রমণ শাণিত হয়ে উঠেছে অন্ত্যজের ভাষায় , তৈরি হয়েছে অদ্ভুত ভয়ের আবহ। বাস্তবতা আর শিল্পরূপ এখানেও অনবদ্য হয়ে উঠেছে পারস্পরিক মিথোজীবিতায়।

এভাবেই তিনি নিখাদ জীবনকে এনেছেন গল্পে। আর তাঁর গল্পও নিজের জন্য তৈরি করে নিয়েছে এক স্বতন্ত্র জায়গা। তাঁর 'দ্রৌপদী; 'নুন', 'বিছন', 'ঘন্টা বাজে' স্তন্যদায়িনী; তাঁকে এক অন্যধারার ছোটগল্পকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। যথার্থ মেলবন্ধন ঘটেছে শিল্প আর বাস্তবের ।

২৯.৭ প্রশ্নাবলী

বিস্তৃত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। 'দ্রৌপদী'র প্রেক্ষাপট হিসেবে নকশাল আন্দোলনের ভূমিকা আলোচনা করো।

২। 'দ্রৌপদী' গল্পের কাহিনী ও চরিত্র নির্মাণে নকশালের আন্দোলনের কী আদৌ কোনও ছায়াপাত ঘটেছে আলোচনা করো।

৩। 'দ্রৌপদী' গল্পে পুরাণ প্রসঙ্গ কীভাবে তৎকালীন পরিস্থিতেও জীবন্ত করে তোলা হয়েছে বিশ্লেষণ করো।

৪। 'দ্রৌপদী' গল্পে বর্ণিত অন্ত্যজ জীবন কীভাবে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে উঠে এসেছে তার ওপর আলোকপাত করো।

৫। বাস্তবতার কথা বলতে গিয়ে 'দ্রৌপদী' গল্পে শিল্প কী কোথাও ক্ষুণ্ণ হয়েছে , মতামত জানাও।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১। 'দ্রৌপদী' চরিত্রটি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করো।

২। গল্পটিতে উচ্চ ও নিম্নবর্গের শ্রেণিগত দ্বান্দ্বিকতার জায়গাটি পরিস্ফুট কর।

৩। গল্পে বর্ণিত নারীর প্রতিবাদী চৈতন্যের পরিচয় দাও।

৪। গল্পের অন্যান্য পার্শ্চরিত্রগুলির পরিচয় দাও।

৫। গল্পকার ভাষার প্রয়োগগত ভিন্নতায় কীভাবে বিভিন্ন শ্রেণির পার্থক্য করেছেন তার কয়েকটি উদাহরণ দাও।

৬। নকশাল আন্দলনে নাগরিক মানুষেরাও যে অংশগ্রহণ করেছিল 'দ্রৌপদী' গল্পে তার কিছু চিহ্ন আছে, পরিচয় দাও।

৭। দ্রৌপদী গল্পে সময় কীভাবে জীবন্ত হয়ে উঠেছে তার পরিচয় দাও।

৮। গল্পটিতে চরিত্রের ভাষার মাধ্যমে কীভাবে তাদের শ্রেণি চিহ্নিত করা হচ্ছে তার দু একটি উদাহরণ দাও।

৯। লেখকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামতের সঙ্গে আলোচ্য গল্পলিখনের বাস্তবতার যে সাজুজ্যটি পাওয়া যায় তার পরিচয় দাও।

১০। গল্পে বর্ণিত প্রশাসনিক নির্লজ্জতার পরিচয় দাও।

২৯.৮ গ্রন্থপঞ্জি

সহায়ক গ্রন্থ-

১। কণিকা বিশ্বাস , 'ছায়াদর্পণে মহাশ্বেতা', *এবং মুশায়েরা* , কলকাতা, ২০১১

২। নির্মল ঘোষ, মহাশ্বেতা দেবী , *অপরাজেয় প্রতিবাদী মুখ*, করুণা প্রকাশনী, ১৯৯৮

৩। সুধীরচন্দ্র সরকার (সঙ্কলিত), *পৌরাণিক অভিধান*, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সনস্ প্রাইভেট লিমিটেড , আষাঢ় ১৩৬৫

সহায়ক পত্র পত্রিকা -

১। *অমৃতলোক* ১০৩, মহাশ্বেতা দেবী বিশেষ সংখ্যা, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ

২। *কুড়াল উঠাও* - প্রসঙ্গ — মহাশ্বতা দেবী, জনপদপ্রয়াস, চুচুঁড়া, ২০০৩

৩। *কোরক সাহিত্য পত্রিকা*, বইমেলা ১৯৯৩, মহাশ্বেতা সংখ্যা

৪। *বর্তিকা*, পুরুলিয়া, জুলাই-ডিসেম্বর, ১৯৯৬

৫। *শিল্পসাহিত্য*, ১ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ২০০৯

৬। *সাহিত্য পত্র* — নহবত — বিশেষ ক্রোড়পত্র মহাশ্বেতা দেবী

NOTES